আয়ুর্ব্বেদ

আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ এল, এম, এস,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত কবিভূষণ,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন
মহোদয়গণের তত্ত্বাবধানে

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ

(সন ১৩২৮ আশ্বিন হইতে ১৩২৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

কলিকাতা
২০৯ নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট—আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজ হইতে কবিরাজ
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য—ডাক মাশুল সহ ৩।৶০ আনা মাত্র
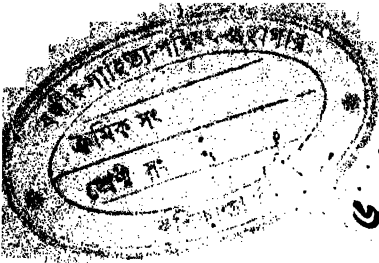
৬ষ্ঠ বর্ষের প্রবন্ধ সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা

আয়ুর্ব্বেদ

৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—আশ্বিন। | ১ম সংখ্যা।

ষষ্ঠ বর্ষ।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার করুণা বলে "আয়ুর্ব্বেদ" পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই পাঁচ বৎসর কাল "আয়ুর্ব্বেদ" পরিচালনায় আমরা যে কত বাধা—কত বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এখন কার দিনে যাঁহারা মাসিকপত্রের পরিচালক, তাঁহারাই অবগত আছেন। ইংরেজ-জর্ম্মনীর যুদ্ধের সময় হইতে কাগজের মূল্য—প্রেসের মূল্য—কর্ম্মচারীদিগের বেতন—সমস্তই প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, অনেক "মাসিকে"র অস্তিত্বও এই কারণে এই দুই বৎসরের মধ্যে লোপও পাইয়াছে। "আয়ুর্ব্বেদ" এই সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যে যে যথারীতি বাহির হইতে পাইয়াছে,—ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে। শ্রীভগবানের অপার করুণার সহিত গ্রাহকবৃন্দের অনুকম্পা লাভই আমাদের এই সৌভাগ্যের কারণ।

"আয়ুর্ব্বেদ" প্রচারের উদ্দেশ্যের কথা অবগত আছেন। তথাপিও নূতন গ্রাহকদিগের জন্য আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে চাই।

আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির নিদান এবং প্রশমনের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত থাকে, তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণ এই সকল উপদেশ তাঁহাদিগের প্রণীত নানা গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ শিক্ষা করিলে মানব অজর—অমর—অক্ষয় হইতে পারে, কিন্তু সে সকল উপদেশ শিক্ষার প্রবৃত্তি অনেকের থাকিলেও সে সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এখনকার দিনে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনকারীর সংখ্যা অতি অল্পই বলিতে হইবে, কাজেই ঋষি প্রণীত সংস্কৃত শাস্ত্রগুলি আয়ত্ত করিবার যোগ্যতা অনেকেরই নাই। আমরা বাঙ্গালীর মাতৃ-

পূরণ করিব—ইহাই আমাদিগের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। আমরা এই পাঁচ বৎসরকাল সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান উপদেশ—আয়ুর হিতাহিত বর্ণন—আমরা এই জন্যই ব্যাধির নিদান এবং প্রশমনের উপায় অপেক্ষা অধিক করিয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

বাস্তবিক রোগ হইলে ঔষধ সেবন করিতে হইবে—সে তো সত্য কথা, কিন্তু যাহাতে আদৌ রোগ জন্মিতে না পারে—তাহারই ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নহে কি ? এই কর্ত্তব্য পালনই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য,—সেইজন্যই "আয়ু-র্ব্বেদে" স্বাস্থ্যরক্ষার কথা বেশী করিয়া আলোচনা করা হয়। চিকিৎসক অপেক্ষা সাধারণের মধ্যে আমাদের গ্রাহকও সেইজন্য অধিক।

ব্যাধির নিদান এবং প্রশমনের উপায়ও এই পাঁচ বৎসরে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি এবং এখনও করিব। আমাদের দেশে অসংখ্য টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ ছিল, যে গুলির নিকট এক সময় বড় বড় ঔষধও কৃত-কার্য্যতায় পরাভব স্বীকার করিত। কালক্রমে সে সকল টোটকা ও মুষ্টিযোগ এখন বিলুপ্ত। আমরা গত পাঁচ বৎসরে সে সকল টোটকা ও মুষ্টিযোগ যতটা পারিয়াছি, পাঠকগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত করিয়াছি, এখনও সে চেষ্টা আমাদের যথেষ্ট রহিয়াছে। গবেষণা মূলক অন্যান্য প্রবন্ধ অপেক্ষাও আমরা এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ টোটকা ও মুষ্টিযোগের পুনরু-দ্ধার করিয়া প্রকাশ করিলে অধিক কৃতার্থ অনুভব করিয়া আসিয়াছি এবং এখনো করিব।

লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি আমাদের যেমন মুখ্য উদ্দেশ্য, দেশবাসী সদাচার ও সদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক যাহাতে রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিতে পারে, আধিব্যাধির লীলা নিকেতন বঙ্গভূমির অধি-বাসিগণ যাহাতে সহজসাধ্য ব্যবস্থায় স্বল্পব্যয়ে আরোগ্যসুখ উপভোগ করিতে পারে—"আয়ু-র্ব্বেদের" প্রচারে ইহাই আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সকল মহানুভব ব্যক্তি "আয়ুর্ব্বেদে"র গ্রাহক থাকিয়া এ পর্য্যন্ত "আয়ুর্ব্বেদ"কে জীবিত রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ, তাঁহাদিগের এই মহানুভবতাপূর্ণ সাহায্য ভিন্ন আমরা যে এতদিন ইহাকে জীবিত রাখিতেই সক্ষম হইতাম না—ইহা ধ্রুব সত্য কথা। আমরা আজি এই ষষ্ঠবর্ষের আরম্ভকালে সেই খাঁটি সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলাম।

যে সকল লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধাদি প্রদানে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন, এই শুভ অবসরে তাঁহাদিগের নিকটও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।"

এই পাঁচবৎসর কাল আমরা "আয়ুর্ব্বেদকে" লালন করিয়া আসিয়াছি, এখন ইহার পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। এখন ইহার যে সকল ত্রুটী লক্ষিত হইবে, তোমরা তাহা তাড়না দ্বারা ইহাকে নির্দ্দোষ করিতে চেষ্টা কর,—স্বদেশ সেবক মহাপুরুষগণ! তোমাদিগের নিকট ইহাই আমাদের বিনীত বক্তব্য।

আর্য্য চিকিৎসা।

—:•:—

আর্য্য চিকিৎসাই জগতের আদি চিকিৎসা। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ইন্দ্র কর্তৃক ইহা ঋষিসমাজে বিস্তারিত হইয়া পড়ে এবং ঋষিদিগের কঠোর সাধনার ফলে ইহা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে আরব, আরব হইতে গ্রীস এবং গ্রীস হইতে সমগ্র জগতে ইহাই প্রকার ভেদে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এ সব তথ্য অনেকেই জানেন, আমরাও অনেকবার বলিয়াছি, সুতরাং সে সব পুরাতন কাহিনীর নূতন করিয়া আলোচনায় আর বড় বেশী প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়ই সনাতন আর্য্যচিকিৎসার অবনতির সূচনাকাল। সে সময় আয়ুর্ব্বেদের গর্ব্ব সাক্ষাৎভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত না হইলেও মুসলমান সমাগমে এই চিকিৎসা আরবীয়গণ যে গ্রহণের সুযোগ অবসর পাইলেন, ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসার উৎপত্তি তাহারই ফলসম্ভূত। এই সময় আর্য্য চিকিৎসাবৃত্তিধারিগণও শাস্ত্রীয় চিকিৎসার উন্নতিকল্পে অনেকটা শিথিলমনোযোগ হইলেন, যথাশাস্ত্র শিক্ষালাভের দীক্ষা গ্রহণ না করিয়াও অনেকে চিকিৎসাবৃত্তি পরিগ্রহ করিলেন, ক্রমে শল্য চিকিৎসার বিলুপ্তি সাধনে আর্য্য চিকিৎসার গর্ব্ব-গরিমা একেবারে নষ্ট হইয়া পড়িল।

তাহার পর ইংরাজ বাহাদুর ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে মনোযোগী হইলেন বটে, কিন্তু সনাতন চিকিৎসার প্রসার-কামনায় কোনরূপ সাহায্যই করিলেন না,—কেহ তাঁহাদিগকে করিতেও বলিল না,—অধিকন্তু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রসার কামনায় উহারই বিস্তৃতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য চিকিৎসাবৃত্তিধারিগণ তো একেই উপযুক্ত শিক্ষায় অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছিলেন, এই সময় রাজকীয় সাহায্যের অভাবে প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থাটা তাঁহাদের মধ্যে আরও শিথিল হইয়া পড়িল। বৈদ্যজাতির যে সকল বালক মেধাবী বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে আর আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাদান করা হইত না, তাহারা ইংরাজী শিখিয়া বড় বড় চাকরি করিত। যাহাদিগের বুদ্ধি মার্জ্জিত বলিয়া বিবেচিত হইত না, যাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও ইংরাজী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিত না, চাকরিলব্ধ অর্থে যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারিবে না বলিয়া একরূপ স্থির সিদ্ধান্তই হইয়া যাইত, জীবন মরণের দায়ীত্বপূর্ণ বৃত্তি—আর্য্য চিকিৎসা-শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাহাদিগকেই নির্ণয় করা হইত। ফলে সনাতন আর্য্য চিকিৎসার উন্নতির অন্তরায় এইরূপেই উপস্থিত হইয়াছে।

এখন কিন্তু দেশের লোকের মতিপ্রবৃত্তি একটু অন্তরূপে ফিরিয়া আসিতেছে। স্বদেশের

শিল্প-বাণিজ্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান—সকল বিষয়েরই উন্নতির জন্য এখন ভারতবাসী ব্যস্ত হইয়াছে। আর্য্য চিকিৎসার পুনরুন্নতি করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই অবসরে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আর্য্য চিকিৎসার পুনরুন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইলে আর্য্য চিকিৎসা আবার যে মাথা তুলিতে পারে তাহা সুনিশ্চয়।

এ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল স্কুলের বৃদ্ধি কামনায় অনেকেই এখন আগ্রহান্বিত। কিন্তু সেই আগ্রহটা আর্য্য চিকিৎসার উন্নতিকল্পে যে কেন করা হয় না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর্য্য চিকিৎসা যে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা এবং এই চিকিৎসার ঔষধ বলী অনেক স্থলেই যে পাশ্চাত্যদেশীয় চিকিৎসা অপেক্ষা সমুন্নত—সে বিষয়ে তো আর সন্দেহমাত্র নাই। পাশ্চাত্য দেশের মনস্বিগণও একথা অস্বীকার করেন না। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ জজ সার জন্ উড্রফ তাঁহার "ভারতশক্তি" নামক ইংরাজী পুস্তকের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে ডাক্তারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা বহুলভাবে হইতেছে, অথচ এই দেশে মহোপকারী গাছ-গাছড়া প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আমি স্বয়ং ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি—ইহা বিশেষ উপকারী। কোন কোন এ্যালোপ্যাথিক ঔষধে যেরূপ অপকার হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজে সেরূপ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য বস্তু যেমন তীব্র নহে, ভেষজসমূহও সেইরূপ তীব্র নহে, অথচ স্বভাবের অবিরোধী হইয়া কার্য্য করে। এই সমস্ত ভেষজ অল্প মূল্যে সহজে পাওয়া যায় এবং কতকগুলি এত প্রচুর পরিমাণে জন্মায় যে মাত্র সংগ্রহ করিবার খরচেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত ভৈষজের এত গুণ থাকিলে কি হইবে? ইহারা তো আমার পাশ্চাত্য দেশজাত নহে? আমার কোন ভৃত্য পীড়িত হইয়া বলিয়াছিল, আমাকে বিলাতী ঔষধ দিন, কারণ তাহার স্বদেশীয় ভেষজের উপর তাহার নিজেরই বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাসের অভাবেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিদেশী ঔষধ বিতরিত হয় এবং এদেশবাসীরাও বিদেশী ঔষধ ক্রয় করে। অথচ বিদেশী ঔষধ বহু দূর হইতে আনীত হওয়ায় এ দেশের ভেষজ অপেক্ষা কত অধিক মূল্য লাগে। যে দেশবাসীরা ক্রমাগত বিদেশী ঔষধ, বিদেশী বস্ত্র এবং বিদেশী অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে, সে দেশের অর্থসম্পদ কিরূপে বৃদ্ধি পাইবে? অথচ তাঁহারাই বলিতেছেন যে, দেশ দরিদ্র হইয়া যাইতেছে। সেকালের কবিরাজ মহোদয়গণের নাড়ী জ্ঞান এবং খাঁটি আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছে, ইহাও একান্ত দুঃখের বিষয়। শুনিতেছি, দেশী গাছ গাছড়ার ঔষধের কারখানা হইতেছে। আবার সেই পাশ্চাত্য ভাব! কারখানার যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ কখনও কি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে হস্ত দ্বারা প্রস্তুত ঔষধের সমকক্ষ হইতে পারে? যোগেন্দ্র রসে যে লৌহ প্রদত্ত হয়, উহা সহস্র পুটিত, উহা কি কারখানায় হইতে পারে? যে দেশে এত প্রকার উপকারী ভেষজ রহিয়াছে সে দেশে বিদেশী ঔষধ আমদানী না করিলেও চলিয়া যায়। কোন উৎসাহশীল ইউরোপবাসী যদি

একণে এ দেশের গাছ গাছড়ার ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বহু এ দেশবাসী নকলনবীশ অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবে। যে জিনিস এখন এদেশীয় ব্যক্তিরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন, সেই সমস্ত জিনিস যদি বিদেশীয়েরা আদর করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আবার দেশের লোক সাদরে ঐ সকল গ্রহণ করিবেন।"

সার জন উড্‌রফ নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ব্যক্তি, তাই তিনি অনেকের অপ্রিয় হইলেও এত বড় সত্য কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের পাশ্চাত্য সভ্যতা-মুগ্ধ অনেকে কিন্তু এ কথাটা বুঝেন না। যদি তাহা বুঝিতেন,—তাহা, হইলে দেশীয় চিকিৎসার উন্নতির সঙ্গে দেশের অর্থও অনেক বাঁচিয়া যাইত। তদ্ভিন্ন দেশীয় ঔষধে দেশের লোকের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকারটাও বড় কম নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতামুগ্ধ বাঙ্গালী বাবু এখন যে কুইনাইনের অদ্ভুত জ্বরনাশক শক্তি দেখিয়া তদ্গদভাবে কুইনাইনের পক্ষপাতী, অনেক বড় বড় ইংরাজ ডাক্তারও অনেক সময় সে হেন কুইনাইনের নিন্দা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কুইনাইনকে ম্যালেরিয়ার বীজাণুনাশক বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন না হইতে পারে, কিন্তু যখন-তখন জ্বর হইলেই যে অনেকে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহা যে আদৌ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে, তাহা খাঁটি সত্য কথা ;—বরং যে-সে জ্বরে যখন-তখন কুইনাইনের ব্যবহারে বিপরীতই ফল হইয়া থাকে ইহাও ধ্রুব সত্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি করিতে হইলে কুইনাইনের মত ম্যালেরিয়ার বীজাণুনাশক ঔষধের বহুল প্রচার আমাদিগকে করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাহার অভাবও নাই। যাঁহারা হরিতাল ঘটিত ঔষধ কখন কুইনাইনের স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছেন। কুইনাইনের ম্যালেরিয়া বীজাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা, তবে জ্বর বন্ধ করিবার যে শক্তি অদ্ভুত তাহা অস্বীকার করিনা, কিন্তু আমাদের হরিতাল ঘটিত ঔষধে জ্বর-বীজাণু নষ্ট করিবার যে শক্তি আছে তাহাও অবিসংবাদিত সত্য কথা। ঋষি এই হরিতালের গুণ বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্।
কণ্ডূ কুষ্ঠাস্য রোগাস্র কফপিত্তকচ ব্রণান্॥

অন্যচ্চ-হরিতালং হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠ মৃত্যু জরাপুহম্।
শোধিতং মারিতং কান্তিং কুরুতে বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥

অর্থাৎ—হরিতাল ভস্ম—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ, বিষঘ্ন, কফপিত্ত নাশক, কান্তিজনক, অকালমৃত্যু নিবারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। ইহা সেবন করিলে কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তবিকৃতি, কেশব্রণ ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় শান্তি হয়।

যাক্, ধান ভানিতে শিবের গীত আনিয়া ফেলিয়াছি। কুইনাইন বা হরিতালের তুলনামূলক সমালোচনার এক্ষেত্রে প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হইতেছে—সনাতন আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির প্রয়াসে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। সে মনোযোগটা

কিরূপভাবে হওয়া উচিত তাহারই আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ এ্যালোপ্যাথির নিকট আয়ুর্বেদ মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছে না—দুইটি কারণে। ১ম—নূতন জ্বরে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অপেক্ষা এ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইলে রোগী শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদের মতে নবজ্বরের চিকিৎসা করিতে হইলে—

জরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্ন প্রতিভোজিতম্।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তম্॥

অর্থাৎ জ্বরের ছয় দিন অতীত হইলে সপ্তম দিবসে রোগীকে লঘু অন্ন (যবাগূ) প্রভৃতি ভোজন করাইয়া অষ্টম দিবসে পাচন বা শমন কষায় ব্যবস্থা করিবে।

এ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামেস্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামেঽৌষধমাচরেৎ॥

অর্থাৎ সপ্তাহের পর আমরসের সম্যক পরিপাক না হইলে পাচন এবং নিরাম অবস্থায় (আম-সম্যক পরিপাক হইলে) শমন ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদি আমরসের পরিপাক না হয়, তবে পাচন কি শমন কোন প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করিবে না, কারণ আমরসের অপক্ক অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহা পরিপাক না হইয়া জ্বরের বেগ আরও বৃদ্ধি করে।

এ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্র কিন্তু এ কথা মানেন না। তাঁহারা জ্বর আরম্ভের পরই জ্বর-প্রশমক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। তদ্দারা জ্বরবেগ কমিয়া আসিলে জ্বরঘ্ন কুইনাইন প্রয়োগে জ্বর বন্ধ করিয়া থাকেন। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা ভাল হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলেই রসের অপরিপক্ক অবস্থায় এইরূপভাবে জ্বর বন্ধ করার ফলে শরীরের ভিতর যে দোষ সকল বদ্ধ থাকিয়া যায়, জ্বরের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ তাহারই ফলসম্ভূত। যাহা হউক আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে এ্যালোপ্যাথির সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবশ্যক। নবজ্বরে ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে একেবারেই মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়াছেন, তাহাও নহে, প্রয়োজন হইলে রসৌষধির প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশও দিয়া গিয়াছেন, যথা—

ন দোষাণাং ন রোগানাং
ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং
রস চিকিৎসিতে॥

অর্থাৎ রস চিকিৎসা বিষয়ে দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও ~~কাল~~—ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে সাত দিন অপেক্ষা না করিয়াও রসৌষধির ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

এ্যালোপ্যাথির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদিগকে নবজ্বরের চিকিৎসার জন্য বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রসৌষধির ব্যবস্থায় অতি শীঘ্র রোগ প্রশমনের উপায় করিতে হইবে। জ্বরবেগ হ্রাস করাইবার এবং জ্বর প্রশমনের পক্ষে আমাদের শাস্ত্রে সেই সকল রসৌষধিরও অভাব নাই। অধিকন্তু

চিকিৎসকগণ সেই সকল বিষয়ে গবেষণা করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিবে।

২য় কথা—আর্য্য চিকিৎসার অবনতির অন্যতম কারণ শল্য চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের অনাস্থা প্রদর্শন। বাস্তবিক এই ক্ষেত্রেই আমরা এ্যালোপ্যাথদিগের অনেক নিম্নস্থানে পতিত হইয়াছি। আর্য্য চিকিৎসাই যে সকল দেশের চিকিৎসার মূল, সূত্র, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং বলা বাহুল্য যে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আজি শল্য কর্ম্মে আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া তুলিলেও উহা আর্য্য চিকিৎসা হইতেই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। শল্যকর্ম্মের প্রকরণ পদ্ধতি আয়ুর্ব্বেদে কিরূপ বিশদভাবে বর্ণিত, তাহা যাঁহারা সুশ্রুতসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই উহা অবগত আছেন। এ বিষয়ে আজি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সমুন্নত হইলেও এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের বর্ণনা সুশ্রুত-সংহিতায় পড়িয়া দেখিলে অনেক স্থলে এ্যালো-প্যাথিক শাস্ত্র অপেক্ষাও বিশদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। মানব দেহের অস্থি নির্ণয়ে এ্যালো-প্যাথিক শাস্ত্রে দুই শতেরও কিছু বেশী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সুশ্রুতসংহিতায় বিশদভাবে লিখিত আছে যে—মানব দেহে দুইশত ছচল্লিশ খানি অস্থি নিহিত আছে। অনেক ক্ষেত্রে সুশ্রুত সংহিতার সহিত এ্যালো-প্যাথিকের অনেক সৌসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্থলেই অস্থি প্রভৃতির ইংরাজীর নাম গুলির অনুবাদ করিলে সুশ্রুত সংহিতার নাম গুলির সহিত ঐক্য হয়। যাহা হউক আমাদের বক্তব্য—অ্যানাটমী ও সার্জ্জারির আলোচনায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অমনোযোগী হইলেও তাঁহাদের নিজস্ব ভাণ্ডারে সে সকল রত্নের অভাব নাই। বহু-দিনের অনমুশীলনে তাঁহারা সে সকল রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের নষ্টগৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবার সেই রত্না-বলীর অন্বেষণের আবশ্যক। এজন্য ভবিষ্যৎ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিগণকে সুশ্রুত সংহিতা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে practical জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য এ্যালোপাথিক চিকিৎসক দিগের নিকট হইতে ও শল্যতন্ত্রের শিক্ষা করিয়া হাতে কলমে উহাতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কারণও ইহাই। সংপ্রতি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠেও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়েরই মত এ সকলের ব্যবস্থা হইতেছে। এই জাতীয় জাগরণের দিনে দেশের লোকে ডাক্তারি স্কুলের প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস অপেক্ষা এই দুইটি আর্য্য চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠ-পোষক রূপে যদি ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং এই ধরণের আরও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির আয়োজন করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যেমন আর্য্য চিকিৎসার লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে, সেইরূপ জাতীয় বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়াও দেশবাসী ধন্যমনা হইতে সমর্থ হইবেন।

অধুনা দেশনায়কগণের শুভ দৃষ্টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যে পতিত হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই সুখের কথা। কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্ব্বেদীয়—সকল প্রকার চিকিৎসা প্রচারের চেষ্টা কেন যে তাঁহাদের প্রাণে জাগিয়া উঠিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা। জাতীয় চিকিৎ-

সার উন্নতিই তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতীয় চিকিৎসার বিদ্যালয় ভিন্ন জাতীয় আখ্যায় অভিহিত করিয়া বিদেশীয় চিকিৎসার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—"সোণার পাথর বাটী" সদৃশ বলিয়াই আমাদের অনুমান হয়। জাতীয় বিদ্যালয় হইতে বিদেশীয় চিকিৎসক প্রস্তুত করিলে সেই সকল চিকিৎসক যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেন, তখন তাঁহাদের ব্যবহৃত ঔষধ সকল কোথা হইতে আসিবে? স্বীকার করি, বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসের মত আরও কতকগুলি কারখানার প্রতিষ্ঠা তাঁহারা করিতে পারেন, কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক সমস্ত ঔষধই কি আমাদের দেশে উৎপন্ন হইতে পারিবে? আর তা' ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু যে যে মতে শিখিতে চাহে—তাহাকে সেই মতেই শিখাইব—ইহা মনে করিয়া সকল চিকিৎসার শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কতটা সমীচীন তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। কায়মনোপ্রাণে আর্য্য চিকিৎসারই শ্রীবৃদ্ধি কামনায় আর্য্যচিকিৎসারই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সেই স্থানেই তুলনামূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি এবং তাহা হইলেই তদ্বারা যেমন আয়ুর্ব্বেদের হিত সাধন করা হইবে, সেইরূপ এই জাতীয় জাগরণের দিনে প্রকৃতই যে স্বদেশের—স্বজাতীয় মহান কল্যাণকর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে—তাহা ধ্রুব সত্য।

আর্য্য চিকিৎসা শাশ্বত কাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব আলোক-সুধা বিতরণ করিয়া আসিতেছে। রোগনির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ, বস্তিকর্ম্ম, শস্ত্র চিকিৎসা ও রসায়ন প্রভৃতি চিকিৎসার সমুদায় প্রয়োজনীয় বিষয়ই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অতি সুন্দর ও সম্যকরূপে বিবৃত আছে। রসায়ন গ্রন্থ সকলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ এবং তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগ হেতু উৎপন্ন নূতন নূতন গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি রাসায়নিক নিয়ম সকল বিশদরূপে ও সুপ্রণালী ক্রমে বিবৃত আছে। পারদের সংস্কার ও সমুদায় রোগেই তাহার অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবার অত্যাশ্চর্য্য কৌশল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের নিকট সকল চিকিৎসা শাস্ত্রই পরাজিত। ভিন্ন দেশীয় চিকিৎসার প্রচলনের পূর্ব্বে বোধ হয় পারদ সেবন জন্য বিকৃতি সংঘটন কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। ফল কথা, সকল দিক আলোচনা করিলে ইহা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারা যায় যে, চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনো বিষয়ের জন্য আয়ুর্ব্বেদ পরিত্যাগ করিয়া অন্য চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার ভারতবাসীর কোনো প্রয়োজনই হয় না। বিশে-ষতঃ ভারতবর্ষীয় দিগের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত' চিকিৎসা ভিন্ন অন্য দেশীয় চিকিৎসা কখনো শুভদও নহে।

আমাদের আর্য্য-চিকিৎসার নাই কি? সুবিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব তাঁহার প্রণীত হিন্দু সিস্টেম্ অব্ মেডিসিন নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—Comnentary on the. Hindu system of medicine. By T. A. wise, M. D. New issue, London 1860 Poge

XVI. অর্থাৎ যে রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শারীর স্থান লিখিত।* এ হেন তোমাদের রত্ন অন্যে গ্রহণ করিয়া সম্মান-সমৃদ্ধিতে দেশমান্য হইলেন, আর তোমরা সে রত্ন হেলায় হারাইয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্য সম্পদে আবেগ পূর্ণ আকুল দৃষ্টিতে ফেল্ ফেল্ নেত্রে চাহিয়া রহিলে! ছি! তোমরা,— ধিক তোমাদের! তোমাদের আর কি বলিব!

যাহা হউক এতদিন যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখনও তোমরা লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সংকল্প হও- এখনও সেই ফল মূলাশি আর্য্য ঋষির অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের গবেষণা গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আয়ত্ত করিয়া আর্য্যমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কর, দেখিবে তোমার ভারত গগনে নব-রাগ প্রদীপ্ত সুখ সূর্য্য আবার উদিত হইয়া শীত বাতাতপাদি হইতে তোমাকে পূর্ব্বের মত আবার রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে—তোমার বীজানুদুষ্ট ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া বালার্ককিরণে তোমাকে স্নিগ্ধ শান্ত মধুরোজ্জ্বল বেশে এক অপূর্ব্ব দেবকান্তি পুরুষ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পারিবে কি বাঙ্গালি! তোমার নিজের এবং স্বজাতীর কল্যাণ সাধনের জন্য এই রূপ ভাবে আবার আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে পারিবে কি? পারিলে কিন্তু তাহা হইতে যে অমৃতময় ফল লাভ করিবে—তাহাই তোমাকে অমর—অজর—অক্ষয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে।

অথ বর্ষপ্রশস্তিঃ।

[কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ]

—:*:—

ত্রৈবিদ্যা অপি যং বদন্তি নিখিলার্থানাং বরং কার্য্যতঃ
সর্ব্বার্য্যার্চ্চিতমাত্মগৌরবকরং সর্ব্বার্থসংসাধকম্।
তং বন্দে প্রতিপত্তয়ে চিরনতো নিত্যপ্রসাদার্থকঃ
আয়ুর্ব্বেদ মনন্তমঙ্গলকরং তদ্ভূ হৃৎপদ্মজং ॥
নানাবিঘ্নমতীত্য যস্য কৃপয়ায়ুর্ব্বেদপত্রং সতাং
সম্প্রাপ্যাদরমদ্য সম্পরিণতং বর্ষে হি ষট্‌পূরণে।
শ্রীমদ্ধন্বন্তরভাগসম্ভববিভুং বৈদ্যাবতারং শুভং
তং ধন্বন্তরিমানতো নরম্ভরং বন্দে জগদ্বন্দিতং ॥
মহানুভাবা! মহতাং ভবাদৃশাং
পরানুকম্পাগুণতো গুণপ্রিয়াঃ।
দিনে দিনে বর্দ্ধিত গৌরবোজ্জ্বলং
বিবর্দ্ধতে পত্রমিদং হি বৈদ্যকং ॥

নকিঞ্চিদত্রাস্তি হিনঃ সমুন্নতো
মহত্ত্বমর্থে পরিচারকত্বতঃ।
সদুর্ব্বরক্ষেত্রগুণেন চীয়তে
কৃষির্যথা বপ্তৃ গুণৈর্নতাদৃশং ॥
প্রসাদতোবো মহনীয়মানসা!
স্তথাসতাং তদ্ ভিষজামনুগ্রহাৎ।
যথাক্রমং বর্দ্ধিত গৌরবং ভবং
কৃতজ্ঞতাং জ্ঞাপয়তীহবো মুদা ॥
সুস্নিগ্ধয়া সকৃপয়া সগুণানুকম্পা!
দৃষ্ট্যাবয়া চিরমিদং পরিপালিতং বঃ।
সৈব স্বভাব সুলভা সহজা সদ্ধান্তাং
পূর্ব্বেব মঙ্গলকরী চিরমত্র পত্রে ॥

আয়ুর্ব্বেদের জয়।

[ডাঃ শ্রীউপেন্দ্র নাথ বসু এল, এম, এস]

—— :o: ——

অনেক সময় সকল চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি নিজে অ্যালোপ্যাথ, মেডিক্যাল কলেজের সে কালের এল, এম, এস, ডিগ্রীধারী,—এখনও হাসপাতালের চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত থাকায় অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া থাকি, কিন্তু অ্যালোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথির আমি বেশী গোঁড়া। কারণ অনেক সময় দেখিয়াছি, অ্যালোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিতে অতি শীঘ্র অধিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কতকগুলি ঘটনায় দেখিয়াছি, হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথি অপেক্ষা কবিরাজী চিকিৎসা যেন মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করিয়া থাকে। আমি নিজে অবশ্য অ্যালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথির মত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সেরূপ ভাবে অধ্যয়ন করি নাই, কিন্তু মোটামুটি এ সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কবিরাজীর কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমি এই "আয়ুর্ব্বেদে"ই এক সময় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে ডাঃ আর, এল, দত্ত মহাশয়ের ব্যবস্থায় পক্ষাঘাতে "গুড়চ্যাদি তৈলে"র অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। সংপ্রতি একটী টায়ফয়েড,

জ্বরে কবিরাজীর কৃতকার্য্যতার কথা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

ঘটনাটি প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বের। এই টায়ফয়েড্ জ্বর হইয়াছিল—এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রেরই সম্পাদক সত্যবাবুর তৃতীয়া কন্যার। সত্যবাবুর পরিবারবর্গ তখন শান্তিপুরের নিকট হরিপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সত্যবাবু সব সময় হরিপুরে থাকিতেন না। তা' ছাড়া আমি শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার, সেই জন্য আমারই উপর মেয়েটার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। হরিপুর,—শান্তিপুর হইতে দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। আমি চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রতিদিনই অশ্বাযানে ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সে রোগীটিকে দেখিতে যাইতাম, প্রয়োজন হইলে কোন দিন বা দুইবারও যাইতাম।

জ্বর এবং অতিসার উভয়ই প্রবল ভাবে বর্ত্তমান ছিল। তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ—ক্রমশঃ সান্নিপাতিকের সকলগুলিই প্রবল হইতে প্রবলতর ভাবে উপস্থিত হইল। আমি চিকিৎসা করিতে লাগিলাম—হোমিওপ্যাথি, কারণ আমি হোমিওপ্যাথির অতিশয় গোঁড়া,—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক আমার চিকিৎসা সত্ত্বেও ক্রমশঃ মেয়েটির অবস্থা ভীষণই হইতে লাগিল,—গৃহস্থ তথাপি চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিলেন না।

সে দিন ৺ শ্যামাপূজা। মেয়েটির সে দিন ২১ দিন। বিকারের সমস্ত লক্ষণই দেখা দিল। আমার বাড়ীতে একটু মায়ের পূজা হইয়া থাকে; অনেক গুলি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবাসীর পদধূলিও সে জন্য পড়িয়া থাকে। কিন্তু আমি এই মেয়েটির দুরন্ত ভার রাখায় সেদিন আর বাড়ীতে তিষ্ঠাইতে পারিলাম না, সে দিনের অধিকাংশ সময় হরিপুরেই কাটাইয়া দিলাম।

হোমিওপ্যাথির গুণেই হউক বা রোগীর পরিচর্য্যায় উপযুক্ত যত্ন লওয়ার জন্যই হউক সত্যবাবুর শিশুকন্যার ক্রমশঃ বিকৃতির অবস্থা কাটিয়া উঠিল। যেমন দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, তেমনি মেয়েটিও আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এমনই করিয়া দুই মাস কাটিয়া গেল,—বিকারের চিন্তা তো তখন আর নাই-ই, অধিকন্তু অনেক সময় তাহাকে বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে উপবিষ্টা থাকিতে দেখিয়া বেশ সুস্থ বলিয়াই অনুমিত হইত। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার নাড়ী হইতে জ্বরবেগ ঘুচিলনা। প্রাতে টেম্পারাচার লইলে ১০০° এবং অপরাহ্ন কালে ১০১°। ইহা আমার হানিম্যানের নানা প্রকার ব্যবস্থাতেও কিছু করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন আমি বাধ্য হইয়া কন্যার পিতাকে আয়ুর্ব্বেদ মতে বিষমজ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলিলাম। এই সময় তাহার পেটে একটু প্লীহাও দেখা দিয়াছিল। কন্যার পিতা ব্যবস্থা করিলেন—এক বেলা "বিষম জ্বরান্তক লৌহ" (পুট পক্ক) এবং অপর বেলা "গুড় পিপ্পলী"। আশ্চর্য্য, এই ব্যবস্থার ১ সপ্তাহ পরেই আমরা যে জ্বরটিকে কিছুতেই ছাড়াইতে পারি নাই, তাহা অতি আশ্চর্য্য রূপে অন্তর্হিত হইব। আমি আর্য্য ঋষির ঔষধের ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

পল্লীচিত্র।*

[শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

একি সেই বঙ্গপল্লী, শান্তির আগার!
কে বলিবে কোন্ পাপে,
কোন্ দেবতার শাপে,
ঘুচে গেছে অতীতের সৌভাগ্য তাহার।
মানব-মানস-লোভা,
কোথা সে সৌন্দর্য্য শোভা,
কোথায় সে প্রকৃতির রম্য উপবন;
নীর শূন্য সরোবর,
নর শূন্য জীর্ণ ঘর,
বাড়িতেছে চতুর্দ্দিকে জঙ্গল ভীষণ!
নির্ম্মম নিয়তি তা'র,
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,
"ম্যালেরিয়া", কলেরার নিত্য লীলাস্থল;
শমনের সহচর
এসেছে "সমর জ্বর"—
রক্ষা নাই, পল্লীভূমি যায় রসাতল।
পড়িয়াছে এই জ্বরে,
প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে,
কেবা কা'কে দেখে, কেবা কা'কে দেয় জল।
ঔষধ কোথায় পাই,
চিকিৎসক গ্রামে নাই,
ঘুরিছে শমন-দূত হাতুড়ের দল।
গরিবের ধন হরি',
উদর পূরণ করি',
জল দিয়া শিশি-ভরি করে সর্ব্বনাশ;
দরিদ্র সরল প্রাণে,
অর্থ দিয়া মৃত্যু আনে,
শেষ তা'র থাকে শুধু অশ্রু দীর্ঘ শ্বাস।
চল যাই দেখে আসি,
নগ্ন, রুগ্ন, উপবাসী,
কত লোক পল্লীগ্রামে করে হাহাকার;
আমরা পল্লীর ছেলে,
আসিয়াছি মাকে ফেলে,
বারেক জাগেনা প্রাণে, কি দশা তাঁহার।
আমাদের তৃপ্তি তরে,
নিত্য যা'রা শ্রম করে,
আমাদের খাদ্য দিয়ে নিত্য উপবাসী;
দুঃখী তা'রা—মূর্খ তা'রা,
আজীবন খেটে সারা,
বিপন্ন হ'য়েছে তা'রা, চল দেখে আসি।
ঔষধ ও অন্নবস্ত্র,
লও জল, চল ত্রস্ত,
মুছা'তে দীনের অশ্রু, বিলম্ব না সয়;
কর আত্মপদে ভর,
ঘুচাইতে অতঃপর,
পল্লী-জননীর নিত্য অভাব নিচয়।
কে আছ মায়ের ছেলে,
উঠ এ জড়তা ঠেলে,
জননীর কোলে ফিরে চল পুনর্ব্বার,—
মায়ের চরণ ধূলি,
লও শিরোপরে তুলি,
সার্থক হউক জন্ম জীবন এবার,
মাতৃভূমি হ'লে ধ্বংস,
লুপ্ত হ'লে ভ্রাতৃবংশ,
কোথা র'বে মাতৃভাষা, কোথা তা'র স্থান?
পল্লী-কবি কহে ভাই হ'ও সাবধান!

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নদীয়া শাখার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আয়ুর্ব্বেদ প্রতিভা

(দৃশ্যকাব্য)

———:•:———

প্রথম অঙ্ক—১ম দৃশ্য।

[স্থান—চ্যবন ঋষির সিদ্ধ কানন,—রাজা শর্য্যাতি ও সুকন্যার প্রবেশ]

শর্য্যাতি। দেখ দেখি সুকন্যা,—তোমাকে সঙ্গে এনে কি অসুবিধাই না হ'য়ে প'ড়েছে! কা'ল্‌কেও তোমার জন্য এই রকম মৃগয়ার ব্যাঘাত হ'য়েছিল, আজও তাই হ'ল। অনুচরেরা সব কতটা এগিয়ে গেল, আর আমি তোমার জন্য তা'দের বহু পশ্চাতে প'ড়ে রইলাম।

সুকন্যা। কেন বাবা, আমি তো যতটা পা'রছি—চ'ল্‌ছি। তোমরা বীরপুরুষ, আর আমি সামান্য স্ত্রীলোক,—তোমাদের সঙ্গে চ'লে উঠ্‌তে পারি কি বাবা!

শর্য্যাতি। সেই জন্যই তো মা, স্ত্রীলোক নিয়ে মৃগয়ায় আস্‌তে নেই। মৃগয়া বীরপুরুষদিগের জন্য। স্ত্রীলোকদিগের কি মৃগয়ায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তে আছে?

সুকন্যা। বাবা, মৃগয়া ক'রে লাভ কি? মৃগয়া দ্বারা যে সখ মিটান হয়, সে সখ তো বাবা, আরও অনেক রকমে মেটান যেতে পারে।

শর্য্যাতি। পাগল মেয়ে; মৃগয়া সখ কি মা। মৃগয়া যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

সুকন্যা। ধর্ম্ম! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃগয়া! —মৃগয়াই যদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হয়,—তা'হ'লে কিরাত জাতির সহিত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মের তো কোনো প্রভেদ নাই বাবা! কিরাতেরা বরং প্রাণিহত্যা করে—উদর পূর্ত্তির জন্য, আর ক্ষত্রিয়েরা মৃগয়ার নামে প্রাণিহত্যা করে—সখ মেটাবার জন্য বা বাহাদুরী নেবার জন্য! বাবা, আমি অল্পমতি কন্যা, স্বভাবতঃই বুদ্ধিহীনা, কিন্তু তুমিই তো ব'লেছ, প্রাণিহত্যায় যে সুখ—সেটা রজোগুণ বা তমোগুণের প্রভাব মাত্র। বাবা, তুমি আমার এত ভালবাসো ব'লেই সাহস ক'রে মনের কথাগুলি খুলে বল্‌লাম; দোষ হয় তো ক্ষমা ক'র।

শর্য্যাতি। দোষ নয় মা,—তোর কোমল মনের উপযুক্ত কথাই ব'লেছিস্। কিন্তু আমরা কি শুধু মৃগয়া ক'রতে এসে তুই যা' ভাল বাসিস্‌নে—সেই নধরকান্তি কুরঙ্গগণেরই প্রাণনাশ করি! তা'তো শুধু নয় মা! এই সকল বনরাজির মধ্যে যে সকল তপঃপরায়ণ ঋষিগণ অবস্থিতি করেন, সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্র জন্তুর তাড়নায় সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের তপশ্চরণে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হয় মা, সুতরাং মৃগয়াব্যপদেশে সেই সকল মৃগ হত্যায় আমরা যে ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করি, সে কথাটা কেন ভুলে যাচ্ছিস্ মা!

সুকন্যা। তা' কর বটে' বাবা, কিন্তু যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব বিষয়ের নিয়ন্তা পুরুষ, তিনিই তো সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সে সকল বিষয়ের উপায় বিধান ক'রেছেন। তোমরা নিজহাতে একটী প্রাণীরও প্রাণ নষ্ট ক'রবে কেন? দেশে কিরাতজাতি বর্ত্তমান, তোমার,

আজ্ঞাবাহী অনুচরগণেরও অভাব নাই, তা'রা দলবদ্ধ হ'য়ে হিংস্র জন্তুর অত্যাচার হ'তে বনচারীদিগকে রক্ষা করুক। সে অনুজ্ঞা প্রচারেও তুমি নিমিত্তের ভাগ গ্রহণ ক'রবে বটে, কিন্তু তা'তে পাপ হ'বে না। কেননা তুমি রাজা, রাজার ধর্ম্ম প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষা সাধন।

শর্য্যাতি। সুকন্যা, তুই এত কথা শিখ্‌লি কোত্থেকে? আচ্ছা, যাক্, আজ আর মৃগয়ায় যা'বনা,—অনুচরেরাই যা' হয় করুকগে। আয়, এই বনে একটু বিচরণ করি। (উভয়ে বিচরণ করিতে করিতে একপার্শ্বে একটী বল্মীকাচ্ছাদিত স্তূপের মধ্যে দুইটি উজ্জ্বল মণির মত পদার্থ দেখিলেন)

সুকন্যা। বাবা, বাবা, দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য! বল্মীকস্তূপের মধ্যে দু'টী নক্ষত্রের মত কি জ্বলছে। দেখ্‌বো এ দু'টো কি? (এই কথা বলিয়াই করবী গুচ্ছ হইতে একটি সোণার কাঁটা বাহির করিয়া সেই উজ্জল পদার্থের একটীতে বিদ্ধ করিলেন। সহসা বল্মীক স্তূপ ভগ্ন হইয়া গেল, তন্মধ্য হইতে ক্ষীরমাণ দেহ অথচ তেজঃপুঞ্জ কলেবর অশীতিপর বৃদ্ধ চ্যবনঋষি বহির্গত হইলেন এবং অতি রুষ্ট ভাবায় বলিলেন)

চ্যবন। কে রে তুই আমার ধ্যানভঙ্গ করিলি! আমি বহু বৎসর তপশ্চরণে সমাধিস্থ হইয়া যে অমৃতময় সুখলাভ করিতেছিলাম, কে ত হাতে বিঘ্ন করিল? কোন্ দুর্বৃত্ত কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ভীষণ অনর্থকর কার্য্য করিয়াছিস্—শীঘ্র আমার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বল্, নচেৎ এখনই আমি তাহাকে ভস্মীভূত করিব।

[রাজা শর্য্যাতি সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি ঋষি পুঙ্গবকে বল্মীকস্তূপ হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়াই বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত দেখিয়া দ্রুতপদে তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন]

শর্য্যাতি। মহাভাগ! অপরাধ মার্জ্জনা করুন,—আমার অল্পবুদ্ধি দুহিতা কৌতূহল পরবশে এরূপ অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র, কৌতূহল নিবারণের সংযম শিক্ষায় সে এখনো অভ্যস্ত হতে পা'রেনি! ক্ষমার অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, আমার এই অবোধ কন্যার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা করুন দয়াময়!

চ্যবন। ক্ষমা! এ অপরাধের ক্ষমা নাই! বহুবর্ষ ধ'রে আমি যে সাধনা ক'রছি,—যে কঠোর সাধনার ফলে আমার সর্ব্বশরীর বল্মীক স্তূপে আচ্ছন্ন হ'য়েছিল সেই সাধনাভঙ্গের অপরাধ—সামান্য অপরাধ নয়। এই সাধনা ভঙ্গের ফলে সিদ্ধিলাভের জন্য আবার আমাকে নূতন ক'রে বহুবর্ষ সাধনা ক'রতে হ'বে! তুমি বিষয়ী লোক, তুমি সাধনা ও সিদ্ধিলাভের মর্ম্ম কি বুঝবে? তোমার কন্যার অপরাধ অতি গুরুতর। এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নহে, আমি নিশ্চয়ই তা'কে অভিসম্পাত প্রদান ক'রবো।

শর্য্যাতি। ঋষিবর! যখন আপনার বহু বর্ষের কঠোর তপস্যা এইরূপ একটা অসম্ভাবিত কারণে নষ্ট হ'য়েছে, তখন হয়তো বিধাতার ইচ্ছা নয় যে আপনার এই পথে সিদ্ধিলাভ হোক্। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহাযোগী,—আপনার নিকট যুক্তিপ্রদর্শনের চেষ্টা প্রগল্‌ভতা

মাত্র। কিন্তু মহাভাগ, কি উদ্দেশ্যে কোন্ সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কার্য্য সংঘটিত হয়,—ক্ষুদ্র মানব আমরা,—আমাদের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। আপনার এই কঠোর তপস্যার বিঘ্নের ফলে হয় তো বিশ্ব নিয়ন্তার এমন একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে—যা'র ফল অতি শুভ—চির কীর্ত্তিময়—প্রকৃতিপুঞ্জের অতি মঙ্গলকর। মহাভাগ! দাসের নাম শর্য্যাতি। আমি সূর্য্যবংশীয় রাজা। এই অবোধ অপরাধিনী কন্যা আমারই দুহিতা। আপনি ইহার এই ভীষণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইহাকে দাসীরূপে গ্রহণ করুন্। আমি দেশের রাজা, প্রজার উপর কেহ অত্যাচার ক'র্‌লে রাজার তো শাস্তি দিবার অধিকার আছে,—আমার কন্যা যে অপরাধ ক'রেছে, তা'র দণ্ডস্বরূপ আমি আপনার সেবার জন্য—আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে তপশ্চর্য্যায় সহায়তার জন্য,—আপনার সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষার জন্য,—আপনার হস্তে আমার এই দুহিতা রত্নকে অর্পণ ক'র্‌লাম। আপনি যদি এ'কে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ করেন, আশা করি যে সাধনমার্গে আপনি অগ্রণী হ'য়েছেন,—সেই পথেই ইহারও মতি প্রবৃত্তি ধাবিত হবে। এই কন্যা আপনার অনুরূপ সহধর্ম্মিণী হ'বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'চ্ছে, আপনাদের উভয়ের এই শুভ সম্মিলনে জগতের অনেক হিতসাধন হ'বে। আপনি আমার প্রার্থনাটী পূর্ণ ক'র্‌বেন কি প্রভু?

চ্যবন। কি বল মহারাজ! আমি সংসারত্যাগী—সন্ন্যাসী—যোগী। তুমি যদি আমায় কেবল ক্ষমা ক'র্‌তেই ব'লতে, তা'ও না হয় সম্ভব হ'তো—কিন্তু তুমি আমাকে যে কামিনী দানের প্রলোভন দে'খাচ্ছ, এ অতি কদর্য্য দান।—এ দানে তপস্বীদিগের মন ভোলাবার প্রয়াস পাওয়া তোমার বাতুলতা মাত্র।

শর্য্যাতি। আমি যে আপনাকে কন্যা-দানের প্রস্তাব ক'র্‌ছি—সে তো অকিঞ্চিৎকর দান নয়,—সে দানের দ্রব্য যে সর্ব্ব-কার্য্যের মূল—এ কথা কি মহাভাগ! আপনার নিকটও আমার ব্যক্ত ক'র্‌তে হ'বে? শক্তি ভিন্ন যে জগদ্বাসীর কোন কর্ম্মে সাফল্য লাভ হয় না মহাভাগ—ইহা তো আপনাদেরই ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের উপদেশ!

চ্যবন। সে সংসারীর পক্ষে,—যোগীর পক্ষে সে ব্যবস্থা নয়। যোগিজনের হৃদয়-মন্দিরে প্রকৃতি পুরুষ—উভয়ের ভেদাপগমে যে মহাশক্তির উদয় হয়, সেই মহাশক্তির সাহায্যেই ঋষিগণ আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার ক'রে থাকেন। থাক্ মহারাজ! সে সব তর্ক-বিচারের প্রয়োজন নাই,—আমি তোমার এই কন্যাগ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পাত্র। বিশেষতঃ তোমার কন্যা চাপল্য বশতঃই হোক্ আর যে কোন কারণেই হোক্, যেরূপ অপকর্ম্ম ক'রেছে,—তা'তে ইহাকে গ্রহণ কর্‌বো কি, কোপানলে ভস্মীভূত করাই এর সমুচিত ব্যবস্থা।

রাজা। মহাভাগ! আপনার নিকট করপুটে কাতর প্রার্থনা করি, সেরূপ অনর্থ সংঘটন ক'র্‌বেন না। আমি যখন কন্যাদান কর্‌বো ব'লে বাগ্‌দান ক'রেছি, তখন এ কন্যা আমার অভিলাষ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অর্পিতা হ'য়েছে। এখন দয়া ক'রে কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক এ'কে আপনার তপস্যার শুশ্রূষা-

কারিণী নিযুক্ত করুন, তাতেও এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে এবং ভবিষ্যতের জন্য সুকৃতি-লাভ হ'বে। ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা।

চ্যবন। রাজন! তা' হ'তে পারে না। বিশেষতঃ আমি যেরূপ অতি বৃদ্ধ, তা'তে এই ষোড়শী যুবতীর পাণিগ্রহণ—আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। এ বয়সে বিবাহের অভিলাষ বাতুলতা মাত্র। আর আমি তপস্বী—আমার দাসীরও প্রয়োজন নাই। দাসী নিয়ে আমি কি করবো?

শর্য্যাতি। ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি বৃদ্ধ হ'য়েছেন। আপনার যত্নের জন্য—আপনার সেবার জন্য—এ বয়সে এক জন সেবা নিপুণা দাসী হ'লেও তো আপনার কায়িক উপকারের সম্ভাবনা। দয়াময়, প্রত্যাখ্যান করবেন না,—গ্রহণ করুন। গ্রহণ করুন মহাভাগ!—আমার এ অনুরোধ আপনাকে রা'খ্‌তেই হ'বে। আমার হৃদয় ব'লছে, এই ঘটনা জগতের মঙ্গলের জন্যই ঘ'টেছে।

চ্যবন। মহারাজ, আমি যোগবলে ধ্যানস্থ হয়ে একবার ভবিষ্যৎ দেখে তোমার কথার উত্তর দেবো। (কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইবার পর) মহারাজ, সত্যই বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আমি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত যে সরণী অনুসরণ কর্‌ছিলাম, আমাকে সে সরণী পরিত্যাগ ক'র্‌তেই হ'বে। রমণি! আমি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তোমাকে সহধর্ম্মিণী ব'লে গ্রহণ ক'রলাম। মহারাজ! নিশ্চিন্ত হউন, আমি জরাজীর্ণ স্থবির হ'লেও তোমার দুহিতা-রত্নকে তপস্যার অংশভাগিনী ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে সমর্থ হ'ব।

শর্য্যাতি। মহর্ষি! কন্যার ভবিষ্যৎ আর আমার দে'খ্‌বার প্রয়োজন নেই, আপনি যুবা হোন বৃদ্ধ হোন—এখন আপনিই এই কন্যার ভবিষ্যৎ শুভাশুভের নিয়ন্তা। আপনি যে ইহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে ইহাকে গ্রহণ ক'রলেন, এতেই আমি শান্তিলাভ ক'রছি। (চ্যবনের হস্তে সুকন্যার হস্ত সংযোজন করিয়া) মহর্ষি, শর্য্যাতির এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করুন। আপনার তপস্যা সার্থক হ'বে। এখন আমি প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রছি, সুকন্যা আপনার অনুরক্ত হ'য়ে আপনার ধর্ম্মের সহায় হোক—ইহাই তাহাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান—আমলকী বন সন্নিহিত নদী তীর, সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল, নদীতীরস্থ সোপানোপরি সুকন্যা আপন মনে গান গাহিতেছিলেন]

ডুবুডুবু ওই রবির কিরণ,
ফুটিবে চাঁদের হাসি,
তারকা নিকর ছাইবে গগন,
উদিবে জোছনা রাশি।
সুধার ক্ষরণে মাতিবে ধরা,
বিশ্বমোহন দৃশ্যে ভরা,
চকোর নিকর অধীর হইয়া
জুটিবে কত না আসি।
মধুর জোছনা মাখিয়া অঙ্গে
বহিবে পবন কত না রঙ্গে,
এ যে প্রকৃতির দান, বড় অভিরাম,
আমি বড় ভাল বাসি।

(দূরে বৃক্ষান্তরালে অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের প্রবেশ)

১ম অঃ কুঃ। না তোমার কথা কখনো ঠিক নয়, এ রমণী অতি সাধ্বী।

২য় অঃ কুঃ। আমার তো তা' কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ভাই! স্বামী অশীতিপরবৃদ্ধ—পিতামহের সমবয়স্ক, তা'র সঙ্গে এরূপ যুবতী নারীর সুখ-সম্মিলন কখনো কি সম্ভব?

১ম অঃ কুঃ। কেন সম্ভব হ'বেনা! এ যে আর্য্যরমণী। আর্য্যরমণীর বিবাহ প্রথা কি শুধু ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য! তুমি সে কথা ভুলে যা'চ্ছ কেন ভাই! আর্য্য-রমণীর বিশ্বাস—

পতি সেবা পরং সত্যং দানং তীর্থাভিসেচনং।
সর্ব্ব দেবময়ঃ স্বামী সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃশুচিঃ।
সর্ব্ব পুণ্য স্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ॥

২য় অঃ কুঃ। তুমি কি তা'হ'লে ব'লতে চাও—আর্য্য রমণী মাত্রেই পতি—মিলনের যোগ্য পাত্র কিনা কিছু মাত্র বিচার না ক'রে পিতা উপযুক্ত বিবেচনায় যাঁরই হাতে তা'কে সম্প্রদান ক'রবেন—তা'রই উপর শ্রদ্ধা—ভক্তি—প্রীতি দিয়ে—দেহ মন প্রাণ সকলি অর্পণ ক'রে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে ক'র্‌তে পা'রবে! এটা কি কখনো সম্ভব?

১ম অঃ কুঃ। কেন সম্ভব নয়? এই তো আবহমান কাল থেকে পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্তে চ'লে আস্‌ছে। অন্যান্য দেশের নারী সমাজের তুলনায় আর্য্যমহিলার তো এই ক্ষণেই বিশেষত্ব। এই জন্যই তো আর্য্য মহিলা নরকুল সমভূতা হ'লেও দেবী নামে অভিহিতা হ'য়ে থাকেন।

২য় অঃ কুঃ। ভাল, চল, ওর নিকটে যাই,—ওর নিকটে গিয়ে আমাদের রূপ রাশির প্রলোভনে ওর মনোভাব পরীক্ষায় তোমার কথা সত্য, কি আমার কথা সত্য—তা' নির্ণয় করা যা'ক।

১ম অঃ কুঃ। আপত্তি নাই, কিন্তু একটা কথা হ'চ্ছে—এতে সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা আর্য্যমহিলার সম্মানের হানি করা হ'বে নাকি ভাই! শুধু সম্মানের হানি নয়, আমরা পরীক্ষার জন্য প্রলোভিত ক'রতে যে চেষ্টা ক'রবো—সে প্রলোভনে সাধ্বীর মনে যেরূপ আঘাত লাগ্‌বে, সে আঘাতের ফলও তো ভয়ানক হ'তে পারে।

২য় অঃ কুঃ। কিন্তু তা' ভাব্‌লে তো এবিষয়ের মীমাংসা হ'বেনা।

১ম অঃ কুঃ। যা'র পরিণাম অপ্রীতিকর—সেরূপ ব্যাপারের মীমাংসায় চেষ্টা করা কি শ্রেয়স্কর?

২য় অঃ কুঃ। শ্রেয়স্কর নয় স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যও তো অসৎ নয়। বেশ তো পরীক্ষায় যদি রমণীই জয়লাভ ক'র্‌তে পারে—তা' হ'লে ওকে এই ঘটনায় যেটুকু মনঃকষ্ট দেওয়া হবে—অভিলষিত বর প্রদানে পরিশেষে সেই রূপ সুখী ক'র্‌লেও ত'ার প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পা'রবে।

১ম অঃ কুঃ। (হাসিয়া) কথাটা মন্দ বলনি,—কিন্তু কাহাকেও পাদুকা প্রহারের পর তা'র গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান ক'র্‌লে যেরূপ হয়, এঘটনাও সেই রূপ হ'বে না কি? না ভাই, এ বিষয়ের মীমাংসায় আর কাজ নাই। এ ঘটনায় সাধ্বীর অন্তরে বিশেষ আঘাত লা'গ্‌বে।

২য় অঃ কুঃ। তুমি ব'লছ সাধ্বী, আমি ব'লছি অসাধ্বী, গোলযোগ তো ঐ থানেই।

না ভাই, এ মতভেদের মীমাংসা ক'রতেই হ'বে,—চল ওর কাছে যাই ।

১ম অঃ কুঃ। তবে চল।

[সুকন্যা আর একটি গান গাহিতেছিলেন]

গান।

আমি গাহিব তোমারি গান।
আমার যা' কিছু সকলি, দিয়েছ যা' তুমি,
সকলি তোমারি দান।
ডাকে পাখীগুলি (সে যে) তোমারি কাকলী,
(তুমি) শিখায়েছ সবে—তোমারি যা' বুলি,—
(ওই সাগর সঙ্গিনী—কলকল ধ্বনি—
তুলিছে তোমারি তান্।
ক্ষিতি মাঝে ওগো তোমারি ছটা,
ইন্দ্রধনু—সে যে—তোমারি ঘটা,
(তুমি) ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে
বিশ্ববাসীর প্রাণ।

(অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের প্রবেশ)

২য় অঃ কুঃ।—
স্নিগ্ধ—শান্ত নদীতীর, আগত প্রদোষ,
মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালা হীনপ্রভ এবে,
আঁধারে ডুবিবে বিশ্ব, এ হেন সময়ে
কে তুমি অপূর্ব্বানারী—বিদ্যুৎ বরণা,
বিদ্যাধরী রূপে—হেথা, বসিয়া বিরলে।
চিন্তা নাই প্রাণে তব ? নারীজাতি তুমি,
নারীর বিপদ যে গো প্রতি পাদক্ষেপে—
পুষ্প কলিকার মত। ফোটে ফুল, ছোটে
তা'র অপূর্ব্ব সৌরভ ; গৌরবে সৌরভ তার
কিন্তু চুরি করে দুর্ব্বৃত্ত পবন
আসি অলক্ষ্যে চকিতে ! কুসুম জানেনা হায়
আগে সে বারতা। জানিনা ললনা,
তব কিবা মনোভাব, কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি
তবে এ হেন সময় একাকিনী বসি,
এই বিরল প্রদেশে ?

[সুকন্যা অপরিচিত পুরুষমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া চমকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন]

সুকন্যা।—আপনারা কে প্রভো! গলায় যজ্ঞোপবীত দেখে ব্রাহ্মণ ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, আপনাদিগকে প্রণাম ক'রছি।

১ম অঃ কুঃ।—
আশীর্ব্বাদ করি তোমা হও আয়ুষ্মতী।
কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দাও—অকপটে বল
কিবা তব মনোভাব ? কি উদ্দেশ্য তরে
একাকিনী বসি এই বিরল প্রদেশে ?

২য় অঃ কুঃ।—
কুসুমের মত ফুটিয়া যে রহিয়াছ
বন আলো করি,—কামনা কি তব
পাইতে কুসুমদশা বায়ুর সহিত ?
শুনেছ কি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার
অপূর্ব্ব যুবক দু'টি—আসিয়াছি হেথা
পতঙ্গের মত তব রূপবহ্নি পাশে।

সুকন্যা।—(ত্রস্তভাবে) আপনারাই স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার! আপনাদের কোটী কোটী প্রণাম। কিন্তু আপনারা কি ব'লছেন—আমি তো উপলব্ধি ক'র্‌তে পারছিনে প্রভো! আমি সামান্যা রমণী। বহু পুণ্যফলে আপনাদের দর্শন পেয়েছি। দয়া ক'রে আমাদের আশ্রমে চলুন, সেখানে আমাদের আতিথ্য স্বীকার ক'রে আমাদের কৃতকৃতার্থ করুন, আমার স্বামীও আপনাদের দর্শনে সৌভাগ্য মনে ক'রবেন।

১ম অঃ কুঃ।—
মা, আতিথ্য সৎকার হইবে পশ্চাতে।
আপাততঃ প্রশ্নের উত্তর দাও অতি ত্বরা ক'রি।
কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি তরে এ হেন সময়ে
একাকিনী নদীতীরে অবস্থিতা তুমি?
২য় অঃ কুঃ।—
অতি বৃদ্ধ স্বামী তব—অতি জীর্ণ তনু,
কঙ্কাল কেবল মাত্র অবশিষ্ট তাঁ'র
জীর্ণ বলভীর মত। তাই কি ললনা
ভাবিতেছ দূরদৃষ্ট বসিয়া বিরলে?
ভাবি'ছ কি চার্ব্বাকের নীতি পরিগ্রহি'—
আত্ম তৃপ্তি—আত্ম সুখ করিবে সাধন?
"যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ"—এই বাক্যটুকু
বোধ হয় জান তুমি।—এ মন্ত্রে দীক্ষিতা
যদ্যপি হইতে সাধ প্রকাশিয়া বল—
সুরলোকে ল'য়ে যা'ব—তোমারে আদরি'।

সুকন্যা।—একি কথা দেবগণ! আমি আর্য্যরমণী,—নির্জ্জরলোকনিবাসীর নিকট এরূপ ভাবে উপহাসের পাত্রী হ'ব—এযে স্বপ্নের অগোচর প্রভো! জানিনা, কোন অপকর্ম্মের ফলে দেবলোকনিবাসীর মুখেও আজ সম্মান হানিকর কথা শুন্‌তে হ'লো। আশ্রমে চলুন দেবগণ! আশ্রমে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করুন,—আমি অতিথির অপরাধ ভুলে যাবো, আতিথ্য সেবা করে স্বামীর সহিত পরম আনন্দ উপভোগ কর্ব্বো।

২য় অঃ কুঃ।—
অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী—যুবতী তুমি।
কত সুধা ক্ষরিতেছে রূপের প্রভায়—
"মরকত মণি যথা পাংশুরাশি মাঝে।"
এ রূপের আহুতি কি কর্ত্তব্য সুন্দরি,
অতি বৃদ্ধ চ্যবনের-চরণ চিন্তনে?
নারী তুমি স্বভাবতঃ সরমে জড়িতা,
সরম ত্যজিয়া কহ কিবা মনোভাব?

[সুকন্যা কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহার পর বাষ্পগদগদ কণ্ঠে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের নিকট করজোড়ে বলিলেন]

সুকন্যা। আপনারা আমার পিতৃস্বরূপ। পিতৃগণ! কন্যার অবমাননা করিবেন না। অন্যে আমার উপর অত্যাচার ক'র্‌লে আপনাদেরই রক্ষা ক'রবার কথা,—নিজেরাই আমাকে বিপন্না ক'রবেন না। আমার স্বামী জরাজীর্ণ, আমি বহুক্ষণ তাঁর নিকট থেকে অনুপস্থিত। জানিনা তাঁর কতই কষ্টই না হ'চ্ছে। পিতৃগণ! রক্ষা করুন, কন্যাকে আর এরূপ ভাবে লজ্জিতা ক'রবেন না।

[সুকন্যার অবস্থা সন্দর্শনে অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের মতভিন্নতার মীমাংসা হইল, তাঁহারা বলিলেন]

২য় অঃ কুঃ। মা, তোমার চিত্ত প্রবৃত্তির পরিচয় প্রাপ্তির জন্য আমরা তোমার পরীক্ষা উদ্দেশ্যে তোমার মনঃকষ্ট দিয়েছি, সে অপরাধ ক্ষমা ক'র মা। তোমার এই পতিভক্তির মাহাত্ম্যে আমাদের হৃদয় অপার আনন্দ রসে আপ্লুত হ'য়েছে। তোমাকে কিছু বর দিব, তোমার যে বর ইচ্ছা—প্রার্থনা কর মা।

সুকন্যা। দেবগণ! যদি সন্তুষ্ট হ'য়ে বরই প্রদান ক'র্‌তে চা'ন, তা'হ'লে এই বর প্রদান করুন—আমার জরাজীর্ণ স্বামী আপনাদের বরে যেন নবযৌবন লাভ ক'রে জগতের উপকার কর্ত্তে সমর্থ হ'ন্।

১ম অঃ কুঃ। তাই হ'বে কিন্তু মা, তুমি যে বর প্রার্থনা ক'র্‌লে—সে বর প্রজ্ঞা

প্রোক্ত সনাতন আয়ুর্ব্বেদের কৃপাতেই সম্ভব। এর জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা ক'রতে হ'বে। আগামী কল্য অতি প্রত্যূষে তুমি এই আমলকী বৃক্ষে আরোহণ ক'রে সাবিত্রী মন্ত্র জপ কর্ত্তে কর্ত্তে সংকল্প ক'রে কতক গুলি সুপক্ব আমলকী ফল সংগ্রহ ক'রে দিবে, সেই ফলে আমরা এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত ক'রে দিব। সেই ঔষধে তাঁর পূর্ব্ব যৌবন আবার ফিরে আসবে। আমরা সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবো মা! এখন চল,—তোমাদের আশ্রমে গিয়ে সেই পরম ধার্ম্মিক ঋষি প্রবর চ্যবনের দর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থ করি।

(সকলের প্রস্থান)

[ক্রমশঃ]

আগমনী।

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ।)

—:•:—

দেখ্ দেখি কা'র চরণ চিণে
পঙ্কজে ওই পড়লো রে,
কাহার কণক জয় পতাকা
শরৎ মেঘে উড়লো রে।
ওই সেফালির স্নিগ্ধ বাসে
কা'র আরতির গন্ধ আসে;
কাহার করুণ দৃষ্টি-সুধায়
বুকের দীঘি ভ'রলো রে।

(২)

আজকে তোদের বুকের ব্যথা—
পুঁথির কথা না তুলে,
ডাক্‌রে কোলের ছেলের মত
কাতর-ব্যাকুল 'মা' ব'লে।
দিন ত আছে কাজের বোঝা,
আজকে নিজের মনকে বোঝা,
নূতন পাওয়া শৈশবেতে
জরার জ্বালা যা' ভু'লে।

(৩)

আসার আশায় ছ'মাস কাটে,
ছ'মাস কাটে উল্লাসে,
জবা যে হায় জেগেই থাকে—
সেই চরণের তল্লাসে,
দুঃখে এ বুক শক্ত থাকে
যায়—গলে যায় 'মায়ের ডাকে',
বল আসে হায় প্রাণের প্রাণে
চোখের কোণায় জল আ৻

স্বাস্থ্যবান হইবার উপায়।

(শ্রীকৃষ্ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ বি,এ)

—— :০: ——

স্বাস্থ্যবান হইবার উপায় মানব মাত্রেরই করায়ত্ত। ঋষি প্রণীত উপদেশ গুলি পালন করিলে সকল মানবই অনায়াসে স্বাস্থ্য-সুখ উপভোগ করিতে পারে। এখনকার দিনে অনেকেই যে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অল্পায়ুঃ, ইহা তাহাদের স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ মাত্র। আর্য্য ঋষি আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান হইবার জন্য আমাদের দৈনন্দিন সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পরম মঙ্গলকর উপদেশাবলী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা সে সকল উপদেশ পালন করিনা—ইহাই তো এখনকার দিনে আমাদের স্বাস্থ্যহানির সর্ব্ব প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতে হইলে রজনীর চতুর্থ যামে গাত্রোত্থান করিতে হয়। শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করার পর যে পর্য্যন্ত ক্লান্তি অনুভব না হয়—ততক্ষণ ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। অন্যবিধ ব্যায়ামের অভ্যাস করিতে না পারিলেও শুধু ভ্রমণেও উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হইয়া থাকে। ব্যায়ামের পর উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দনান্তর নদী বা দীর্ঘিকার স্বচ্ছ সলিলে স্নান করিতে হয়। স্নানান্তে পূজায় আত্মতৃপ্তির অনুষ্ঠান। তাহার পর লঘুপাচ্য ও তৃপ্তিকর দ্রব্য ভক্ষণে—জল যোগ। তদনন্তর শারীরিক স্বচ্ছন্দতা অনুভূতি হইলে দুই তিন ঘণ্টা বিষয় কর্ম্মে মনঃ সংযোগ এবং উহা সমাপনান্তে দ্বিপ্রহর কালে উৎকৃষ্ট ও সহজে পরিপাক হয়—এরূপ ব্যঞ্জনাদি সহ অন্নাহার। আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রামের ব্যবস্থা। বৈকালে আবার বিষয় কর্ম্মে মনঃ সংযোগ। সন্ধ্যা কালে ভ্রমণ বা অন্যরূপ ব্যায়াম কার্য্য নির্ব্বাহ। তদনন্তর সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রিয়জন সম্মেলনে কিয়ৎকাল হাস্য কৌতুক ক্রীড়া দ্বারা মানসিক সুস্থতা লাভের চেষ্টা এবং তাহার পর রজনীর এক প্রহরকাল উত্তীর্ণ না হইতেই আহার ও আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়াই শয়ন। ইহাই হইল—স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সংক্ষেপতঃ দিন ও রাত্রি চর্য্যার ব্যবস্থা। এখনকার দিনে যাঁহাদিগকে চাকরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়—তাঁহারা তো এ ব্যবস্থা আদৌ প্রতিপালন করিতে পারেন না। দ্বি প্রহরে আহার বা আহারান্তে বিশ্রাম—তাঁহাদের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে, তদভিন্ন অন্যান্য নিয়মেরও ব্যতিক্রম তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

তা' ছাড়া যাঁহাদিগকে চাকরি করিতে হয় না, ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া যাঁহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও এ সকল নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গাত্রোত্থান —ইহা আর এখন যোগী এবং সন্ন্যাসিগণ ভিন্ন আর কাহারও অভ্যাসের বিষয় নহে।

প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থাও দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। লঘুপাচ্য এবং তৃপ্তিকর দ্রব্য ভক্ষণে যে জলযোগের ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি,—চা-বিস্কুট তাহার স্থান পূর্ণ করিয়াছে। অনেকের নিকট আবার বিস্কুটেরও প্রয়োজন হয় না, অতি গরম এক পেয়ালা চা না পাইলে অনেক শয্যোত্থিত ব্যক্তিরই এখন নিদ্রালস চক্ষুর উন্মীলন হয় না। চা পান করিয়া তবে এখন অনেকের মুখ প্রক্ষালন এবং মল মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করিতে হয়। বেলা ৮টার সময় অনেকের এই সকলের সমাধা হইল, তাহার পরই আফিসের বেলা;—তাড়াতাড়ি স্নান এবং নিমেষ কাল মধ্যে অন্ন ব্যঞ্জনের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াই দ্রুতপদে কর্ম্মালয় উদ্দেশে গমন;—আপিসে গিয়া পদোন্নতির কামনায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—সায়ং কালে ক্লান্ত দেহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, তাহার পর আহার এবং আহার করিয়াই শয়ন—ইহাই হইয়াছে এখন অধিকাংশ ব্যক্তির দিনলিপি। বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা ইহারই মুখ্য কারণ।

চাকরিজীবি-বাঙ্গালীর পক্ষে এ কারণের সকল গুলির পরিহার সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইচ্ছা করিলে রজনীর চতুর্থ প্রহরে না হউক, অনন্ত অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা অসম্ভব নহে এবং খালি পেটে চা পানের কদভ্যাস পরিত্যাগও নিশ্চয়ই সম্ভবপর। চাকরি না করিলে যখন আর এখন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই, তখন চাকরি কর, কিন্তু পদোন্নতির কামনায় স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন না জন্মাইয়া যাহাতে নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পার, তাহা করাটা তোমার কর্ত্তব্য নহে কি?

সদাচার এবং সদ্বৃত্তি পালন স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম সোপান। এই সোপান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই অনেকে এখন দেহ-মন্দিরটিকে নানা প্রকার আধি ব্যাধির আকর করিয়া তুলিয়াছেন। সদাচার এবং সদ্বৃত্তি পালন করিতে হইলে চিত্ত সংযমের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের চক্ষের সম্মুখে সকল বিষয়েই এত অধিক প্রলোভনের দ্রব্য সম্ভার সুসজ্জিত যে, পদেপদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যিনি সেই প্রলোভনে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেন,তাঁহার আর চিত্ত সংযম হইল না। চিত্ত সংযম না করিতে পারিলে সদাচার ও সদ্বৃত্তি পালন তাঁহার দ্বারা সম্ভবপরও নহে। বাঙ্গালীর এখন সেই অবস্থা। কাম ক্রোধাদি দশ রিপু সত্য ত্রেতা দ্বাপর হইতে মানব জাতির কর্ত্তব্য চ্যুতি সংঘটন করিতে চেষ্টা করিতেছে সত্য, সর্ব্বাপেক্ষা কামিনী-কাঞ্চনের রূপজ্যোতিঃ মানব জাতিকে আবহমান কাল হইতেই পথহারা করিবার প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে—ইহাও অবিসংবাদিত সত্য, কিন্তু সে কালের মানব জাতি অধর্ম্ম হইবে সম্ভাবনায় সকল সময়ই যে ভীত হইয়া পড়িতেন, সেই ভীতি সঙ্কুল চিত্তই তাঁহাদিগকে কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিত। সদাচার এবং সদ্বৃত্তি পালনের প্রবৃত্তিও ইহারই ফলে তাঁহাদের নিকট আপনাপনিই কে যেন উপস্থাপিত করিত!

সদাচার এবং সদ্বৃত্তি পালন করিতে হইলে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী জাতির অনেকেই এখন আর সে বাছ বিচার করিতে রাজি নহেন। চরক বলিয়াছেন,—"মাত্রাশী স্যাৎ"। অর্থাৎ পরিমিত ভোজী হওয়া আবশ্যক। শুধু এই "মাত্রাশী

াৎ”—বলিয়া চরক ক্ষান্ত হন নাই, তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন,—

“তস্যাশিতাদ্যাদাহারাদ্বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে।
তস্যর্ত্তু স্যাত্ম্যং বিদিতং চেষ্টাহার ব্যপাশ্রয়ম্॥”

অর্থাৎ “কেবল মিতভোজী হইলেই হইবে না, যে ঋতুতে যেরূপ আহার বিহার সহ্য হয়, তাহাও অবগত থাকা উচিত। এইরূপ অবগতি থাকিলে মিতভোজী ব্যক্তি পরিমিত ভোজন ও পান দ্বারা বল ও অগ্নি বৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন।” কিন্তু এখনকার দিনে বাঙ্গালী কি চরকের এই উপদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকেন? তাহা যদি করিতেন, তাহা হইলে কলিকাতায় আজি এত ‘রেষ্টুরেণ্টে’র বা চপ্ কাটলেটের দোকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত না, ছত্রিশ জাতির সমন্বয়ে বাঙ্গালী জাতির চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধারের ব্যবস্থাটাও প্রতিদিন প্রকাশ্য ভাবে পরিলক্ষিত হইত না।

বাস্তবিক এই রেষ্টুরেণ্ট বা চপ্ কাট্‌লেটের দোকান গুলি হইতে আমাদের দেশের যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, এমন আর কিছুতে নহে। এই সকল দোকানের দ্রব্য সম্ভার ভক্ষণ করিয়া বাঙ্গালী সন্তান ধর্ম্মের মর্য্যাদা তো যথেষ্টই রক্ষা করিতেছেন, তা' ছাড়া এখনকার বাঙ্গালীর এত অধিক অজীর্ণ প্রবণতার অন্যতম কারণও এই দোকান গুলি। এই দোকান গুলিতে যে সকল খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহা যে ছত্রিশ জাতির তৈয়ারি সে কথাটা না হয় নাই তুলিলাম, কিন্তু কিরূপ মাংস ভক্ষণে অপকার হইতে পারে ঐ সকল দোকানের অধিকারীদিগের তো সে সকল বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না, অর্থাগমের উন্নতি করিতে পারিলেই ঐ সকল দোকানের অধিকারিগণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে করেন। এরূপ অবস্থায় বলা বাহুল্য যে, ঐ সকল দোকানের খাদ্য ভক্ষণে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। দিন দিন এইরূপ খাদ্য বিক্রয়ের সংখা বৃদ্ধির সহিত দোকানের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে। স্বদেশ সেবকগণ এ সকল কথা চিন্তা করিতেছেন কি?

(ক্রমশঃ)

শরতে কর্ত্তব্য।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি]

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস আয়ুর্ব্বেদে শরৎ* কাল বলিয়া উল্লিখিত। এই সময় বর্ষার শৈত্যে অভ্যস্ত হইবার পর শরীর শরদাগমে সহসাই সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত হওয়ায় সঞ্চিত পিত্ত প্রায়ই কুপিত হয়। এজন্য শরৎ কালে মধুর ও লঘু, শীতল এবং ঈষৎ তিক্ত পিত্তনাশক খাদ্য ক্ষুধাকালে যথা মাত্রায় ভোজন করিবে। এই সময় মেষ, হরিণ এবং শশকাদির মাংস এবং শালিধান্য ও যব তণ্ডুল ও গোধূম আহার

* আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য মতে ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎকাল। যাহা হউক আমরা আয়ুর্ব্বেদেরই মত মানিয়া লইয়া প্রত্যেক ঋতুতে যেরূপ ব্যবহার থাকা কর্ত্তব্য—তাহা পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিব।

উপযুক্ত। মধ্যে মধ্যে বিরেচন লওয়া এই সময় একান্তই কর্ত্তব্য। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত—এই তিন ঋতুকে শাস্ত্রকারেরা বিসর্গকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিসর্গকালে বায়ু সকল নাতিরুক্ষ হয়। এই বিসর্গকালে সূর্য্য দক্ষিণ মুখে গমন করিলে তদীয় প্রতাপ, কাল, মার্গ, মেঘ, বাত ও বর্ষা দ্বারা অভিভূত হয়, চন্দ্রের বল অব্যাহত থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে শরৎকালে মানবদেহ মধ্যবল-যুক্ত হইয়া থাকে।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, পিত্তের প্রকোপই তাহার প্রধান কারণ। বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে সঞ্চিত পিত্ত সহজেই সাম্য হইয়া থাকে।

যাহা তিক্ত ও পিত্ত নাশক—সেইরূপ আহারই শরৎকালে প্রশস্ত। পলতা ও উচ্ছে এই সময় প্রতিদিন সেবন করিলে মন্দ হয় না। পটোল, বেগুন, ডুমুর, মোচা, থোড়, দেশী কুমড়া প্রভৃতি ব্যঞ্জন ব্যবহার করা এ সময় মন্দ নহে। দালের মধ্যে মুগের দালই এ সময় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। বিলাতী কুমড়া এ সময় ব্যবহার না করিলেই ভাল হয়, ব্যবহার করিলে অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে। ইক্ষু, চিনি, মিছরি, দুগ্ধ—এ সময় উৎকৃষ্ট পথ্য।

পেঁপে, বাতাবীলেবু, আতা, আমলকী, খেজুর, নাসপাতি—শরৎকালে বেশ উত্তম ব্যবস্থা।

এই ঋতুতে রৌদ্র সেবন এবং দিবানিদ্রা সেবন একেবারেই বর্জ্জনীয়। দধি ও ক্ষার দ্রব্যও এই ঋতুতে বর্জ্জন করিতে হইবে।

দম্পতী জীবন

"বিবাহ"

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ তর্কতীর্থ]

বিবাহ গৃহাস্থাশ্রমের মূল। পূর্ব্বকালে মনুষ্য-গণ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য-অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেন, এবং গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী রীতি নীতি শিক্ষা করতঃ গৃহস্থাশ্রমের অবশ্যম্ভাবী নানাবিধ উদ্বেগ, নানাবিধ ক্লেশ সহিবার শক্তিলাভ করিয়া কেহ চব্বিশ বৎসর বয়সে কেহ, ত্রিশ বৎসর, কেহ বা তাহারও অধিক বয়সে বিবাহ করিতেন, আজ কাল আর কোনও বিবাহের কাল নির্দ্দিষ্ট নাই—যে সময়ে বিবাহ দিলে নিজেদের সুবিধা বা স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, সেই সময়েই আত্মীয়গণকে ছেলেদের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত দেখা যায়। অকাল বিবাহে সন্তানের শারীরিক ইষ্টানিষ্ঠ হইতে পারে, ইহাও অনেকে চিন্তা করিবার অবসর পান না। যাহা হউক আজ কাল পুরুষ ও নারীগণের কত বয়সে বিবাহ হইলে পরস্পরের আন্তরিক স্নেহ দৃঢ় হয় এবং সুস্থ ও সবল শরীরে সংসার ধর্ম্ম রক্ষা

হয়, প্রথমে সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করা আবশ্যক।

মনুর যুগে চব্বিশ বৎসরের পুরুষ ও আট বৎসরের কন্যা, অথবা ত্রিশ বৎসরের পুরুষ ও বার বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ সর্ব্বানুমোদিত হইলেও এ অল্পায়ুর যুগে তাহা অনেকেরই স্পৃহনীয় হয় না, এখন কিছু কাল ধর্ম্মে বিশেষতঃ দধি দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেশের অধিকাংশ লোকের শরীর অপরিপুষ্ট, লাবণ্যহীন। পরমায়ুও প্রায় ষাট বৎসরের অধিক দেখা যায় না, সেই জন্য পুরুষের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইলেই লোকে তাহাকে প্রৌঢ় বা অর্দ্ধবৃদ্ধ বলিয়া বৈধব্যের আশঙ্কায় কন্যাদান করিতে ইতস্ততঃ করে। পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের নিকটও অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা ব্যবহার জ্ঞান শূন্যা নিতান্ত বালিকা বলিয়া উপেক্ষার যোগ্যাই হইয়া থাকে। প্রাচীন কালের মত এখন আর কেহ অস্ফুটজ্ঞানা বালিকাকে বধূরূপে আনিয়া, নিজেদের ছোট সন্তানের মত শিক্ষা দিয়া আপনাদের সংসারের মত, আপনাদের মনের মত, করিয়া লইতে ইচ্ছা করে না, সকলেই মানুষ করা—কিছু বিষয় জ্ঞান সম্পন্না কন্যাকেই আদর করিয়া থাকে। যাহা হউক যুগধর্ম্মের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, অথচ একালের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং যে সময়ে বিবাহ দিলে অকালে ধাতুক্ষয় বশতঃ শরীর অপুষ্ট না হয়, সেইকাল নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

"বিবাহে কন্যার বয়স"

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তদুর্দ্ধং হি রজস্বলা॥"

মহামুনির এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, অষ্টম বৎসর হইতেই স্ত্রীলোক দিগের বিবাহের কাল আরম্ভ হইয়া থাকে। (তাহার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া যেন সঙ্গত নহে)

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেদ্ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকী
ত্র্যষ্ট বর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা .....

মনুর এই শ্লোকটীতেও কন্যার দ্বাদশবর্ষ ও অষ্টম বর্ষের উল্লেখ দেখা যায়, ইহাতেও স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে,ন্যূন্য পক্ষে অষ্টম বর্ষে এবং শেষ পক্ষে দ্বাদশ বর্ষে কন্যাদের বিবাহ দেওয়া সঙ্গত, এবং অষ্টম বৎসরের ন্যূন বয়সে বা দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

শাস্ত্রে অষ্টম বর্ষই ব্রাহ্মণের উপনয়নের প্রথম কাল বলিয়া বর্ণিত আছে, ইহাতেও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, আট বৎসর বয়স হইতে মানুষের সাধারণতঃ কিছু জ্ঞান বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান, উপদেশ গ্রহণে সামর্থ্য জন্মে। সেই হেতু পূর্ব্বে আট বৎসরে উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা—শাস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতির জন্য গুরুগৃহে সন্তান গণকে প্রেরণ করা হইত। নারীগণেরও আট বৎসর বয়সে জ্ঞান বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়, তজ্জন্য অষ্টমবর্ষ হইতে তাহাদের বিবাহকাল বলিয়া উল্লেখ আছে। ঋষিদিগের যুগে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে সময়ে ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় কন্যা বা বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়—বৈশ্যকন্যা বা শূদ্র কন্যা, বৈশ্য—শূদ্রকন্যাও বিবাহ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয় কন্যা বা বৈশ্য কন্যা বিবাহের পর ব্রাহ্মণীত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী হইতেন। বৈশ্যকন্যাও

ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহের পর ক্ষত্রিয়া তুল্যা হইয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কার্য্যে সহকারিণী হইতেন।

যেমন নব বল্লরীকে ইচ্ছা মত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়, সেইরূপ অপরিপক্ক জ্ঞানা বালিকাকেও শিক্ষা দিলে নিজের অভিমত পথে আনিতে বেশী প্রয়াস পাইতে হয় না, বিজাতীয় পশু পক্ষীকে মনুষ্যোচিত বুলি অথবা ব্যবহার শিখাইতে হইলে যেমন তাহাদিগকে শাবকাবস্থায় আনিয়া পোষণ করতঃ শিক্ষা দিতে হয়, বয়স হইয়া গেলে তাহাদের মাতৃভাষা বা স্বজাতীয় ব্যবহার ভুলান কঠিন হইয়া পড়ে, ব্রাহ্মণাদির পক্ষেও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়া কন্যাকে বধূরূপে আনিয়া নিজেদের মত আচার ব্যবহারে শিক্ষিতা করিতে হইলে ও স্বজাতীয় কন্যাকেও নিজেদের মনের মত করিতে হইলে, তাহাদিগকে কোমল জ্ঞানাবস্থায় বিবাহ করিয়া আনিয়া শিক্ষা দিলেই তাহা সহজে সম্ভব হইয়া থাকে, এই সকল কারণে পূর্ব্বকালে কন্যাদিগের আট-বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহটা "গৌরীদান" বলিয়া বিশেষ আদরের ছিল। এ যুগে আর হিন্দু সমাজে ভিন্ন জাতীয় বর কন্যার বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। স্ব স্ব জাতীয় পাত্র কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে, সেই সেই জাতীয় কন্যাগণও নিজেদের জাতি বংশের মত আচার ব্যবহার পিতৃগৃহেই শিখিয়া থাকে, শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগকে আর নূতন করিয়া জাত্যুক্ত আচার ব্যবহার শিখিতে হয় না। বিশেষতঃ এ যুগে আর পূর্ব্বের ন্যায় সবল দীর্ঘকায় মনুষ্য হয় না। এখনও যাঁ'রা প্রাচীন আছেন, তাঁহাদের শরীরের সঙ্গে আজ কালকার বালক বালিকাগণের স্বাস্থ্যের প্রভেদ অনেক, তাঁহাদের শরীরের তুলনায় এখনকার বালক বালিকার শরীর অনেক খর্ব্বাকৃতি, অপুষ্ট এবং দুর্ব্বল। এখনকার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাগণ নিতান্ত ক্ষুদ্র। এই সকল কারণে হিন্দু সমাজেরও অনেকে আজকা'ল কন্যার অষ্টম বা নবম বর্ষে বিবাহ অনুমোদন করেন না।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে যে, বার বৎসরের পর স্ত্রীলোকের রজোনির্গম এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর রজোনিবৃত্তি হইয়া থাকে। রজোনির্গমের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের মানসিক উত্তেজনাও প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়কে যৌবনের প্রথমোন্মেষ বলা যায়। ঋতু হইলে গর্ভধারণের ক্ষমতা আসিয়া থাকে। এই সকল কারণে ঋষিগণ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যাদিগের বিবাহ দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ সেই আদেশ নতমস্তকে পালন করেন বলিয়াই হিন্দু সমাজের অধিকাংশ স্ত্রী সচ্চরিত্রা। যাহা হউক আমরা যদি মনুর অনুমোদিত কন্যার দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ দেওয়া উচিত বলিয়া নিশ্চয় করি, তাহা হইলে বোধ হয় সকল দিক বজায় থাকে। বর পক্ষের নিকট দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা নিতান্ত বালিকা বলিয়া পরিগণিতা হয় না, বার বৎসরে ঋতু না হওয়ায়, সে সময়ে বিবাহ দিলে কন্যার মাতা পিতা প্রভৃতিকেও 'কালাতিপাতে বিবাহ দেওয়ার জন্য মুনিগণ-নির্দ্দিষ্ট পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না।

ঋতুকাল উপস্থিত হইলেও স্ত্রীলোকদিগকে অপরিণীতাবস্থায় রাখা একবারে উচিত নহে, যেমন গ্রীষ্ম ঋতুতে গরম আসে, বর্ষাকালে বৃষ্টি বর্ষণ, শীতকালে শীতাগম, শরৎ

কালে সপ্তচ্ছদ পুষ্পের বিকাশ স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, সেইরূপ ঋতুকালে নারীদিগের মানসিক উল্লাস পরিস্ফুট হওয়াও স্বাভাবিক। সেই সময়ে মনোমত পাত্রের সঙ্গে মিলন না ঘটিলে তাহাদের মন বিবিধ কুপথে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। বার বৎসরের পর ষোল বৎসরের মধ্যে নারীদিগের গর্ভাশয়াদি পুষ্ট হইয়া থাকে। সন্তান সৃষ্টির জন্যই বিধাতা স্ত্রীলোকগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা সুস্থকায়ে থাকিয়া সুস্থ সন্তানের জননী হইতে পারেন, প্রথমতঃ সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি করা নিতান্ত আবশ্যক।

"বিবাহে পুরুষের বয়স"

সকল মুনির অভিপ্রায় যে, গৃহীস্থাশ্রমের কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইলে পুরুষগণকে প্রথমতঃ শারীরিক সুস্থতা, নানারূপ ক্লেশ সহনের শক্তি, এবং বিদ্যালাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন, সেইজন্য পূর্ব্বকালে প্রথম বয়সে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য নানাবিধ কঠোরতাবলম্বন পূর্ব্বক সাঙ্গ-বেদাধ্যয়ন আর্য্য দিগের কর্ত্তব্য ছিল। সে কালে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন করিলে লোকে কৃতবিদ্য ও উপার্জ্জনক্ষম হইতেন। সকলের প্রায়শঃ চব্বিশ বৎসর বয়ঃ ক্রমে শিক্ষা শেষ হইত। এই সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় থাকার জন্য অকালে শুক্রপাত না হওয়ায় শরীর সম্পূর্ণ রূপে বৃদ্ধি, পুষ্ট ও দৃঢ় হইত। চব্বিশ বৎসরে মনুষ্যের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় হয়। এই হেতু মনুসংহিতাতে মোটামুটি চব্বিশ বৎসরে পুরুষের বিবাহের কথা দেখা যায়। যাহাদের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা শেষ না হইয়া অধিক সময় লাগিত, তাহাদের ত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইত।

এ যুগে কত বয়সে পুরুষের বিবাহ করা উচিত তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

আয়ুর্ব্বেদে আছে—

বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যমং বার্দ্ধক স্তথা,
উনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে।
মধ্যে ষোড়শ সপ্তত্যো র্মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ
চতুর্দ্ধা মধ্যমং বৃদ্ধি-যুব পূর্ণ-ক্ষয়ান্বিতং।
ভবেদাবিংশতে বৃদ্ধি র্যুবা দ্বাত্রিংশতো মতঃ
চত্বারিংশৎ সমা যাবৎ তিষ্ঠেদ্ বীর্য্যাদি পূরিতঃ
ততঃ ক্রমেণ হীনঃ স্যাদ্ যাবদ্ ভবতি সপ্ততিঃ

বয়সকে বাল্য, মধ্য ও বৃদ্ধ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহার মধ্যে ষোল বৎসরের কম হইলে বাল্য, ষোল হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্তকে মধ্যাবস্থা, তাহার পর বৃদ্ধাবস্থা বলা যায়। ঐ মধ্যাবস্থা আবার চারিভাগে বিভক্ত যথা,—(১) ষোল হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধির অবস্থা (২) বিশ বৎসরের পর বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনাবস্থা, (৩) বত্রিশের পর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণাবস্থা (৪) তাহার পর সত্তর বৎসর পর্য্যন্তকে ক্ষয়াবস্থা বলে। এখন যদি আমরা শরীরের বৃদ্ধি শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ ২১ একুশ বা বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে পুরুষের বিবাহ কাল নির্দ্ধারণ করি, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বিশেষ অসঙ্গত হয় না। যে সময়ে শরীরের বৃদ্ধি শেষ হওয়ায় যদি ও কোনরূপে শুক্রচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলেও শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। এখন বি, এ, পাশ করিতে পারিলেই কৃতবিদ্য হওয়া যায়। বিশ বৎসর বয়সে প্রায় সকলে বি, এ, পাশ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে বিবাহ করিলে কৃতবিদ্য না হইয়া বিবাহ করার দোষেও লিপ্ত হইতে হয়

না। এ দিকে বি, এ, পাশ করার পর অন্যান্য পাঠ শেষ করিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতে আর পাঁচ বৎসর সময় লাগিতে পারে। পঁচিশ বৎসরে পুরুষ একটুকু স্বাধীনতা পাইয়া থাকে, একুশ বৎসর বা বাইশ বৎসরে বিবাহের পর তিনবৎসর কর্ম্মান্তরে কাটিয়া গেলে পুরুষ যেমন সকল দিকে উপযুক্ততা লাভ করে, শরীরও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তা হয়। এদিকে বার বৎসরের কন্যার বিবাহ দিলে তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা আসিতে আরও তিন বৎসর অপেক্ষা করে। এই প্রথম তিন বৎসরের অধিকাংশ সময়ই স্ত্রীলোকদিগের পিতৃগৃহে অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই ভাবে নারীগণ যখন ষোড়শী হয়, পুরুষ ও সেইরূপ পঁচিশ বৎসরে উপনীত হয়। পঁচিশ বৎসরের পুরুষের ঔরসে ষোল বৎসর বা সতের বৎসরের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহারা বেশ সবলকায় হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করে। শারীরিক যন্ত্র সকল পরিপূর্ণ ও দৃঢ় হওয়ায় মাতা পিতারও কোন রূপ অনিষ্ট হয় না। শুশ্রুত মুনি বলিয়াছেন যে,—

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগত বীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

অর্থাৎ পুরুষদিগের পঁচিশবৎসরে এবং স্ত্রীলোক দিগের ষোল বৎসরে সমস্ত ধাতু পূর্ণ হয়, এবং বীর্য্য ও আর্ত্তব পরিপুষ্ট হয়।

"উন ষোড়শ বর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং
যদাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ, জীবেদ্ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়
স্তমোদতস্ত বালায়ং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"

অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে পুরুষের ঔরসে যদি ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীর গর্ভ হয়, তাহা হইলে সে গর্ভ উদরের মধ্যে মৃত হয়, জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ট হইলেও সে সন্তান বেশীদিন বাঁচে না; বাঁচিলেও দুর্ব্বল শরীরে চির কাল কাটাইতে হয়। এই সকল কারণে অতিশয় বালিকাতে গর্ভাধান করিবেনা। (ক্রমশঃ)

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ বা
Practicc of medicine,
(২য় খণ্ড)

—:o:—

রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ।

পূর্ব্বে যে রক্তপিত্তের কথা বলা হইয়াছে, সেই রক্তপিত্ত রোগ বহুদিন অচিকিৎস্য ভাবে অবস্থান করিলে যক্ষ্মা রোগ উপস্থিত হইতে পারে। তা' ছাড়া বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটিই যখন কুপিত হইয়া রসবাহী শিরা সকলকে রুদ্ধ করে, তখন তাহা হইতে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়, কারণ রসের গতিরোধ বশতঃ অন্য ধাতুগুলির পরিপোষণ হইতে পারে

না। রাজযক্ষ্মা এরূপ ভাবেও মনুষ্য শরীর ধ্বংস করিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা অতিরিক্ত মৈথুন জন্য শুক্রের অপব্যয়ই যক্ষ্মারোগ উৎপত্তির মুখ্য কারণ। অতিরিক্ত মৈথুন জন্য শুক্রধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সেই শুক্রের ক্ষীণতা পূর্ণ করিবার জন্য অন্যান্য ধাতু গুলিও ক্ষীয়মাণ হইয়াপড়ে, মানবের এই ক্ষীয়মাণ অবস্থার নামই রাজযক্ষ্মা।

যক্ষ্মা রোগের শ্রেণী বিভাগে আর একটি রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম উরঃক্ষত। অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস ভিন্ন অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, সর্ব্বদা অতিরিক্ত বা অল্প পরিমিত আহার গ্রহণ, অধিক সন্তরণ বা লম্ফন প্রভৃতি দ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে তাহাকে উরঃক্ষত বলে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর জ্বর, কফ ও রক্ত বমন জন্য ক্রমশঃ শুক্র ও রজঃ ধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। এ রোগ রাজযক্ষ্মারই অন্তর্নিহিত।

ক্ষীণ রোগও উরঃক্ষত রোগেরই অন্তর্নিবিষ্ট এবং উরঃক্ষত হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইতে থাকে। অতিরিক্ত মৈথুন, শোক ও ব্যায়ামের ফলেও ক্ষীণ রোগের উৎপত্তি হয়।

রাজযক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং ক্ষীণ রোগের চিকিৎসায় বড় পার্থক্য নাই। এই তিনটি রোগেই বল ও মল রক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নপর হওয়া উচিত। বলরক্ষার জন্য ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগ দুগ্ধ পান এবং পুষ্টিকর ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মল ভেদের জন্য এ তিনটি রোগে বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে না, তবে যদি একেবারে মলবদ্ধতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অগত্যা মৃদুবিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই তিনটি রোগে আক্রান্ত রোগীর সাধারণতঃ যে সকল কষ্ট উপস্থিত হয় এবং সেই সকলের প্রতীকারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা বলা যাইতেছে :—

এই সকল রোগে রক্ত বমন নিবারণের জন্য আয়াপান বা কুকসিমার রস, মধু বা চিনি মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে। রসের পরিমাণ ২ তোলা। আলতার জল ২তোলা, মধুর সহিত মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও রক্ত বমনের নিবৃত্তি না হইলে রক্তপিত্ত অধিকারে যে সকল ব্যবস্থা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে গুলি জ্বরাদির অবিরোধী সেই গুলির প্রয়োগ করিবে।

পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্তির জন্য ধনে, পিঁপুল, শুঠ, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বেলছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছাল—সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া—যথাবিধানে প্রস্তুত করিয়া পান করাইবার ব্যবস্থা করিবে।

মস্তকে, পার্শ্বে এবং স্কন্ধে বেদনা থাকিলে, শুলফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন একত্র বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। বেড়েলা, রাস্না, নীল, যষ্টিমধু, নীলসুঁদি—এইগুলি বাটিয়া পূর্ব্ববৎ ঘৃত মিশাইয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। গুগ্‌গুলু দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগকেশর এই কয়টি বাটিয়াও পূর্ব্ববৎ ঘৃত মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল প্রলেপে

উপকার না হইলে ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুকা ও পুনর্নবা—এই কয়টি দ্রব্য কিম্বা শতমূলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

যব ১ পল, কুলথ কলায় ১ পল, ছাগ মাংস চারি পল, জল ৪৮ পল, একত্র সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সংস্কারার্থ ১ পল ঘৃত ও ২ তোলা সৈন্ধব এবং সুগন্ধিকরণের জন্য কিঞ্চিৎ হিঙ্গু কুট্টিত করিয়া উহাতে প্রদান করিবে। ইহা সেবনে যক্ষ্মা রোগীর শিরঃশূল, কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয় ও পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।

পিপ্পলী ৪ মাষা, শুঁঠ ৪ মাষা, যব ২ তোলা, কুলথ কলাই ২তোলা, দাড়িম ৪ মাষা, আমলকী ৬ মাষা, ছাগমাংস সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ—এবং জল ৮ গুণ—একত্র পাক করিয়া তিন ভাগ জল শুষ্ক হইলে নামাইয়া ঘৃত দ্বারা সন্তলন পূর্ব্বক সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

> ককুভত্বক্ নাগবলা বানরীবীজং বিচূর্ণিতং পয়সা।
> পক্বং মধুঘৃতযুক্তং মদিকং যক্ষ্মাদিকাস হরম্॥

অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল, গোরক্ষ চাকুলে ও শুকশিম্বী বীজ, প্রত্যেকটির ১ পল চূর্ণ করিয়া চারি তোলা ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া চিনি ১ পল ও দুগ্ধ /২ সের—একত্র পাক করিয়া মোদকাকার হইলে নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া যক্ষ্মা রোগে কাস নিবৃত্তির জন্য সেবন করিতে দিবে।

> ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পি সশর্করম্।
> ছাগোপসেবী শয়নং ছাগ মধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

ছাগ মাংস ভক্ষণ, শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত ছাগ দুগ্ধ ও ছাগ ঘৃত পান, ছাগ সহ ক্রীড়া ও ছাগ বেষ্টিত স্থানে শয়ন করিলে যক্ষ্মা রোগ নষ্ট হয়।

> মধুতাপ্য বিড়ঙ্গাশ্ম জতু লোহা ঘৃতাভয়াঃ।
> ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনঃ॥

স্বর্ণ মক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, লৌহ এবং হরীতকী—এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও ঘৃত মিশাইয়া লেহন করাইলে অতি উৎকট যক্ষ্মা রোগও বিনষ্ট হয়।

> শর্করা মধু সংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
> ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্য মাক্ষিকে॥

ক্ষয়রোগী—চিনি ও মধু সমন্বিত নবনীত লেহন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি লাভ করে এবং অতুল্য পরিমাণে ঘৃত ও মধু সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলেও পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে।

এইবার হেতু বিশেষে যক্ষ্মা রোগের সাধারণ চিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে:—

অত্যন্ত মৈথুন প্রযুক্ত যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইলে মাংসরস, ঘৃত ও মধুর রস সংযুক্ত হিতকর দ্রব্য অথচ হৃদয়গ্রাহী সামগ্রী আহার ও জীবনীয়গণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

শোকের জন্য শোষ হইলে, হর্ষজনন আশ্বাস বাক্য, দুগ্ধ, স্নিগ্ধ, মধুর শীতল, লঘু ও অগ্নি প্রদীপক দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়াম জন্য শোষ হইলে, স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্য, জীবনীয় গণ দ্বারা এবং ক্ষতক্ষয় ও শ্লৈষ্মিক চিকিৎসার বিধান অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

পথপর্য্যটন জন্য শোষ রোগীকে, শীতল দ্রব্য, মধুর রসযুক্ত দ্রব্য, শরীরের উপচয় কারক দ্রব্য এবং অন্ন ও মাংসরস আহার

দিয়া চিকিৎসা করিবে। দিবা নিদ্রা ও উপবেশন এইরূপ শোষ রোগে উপকারক।

ব্রণ শোষ রোগীকে স্নিগ্ধ দ্রব্য, অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য, মধুর দ্রব্য ও শীতল দ্রব্য দ্বারা এবং দাড়িম্বাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ অম্লীকৃত বা অনম্লযূষ অথবা মাংস রসাদির দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উরঃক্ষত রোগীকে বেড়েলা অশ্বগন্ধা, গাম্ভারী, শতমূলী ও পুনর্নবা—এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দুগ্ধসহ প্রত্যহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

যক্ষ্মারোগে যে জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা প্রলেপক জ্বর।

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেন চ।
মন্দজ্বর বিলেপীচ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥

এই জ্বরে রোগীর শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা লিপ্তবৎ অনুভূত হয় এবং জ্বরও মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে ও জ্বরকালে শীত অনুভব হয়। এই জ্বর নিবারণের জন্য জ্বরাধিকারের স্বতন্ত্র ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফলের সম্ভাবনা নাই। যক্ষ্মাধিকারের ধাতু ঘটিত যে সকল ঔষধের কথা বলা যাইবে—তাহারই ব্যবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জ্বর থাকিলে ঘৃত বা তৈলাদির ব্যবহারে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে। রক্ত বমন থাকিলে মৃগনাভি ঘটিত ঔষধেরও ব্যবস্থা করিবেনা। জ্বরের জন্য জয়মঙ্গল রস, মহাজ্বরাঙ্কুশ, বৃহজ্জ্বরান্তক—এই ধরণের কোনো একটী ঔষধ ১ বার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। কাস রোগোক্ত "বসন্ত তিলক" নামক ঔষধটী যক্ষ্মা রোগীকে অনেকে পানের রসের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সময় শুভ ফলই পাওয়া যায়। এই ঔষধের উপাদান—কাস রোগ অধিকারে বলা যাইবে। প্রাতে জয়মঙ্গল দিলে, এই ঔষধের ব্যবস্থা বৈকালে করিবে।

যক্ষ্মারি লৌহ, যক্ষ্মান্তক লৌহ, ক্ষয় কেশরী নামক ঔষধ কয়টির কোনো একটিও একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নে উহাদের উপাদান লেখা যাইতেছে—

যক্ষ্মারি লৌহম্।

মধুতাপ্য বিড়ঙ্গাশ্মজতু লৌহ ঘৃতাভয়াঃ
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা॥
সর্ব্ব চূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃত মধুভ্যাং লেহয়িতি
তাম্বুদাসঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী চূর্ণ—প্রত্যেক ১ ভাগ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহ। ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় সেব্য।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—

স্বর্ণমাক্ষিক—

মাক্ষিকং মধুরং তিক্তং স্বর্য্যং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্ কুষ্ঠ পাণ্ডু মেহ বিষোদরম্॥
অর্শং শোফং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষক্ষ বিযচ্ছতি।

ইহা মধুর তিক্ত, স্বরবিশোধক, বৃষ্য, রসায়ন, চক্ষুষ্য, ত্রিদোষ নাশক ও বিষঘ্ন। ইহা সেবনে বস্তি পীড়া, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদরী, অর্শ, ক্ষয় ও কণ্ডু রোগ উপশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ—ক্রিমি ও বায়ু নাশক ও মল বদ্ধ নিবারক।

শিলাজতু—শিলাজতু স্মৃতং তিক্তং কটূষ্ণং কটুপাকিচ।
রসায়নং যোগবাহি শ্লেষ্ম মেহাশ্ম শর্করাঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং শোথার্শাংসি পাণ্ডুতা।
বাতরক্তং তথাকুষ্ঠমপস্মারোদরং হরেৎ।

ইহা তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কটুপাক, রসায়ন,

ক্ষয় রোগের প্রাবল্যে মৃগাঙ্ক রস বা রাজ মৃগাঙ্ক রস একবার করিয়া ব্যবস্থা করিও। ঐ ঔষধ ২টির উপাদান লিখিত হইতেছে—

মৃগাঙ্কোরস।

তাম্রসেন সমংহেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ।
গন্ধকঞ্চ সমংতেন রসপাদন্তু টঙ্কনম্‌।
সর্ব্বং তদ্গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেনাবশেষয়েৎ।
ভাণ্ডে লবণ পূর্ণেহথ পচেদ্‌ যাম চতুষ্টয়ম্‌।
মৃগাঙ্কা সংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজ নিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জা চতুষ্টয়ং চাস্য মরিচৈর্ভক্ষয়েন্ত্রিযক্‌।

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তা ভস্ম ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও সোহাগা ।০ আনা। সমস্ত দ্রব্য একত্র কাঁজি দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গোলাকৃতি করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মুষা মধ্যে স্থাপন করিয়া মুষার মুখ রুদ্ধ করিয়া লবণ যন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মরিচ চূর্ণ ও মধু বা পিঁপুল চূর্ণ ও মধু।

পারদ—রসায়ন। স্বর্ণভস্ম—ক্ষয়নিবারক। মুক্তাভস্ম—ক্ষয়নিবারক। গন্ধক—বল ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক। সোহাগা—কফঘ্ন।

কাঁজি—

তাং ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ
দাহং জ্বরঘ্নং কফ বাত নাশি।

ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহ জ্বর নাশক, কফঘ্ন ও বায়ুশান্তিকর।

রাজমৃগাঙ্কোরসঃ।

রস ভস্ম ত্রয়োভাগা ভাগৈকং হেম ভস্মকম্‌।
মৃত তাম্রস্য ভাগৈকং শিলাতালক গন্ধকম্‌।
প্রতিভাগদ্বয়ং ভত্রাপ্যেকিকৃত্য নিধাপয়েৎ।
বরাটী পূরয়েত্তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্কনম্‌।
পিষ্ট্বাতেন মুখং রুদ্ধা মৃদভাণ্ডেন নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গ শীতলম্‌।
রসো রাজো মৃগাঙ্কোহয়ং চতুর্গুঞ্জাং ক্ষয়াপহম্‌।

পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া বড় বড় কড়ি র মধ্যে পুরিবে এবং ছাগদুগ্ধ দ্বারা সোহাগা বাটিয়া তদ্বারা ঐ কড়ি গুলির মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক কুট্টিত বস্ত্র সংযুক্ত মৃত্তিকাদ্বারা পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ঐ মৃত্তিকাভাণ্ড তুলিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান মধু ও পিঁপুলচূর্ণ।

পারদ—রসায়ন। স্বর্ণ ভস্ম—রসায়ন। তাম্র—ক্ষয় নিবারক। মনঃশিলা—শ্বাসনিবারক। হরিতাল—কফ পিত্তনাশক। গন্ধক—রসায়ন, কফঘ্ন ও বায়ুনাশক।

ক্ষয়ের পরিপোষণের জন্য যক্ষ্মারোগে ধাতু-ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

বলী পলিত খালিত্য কার্শ্যাবল্য জ্বরাময়ান্‌।
নিবার্য্য দেহং দধতি নৃণাং তদ্ধাতবো মতাঃ।

ধাতু সকল বলী, পলিত, খালিত্য, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, ও জ্বর প্রভৃতি নিবারণ করিয়া দেহ ধারণ করে বলিয়া ইহাদের নাম ধাতু।

এই গ্রন্থ আরম্ভের সময়েই বলা গিয়াছে, যে, ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া উপদ্রব সকলের দূরীকরণই চিকিৎসকের বিশেষত্ব। যক্ষ্মা রোগে ধাতুর পরিপোষক ঔষধ প্রয়োগে ক্ষয় পরিপূরণের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উপদ্রব সকলের দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবে। এ কথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অনেক সময় মূলরোগ হইতেও উপদ্রব সকল বলবান হইয়া জীবননাশ করিয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগের অন্যান্য উপদ্রবের সহিত অনেক সময় বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা বদ্ধ হইয়া বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। তন্নিবারণের জন্য বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘৃতের মালিশ বিশেষ কার্য্যকরী। শ্বাসোপদ্রব থাকিলে এবং বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাবদ্ধ হইয়া কষ্ট হইলে "সিতোপলাদি লেহ" প্রত্যহ ১ বার, আবশ্যক হইলে দুইবারও সেবনের ব্যবস্থা করিবে। অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা ভিন্ন এই ঔষধ প্রাতে ১ বার মধুর সহিত মাড়িয়া রাখিয়া সমস্ত দিনে এক একটু করিয়া এবং বৈকালে একবার মাড়িয়া রাখিয়া রাত্রে যতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটু একটু করিয়া অবলেহ করা উত্তম ব্যবস্থা। এই ঔষধের উপাদান—

সিতোপলা তুগাক্ষরী পিপ্পলী বহুলা ত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্র সর্পিষা।
চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাস ক্ষয়াপহম্।

দারুচিনি ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা এবং চিনি ১৬ তোলা। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—সকল দ্রব্যগুলিই শ্লেষ্মঘ্ন, বিশেষতঃ বংশলোচন ক্ষয় পূরক। এই ঔষধে বদ্ধ শ্লেষ্মা সরল করিয়া তুলাইয়া দিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এই ঔষধে যক্ষ্মারোগীর হস্ত পদাদির দাহও প্রশমিত হয়।

রোগের বাড়াবাড়ি দেখিলে ক্ষয় পরিপূরণের জন্য "কাঞ্চনাভ্র" ও "বৃহৎ কাঞ্চনাভ্রের" ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ দুইটির উপাদান বলা যাইতেছে,—

কাঞ্চনাভ্রঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকং।
বিদ্রুমকাভয়ারাৎং কস্তূরীত মনঃশিলা।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রন্তু সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফল মানতঃ।

স্বর্ণ ভস্ম, রসসিন্দুর, মুক্তা ভস্ম, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরিতকী চূর্ণ, রৌপ্য ভস্ম, ও মনঃশিলা—সমস্ত দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া জল সহ মাড়িয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান দোষানুসারে ব্যবস্থা করিবে।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্রঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকং।
বিদ্রুমং মৃতবৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চবঙ্গকং।
কস্তূরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতীকোষঞ্চ বালুকং।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বমর্দ্দ্য প্রযত্নতঃ।
কন্যানীরেণ সমর্দ্দ্যাং কেশরাজ রসেন চ।
অজাক্ষীরেণ সংভাব্যাং প্রত্যেকং দিবসত্রয়ং।
চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক।

স্বর্ণ ভস্ম, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হীরক, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জৈত্রী ও এলবালুকা। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে তিন দিন, কেশরাজের রসে ৩ দিন ও ছাগ দুগ্ধে ৩ দিন ভাবনা দিয়া চারি রতি বটি করিবে। অনুপান দোষানুসারে।

যদি রক্ত বমন থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ ২টির ব্যবস্থা করিবে না। কারণ মৃগনাভি থাকায় এই ঔষধ ২টি সেরূপ স্থলে প্রয়োগ করিলে রক্ত বমনের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

রাজ যক্ষ্মার কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল হৃচ্ছুল, রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এক-ধার করিয়া বাসাবলেহ সেবনের ব্যবস্থা। অতি উত্তম। ইহার উপাদান—

বাসকস্বরসপ্রস্থং মানিকা সিত শর্করাঃ।
পিপ্পল্যা দ্বিপলং তাবৎ সর্পিষশ্চ শনৈঃ পচেৎ॥
তস্মিন্ লেহত্বমায়াতে শীতে ক্ষৌদ্র পলাষ্টকম্।
দত্বাবতারয়েদ্বৌ লীঢ়ো লেহোঽয়মুত্তমঃ।

বাসকের স্বরস চারি সের, চিনি এক সের, পিঁপুল এক পোয়া, এবং ঘৃত এক পোয়া। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে লেহবৎ পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে নামাইবে। শীতল হইলে এক সের মধু মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা চারি আনা।

"চ্যবনপ্রাশ"—যক্ষ্মারোগের বিখ্যাত ঔষধ, কিন্তু যক্ষ্মার যদি জ্বর থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে না। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ রোগে, কাসোপদ্রবযুক্ত উরঃক্ষতে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। ইহার উপাদান—

বিম্বাগ্নিমন্থ শ্যোনাক কাশ্মর্য্য পাটলা বলা।
পর্ণ্যশ্চ তস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধি র্জীবকর্ষভকৌ শটী।
মুস্তং পুনর্ণবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপল চন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা।
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতানামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকধ্যং জল দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
জ্ঞাত্বা গত রসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈল সর্পিষোঃ॥
পলদ্বিদশকে ভৃষ্ট্বা দত্বার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ।
ষট্পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা।
পলমেকং নিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্র কেশরাৎ।

বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পিঁপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি (অভাবে লোধ) জীবক, ঋষভক (জীবক ও ঋষভকের অভাবে অশ্বগন্ধা) শটী, মুথা, পুনর্নবা, মেদ (অভাবে কুড়) ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাঁকোলী ও কাকজঙ্ঘা—প্রত্যেক ৮ তোলা এবং গোটা কাঁচা আমলকী ৫০০শত। (আমলকীগুলি বস্ত্রে বাঁধিয়া পুঁটলী করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে) এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইয়া ও পুঁটলী বদ্ধ আমলকীগুলি খুলিয়া, বীজ ও শিরা ফেলিয়া দিবে। তাহার পরে তিল তৈল ৪৮ তোলা ও ঘৃত ৪৮ তোলা একত্র করিয়া তাহাতে ঐ আমলকীগুলি ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত কাথের সহিত ইক্ষুগুড়ের বাতাসা ⁄৬।০ ভর্জ্জিত আমলকীতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিঁপুল ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা ছোট এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে এবং শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে

রাখিবে। মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ।

উরঃক্ষত ও ক্ষীণরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক ১ বার করিয়া ঘৃতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ঐ সকল ঘৃতের মধ্যে অজাপঞ্চক ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সুব্যবস্থা। নিম্নে ঐ দুইটীর উপাদান লিখিত হইতেছে—

অজাপঞ্চক ঘৃতম্।

ছাগশকৃদ্রসমূত্র-ক্ষীরৈর্দধ্নাচ সাধিতং সর্পিঃ।
সক্ষারং যক্ষ্মাহরং শ্বাস কাসোপশান্তয়ে পরম্॥

ছাগ ঘৃত /৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস /৪ সের, ছাগমূত্র /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধের দধি /৪ সের। সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যবক্ষার চূর্ণ /১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে।

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংস তুলাং গৃহ্য সাধয়েন্নল্বণেহম্ভসি।
পাদশেষেণ তেনৈব ঘৃত প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ঋদ্ধিবৃদ্ধী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী কল্কৈঃপৃথক পলোন্মিতৈঃ॥
সম্যক সিদ্ধে অবতার্য্য শীতে তস্মিন প্রদাপয়েৎ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনঃ কুড়বং ক্ষিপেৎ॥

গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা—ক্বাথার্থ ছাগ মাংস ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইয়া চিনি /১ সের ও মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা।০ আনা হইতে ॥০ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল।

যক্ষ্মায় যদি অতীসারে না থাকে, তাহা হইলে "দ্রাক্ষারিষ্ট" সেবন—মন্দ ব্যবস্থা নহে। ইহার উপাদান।

দ্রাক্ষা /৬।, পাকার্থ জল ১২৮ সের। শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিঁপুল ও বিট লবণ—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া এক মাস ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে।

বৃঃ চন্দ্রামৃত রস—যক্ষ্মারোগের সকল অবস্থায় সায়ংকালে পিঁপুলের গুঁড়া মধু অনুপানে একবার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা ক্ষয়ের পরিপোষক ও শ্লেষ্মঘ্ন। কাসরোগ অধিকারে ইহার উপাদানের পরিচয় দেওয়া যাইবে।

যে যক্ষ্মারোগী অত্যধিক আহার করিয়াও ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহাকে এবং অতীসার কিম্বা অণ্ডকোষ ও উদরে শোথ উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে যশোভিলাষী বুদ্ধিমান চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

দিবোদাসের পরিশিষ্ট।*

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণ-কাব্যতীর্থ, এইচ-এম, বি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

:০:

এই সকল পৌরাণিক বার্ত্তা হইতে বেশ বুঝা যায় যে—মহাত্মা দিবোদাস মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এবং সেই মানব দেবতা যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহা ভারত মহাসাগরের অতল সলিলেও নিমজ্জিত হইবেনা বা হিমাচলের অভ্রস্পর্শী উচ্চশৃঙ্গ প্রপাতে ও বিচুর্ণিত হইবেনা। যতদিন ভারতবর্ষে ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বর্ত্তমান রহিবে ততদিন দিবোদাসের নাম মানব হৃদয়ে প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জল থাকিবে। দেব দিবোসাসের যে দয়া, করুণা ও আশীর্ব্বাদ এখনও ভারতের ঘরে ঘরে স্তরে স্তরে বর্ষিত হইতেছে, তাহা অনন্ত কালেও লয় প্রাপ্ত হইবেনা। তাঁহার অভ্যুদয়ে সমগ্র ভারতবাসী—ভারতবাসী কেন পাশ্চাত্য জগত ও যে মহান সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন। তাঁহার প্রচারিত শল্যশাস্ত্রের মহিমা যখন "মথিয়া সিন্ধু দলিয়া মেদিনী লজ্ঘী শৈল রাজী" ধীরে ধীরে ভারতের অপরপারে দিগদিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, যখন ভারতীয় বিজ্ঞানালোকে জগত উদ্ভাসিত উন্মেষিত জাগরিত হইতেছিল তখন সুদুর আরবের অধীশ্বর হারুন্ অল্—রসিদ এই ভারতীয় শল্য চিকিৎসার প্রভাবে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন ভারতীয় শল্য চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাধর্ম্মালম্বী মঙ্কু আরবেশ্বর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার করোটী বিদারণকরতঃ দুরারোগ্য মস্তিষ্ক রোগ হইতে বিমুক্ত করিলেন তখন আরবাধিপতি এই দিবোদাস প্রচারিত শল্য শাস্ত্রের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অধীনস্থ সুযোগ্য চিকিৎসক মণ্ডলী ভারতবর্ষে প্রেরণ করতঃ শল্যতন্ত্র প্রধান সুশ্রুত সংহিতার অনুকরণে আহৃত সর্স'দ নামক আরব ভাষায় লিখিত শল্য শাস্ত্র খানি লইয়া গিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। আর যে শল্য চিকিৎসার জন্য আজ পাশ্চাত্য শল্য চিকিৎসক মণ্ডলী গৌরবান্বিত সেই সার্জ্জারী ও ঐ আরবের ধন সর্স'দ গ্রন্থের কৃপাতেই প্রথম লাভ করেন কিন্তু তাঁহার আজ অনেক উচ্চে আর আমরা ঘরের ধন নরকে দিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া মাত্র নিজেদের মহিমা কীর্ত্তনে, গরিমা প্রদর্শনেই পরিতৃপ্ত। কিন্তু আবার জাগিবে; যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহার মলিনতা আবার মুছিবে। যখন ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক মণ্ডলী আপনাদের পূর্ব্ব আচার্য্য গণের ও প্রাক্তন পুরুষদিগের কঠোর চিন্তাপ্রসূত, অশেষ গবেষণার ফল তাঁহাদিগের

* আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

প্রাণস্বরূপ শল্য শাস্ত্র নিচয় অন্বেষণ করিবেন। অধ্যয়ন করিবেন, অধ্যাপনা করিবেন, অনুসন্ধিৎসা আসিবে এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি মধুর্য্য রাখিতে চেষ্টা জাগিবে সেই দিন আবার ভারতবর্ষে শল্যশাস্ত্রের অভ্যুদয় ও অভ্যুন্নতি হইবে। অধুনা তাহার সূচনা ও আরম্ভ হইয়াছে ইহার অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী

ধন্বন্তরিস্ত্বামরমৃত্যুভীত
জগতীতার্থং প্রতীকার কারী।
সংকীর্ত্তনাৎ যস্য ভবেত্ত শর্ম্ম।
তস্মৈ নমো বৈদ্যকুলোদ্ভবায়॥
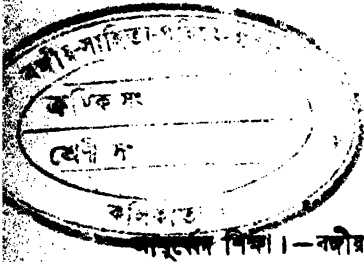
বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব মতে ও মাননীয় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতিক্রমে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিরূপভাবে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়া উচিত তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ এই সমিতির উদ্দেশ্য। চারি জন ডাক্তার ও ছয় জন কবিরাজকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন—ঐ চারি জন ডাক্তারের মধ্যে ২ জন। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য ডাক্তার সভাপতি ও ডাক্তার সম্পাদকের নিয়োগে এই সমিতি হইতে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা-প্রণালীর যে আদৌ উন্নতি সম্ভবপর নহে সে কথা যাঁহার একটু সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে, তিনিও বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সমাজ সংস্কার করিবার জন্য পুরোহিতদিগের সভাপতি ও সম্পাদক যেরূপ পাদরিগণ হইলে হইয়া থাকে, ইহার ফলও সেইরূপ হইবে। ঋষি প্রবর্ত্তিত আর্য্য চিকিৎসার শিক্ষার পন্থা-নির্দ্দেশ ডাক্তারেরা করিবেন—ইহা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের পক্ষে কখনই সৌভাগ্য নহে,—দুর্ভাগ্যেরই কথা।

ভ্রম প্রমাদ।—তা' ছাড়া এই সমিতি গঠনে ভ্রমপ্রমাদও যথেষ্ট ঘটিয়াছে। সমিতি গঠন করা উচিত ছিল,—হয় কেবল খ্যাতনামা কবিরাজদিগকে লইয়া, নয় খ্যাতনামা না হইলেও যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আজীবন শিক্ষারই চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে লইয়া। এ ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ যদি খ্যাতনামা কবিরাজদিগকে লইয়া সমিতির গঠন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়কে কেন যে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করা হইল না—তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর শুধু কলিকাতার কবিরাজদিগকে লইয়া ইহা গঠন না করিয়া মফঃস্বলেরও ২।১ জন বিচক্ষণ কবিরাজকে লইলে ইহার ফল ভাল হইত। কাজেই এই সমিতি হইতে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা সম্বন্ধে যে উপায় নির্দ্ধারণ করা হইবে, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত

বলিয়া সকলে স্বীকার করিতে পারিবেন কি না—তাহাও সন্দেহ।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।—যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের আভিজাত্য বজায় রাখিতে হইলে এখনও সকল কবিরাজেরই কর্ত্তব্য ব্যবস্থাপক সভায় ইহার তীব্রপ্রতিবাদ প্রেরণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরই সভাপতিত্বে ও সম্পাদকতায় যাহাতে এই সমিতির পুনর্গঠন হয়—সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার চেষ্টা করা। যদি সে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইতে হয়—তাহা হইলে বৈদ্যের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কবিরাজমাত্রেরই সভ্যপদ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। ব্যবস্থাপক সভার এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিয়া স্বর্গীয় ডি, এল রায়ের এই গানটি মনে পড়ে—

"হ'ল কি ? হ'ল কি !
বিলেত ফেরৎ টান্‌ছেন হুঁকা,—
সিগারেট টান্‌ছেন ভট্‌চাযি্য।"

কৃতজ্ঞতা।—যাহা হউক লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি জন্য শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয় যে ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং মাননীয় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকমাত্রেরই তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু ব্যবস্থাটি বিপরীত হইয়াছে। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন কবিরাজ মহাশয়েরা নিশ্চয়ই এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিবেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সেই প্রতিবাদ সাদরে গৃহীত হইয়া নূতন সমিতি গঠন করা হউক—সার সুরেন্দ্রনাথের নিকট ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। আমরা ভরসা করি, আমাদের এ ন্যায্য প্রার্থনা সার সুরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির উপায়ের কর্ত্তব্য অবধারণ সম্বন্ধে ডাক্তার ও কবিরাজের সমন্বয়ে যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেই সমিতিতে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার যোগ দান করা কর্ত্তব্য কিনা এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য গত ১০ই আশ্বিন গ্রেষ্ট্রীটস্থ আয়ুর্ব্বেদ সভাগৃহে একটি সভা হইয়াছিল। অনেক বাদানুবাদের পর সেই সভায় যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা এই,—

"আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে গঠিত সমিতিতে ডাক্তার সভ্য এবং সভাপতি ও সম্পাদক পরিবর্ত্তন না হইলে উক্ত সমিতিতে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীগণের যোগদান করা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ সভা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে এই প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাব গৃহীত হইল।"

বৈদ্যসভা।

(রিপোর্টারের পত্র)

—:০:—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে মাননীয় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে যে অনুসন্ধান সমিতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, ঐ বিষয়ে ডাক্তার সভাপতি ও সম্পাদক থাকা উচিত কিনা—ইহার জন্য গত ৯ই আশ্বিন বিদ্যাসাগর কলেজে এক সভা আহূত হইয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার আয়ুর্ব্বেদ সভা ইহার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় অনেক কবিরাজ মহাশয়ই এই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য—যে ডাক্তার সভাপতি থাকা উচিত কিনা তাহার আন্দোলন না করিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে আমাদের সাহায্য গ্রহণ উচিত কিনা—সেই বিষয়েই আলোচনায়

অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। ফলে নানারূপ অবান্তর কথায় উত্থাপনে সভার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া শেষে এই সভাটি "মেছো-হাটার" মত একটা কেলেঙ্কারীতে পরিণত হয়।

আমরা বৈদ্য সম্মেলনে এইরূপ কেলেঙ্কারী দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি।

বৈদ্যজাতি চিরকালই বলিয়া আসিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাওয়াতেই আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিতে পারিতেছেনা। অ্যালোপ্যাথি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতীতার কথা—সত্য করিয়া বল দেখি—তোমরা ইতোপূর্ব্বে বারম্বার বল নাই কি? এখন যেরূপ ভাবেই হউক গবর্ণমেণ্ট তোমাদের কথা গ্রহণ করিয়াছেন ইহা যে তোমাদের পরম সৌভাগ্য, ইহা তোমরা ভুলিয়া যাইলে—ইহা কি তোমাদের সুবুদ্ধির পরিচয়? তোমরা সভায় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলিলে—শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবু এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় যাহা উত্থাপন করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি তোমাদিগের কোনো মত গ্রহণ করেন নাই। অনুমান করিয়া বলিলে—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায়ের মত লইয়া বা তাঁহার দ্বারাই অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। হইতে পারে তোমাদের এই অনুমান সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। কারণ তোমরা তো কেহ সে চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি আনিতে পার নাই, সে চিন্তা ইতিপূর্ব্বে তোমরা মনোমধ্যে স্থানও প্রদান কর নাই। তাহার পর কিশোরী বাবু তোমাদের জন্য যে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্যও তোমাদের তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তাঁহার কি ইহার জন্য তোমাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তোমাদের প্রত্যেকের মত সংগ্রহ করা উচিত ছিল ইহাই তোমরা বলিতে চাও? তোমাদের লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য তিনি যতটা করিয়াছেন তাহাই তো যথেষ্ট—তাহার বেশী তাঁহার তো মাথা ব্যথা পড়ে নাই!

ডাক্তার প্রেসিডেণ্টের পরিবর্ত্তন একান্তই কর্ত্তব্য—সে পক্ষে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য তোমাদের "থৈই" হারাইবার চেষ্টা করা কখনই সমীচীন নহে।

এ ক্ষেত্রে এ কথাটি বলিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবেনা যে, ঈর্ষাই আমাদের জাতীয় উন্নতির বরাবর অন্তরায় ঘটাইয়া আসিয়াছে। এই সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল—ইহাও ঈর্ষা প্রণোদিত। "আয়ুর্ব্বেদ সভা" নাম দিয়া দুইজন কবিরাজের স্বাক্ষরিত পত্রে এই সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু এই 'আয়ুর্ব্বেদ সভা'র নাম পূর্ব্বে আর কেহই অবগত ছিলেন না, তবে বিষয়টার গুরুত্ব অনুভব করিয়া অনেকে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সভার আহ্বানকারীগণের মনে যে অন্যরূপ অভিসন্ধি নিহিত ছিল, তাহা যদি অনেকে অগ্রে বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদের মনে হয় এই সভায় এত বৈদ্য-চিকিৎসকের সমাগম হইত কিনা সন্দেহ।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ
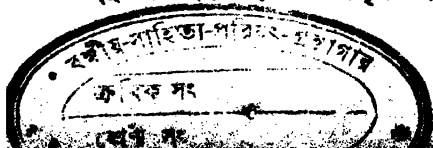
৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

বিজয়া।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

—o:*:o—

(১)

শানাই সুরে কান্না বাড়ায়,—
কুসুম তোলা মিছে আর,
শোভার আলো ওই নিভালো
আস্‌লো আঁধার বিজয়ার।
এই দশমীর বুকটী ভ'রে
কতই ভাসান্ জা'গছে ওরে,
যুগের যুগের নয়ন লোরে
বক্ষ-বসন ভিজে তা'র।

(২)

ওই যে মলিন আমের শাখা
ম্লান ম্রিয়মাণ শতদল,
ভাজা বুকের রাজা বেদন
ব'লছে ফুটে কত বল ?
হারাণো সব বুকের পুঁজি
আজকে সবাই ফিরছে খুঁজি,
আল্‌পনা ওই যায়রে মুছে
প'ড়ছে ঝ'রে আঁখি ধার।

(৩)

হেথায় যা'রা আপন ছিল
হায় রে যা'রা আস্‌বে না,
এই ভাসানে তাদের স্মৃতি
আজ কি বুকে ভাসবে না ?
এলো বুকের অতিথ গুলি,
তাও তা'দি'কে কোলাকুলি,
তা'রাও আজ কাঁদায় রে ভাই,—
সঙ্গী সবাই শারদার।

বিষ-বিজ্ঞান।

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

—:*:—

"ঈশ্বরের সন্তান"—এই অপূর্ব্ব বিশেষণে আত্মপরিচয় দিয়া, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট যখন মর্ত্ত্য ভূমে অবতরণ করিয়াছিলেন—তাহার ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে, মেসিডনের অধীশ্বর 'আলেকজাণ্ডার' ভারতবর্ষের প্রতি শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই আক্রমণ-কাল হইতেই ভারতের সাল-তারিখ-বিশিষ্ট ইতিহাসের সূত্রপাত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ও ভৌগলিক নিবন্ধে, এই সময়ের পরবর্ত্তী যুগ—ধারাবাহিক ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রায়—গ্রীক্ ব্যাপর-ভারতেতিহাসের অনেক উপাদান ও পাওয়া গিয়াছে।

স্বীকার করি—এ দেশের ইতিবৃত্ত রচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এখনও উপকরণ আহরণ পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। আমাদের অতীত এখনও নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। আমাদের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য-আবিষ্কার—তাহার অধিকাংশের মূলেই বিদেশীর জ্ঞান ও প্রয়াস সগৌরবে আত্মঘোষণা করিতেছে। হায়! আমরা এমনই অমানুষ, এমনই অপদার্থ! কেবল আলস্যের বশে—নিজের স্বাধীন অনুসন্ধিৎসাও আমরা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছি! ভূতব্যাপারের আনন্দময়ী আলোচনায়, আমাদের উৎসাহ নাই, একাগ্রতা নাই,—বুঝি বা ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন করিবার প্রবৃত্তিও আমাদের নাই! বিদেশীর মুখে আমরা এখন শুনিতে পাইতেছি—মেসিডনের সম্রাট "আলেকজাণ্ডারের" সহিত ভারতেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের এক অপূর্ব্ব সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীকরাজ চন্দ্রগুপ্তের হস্তে এক পরমা সুন্দরী কুমারীকে সানন্দে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই মহামিলনের মধুর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য, চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারকে বার জন বিষ-বৈদ্য উপহার দিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের বিশাল রাজ্যে তখন বড় বিষধরের প্রাদুর্ভাব। তাঁহার প্রাণপ্রিয় প্রজাগণ তখন প্রতি নিয়তই সর্পাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিত। সে দেশের চিকিৎসকগণ সর্পদংশনের প্রতিকার জানিতেন না। ভারতের বিষ-বৈদ্যগণ—মেসিডনের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়া, ভুজগ-ভীতি-কাতর বহু নারীনরকে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুপাশছেদি অগদ, পুনর্জীবন-প্রদ-মণি মন্ত্র মহৌষধ, গ্রীসের বিষ-জর্জ্জর দেহে জীবনীয় প্রলেপ দিয়া, ভারতের ঋষি প্রতিভা জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু সে শ্লাঘার, গর্ব্বের, দর্পদম্ভের বিষ-বিজ্ঞান আজ কোথায়? "প্রত্যক্ষ যে আজ "অনুভূতিতে" দাঁড়াইয়াছে। দিব্যোজ্জল "বাস্তব"—"আরব্য রজনীর" অসার কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। ভারতে আর বিষ-বৈদ্য নাই। ভারতের সহস্র সহস্র নরনারী—সর্প

দংশনে বিনা চিকিৎসায় পোকামাকড়ের মত মরিতেছে। ভারতের "বিষ-তন্ত্র"—মন্ত্রার্থ হীন; বিষ-বিজ্ঞানের গুরু নাই, শিষ্যও নাই। আছে কেবল অশিক্ষিত ওঝার মুখে অর্থ শূন্য বড়বড়াং ধ্বনি, আর অবৈজ্ঞানিকের হাতে—দংশিত ব্যক্তির অমূল্য জীবনের কন্দুক ক্রীড়া!

কেন এমন হইল? ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিষ-বিজ্ঞান কেন লোপ পাইল? ইহার একমাত্র উত্তর—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞায়। যাঁহারা শিক্ষিত—তাঁহারা বিষ-বিজ্ঞানের আলোচনা অনেক দিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন;—সুযোগ পাইয়া কাণ্ড-জ্ঞান রহিত গণ্ডমূর্খের দল—সর্পদংশন প্রতিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা একে নীচ জাতি, তাহার উপর নিরক্ষর;—মৃত্যুঞ্জয় অগদের মর্ম্ম ইহারা কেমন করিয়া বুঝিবে? কাজেই ঔষধ ছাড়িয়া ইহারা "ঝাড় ফুঁক" আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কতকগুলা অসম্বন্ধ প্রলাপকে মন্ত্র নামে অভিহিত করিয়া দেশের লোককে মোহ-মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের নাম, হইয়াছিল—"ওস্তাদ" "গুণিন্" ও "ওঝা"। ইহাদের নিকট বিষ-চিকিৎসার সাফল্য-প্রত্যাশা একেবারেই অসম্ভব। দেশের লোক তখনও ইহা বুঝে নাই, এখনও বুঝেনা। অনভিজ্ঞ ওঝার মন্ত্রৌষধির বাগাড়ম্বর—এখনও অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতেছে। এখনও সাপুড়ের ক্রিয়া নৈপুণ্যের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি, অনিষ্টকারী অহিতুণ্ডিব্যের উপর অন্ধ বিশ্বাস এখনও দেশের অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। ভারতবাসীর ইহা দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্য কখনও ঘুচিবে কিনা বলিতে পারি না। বলিতে পারি—ভারতের "বিষ-বিজ্ঞান" এখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই। এখনও আয়ুর্ব্বেদে, তন্ত্রে, কাব্যে, পুরাণে, উড্ডাশে, গল্পে, গাথায়— তাহার স্বপ্নাভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে—আমি তাহা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিব। কেননা "বিষতন্ত্র" আমাদের আয়ুর্ব্বেদের অপরিহার্য্য অঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করিতে হইলে বিষ-বিজ্ঞানকেও বাঁচাইতে হইবে।

দুঃখের বিষয়—এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের পরিচালক, সম্পাদক, উপাসক, লেখক,—চিকিৎসা-জগতে যাঁহারা এক এক জন রথী-মহারথী,—বিষ-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদেরও তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। "ভীষ্ম দ্রোণ" কে পরাঙ্মুখ দেখিয়া—"শল্য" আজ রথী হইতে চলিয়াছে! পাঠকগণ—এ অধমের এই আকস্মিক উন্মত্ততা ক্ষমা করিবেন।

বাজে কথায় আমরা অনেক সময় অপব্যবহার করিয়াছি এইবার কাজের কথা বলা যাউক।

ইতিকাহিনীর যে দ্বাদশ বিষবৈদ্য সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সহযাত্রী হইয়াছিলেন—তাঁহাদের একজনের নাম "কঙ্ক"। কঙ্কের নাম "আয়ুর্ব্বেদে" পাওয়া যায়। চরক-পাঠার্থী—এ নামের সহিত অবশ্যই পরিচিত। কঙ্ক রচিত বিষতন্ত্রের দুই চারিটী শ্লোক কোন কোন প্রাচীন টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উপ-সংহারে আমি তাহার উল্লেখ করিব। কঙ্কের মূল গ্রন্থ বোধ হয় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অথবা—ধূলিমলিন, জীর্ণদীর্ণ, কীটাকুল অবস্থায়, কোনও প্রাণীহীন ভূর্জ্জের অতলে এখনও লুকাইয়া রহিয়াছে।

মানুষ যেমন সর্পজাতিকে ভয় করে, সর্প ও তেমনই মনুষ্য জাতিকে ভয় করে। লোকালয়ের বহির্ভাগে—সম্পূর্ণ 'অদৃশ্য ভাবেই উহাদের অবস্থিতি। সুতরাং সর্পের আকৃতি, প্রকৃতি, জাতি—প্রভৃতি জানিতে হইলে—বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে,—সর্প দংশনের লক্ষণ, দংশনের স্থান, কাল, পাত্র ভেদে—বিষ-ক্রিয়ার তারতম্য, বিষের প্রতিকার—এ সমস্ত বিষয়ের রীতিমত আলোচনা করিতে হইবে। কেবল কতকগুলি টোটকা ঔষধ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবেনা। কাজ বড় গুরুতর, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির একার সাধ্যায়ত্ত নহে। জগবন্ধুর রথ চালাইতে হইলে, অনেক বন্ধুর 'হাত' চাই। আমি সকলেরই সাহায্যপ্রার্থী। সর্প সম্বন্ধে যাঁহার যে টুকু অভিজ্ঞতা অছে, আশা করি, তিনি আমাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

বোধ হয় ১২ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। হুগলী-তাঁত পাড়া অবৈতনিক নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক—বিজয়া দশমীর প্রাতঃকালে—মদ্রচিত 'মহেন্দ্র মিলন" নাটক অভিনীত হইতেছিল। প্রসিদ্ধ অভিনেতা কার্ত্তিক চন্দ্র দে—পৃথু রাজার অংশ এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায় চন্দ্রাপীড়ের অংশ অভিনয় করিবেন,—নাট্যসম্প্রদায় সেবার বিপুল উৎসাহে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হুগলী ও চুঁচুড়ার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বন্ধুবর ডাক্তার ৺জহরলাল দে এম্ বি মহাশয়ের সঙ্গে আমিও রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পূর্ণ বেগে নাটকের মহলা চলিতেছিল। শ্রোতৃবৃন্দ—মন্ত্র মুগ্ধের মত অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিতেছিলেন,—এমন সময় হুগলী-চকবাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মান্না আসিয়া আমাকে বলিলেন—"একটী সর্পাঘাতের রোগীকে দেখিতে হইবে। লোকটী জীবিত আছে কি মরিয়া গিয়াছে—আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা।" আমি অনেক আপত্তি করিলাম, মৃতদেহ স্পর্শে অশুচিত্বের সম্ভাবনাও জানাইলাম, মান্না মহাশয় কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার ব্যাকুল-অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অগত্যা আমাকে উঠিতে হইল। আমার শিশুকন্যা "মঞ্জুপ্রিয়া" আমার সঙ্গে ছিল। তাহাকে জহরবাবুর জিম্মায় রাখিয়া, আমি রোগী দেখিতে চলিলাম।

রোগী—প্রসিদ্ধ লেখক, 'হুগলী পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট" নামক ইতিহাস রচয়িতা, অবসর প্রাপ্ত মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দে এম-এ-বি-এল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—মনোমোহন দে। রোগীর আর একটী পরিচয় আছে। তিনি একজন বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ী। প্রথমে "দে'র চা" (De's tea) পরে 'একমি চা' নামে তিনি চা'য়ের কারবার খুলিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুর 'একমি চা' এখনও বাজারে বিক্রয় হয়।

এই চা' আমদানী করিবার জন্য পূজার সপ্তমীর দিন, মনোমোহন বাবু দার্জ্জিলিং যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেশ ছাড়িয়া —বিদেশ যাত্রা, কাজেই বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে বাবুগঞ্জের মল্লিকদের সুরকীর কলের সম্মুখভাগে—মনোমোহন বাবুকে ভর সন্ধ্যার সময় বিষধরে দংশন করে। ঘটনাস্থল

হইতে—ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিক এম-বির ঔষধালয় অধিক দূরে ছিল না। মনোমোহন বাবুকে তৎক্ষণাৎ প্রসাদ বাবুর নিকটে লইয়া যাওয়া হয়। তৎকালোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রসাদ বাবু রোগীকে বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ প্রতিভা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)
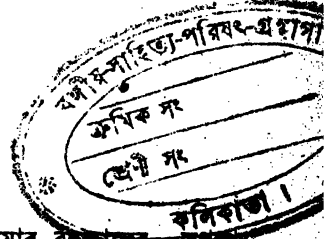
[তৃতীয় দৃশ্য]

চ্যবনের আশ্রম।

নব যৌবন সম্পন্ন চ্যবন ও সুকন্যা।

চ্যবন। সাধ্বি! তোমার সাধনা আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চে। আমি এতদিন সাধনমার্গের বৃথা অভিমান ক'রতাম, কিন্তু তোমার অসম্ভাবিত কার্য্যকলাপে আমার সে অভিমান চূর্ণ হ'য়েছে। এখন বুঝেছি—ঐকান্তিক ইচ্ছাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সকলপ্রকার উচ্চ অধিকার লাভের সঙ্কল্প সকলেই তো হৃদয়ে পোষণ ক'রে থাকে, কিন্তু সকলেই যে সিদ্ধিলাভ করেনা—তা'র প্রধান কারণ—সে সঙ্কল্পের সহিত কামনা বিজড়িত। কামনা শূন্য হ'য়ে সঙ্কল্প ক'রতে পা'রলে সিদ্ধির পথ সহজেই পরিষ্কৃত হয়। তুমি বালসুলভ চাপল্য নিবন্ধন আমার চক্ষুতে শলাকা বিদ্ধ ক'রে যে অপরাধ ক'রেছিলে—তা'র প্রায়শ্চিত্ত—তোমার কামনাশূন্য দৃঢ় সঙ্কল্প,—এই অতিবৃদ্ধ চ্যবনের নবযৌবন ফিরিয়ে এনে তা'কে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করা। তোমার সে সঙ্কল্প এখন পূর্ণ হ'য়েছে, তুমি আমার বহুকালের ... গৌরবকে পরাস্ত ক'রে সতীত্ব-গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছ। প্রকৃত পতিপ্রাণা ভার্য্যা লাভে স্বামীর যে সর্ব্বপ্রকার শান্তির পথ পরিষ্কার হ'য়ে থাকে—তুমিই তা'র জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সুকন্যা। আর্য্যপুত্র! আমাকে এত কথা ব'লে লজ্জিতা ক'রছেন কেন? রমণীর পক্ষে স্বামীর তৃপ্তিসাধনই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমি আর বেশী কি ক'রেছি, দেবতারা সন্তুষ্ট হ'য়ে বর দিতে চেয়েছিলেন,—আমি আপনার অক্ষত স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি,—সে তো আমার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। থাক্ সে কথা প্রভো! এখন একটা কাজ ক'রতে হ'বে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের অবসানে বসুন্ধরার সে সৌম্য-মধুর-স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃশ্য যেন অন্তর্হিত হ'বার উপক্রম হ'য়ে আসছে। জীবকুল ধর্ম্ম-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে পাপরাশি অর্জ্জনে রোগ-সঙ্কুল হ'য়ে প'ড়্ছে। অল্পায়ুঃ—অকাল বার্দ্ধক্য—স্বাস্থ্যহীনতা—সকল গুলিই ক্রমে ক্রমে শরীরিদিগকে আক্রমণ ক'রেছে। সূচনা কালেই অবস্থা যেরূপ ভয়ানক হ'য়েছে, তা'তে অতি শীঘ্র ইহার প্রতিবিধানের উপায় না

ক'রতে পা'রলে কালে পৃথিবীতে মানব জাতির ধ্বংস সুনিশ্চিত।

চ্যবন। (হাসিয়া) তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে তা'র কি উপায় বিধান ক'র্‌বে, প্রিয়তমে!

সুকন্যা। উপায় বিধান আমি ক'রবনা, —উপায় বিধান ক'রবেন সেই জগৎস্রষ্টা —বিশ্বনিয়ন্তা অনাদিপুরুষ স্বয়ম্ভু। তিনি কালে ধরিত্রীকে এইরূপ রোগসঙ্কুল হ'বে দিব্য দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে নিজেই উপায় বিধানে ব্যগ্র হ'য়ে "আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা" প্রণয়ণ ক'রেছেন। শুনেছি—দক্ষপ্রজাপতি তাঁর প্রধান শিষ্য। দক্ষপ্রজাপতির নিকট থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট থেকে দেবরাজ ইন্দ্র যথারীতি দীক্ষা নিয়ে সে সকল শিক্ষা আয়ত্ত ক'রেছেন। স্বর্গরাজ্য রোগাসুর দিগের আক্রমণ থেকে তা'রি ফলে আজি নিরাময়। আর মর্ত্ত্যলোকে —আপনারা যে তপঃপরায়ণ এতগুলি ঋষি ত্রিলোকের হিতকামনায় দেহ-মন-প্রাণ— সকলই ঐকান্তিক ভাবে শ্রীভগবানে নিয়োজিত ক'রেছেন, তাঁদের কি সে শিক্ষা-গ্রহণের শক্তির অভাব আছে? চিকিৎসা আর শ্রুতি সুখকর-বিষয়ের অন্তর্নিহিত নহে, আপনিই তা'র জাজ্জল্যমান প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আপনি অশীতিপর বৃদ্ধ, পলিতকেশ—গলিত দন্ত— জীর্ণশীর্ণ-দেহ ছিলেন—বার্দ্ধক্যের সকল চিহ্নই আপনাকে ভীষণভাবে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল, স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অশেষ করুণায় আপনার সে দশা অপগত হ'য়েছে। চিকিৎসার মহিমা আর শু'নবার বিষয় কি আছে আর্য্যপুত্র! আপনারা আর কালবিলম্ব না ক'রে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্বর্গলাভের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যা—এই চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ত্ত করুন,—তাহার প্রভাবে দেহীদিগের কল্যাণ সাধনে অশেষ পুণ্য অর্জ্জন করুন,— বহুবর্ষব্যাপী যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা দ্বারা যে আত্মতৃপ্তি না হয়, একটি আতুরের প্রাণরক্ষা ক'র্‌লে সে আত্মতৃপ্তি সহজেই হয়। আপনারা নির্জ্জন গিরিকন্দরের তপস্যা ত্যাগ ক'রে এখন জনপদে গিয়ে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা বিস্তার ক'রে সেই আত্ম তৃপ্তিলাভ করুন, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। প্রভো! এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রবেন কি?

চ্যবন। সাধ্বি, তুমি এ কি বলছ? তুমি এ সকল কথা কোথায় শু'নলে? তুমি রমণী,—দেবলোকের সংবাদ মানবমহিলার গোচর হ'ল কি ক'রে?

সুকন্যা। প্রভো! যাঁদের অপার করুণাবলে আপনার বিগত যৌবন ফিরে এসেছে— সেই মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ই গত রাত্রে স্বপ্ন দিয়া এ সকল রহস্য আমাকে অবগত করিয়েছেন এবং হৃদয়ে এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন ক'রেছেন। প্রভো! শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে,—সঙ্গে সঙ্গে স্পর্দ্ধাও উপস্থিত হ'চ্ছে, কিন্তু আপনার কাছে সব কথা প্রকাশ না ক'র্‌লে যে কোনো উপায়ই হ'বেনা, সেই জন্য আপনাকে সব কথা নিবেদন ক'রছি। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাকে এ সকল তথ্য প্রকাশের পর আদেশ ক'রলেন—"সাধ্বি! তোমার স্বামী মহাপুরুষ। তাঁকে তপ, জপ—অন্যান্য আরাধনা ছাড়িয়ে এই কার্য্যে ব্রতী কর। উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজ হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থান ক'রছেন, তাঁর নিকট গমন ক'রতে পরামর্শ দাও এবং মহাতপা ঋষিদিগকে

আহ্বান ক'রে সেখানে মহাসভার আয়োজন কর্ত্তে বল। ঋষিপুঙ্গবদিগের সুখ-সম্মেলনে ধরিত্রীর জীবগণের রোগ মুক্তির পথ অতি সহজেই পরিষ্কৃত হ'বে। যাও দেবি! কল্য প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গেই এ কথা স্বামীর নিকট ব্যক্ত কর—স্বামীর এই সার্ব্বজনীন-লোকরক্ষা-ধর্ম্মের সহায়তায় তুমি যশস্বিনী হ'বে, সেই যশঃ-সৌরভ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত হ'য়ে প'ড়বে। উঠ সাধ্বি! আর নিদ্রা যেওনা। পৃথিবীর বড় বিপদ,—এ বিপদে, তুমি মূর্ত্তিমতী শক্তিরূপে বিশ্বসংসার রক্ষা ক'রবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।" প্রভো! স্বপ্ন অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল, তা'র পর আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি!

চ্যবন। কি অপূর্ব্ব রহস্য! শক্তির অংশ সম্ভূতা-প্রাণী দুঃখকাতরা কোন মহাদেবী তুমি? এরূপ স্বপ্নাবেশের অদৃষ্ট তোমার পক্ষেই সম্ভব। সত্যই আমি বহু পুণ্যফলে তোমার মত রমণীরত্ন লাভ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছি। জগদীশ্বর এ সংসারে যে সকল ব্যাপার সংঘটন করেন, সে সকলের মূলেই এক অভূতপূর্ব্ব উদ্দেশ্য নিহিত। নেত্রতারকায় শলাকা বিদ্ধ হ'য়ে যদি রাজকীয় দান উপেক্ষা ক'রে তোমাকে অভিসম্পাতে ভস্ম ক'রে ফে'লতাম, তা'হলে তো আমার এই শুভদিন উপস্থিত হ'তনা। যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা—সকল বিষয়ের অপেক্ষা আতুরের রক্ষায় যে মোক্ষলাভের পথ অতি প্রশস্ত—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আজ তুমি সত্যই আমার চক্ষে নূতন জ্যোতিঃ প্রদান ক'রেছ। আমি আজ থেকে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমারই উপদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন ক'রবো। তোমাকে বিবাহ ক'রে সংসারী হ'য়েছি, এক্ষণে ভগবদারাধনায় আর বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন না হ'য়ে, সংসারী জীবগণের রক্ষার জন্য কায়মনোপ্রাণ—সকলি নিযুক্ত ক'রবো। যা'তে জীবকুল রক্ষা লাভ করে, তাহাই চ্যবনের যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা—সর্ব্ব বিষয়ের মূল হ'বে।

সুকন্যা। প্রভো! ধন্য হ'লাম,—মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট আপনার একাকী গমন ক'রতে হ'বেনা, আমিও আপনার অনুগামিনী হ'ব। কি হ'বে প্রভো! শুধু ভগবদারাধনার তপস্যা ক'রে? ভগবানের সৃষ্ট জীবকুলের রক্ষার জন্য যে তপস্যা,—সে তপস্যা ভগবানকে ডাকার চেয়ে ঢের বেশী। সে তো ভগবানেরই প্রিয়তম কার্য্য।

(দূরে রাজা শর্য্যাতির প্রবেশ)

শর্য্যাতি।

বহুদিন দেখি নাই তনয়ার মুখ,
চির আদরের সে যে সন্ততি আমার,
কঠিন-নির্ম্মম হ'য়ে দিয়াছি বিলা'য়ে
এই বনে—এইস্থানে পিশাচের মত।
কি করিব—অনুপায়—ভীষণ সে দিন,
ঋষি-কোপ হ'তে দেখি আর রক্ষা নাই,
কাজেই বিবেকহীন হতবুদ্ধি হ'য়ে—
দুষ্ট সরস্বতী বশে বিবশ-বচনে—
রক্ষা হেতু প্রাণ তা'র দিলাম বিলা'য়ে।
বিলা'য়ে দিয়াছি বটে, কিন্তু স্নেহ তা'র
ভুলিতে যে নাহি পারি (ভোলা নাহি যায়)
এসেছি তা'তেই ছুটে—লইব কুশল,
দেখিব নয়ন ভরি' মু'খানি তাহার।
ঐ না কুটীর দূরে?—যাই ত্বরা করি।
ও কি ও—ওই না সে, রহিয়াছে ওই না দাঁড়ায়ে?
(কিন্তু) কোথা সে চ্যবন ঋষি স্থবির জামাতা?

চক্ষের নহেতো ভ্রম ?—দুহিতা আমার
রহিয়াছে উপবিষ্ট ল'য়ে এক যুবা !
একি ! কলঙ্কিনী তবে কি সে দুহিতা আমার ?
হে বিধি !
এই কি বিধান তব ! এ দৃশ্য দে'খাতে
আনিলে কি শর্য্যাতিরে এ হেন কুস্থানে।
না—না—চক্ষের নিশ্চয় ভ্রম। চির-ধর্ম্মশীলা
দুহিতা আমার সে যে,—তা'র দ্বারা কভু
এ হেন বীভৎস কার্য্য হ'বে না সাধন।
যাই—ছুটে যাই—সত্য মিথ্যা করিগে নির্ণয়।

সুকন্যা। (শর্য্যাতিকে দেখিয়া)
পিতা—পিতা, প্রণাম তোমার পদে।

শর্য্যাতি।
ওঃ ! কি ভীষণ দৃশ্য ! দূর হ' পাপিষ্ঠা,
শর্য্যাতির মুখে কালী দিলি এতদিনে !
ব্যভিচার ! হা বিধাতঃ ! এ হেন তাণ্ডবলীলা
দেখাবার আগে, শর্য্যাতিরে কেন তুমি
অন্ধ না করিলে ?

সুকন্যা। পিতা, কি বলিছ ?
ব্যভিচার কোথা ?
পরম গার্হস্থাচারে ধন্য কন্যা তব।
কেন এ অনর্থ বাণী তোমার বদনে ?

শর্য্যাতি। কেন এ অনর্থবাণী ?
কেবা এ যুবক ?
কোথা গেল স্বামী তোর সে বৃদ্ধ তাপস ?
বধিয়াছ তা'রে বুঝি, ব্যভিচার-লীলা
নিরাপদে সংঘটন করিবার তরে ?
কিন্তু—
অতঃপর পাপ-লীলা আর না চলিবে।
শাস্তি দিব নিজহাতে সমুচিত যাহা,—
এস,—লহ এই শাস্তি আজ জারের সহিত।
(অসি নিষ্কাশন ও হত্যা করিতে উদ্যত এবং স্বর্গ হইতে আকাশবাণী)

মহারাজ ! নিরস্ত হউন, আপনার এই কন্যা অতি পতিব্রতা। শুভক্ষণে এই কন্যা আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সম্মুখে যে যুবা পুরুষ বর্ত্তমান—উনিই মহর্ষি চ্যবন। আপনার কন্যার পাতিব্রত্যে আমরা চিকিৎসা বিদ্যা দ্বারা উঁহাকে পুর্ব্বযৌবন প্রদান করিয়াছি।

(রাজা আকাশবাণী শ্রবণে ক্ষণকালের জন্য গুম্ভিত হইলেন। তাহার পর স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন)

১ম অঃ কু। মহারাজ ! স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের নাম শুনেছেন বোধ হয়, আমরাই সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আকাশবাণী দ্বারা আমরাই আপনাকে কন্যাবধে নিরস্ত ক'রেছি। আপনার কন্যার যশঃপ্রভায় আপনি গৌরবান্বিত হ'বেন। আপনার কন্যা শুধু পাতিব্রত্যে নহে, নারী-সমাজে মাতৃত্বের আদর্শ হ'য়ে অতি শীঘ্রই বিশ্ব সংসারে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুধা বিতরণ ক'রবেন। সে সুধার আস্বাদ পেয়ে ব্যাধি ক্লিষ্ট আতুরকুলের জীবন রক্ষা হ'বে। আপনার কন্যার পাতিব্রত্যে একান্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে আমরাই তাঁহাকে "আমলকী রসায়ন" নামে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত ক'রে দি'ছলাম, সেই ঔষধ সেবনে, অতি বৃদ্ধ চ্যবন আজ আপনার সমক্ষে যুবকরূপে উপস্থিত থেকে আপনাকে ভ্রান্ত ক'রে তুলেছেন। আজ থেকে এই "আমলকী রসায়নের" নাম "চ্যবনপ্রাশ" হ'ল। মহারাজ ! নিশ্চিন্ত হোন ! আপনার বহু সুকৃতির ফলে আপনি যে

কন্যারত্ন লাভ ক'রেছেন, তাঁরই পুণ্যে আপনার নিষ্কলঙ্ক কুল চিরদিনই পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা উজ্জ্বল হবে।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয় অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিলেন এবং রাজা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহাদের উর্দ্ধগতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন]

সুকন্যা। বাবা, দেবতাদ্বয়ের কৃপায় আজ আমার বৃদ্ধস্বামী নবযুবক। বাবা, উঁহারা স্বর্গবৈদ্য, উঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই।

শর্য্যাতি। মা, না বুঝতে পেরে কটু কথা ব'লেছি, কিছু মনে করিসনে। এখন চল্ বিশ্রাম করিগে।

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(মর্ত্তভূমি)

[রোগ রাক্ষসগণ]

গীত।

আয় আয় আয়, মস্ত সুযোগ, নাই গোলযোগ,
ওলট পালট ক'রবো আজি বিশ্ব।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেছে,
কলির রাজ্যে পাপ ঢুকেছে,
এই তো সময়,— খুব সুবিধা,
খুলতে মোদের দৃশ্য।
ভেঙ্গে দিব যুবার দেহ,
শূন্য ক'রবো কারো গেহ,
কারো সন্তান নেবো কেড়ে,
কারো কাছে যাবো তেড়ে,—
কারুর স্বামী— কারুর পত্নী,—
কারুর নেবো শিষ্য।
কারুর শরীর ফুলিয়ে দেবো,
কারুর রক্ত চুষে নেবো,
শিরঃপীড়ায় কাতর হ'য়ে
কেউবা টানবে নস্য।
কেউ বা ব'লবে—পালাই পালাই,
কেউবা ব'লবে— চল্— চ'লে যাই,
কেউ বা যা'বে ডাকতে বদ্যি,—
হ'য়ে অনুগত বশ্য।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান—হিমালয়ের সানুপ্রদেশ, সময়— প্রভাত। আত্রেয়, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, যাজ্ঞবল্ক, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণ ও সুকন্যা]

ভরদ্বাজ। মহর্ষি চ্যবন! আপনি যে সহধর্ম্মিণী লাভ ক'রেছেন, এই সহধর্ম্মিণী হ'তে শুধু আপনার নয়—সমগ্র ঋষির মুখ উজ্জ্বল হ'বে। সত্যই তো ঋষিবৃন্দ!—আমরা কি ক'রছি! শুধু তপঃপ্রভাবে আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই কি আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য? সমগ্র মানবজাতির শুভাশুভের ভার লওয়া কি ঋষিকুলের প্রধান কার্য্য নয়? পরমাত্মা তো সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, সুতরাং অহং জ্ঞানে বিভোর হ'য়ে শুধু নিজ দেহের মধ্যে অবস্থিত এই কণামাত্র বিরাট আত্মার উৎকর্ষের সাধন ক'রলে কি সব করা হ'ল? না না, সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মারই সদ্গতি কামনা

ক'রতে হ'বে। সুস্থদেহ—সুস্থমন না হ'লে আত্মার উন্নতি অসম্ভব। বাস্তবিক পৃথিবীর লোক যে এত রোগ সঙ্কুল—এ তো আমাদের মাথায় আসেনি। আপনার সহধর্ম্মিণীই দয়াবতী হ'য়ে আমাদের চক্ষুরুন্মীলন ক'রে দিয়েছেন। আমাদের কর্ত্তব্য এখন উজ্জ্বলভাবে সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছে।

(দূরে "ওগো তুমি কোথায় গেলেগো" ক্রন্দনশব্দ)

সুকন্যা। ওই ওই শোন প্রভো, ভীষণ—ক্রন্দন অভাগিনী কোন নারী স্বামী হীনা বুঝি।

(দূরে "ওগো আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ" বলিয়া আবার ক্রন্দন রোল উত্থিত হওন)

সুকন্যা।—শোন প্রভো!
সত্য আজি অনাথিনী হ'য়ে
করুণ ক্রন্দন রোল তুলিতেছে ওই।
আমিও রমণী জাতি,—
ওই শোক ধ্বনি
বিদীর্ণ করিছে প্রাণ পশিয়া মরমে।
কর প্রভো! নিবারণ এই অত্যাচার,
অকাল মরণ-ব্যথা দাও উঠাইয়ে।

ভরদ্বাজ। ঋষিবৃন্দ!—
বদ্ধ হও প্রতিজ্ঞার পাশে,
শিখিবে যতন করি' চিকিৎসা পদ্ধতি।
যা'ব আমি ইন্দ্রালয়ে অগ্রণী হইয়া,
শিখিয়া আসিব সেথা যত বিদ্যা তাঁর,
শিখাইব সযতনে তোমাদের পরে,
রোগসিন্ধু-কর্ণধার হইবে তোমরা।
মোদের হৃদয় নাই, কিন্তু এই নারী,
—কি উদার প্রাণ ল'য়ে ল'ভেছে জনম,
ভাবহ বারেক তাহা। শাপভ্রষ্টা দেবী
নারীরূপে অবতীর্ণা উপদেশ দানে।
আর না—র'বনা নিশ্চিন্ত আর;
বিদরে হৃদয়,
আর্ত্তের বিয়োগপূর্ণ শুনি শোকধ্বনি।

অঙ্গিরা। একা যা'বে তুমি প্রভো!
মোর সাধ মনে—
যা'ব আমি তব সাথে,—তব তৃপ্তি তরে।

ভরদ্বাজ। না, না—একাই যাইব আমি—
দুর্গম সেথায় হিমালয় পরপারে।
তোমরা সকলে—
চিত্তশুদ্ধি করি রহ মোর প্রতীক্ষায়।
যত শীঘ্র পারি আমি আসিব ফিরিয়া
পরে শিখ যত বিদ্যা অধীত আমার।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

[স্থান—ইন্দ্রপুরী, সময় অপরাহ্ণ।
ইন্দ্র ও শচী]

শচী। দেবরাজ! ত্রিভুবনে যত বিদ্যা আছে আপনি কি সব শিখ'বেন? কি যে একটা "আয়ুর্ব্বেদ" নামে নূতন বিদ্যা শিখেছেন, এতদিন অন্যান্য বিদ্যা অর্জ্জনের পর আপনার তবু কিছু অবসর ছিল, কিন্তু এ বিদ্যাটা লাভ ক'রার পর থেকে আপনার যেন আর এক মুহূর্ত্ত সময় নেই। ওই চিন্তায় রাত দিনই বিভোর হ'য়ে আছেন!

ইন্দ্র। মহিষি! সত্যই রাত দিন এই বিদ্যা নিয়ে বিভোর হ'য়ে আছি। এতদিন যে সকল বিদ্যার চর্চ্চা ক'রেছি—এই বিদ্যাটা

বাস্তবিকই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ বিদ্যা প্রকৃত যে আয়ত্ত ক'রতে পারে, তা'র আর অন্য বিদ্যার অনুশীলনে রুচি হয় না। এ বিদ্যার ফলে একটী আতুরকে আরোগ্য ক'রতে পার'লে কি ফল হয় শুনবে—

"কপিলা কোটী দানাদ্ধি যৎ ফলং
পরিকীর্ত্তিতম্।
ফলং তৎকোটী গুণীতমেকাতুরা
চিকিৎসয়া॥

অর্থাৎ কোটী কপিলা দান ক'রলে যে ফল লাভ হয়, একটিমাত্র আতুরকে নির্ব্যাধি ক'রতে পা'রলে তা'রও কোটী গুণ ফল লাভ হ'য়ে থাকে।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যার হর্ত্তারঃ শ্রেয় সো জীবিতস্যচ॥

আরোগ্যই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সম্পত্তি লাভের প্রধান উপায়। কিন্তু একমাত্র ব্যাধিই সেই আরোগ্য, পারলৌকিক মঙ্গল,এমনকি জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করে। মহর্ষি! আমি ত্রিদশালয়ের অধীশ্বর,—রোগ-রাক্ষসগণ তাণ্ডবলীলায় বিশ্বসংসার বিপর্য্যস্ত ক'রে তুল'ছে। আমার কি উচিত নয় সে সকলের প্রতীকারের ব্যবস্থা করা—ঐ সকল রাক্ষসকে একেবারে সংহার করা,—আরোগ্য অক্ষুন্ন রা'খবার ব্যবস্থা ক'রে বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধন করা? মহর্ষি! এই জন্যই এই বিদ্যা অর্জ্জন করার পর এত করে এর অনুশীলন ক'রছি।

শচী। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই—এ বিদ্যা শিক্ষার ক'রবার প্রবৃত্তি কি আর কারো নেই? আপনারা ক'জনই বা এ বিদ্যা শিক্ষা ক'রেছেন? আর সুরলোকেই কি শুধু রোগরাক্ষসগণের অত্যাচার? এই যে পৃথিবীর কর্ম্মগতপ্রাণ জীবগণ, যা'রা কর্ম্মের তাড়নে অম্লান বদনে মাথায় পাপের পসরা বহন করে এবং তারই ফলে এই রোগ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পদে পদে উৎপীড়িত হয়, তা'দের মধ্যেই বা কয়জন এই লোক হিতকর বিদ্যা আয়ত্ত করেছে? আপনারাই বা সে জন্য কি ব্যবস্থা ক'রেছেন প্রভো! এ বিদ্যাটা যদি এতই প্রয়োজনীয়, তা' হ'লে তো সমগ্র জগতেই এ বিদ্যার বিস্তার লাভ করা উচিত।

ইন্দ্র! হাঁ তা'তো উচিতই এবং সে কার্য্য সম্পন্ন হ'তেও বেশী বিলম্ব হ'বেনা। প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক ব্যাপারেই আগ্রহ বাহুল্য হয়—এটা বিধাতার নিয়ম। আগে যখন আমরা অসুরজাতির উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত ছিলাম, তখন ধনুর্ব্বেদের চর্চ্চা ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হ'য়েছিল। এখন রাক্ষসগণ রোগের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছে। এখন এই বিদ্যা বিশ্বসংসারে শীঘ্রই আপনা থেকে বিস্তৃতিলাভ ক'রবে।

(মহর্ষি ভরদ্বাজ ম্লানমুখে ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ করিলেন)

ইন্দ্র। আসুন মহর্ষি! আপনার নিজের এবং মর্ত্ত্যলোকের সার্ব্বজনীন কুশলতো! আপনার পদাপর্ণে আজি ইন্দ্রপুরী ধন্য হ'ল।

(এই বলিয়া ইন্দ্র ও শচী মহর্ষির পাদ বন্দনা করিলেন)

ভরদ্বাজ। দেবেন্দ্র! আপনার অভ্যর্থনায় আমি প্রসন্ন হ'লাম। আমার সমস্তই কুশল। তপশ্চরণে কোনো বিঘ্ন হ'চ্ছেনা। কিন্তু দেবরাজ! পৃথিবীর বড় দুর্দ্দিন. এরূপ দুর্দ্দিন

বুঝি আর কখনো উপস্থিত হয়নি। রাক্ষসগণ স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে মর্ত্ত্যধামে রোগরূপে তাণ্ডবলীলা ক'রছে, তা'র ফলে এখন—বিশ্ববাসীর শীর্ণ দেহ,—মলিন বদন, কোটরাগত চক্ষু,—যৌবনেই যেন বার্দ্ধক্যের লেলিহান রসনা তাদের গ্রাস ক'রে ফেলছে। অকালমৃত্যু আর চক্ষে দেখা যায় না। কত জননী—একমাত্র পুত্রের বিয়োগ-বেদনায় মর্ম্মভেদী চীৎকারে গগন বিদীর্ণ ক'রে তুলছে,—কত পতিপ্রাণা সাধ্বী যুবতী পার্থিব জীবনের সারসর্ব্বস্ব স্বামী-বিয়োগে চিরজীবনের মত সুখৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলী প্রদান ক'রেছে,—রোগ-রাক্ষসের তাণ্ডব লীলায় কত সোণার সংসার দাবাগ্নির মত প্রজ্জলিত হ'য়ে একবারে ভস্মীভূত হ'য়ে প'ড়ছে। আজ আমার আগমন সেই দাবাগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য। শুনেছি আপনি ব্রহ্মপ্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদ যথারীতি আয়ত্ত ক,রেছেন। আপনার অর্জ্জিত বিদ্যা আমাকে অর্পণ করুন,—আমি মর্ত্ত্যধামে ফিরে গিয়ে সেই পুণ্যতম বিদ্যার বিস্তৃতি সাধন ক'রে ধন্য হ'ব।

ইন্দ্র। জীবের মঙ্গলসাধনে এরূপ প্রবৃত্তি—আপনার ন্যায় ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মারই উপযুক্ত। আপনি কৃপাপূর্ব্বক কিছুকাল আমার এখানে অবস্থিতি করুন, আমার অর্জ্জিত বিদ্যা আমি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে অর্পণ ক'রবো। কিন্তু ঋষিরাজ! আপনি আমার নিকট যা' শিক্ষা ক'রবেন তাহাই সম্পূর্ণ হবে না। আমার জ্যেষ্ঠ শিষ্য দেবদেব ধন্বন্তরি বারাণসীধামে "দিবোদাস" আখ্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে শিষ্যদিগকে যোগ্য করিয়ে শল্যাঙ্গের উপদেশ দিবেন। আপনি আমার নিকট যে বিদ্যা অর্জ্জন ক'রবেন, তাহার শিক্ষাদান ভিন্ন ছাত্রদিগকে নূতন জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁর নিকট সংগ্রহ ক'রে উপদেশ দিতে হ'বে। নচেৎ রোগাসুর-সংগ্রামে তাঁরা সকল স্থলে জয়লাভ ক'রতে পা'রবেনা।

ভরদ্বাজ। তাহাই হইবে দেবেন্দ্র। আপনার অর্জ্জিত বিদ্যাগুলি আমাকে শিক্ষাদান করুন।

ইন্দ্র। উত্তম আপনি অদ্যকার দিন বিশ্রাম করুন, আগামী কল্য থেকে আপনাকে শিক্ষা প্রদান ক'রবো, (শচীর প্রতি) দে'খছ ইন্দ্রাণি! রোগ সঙ্কুল পৃথিবীতে এই বিদ্যা কিরূপভাবে প্রবর্ত্তিত হ'বার ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি মহর্ষির আগমণের পূর্ব্বেই না আমার নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রেছিলে! (ভরদ্বাজের প্রতি) আসুন মহর্ষি! আপনার আতিথ্য সৎকারের ব্যবস্থা করিগে। (শচীর প্রতি, এস মহিষি! বড় সুকৃতির ফলে আজ আমি মহর্ষি ভরদ্বাজের ন্যায় শিষ্য পেয়েছি, এস সমাদরে স্বহস্তে তাঁর আতিথ্যের আয়োজন ক'রবে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—মর্ত্ত্যভূমি। রোগ—রাক্ষসগণ]

গীত।

দে রসাতল—এই ধরাতল,—
ফেল্‌রে ভেঙ্গে চুরে।
বিশ্ববাসীর সৃষ্ট জগৎ—সব্ স্থানটা ঘুরে।
মূর্ত্তিগুলি দেখিয়ে দে না,
সাঙ্গোপাঙ্গ সুদ্ধে নে না,
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
নে রে মুখে পুরে।

সাম্‌নে যা'রে দেখ্‌তে পাবি,
তা'রেই অমনি চিবিয়ে খা'বি,
কেউ যেন না স'রে পড়ে—
দেখিস্ ভাল করে।
কটমটিয়ে থাক্‌না চেয়ে,
বাগে পেলেই যা'বি ধেয়ে,
একলা যদি নাহি পারিস্—সবাই যাব জুড়ে।

শিশুর রক্ত চুসে খাবি,
যুবা খেয়ে হৃষ্ট হ'বি,
মেয়ে পুরুষ সবাই খাবি—বাছ বিচার
না ক'রে।

[পটক্ষেপণ]

জরা।

[শ্রীভূদেব শোভাকর বি-এ বি-ই]

—:o:—

এসো এসো জরা।
নিতান্ত মূঢ়তা হায় তোমা ভয়করা।
শ্বাস কাস বল নাশ,—কেন তা'য় হা হুতাশ!
থাকিলে অটুট বল বল মরণের ফল—
কিসে চলে কিসে হয় মরা—
নূতন পুরাণো হ'বে, জীর্ণ হ'য়ে ছিড়ে য'াবে
তবে নূতনে পুনঃ ভরিবে হে ধরা,
এসো এসো জরা।

এসো এসো জরা
যৌবনের তেজ খর্ব্বকরা
এতটুকু দেহ যা'র, ক্ষিতি প'রে সে আবার
সগর্ব্বে হাঁটিয়া যায় ধরা দে'খে সরা।
কোথা হ'তে আসে হেথা,
কি কাজে বা ঘুরে বৃথা,
আবার চলে যে কোথা তার এক কড়া—
মাথা খুঁড়িলেও হায়—
কভু নাহি জানা যায়—
সেই জ্ঞানে বড় হ'য়ে কোলাহল করা।
ভেঙ্গে দাও মন-ভাণ্ড অভিমান-ভরা
আসি তুমি জরা।

এস এস জরা,
কাঁখে ল'য়ে জ্ঞানের পসরা।
যতদিন স্ফীত বুক
বলদৃপ্ত ভরা মুখ
যতদিন দুই হাতে
যাহা পাই সব তা'তে
অগ্নির অমোঘ তেজ পরিপাক করা;
দশনের দুই সার
বহে সবে ক্ষুর ধার,
জগত পিষিয়া পারে করিবারে গুঁড়া;
যতদিন দুই পায়—
কিবা অমা কি জ্যোৎস্নায়
ক্রোশ অতিক্রমি যায় বিঘতের পারা,
হায় হায় সেই ক্ষণে
কা'র কথা কে রে শুনে
কেবা গণে শেষ দিনে—কেবা করে ত্বরা?
বাঁধিতে পাথেয় যম যন্ত্রণা হরা?
রূপার হিসাব ছাড়ি
রূপ সনে করি আড়ি
কেবা বল তাড়াতাড়ি তুলিয়া পশরা—

সাজ করে কেনা বেচা দরদাম করা,
ভোগে থাকি কা'র হয় ভাগবত পড়া ?
রাক্ষসী জরা

এস এস জরা,
তোমার পরশ ভিন্ন
বাঁধন না হয় ছিন্ন,
আশা নাহি হয় ক্ষুণ্ণ
দেহ নাহি হ'লে খিন্ন
তুমি ছুঁলে জরা,
রূপ রস গন্ধ সব
মানি মহা পরাভব,—
উচ্চ বুক হয় দীর্ণ,
ভরা মুখ হয় শীর্ণ,
সব হয়ে ছিন্ন ভিন্ন জীয়ন্তেতে মরা
"কোথা আছ পথ দাও"—কাঁদে পথ হারা।

তুমি ছুঁলে জরা
চলিতে যষ্টির ভরে চারিদিকে দৃষ্টি করে
লঘু মন ভাবে ভ'রে—
সকল ভোগেতে পড়ে অরুচির ছড়া,
ত্যাগের মন্ত্রটি কানে দাও তুমি সেই খানে
নির্ব্বেদ আনিয়া প্রাণে কর শান্তি ভরা,
ধন্য তুমি জরা।

এসো তবে জরা
আসন করিয়া লও নিজ হাতে গড়া।
দু'গণ্ড ললাট নেত্রে ছাইয়া রেখার সূত্রে
শ্বেত কর শ্মশ্রুকেশ, দশনের কর শেষ
আঁখিল আবিল বেশ হীন জ্যোতিঃ তারা,
লহ এই মাংস ভার সব দন্ত যাক আমার
কর অস্থি চর্ম্মসার, ধমনীতে ক্ষীণধার
সব ভাঙো সব লও—যা'য় তুমি খুসী হও
শুধু সেই কথা কও শেষ ভয় হরা
জ্ঞান বৃদ্ধ জরা।

যেই কথা বহু বার
শুনিয়াও অর্থ তা'র—
প্রতিভাত নয় মনে,
তোমার মুখেতে শুনে
পাইব যথার্থ মানে;—
সুখে হ'বে মরা,
এই ভিক্ষা জরা।

দম্পতী জীবন।

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণতর্কতীর্থ]

পতি-পত্নীর পরস্পর আনুগত্য, পরস্পর অনুরাগ—বস্তুতঃ আকাঙ্ক্ষণীয় দুর্লভ বস্তু। তুমি দুঃখময় সংসারের যতই দুঃখানলে সন্তপ্ত হওনা কেন, যদি তোমার গৃহিণী "পতিই পরম গুরু" "পতিই পরম দেবতা" "পতির সুখেই আমার সুখ" "পতির দুঃখেই আমার দুঃখ"

মনে করিয়া তোমার সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখভাগিনী হন, তাহা হইলে তোমার দেহ সে সন্তাপেশীতলশান্তিবারিবর্ষণে সিক্ত হইয়া অচিরে নির্ব্বাপিত হইবেই হইবে। মিষ্টভাষিণী পতিপ্রাণা স্ত্রী, হতাশের আশ্বাস, অন্ধের যষ্টি, বিষপীড়িতের বিশল্যকরণী। স্বামীর পাপ পুণ্য-সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন বলিয়া পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে।' গৃহস্থাশ্রমে বাস করা কেবল ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ফল-সুখ-সম্ভোগ নিমিত্ত। স্ত্রীই সে সুখের মূল, যে পুরুষের পত্নী বিনয়যুক্তা, বশবর্ত্তিনী ও স্বামীর মনোমত অভিপ্রায় বুঝিয়া আচরণ করিতে সমর্থা হন, তাহার এই বিষময় সংসারও স্বর্গ এবং যাহার পত্নী অবশবর্ত্তিনী হইয়া প্রতিকূলতা আচরণ করে, সে শত শত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও, অকিঞ্চনের মত—নিরাশ্রয়ের মত আপনাকে নিরীক্ষণ করত দারুণ অশান্তি-দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকে। তাহার পক্ষে সোনার সংসারও অসার নরক যাতনা ভোগের স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যদি একজন অনুরাগযুক্ত, আর একজন বিরাগযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা মর্ম্ম-বিদারক অন্য দুঃখ আছে কিনা সন্দেহ। এই হেতু পতি পত্নীর আনুগত্য পরস্পর প্রেম একাত্মতা যাহাতে দৃঢ়মূলে জন্মাইতে পারে, প্রথম হইতে যে দিকে লক্ষ্য করা নিতান্ত আবশ্যক।

মন যাহা চায়—মন যে ভাবটি ভালবাসে—যদি তাহা নিরাপদে সম্পাদন হয়, তাহা হইলে সে মন কখনও বিরক্তিযুক্ত বা প্রতিকূল হইতে পারে না। আর তাহার অনভিমত পথে চলিতে গেলে সে অপ্রসন্ন বা বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।. পরের মনের মত হইতে চাহিলে, পরকে আপনার মত করিতে হইলে, আগে পরের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া হইতে হয় এবং সেই অভিপ্রায়ানুসারে চলিবার জন্য যত্ন করিতে হয়। স্ত্রী যদি স্বামীর অভিপ্রেত পথ অবলম্বন করিয়া স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া, মন, বাক্য ও কার্য্য দ্বারা স্বামীর হিতসাধনে নিরতা হন, ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা হইয়া নির্ম্মল চরিত্রে স্বামীর শুশ্রূষায় আত্ম নিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে হৃদয় শূন্য পুরুষও সেই পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণীর গুণে আবদ্ধ না হইয়া, আত্মদান না করিয়া থাকিতে পারে না। পত্নীর মধুর প্রীতিভাব, মধুর আলাপ, স্বামীর চিত্তাকর্ষণ করিতে যেমন অমোঘ ঔষধ, তেমনই অপ্রিয় বাক্য—সর্ব্বদা বিষণ্নভাব, স্বামী হইতে বিচ্ছেদ করিবার, বা স্বামীর বিরক্তি আনিবার প্রধান অস্ত্র। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতাও বহু অনর্থের মূল। এই জন্য মহর্ষিগণ স্ত্রীলোকদিগের বাল্যাবস্থায় পিতার অধীনে', যৌবনে স্বামীর অধীনে, বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অধীনে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। স্ত্রী যে কোন সৎকার্য্য করুন না কেন, স্বামী থাকিতে তাহার অনুমতি না লইয়া স্বাধীনভাবে সে কার্য্য করিলে, তাহাও কুকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোক পাইবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-উপবাস-তীর্থ ভ্রমণ কিছুই করিতে হয় না; যদি তিনি অন্যমনে ভক্তি সহকারে শুশ্রূষা করিয়া পতি-দেবতার প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থা হন। স্বামী সন্তুষ্ট হইলেই

স্ত্রীলোকের উপর সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন। আর তাঁহার অসন্তোষে জগৎ অসন্তুষ্ট হয়। যে সাধ্বী স্ত্রী শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন এবং পতির প্রিয় পাত্র হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কটুকথা, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, বিবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, পতির সৎকার্য্যে প্রতিকূলতাচরণ, পরের ঈর্ষা, বঞ্চনা, খলতা অত্যন্ত অহঙ্কার, পরের হিংসা করা, শঠতা, নির্ভীকতা সকল বিষয়েই অসন্তোষ প্রভৃতি নিন্দিত বিষয়গুলি ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

পত্নী যেমন পতিকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া নিজের নিজত্ব বিস্মৃতা হইয়া নিজের সুখ-দুঃখ সম্পদ, বিপদ, তাঁহাকে অর্পণ করিবেন, পতিও তেমনি ভার্য্যাকে আপনার অর্দ্ধাঙ্গ জ্ঞানে আপনার মত ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। কেবল উদর পূরণের জন্য অন্ন, লজ্জানিবারণের জন্য বস্ত্র, বেশ ভূষার জন্য ভূষণাদি অর্পণ করাই পতির পরম কর্ত্তব্য নহে, পত্নী, পুরুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রতিপালিত পশু পক্ষীর মত সৌখীনের বস্তু বা নিপুণ কারিকর কর্ত্তৃক নিপুণভাবে নানারূপে চিত্রিত চিত্রের ন্যায়, কেবল মনোমোহনের নিমিত্ত নহে, সে যে গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মরক্ষার সহকারিণী, সহচারিণী সহধর্ম্মিণী। সেই দুরবগাহ গৃহস্থাশ্রমের উপযোগিনী হইতে হইলে পত্নীর যে সকল শিক্ষা, সদগুণ থাকা আবশ্যক, সেই সব শিক্ষা ও সদ্‌গুণের আধার করিতে চেষ্টাশীল হইতে হইবে। স্ত্রী, স্বামীর শক্তি, সেই শক্তি মহনীয়া মহতী হইলে, স্বামী সেই স্ত্রী শক্তি মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার নিকটে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে। আর সে শক্তি হীনা, অধমা, কুণ্ঠিতা হইলে, তাহার সহবাসে স্বামীও অধম দুর্ব্বল চিত্ত এবং স্বার্থ পরায়ণ হইয়া থাকে। সাংখ্যের উদাসীন নির্ব্বিকার শুদ্ধচৈতন্যময় পুরুষ যেমন প্রকৃতির সহিত মিলনের পর অহঙ্কার ভাবাপন্ন হইয়া স্বচ্ছজ্ঞান হারাইয়া বিবিধ বিকার ভ্রান্ত হয় বলিয়া বর্ণিত আছে, উদার, সহৃদয়, সাম্যদর্শী অনেক স্বামীও তেমনি দুষ্ট স্ত্রীর সাহচর্য্যে স্ত্রীরপ্রকৃতি দ্বারা স্বপ্রকৃতি অনুপ্রাণিত হওয়ায়, আত্মজ্ঞান হারাইয়া অনুদার, অসমদর্শী ও হৃদয়হীন হইয়া থাকে। প্রথমে পুরুষের চরিত্র ও মানসিক উন্নতি অবনতির অনুকরণে, স্ত্রীলোকের চরিত্র অথবা মানসিক উন্নতাবনতাবস্থা হইলেও প্রকৃতির গুণে পরে পুরুষের চরিত্র হৃদয়ের উদারতা বা সঙ্কীর্ণতা স্ত্রীর অনুকরণেই অনুকৃত হইতে দেখা যায়। এই জন্য পুরুষকে গৃহস্থের উপযুক্ত হইতে হইলে, গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন, আপন-পরে সমদর্শিতা, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা লাভ করিতে হইলে, তাহার নিত্য সহচারিণী মন্ত্রণাদাত্রীকে সকল দিকেই উন্নতিশীলা 'চৌখশ' করিতে হয়। স্ত্রীলোকের মনোমত সৎকার্য্য করিয়া তাহাদের প্রার্থিত বস্তু যথাসম্ভব অর্পণ করিয়া তাহাদের সন্তোষ সাধন করা আবশ্যক। শাস্ত্রে আছে "যে সংসারে স্ত্রীলোকদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া তাহাদিগের সম্মানিতা করা হয়, সে সংসারের উপর দেবতারাও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে সংসারে স্ত্রীলোকদিগকে প্রসন্না করা না হয়, সে সংসারের উপর দেবতারা অপ্রসন্ন হন এবং সে সংসারে পূজা যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকলও নিষ্ফল হয়। ভগিনী, কন্যা, পত্নী,

পুত্রবধূ প্রভৃতি নারীগণ যে বংশে যথাযোগ্য সম্মান না পাইয়া অভিশাপ প্রদান করেন, সে বংশ শীঘ্রই সর্ব্বস্বের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এই জন্য অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ও ভোজনাদির দ্বারা রমণীগণের সর্ব্বদা সন্তোষ সাধন করিতে হয়। যে বংশে পত্নীর দ্বারা পতি সন্তোষ লাভ এবং স্বামী কর্ত্তৃক ভার্য্যা প্রীতা হন, সে বংশে চিরকাল মঙ্গল সাধিত হয়। সে বংশের পুত্র পৌত্রগণও পরম কল্যাণ লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

থেরাপুটিকস্।

[রায়সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ]

বৌদ্ধ সাহিত্যে স্থবির শব্দের ব্যবহার খুব বহুল। "স্থবির", "মহাস্থবির" প্রভৃতি উপাধিতে প্রবীণ শ্রমণগণ পরিচিত হইতেন। স্থবির শব্দ পালী এবং প্রাকৃতে 'থেরা" রূপ ধারণ করিয়াছিল; এখনও ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে "থেরা" শব্দের বহুল প্রচলন আছে। পালি-সাহিত্যে "থেরা" কথা অজস্র পাওয়া যায়। এই শব্দ সময় সময় 'পুত" শব্দের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়ও পালীতে দৃষ্ট হয়, "থেরাপুত" বলিতে স্থবির-পুত্র বুঝায়, "থেরা" ও থেরাপুতে" অর্থের বিশেষ বৈষম্য নাই। উভয় শব্দই প্রবীণতা-ব্যঞ্জক। এই "পুত্ত" শব্দ—পালীতে অনেক সংজ্ঞার সঙ্গে একত্র সংযুক্ত দৃষ্ট হয়, যথা "সারিপুত্ত"। "থেরাপুত" শব্দের মৌলিক অর্থ—স্থবিরের সন্তান,—যেমন "বামুনের ছেলে" বলিতে বামুন বুঝা যায়, সেইরূপ "থেরিপুত" বলিতেও জ্ঞানী বা স্থবির বোঝা যায়।

অশোকের প্রস্তর লিপিতে দৃষ্ট হয়—গ্রীস্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রদেশে উক্ত রাজা—মনুষ্য ও পশু চিকিৎসার জন্য বহু সংখ্যক ভিষক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-যুগে "থেরা" ও "থেরা পুতেরা"ই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। সুতরাং গ্রীস প্রভৃতি দেশে যাইয়া "থেরা-পুতেরা" চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন।

য়ুরোপীয় চিকিৎসার ভিত্তি "Therapeutics" থেরাপুটিকস্। এই শব্দ যে "থেরা পুত" শব্দ হইতেই আসিয়াছে, তাহা দর্শন মাত্রই টের পাওয়া যায়। কিন্তু য়ুরোপীয় লোকেরা তাঁহাদের সভ্যতা সমস্তই গ্রীস ও রোম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—এই কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রাচ্যদেশের ঋণ তাঁহারা সহজে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। এই জন্য "থেরাপুটিকস্" শব্দটির উৎপত্তি কিরূপে হইল—তাহা তাঁহারা ভাবিয়া ঠিক পান না। নানা পণ্ডিত এ সম্বন্ধে নানারূপ

জল্পনা-কল্পনা করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, উক্ত শব্দের উৎপত্তি অনিশ্চিত। কিন্তু সত্য জিনিষটা অগ্নি কণার ন্যায়, উহা মিথ্যার ছাই চাপা দিয়া রাখিলেও সহজে নিবিয়া যায় না। আপনারা যদি ওয়েব-ষ্টারের ইংরেজী অভিধানে "থেরা পুটিকস্" শব্দের অর্থ খোঁজেন, তবে দেখিতে পাইবেন, একস্থানে লেখা আছে, প্রাচ্য দেশীয় জ্ঞানী কোন শ্রেণীর লোকের নাম হইতে এই শব্দ আসিয়াছে,—ইহাই গ্রীক কোন কোন কেতাবে উল্লিখিত আছে।

যাঁহাদের শাস্ত্র, তাঁহাদেরই নামে যে উহা অভিহিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আজ আয়ুর্ব্বেদের জাতি গিয়াছে, যে সকল অস্ত্রশস্ত্র আমরা নাপিতের হাতে ছাড়িয়া দিয়া শুধু ঔষধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছিলাম, তাহারই শুটিকতকের উন্নতি করিয়া—ফোঁড়াকাটায় দক্ষতা লাভ করিয়া আজ সভ্য এ্যালিওপেথিক ডাক্তার কবিরাজী শাস্ত্র ঘৃণা করিতেছেন, কিন্তু তাহার ললাটে যে "থিরাপুটিক্সের" মার্কা চিহ্নিত আছে;—এই ঋণ তো শব্দটাই বহন করিয়া যুগ যুগান্তর যাবৎ আমাদের প্রভাব সপ্রমাণ করিতেছে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদকে আশ্রয় করিয়া যে বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদকে উপেক্ষা করিতেছে। এ যেন শিশু স্পর্দ্ধা করিয়া তাহার পিতার টিকি ধরিতেছে।
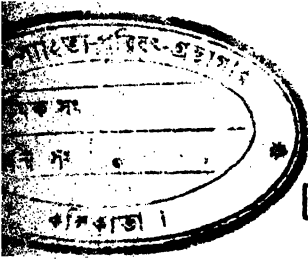
পারদ।*

[কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি]

"সংসারস্য পরং পারং দত্তেঽসৌ পারদঃস্মৃতঃ"

পারদই সংসারের পরমবস্তু মুক্তি প্রদানে সমর্থ। আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সকল শাস্ত্রেই জীবের চরম ফল "মোক্ষ প্রাপ্তি" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "রসেশ্বর দর্শনে" দেখা যায় যে, এই পারদ দ্বারা সংসারের শ্রেষ্ঠ বস্তু মোক্ষ ফল লাভ হয়, রসেশ্বর-দার্শনিকেরা বলেন যে, অন্যান্য দার্শনিকেরা এই পাঞ্চ ভৌতিক দেহাব সানের পর মুক্তি লাভ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ত করামলকবৎ (হস্তস্থিত আমলকীর ন্যায়) প্রত্যক্ষ হয় না। যদি কোন উপায়ে এই স্থূল দেহকে জরামরণবিহীন করিতে পারা যায়, তৎপরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালে মুক্তিরসের আবির্ভাব হয়। উদাহরণ বলা যাইতে পারে যে, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, বালখিল্যাদি ঋষিগণ, শ্রীমৎ গোবিন্দ ভগবৎ পাদাচার্য্য প্রভৃতি পরমাচার্য্যগণ রসদ্বারা দিব্যদেহ সম্পাদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন—তন্ত্রের এই বাক্যের উপর সংশয়ই বা কি? রসের অষ্টাদশবিধ সংস্কার করিলে সে যে কি অপূর্ব্ব বস্তু রূপে পরিণত হয়—তাহা সহজেই অনুমেয়।

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

রসোন স্বরসৈঃ সূতো নাগবল্লী দলোত্থিতৈঃ।
ত্রিফলায়া স্তথা কাথে রসো মর্দ্দ্যঃ প্রযত্নতঃ॥

অথবা—

হিঙ্গুলাৎ সূতং গ্রাহয়েৎ তন্নিগদ্যতে।
জম্বীরনিম্বুনীরেণ মর্দ্দিতো হিঙ্গুলোদিনং,
ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রেণ গ্রাহ্যঃ স্যাৎ নির্ম্মালোরসঃ॥

অর্থাৎ পারদকে রসোনের রস, পানের রস ও ত্রিফলার কাথ দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হয়। অথবা জম্বীরের রস দিয়া হিঙ্গুলকে মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রদ্বারা পাক করিয়া, নির্ম্মল পারদকে গ্রহণ করিবে। এই রূপ সহজসাধ্য সামান্য উপায়ে সংস্কৃত পারদ বর্ত্তমান সময়ে যে কি অপূর্ব্ব ফল দেখাইয়া কত শত রোগীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতেছে, তখন সেই অষ্টাদশ সংস্কারে সংস্কৃত পারদের শক্তির বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আজ আমরা পাশ্চাত্য মোহমুগ্ধ, তাই তন্ত্রের কথা অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি। ১৩১২ সালের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকার কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক—তন্ত্রকে যেরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেও কষ্ট বোধ হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী এ দেশীয় বিদ্বৎবর্গ তন্ত্র জানিতেন না এবং এখনও জানেন না। কিন্তু মহানুভব উড্রোফ সাহেব আজ তন্ত্রের মহিমা প্রচার করিতেছেন, তাই আজ সেই সমস্ত লোক তন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পরাঙ্মুখ। যে কোন শাস্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া আদ্যন্ত আলোচনা করিয়া না দেখিলে এইরূপই হয়। অধুনা আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করিতে আমরা নিরস্ত, আর ভিন্ন দেশীয়েরা সেই বিষয়ে অদম্য উৎসাহে অগ্রসর। মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে একজন জার্ম্মান দেশীয় পণ্ডিত কাঙ্গা হইতে বহু দুর্ল্লভ রসতন্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান, সেই সময়ে কোন এ দেশীয় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "আপনাদের যে ইউরোপে কত নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে, সেখানে এইরূপ পুরাতন পুঁথিতে কি উপকার হইবে?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে যখন আমরা সার সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া পাঠাইব, তখন এই দেশের লোকেরাই ইহা আদর করিয়া লইবে।" তাই বড় দুঃখেই বলিতেছি যে, ইউরোপে কত মনীষী ব্যক্তি সামান্য সামান্য উপাদান সম্বল করিয়া জীবনব্যাপি-গবেষণায় জগতে কত জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচার করিতেছেন, আর আমাদের দেশে রস সংস্কারাদির ন্যায় কত সম্পূর্ণীকৃত তত্ত্ব—আলোচনার অভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে। অষ্টাদশ সংস্কারাদি তত্ত্ব সম্যক আয়ত্ত করিয়া লইবার আগ্রহ না থাকিলেও বর্ত্তমান রসায়ন বিদ্যা বা কেমিষ্ট্রী শিক্ষার জন্য কত না আড়ম্বর হইতেছে।

অতঃপর পারদের উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করিতেছি,—পুরাকালে হিমালয় পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী নিভৃতে বিহার করিতেছিলেন, সেই স্থানে কপোতরূপে অগ্নি উপস্থিত হওয়ায় মহাদেব লজ্জিত হইয়া সম্ভোগ হইতে বিরত হন এবং স্বীয় স্খলিতবীর্য্য কপোতরূপী অগ্নির মুখে নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি—সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গায় পতিত হইলেন, গঙ্গাও উহা সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অত্যন্ত গুরুত্ব বশতঃ

সেই শিববীর্য্য—অধোগামী হইয়া শতযোজন গভীর পাঁচটী কূপের সৃষ্টি করিল। সেই শিব বীর্য্য ক্ষেত্রভেদে আকারের ভিন্নতা বশতঃ পঞ্চ কূপে যথা ক্রমে (১) রস, (২) রসেন্দ্র (৩) সূত (৪) পারদ ও (৫) মিশ্রক —এই পঞ্চ নামে বিখ্যাত হইল। তন্মধ্যে (১ রস নামক পারদ রক্ত বর্ণ—সর্ব্ব প্রকার দোষ বর্জ্জিত এবং রসায়নের উপযোগী। এই রস-প্রভাবে দেবগণ জরামরণ বিহীন হইয়াছিলেন। (২) "রসেন্দ্র" নামক পারদ শ্যাববর্ণ, দোষহীন, রুক্ষ এবং অতি চঞ্চল। এই রসেন্দ্র সেবনে নাগগণ অমর হইয়াছিলেন। দেবগণ ও নাগগণ এই রস ও রসেন্দ্র উভয় কূপের মুখ মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করায়, উহা মনুষ্য গণের পক্ষে সুদুর্লভ হইয়াছে। (৩) সূত—ঈষৎ পীতবর্ণ, রুক্ষ ও দোষযুক্ত, উহা অষ্টাদশ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য দেহকে দৃঢ় করে। (৪) "পারদ"— শ্বেতবর্ণ ও চঞ্চল,—নানাবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সর্ব্বরোগ নাশ করে। (৫) "মিশ্রক" নামক পারদ ময়ূরচন্দ্রিকার ছায়া বিশিষ্ট এবং অষ্টাদশ প্রকার সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া অতীব সিদ্ধিপ্রদ হয়। কোন সময়ে একটী সুন্দরী বধূ অশ্বারোহণে রসকূপের পার্শ্ব দিয়া রসকূপ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, সেই বধূকে দেখিয়া কূপস্থ পারদ তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল, সেই বধূও ভীতা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন; অতঃপর পারদ যোজন পথ অতিক্রম করিয়াও অকৃতকার্য্য হওয়ায় স্বস্ব কূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এইরূপ যাতায়াতে পথি মধ্যে যে সকল গর্ত্ত ছিল—তাহাতে পারদ সংলগ্ন হইল, এবং সেই সমস্ত গর্ত্তস্থিত পারদ সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং অগ্নির মুখ হইতে নিঃসৃত পারদ দরদ দেশে পতিত হইয়া মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তদ্দেশ বাসী মনুষ্যগণ সেই মৃত্তিকা হইতে পাতন যন্ত্রে পারদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এ সব পুরাকালের কথা।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে পারদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, উহার অধিকাংশ নৈসর্গিক হিঙ্গুল বা সিনাবার (cinnabar) হইতেই অল্প সন্তাপ দ্বারা সংগৃহীত, পারদ স্বীয় তরল অবস্থায় অতি সামান্যই পাঁওয়া যায়, এইবার পুরাকালীন বার্ত্তা মিলাইয়া দেখুন—

পতিতো দরদে দেশে গৌরবাৎ বহ্নিবক্ত্রতঃ,
সরসো ভূতলে লীন স্তত্তদ্দেশ নিবাসিনঃ।
তাং মৃদং পাতনাযন্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা সূতং হরন্তিচ।

অর্থাৎ দরদ প্রদেশ বর্ত্তমান দার্দ্দি স্থান কাশ্মীরের পার্ব্বত্য প্রদেশ, যে স্থানে হিঙ্গুল প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং তাহা হইতে পারদ সংগৃহীত হয়।

"মার্গ নির্ম্মিত গর্ত্তেষু স্থিতং গৃহ্নন্তি পারদং"

অর্থাৎ গর্ত্ত বা খনিস্থিত পারদ স্বীয় অবস্থাতেও পাওয়া যায়।

পারদ যে শিববীর্য্য—তাহার তাৎপর্য্য এই এই যে, শিব যেমন শিবময় অর্থাৎ মঙ্গলময় এবং নিত্য,—তদঙ্গ সম্ভূত পারদও নিত্য এবং জীবনদায়ক। কাষ্ঠৌষধির তুলনায় উহা নিত্য,—অধিকন্তু অব্যর্থ। পারদ, কজ্জলী কৃতই হউক বা স্বর্ণ সিন্দূর রূপেই পরিণিত হউক; পাতনযন্ত্রের সাহায্যে আবার স্বীয় অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এরূপ আর কোন বস্তু হয় না, তাই উহাকে নিত্য বলা যায়। পারদ-

প্রসঙ্গে পারদের উৎপত্তি কারণ হিঙ্গুলের কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি। এক্ষণে যে হিঙ্গুল বাজারে বিক্রীত হয়, উহা পারদ, গন্ধক ও সীসকাদি ধাতু সংযোগে প্রস্তুত হয়, সুতরাং উহা নৈসর্গিক হিঙ্গুলের মত ফলপ্রদ নহে, এবং সীস কাদির মিশ্রণে উহার জাড্য কুষ্ঠাদি রোগ-কারণতা-দোষ সংক্রামিত হয়। সুতরাং আমাদের ঔষধার্থ ব্যবহারের জন্য হিঙ্গুল খনি হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূত, পারদ, ও মিশ্রক এই ত্রিবিধ পারদই নৈসর্গিক দোষ যুক্ত। পারদের দোষের সংখ্যা দ্বাদশ* প্রকার যথা—(১) বিষ (২) বহ্নি (৩) মল— এই তিনটী নৈসর্গিক। বিষদোষে মৃত্যু, বহ্নিদোষে সন্তাপ এবং মলদোষের দ্বারা মূর্চ্ছা ঘটে। (৪) নাগ (৫) বঙ্গ দোষ—এতদুভয় যোগিক দোষ, উহা দ্বারা জড়তা, আধ্মান ও কুষ্ঠরোগ হয়। এতদ্ভিন্ন সপ্তবিধ উপাধিক দোষ আছে, তাহারা সপ্তকঞ্চুক নামে অভিহিত হয়। উহারা ভূমি ও গিরি হইতে জাত যথা (৬) পর্পটী (৭) পাটনী (৮) ভেদী (৯) দ্রাবী (১০) মলকরী (১১) অন্ধকারী (১২) এবং ধ্বাঙ্ক্ষী। এই দ্বাদশবিষদোষ দূরীকরণ করিয়া, অপূর্ব্ব গুণযুক্ত করিবার জন্যই—পারদের অষ্টাদশ বিধ সংস্কার করা প্রয়োজন। রসের অষ্টাদশ বিধ সংস্কার যথা—(১) স্বেদন (২) মর্দ্দন (৩) মূর্চ্ছন (৪) উদ্ধরণ বা উত্থাপন (৫) পাতন (৬) নিরোধন (৭) নিয়মন (৮) এবং দীপন—এই অষ্টবিধ রসসংস্কার সমধিক প্রচলিত। অবশিষ্ট দশ প্রকার যথা—(৯) অভ্রগ্রাস দান (১০) চারণ (১১) গর্ভদ্রুতি (১২) বাহ্যদ্রুতি (১৩) জারণ (১৪) রসরাগ বা রসরঞ্জন (১৫) সারণ (১৬) ক্রামণ (১৭) বেধ এবং (১৮) ভক্ষণ বা শরীরে প্রয়োগ।

(১ম) "স্বেদন" শ্বেতসরিষা, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, চিতামূল ও আদা—প্রত্যেকের পরিমাণ পারদের ষোড়শাংশ, এই দ্রব্যগুলি ও কাঞ্জিক সহ পারদকে তিন দিন মৃদুতাপে দোলা যন্ত্রে স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য।

(২য়) "মর্দ্দন"- গুড়, দগ্ধমেষ-লোম, সৈন্ধবলবণ, গৃহধূম, ইষ্টকচূর্ণ, শ্বেত সরিষা—প্রত্যেকের পরিমাণ পারদের ষোড়-শাংশ, উক্ত দ্রব্য সমূহ ও কাঞ্জিকের সহ পারদকে তিন দিন মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

(৩য়) "মূর্চ্ছন"।—ঘৃতকুমারী, ত্রিফলা ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত পৃথক ভাবে পারদকে এক এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া কিন্নরযন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিবে, যন্ত্রের তলপ্রদেশ পূর্ব্বোক্ত ঔষধি দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পারদের উপরিভাগ শরাব দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধিস্থল দৃঢ় ভাবে সন্ধিত করিবে, এবং শরাবের উপরিভাগ সৈন্ধব লবণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তীব্রতাপে এক প্রহর কাল জ্বাল দিবে, শীতল হইলে যন্ত্রস্থ পারদ গ্রহণ করিবে।

(৪র্থ) "উদ্ধরণ ও উত্থাপন"—উক্ত ত্রিবিধ সংস্কারের পর পাতন ক্রিয়ার পূর্ব্বে পারদের পূতিদোষ নিবৃত্তির জন্য

* পারদের দোষ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও আমি প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় উহার আলোচনা করি নাই।

কাঞ্জিক দ্বারা ধৌত করিতে হয়। এই বিধিকে উদ্ধরণ বা উত্থাপন বলে।

(৫ম) "পাতন" পাতন তিন প্রকার, যথা—(ক) উর্দ্ধপাতন, (খ) অধঃপাতন ও (গ) তির্য্যকপাতন। উর্দ্ধপাতন তিনবার (ক) অধঃপাতন সাতবার এবং তির্য্যক পাতন একবার করিতে হয়। উর্দ্ধপাতন যথা—তাম্র এক ভাগ, পারদ ২ ভাগ, এবং সৈন্ধব লবণ পারদের বিংশ ভাগের এক ভাগ—উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া, পিষ্টি প্রস্তুত করিয়া উর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পাক করিয়া উর্দ্ধ পাত্র সংলগ্ন পারদ গ্রহণ করিবে।

(খ) অথ অধঃপাতন—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিষ্টি প্রস্তুত করিয়া অধঃ পাতন যন্ত্রে পাক করিবে, তৎপরে নিম্ন পাত্রস্থ জলে পতিত রসকে গ্রহণ করিবে।

(গ) তির্য্যকপাতন—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিষ্টি প্রস্তুত করিয়া তির্য্যকপাতন যন্ত্রে পাক করিবে এবং তির্য্যক্ ভাবে অপর পাত্রে নিপতিত পারদ গ্রহণ করিবে।

(৬ষ্ঠ) "নিরোধন"। মর্দ্দন, মূর্চ্ছন ও পাতন দ্বারা হীনবীর্য্য পারদকে লবণ ও গোমূত্রাদির দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, মুষা যন্ত্রের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এই বিধি দ্বারা পারদ প্রাপ্তবল হয়।

(৭ম) "নিয়মন"। তাম্বুল, রসোন, লবণ, ভৃঙ্গরাজ, ও তিন্তিড়ীর রসের সহিত স্বেদ যন্ত্রে পারদকে পাক করিতে হয়, ইহাকে নিয়মন কহে।

(৮ম) "দীপন"। হিরাকস্, টঙ্কন ক্ষার, মরিচ, রাইসরিষা, সৈন্ধবলবণ ও সজিনা ছাল দ্বারা পারদকে মর্দ্দন করিয়া, কাঞ্জিকের সহ তিন দিন স্বেদনীযন্ত্রে পাক করিলে পারদ গ্রাসার্থী অর্থাৎ অভ্রকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকার সংস্কারানন্তর পুনরায় দশবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রসতত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ গোবিন্দ ভগবৎ পাদাচার্য্য বলেন যে—

"অত্যগ্নিতো নিরাহারাৎ ক্রমেণারহিতস্তচ,
ইত্যেতা বিক্রিয়া জ্ঞেয়া অষ্টভিঃ ষণ্ডতাং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ—দীপনাদি সংস্কার দ্বারা পারদ বুভুক্ষিত অর্থাৎ অভ্রাদি গ্রাসার্থী হন, সুতরাং অভ্রগ্রাসদান অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অষ্টবিধসংস্কার দ্বারা যে ষণ্ড ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা দূরীকরণার্থ ক্রামণাদি সংস্কার করা উচিত।

(৯ম) "অভ্রগ্রাস দান"—লৌহনির্ম্মিত অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত খলে অগ্রে গন্ধক দিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে অল্প অল্প করিয়া উহাতে পারদ দিবে ও মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে উক্ত কজ্জলীর সম পরিমিত অভ্র ভেকাদির বসা দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পিষ্টি প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঐ পিষ্টি দীপিকাযন্ত্রে অধঃপাতিত করিয়া ঐ রস গ্রহণ করিবে।

(১০ম) "চারণ"। লৌহনির্ম্মিত খলে স্বর্ণের সহ পারদকে লেবুর রস দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করাকে চারণক্রিয়া কহে।

(১১শ) "গর্ভক্রুতি"। তুল্য পরিমিত স্বর্ণের সহিত স্বর্ণ মাক্ষিক বারংবার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উভয়কে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পারদে নিক্ষিপ্ত করিলে স্বর্ণদ্রবীভূত হয় এবং সেই জারিত স্বর্ণ পারদকে বন্ধন করে। অর্থাৎ গুণোৎকর্ষ ঘটায়। উক্ত স্বর্ণাদি ধাতু পূর্ব্বোক্ত বিধানে পারদ সহ মিশ্রিত হইবার পর, কাপ-

ড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া ওজন করিলে পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, এবং পারদকেও তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। মাক্ষিক না দিলে স্বর্ণাদি ধাতুর দ্রুতি বা দ্রবণ (তারল্য সম্পাদন) হয় না। বাহ্য দ্রুতির সম্যক পরিচয় দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। শ্রীমৎ গোবিন্দ ভগবৎ পাদাচার্য্য বলিয়াছেন,—

> "বাহ্য দ্রুতি রতি বিমলা-
> স্ফুরতিহি কেষাঞ্চিদেব সিদ্ধানাং
> তেভ্যঃ জ্ঞাত্বা কল্পনাঃ কার্য্যাস্তথা দ্রুতয়ঃ।"

তথাপি সাধ্যমত কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল—

> "অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে,
> সূতেন্দ্র কর্ম্ম গুরবো গুরবস্তএব।
> শিষ্যাস্তএব রচয়ন্তিগুরোঃ পুরোযে,
> শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে।"

অর্থাৎ—যে অধ্যাপক স্বহস্তে শিষ্যগণের সম্মুখে রসকর্ম্ম দেখাইয়া শিক্ষা দেন, এবং যে শিষ্য শিক্ষিত হইয়া গুরুর সম্মুখে উহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন, উভয়েই রসগুরু ও রস শিষ্য নামে অভিহিত হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন যাঁহারা কেবল রস বিষয়ে গ্রন্থগতবিদ্য হইয়া অধ্যাপনা করেন এবং শিষ্যও শ্লোকের অর্থ জানিয়াই নিরস্ত হন, তাঁহারা উভয়েই গুরু-শিষ্যের অভিনয় করিয়া থাকেন মাত্র। এখন এমন রসেন্দ্র-কর্ম্ম-গুরু কোথায় পাইব? তবে যদি আজ রসের আলোচনায় উৎসাহিত হইয়া কোনও ভিষককুলতিলক এই রস সংস্কারে কায়-মনঃ উৎসর্গ করেন, তাহা হইলেই, আমার এই প্রবন্ধ লেখা সার্থক জ্ঞান করিব। গুরুর প্রতিমা রচনা করিয়া যদি একলব্য ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সমস্ত তন্ত্র এখনও যাহা যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা অবলম্বন করিয়া "সূতেন্দ্র কর্ম্মগুরুর" পদবী লাভ কি দুরাশা?

(১২শ) "বাহ্যদ্রুতি"—বজ্রবল্লী (হাড়-জোড়া) লতার রস—দ্বারা সৌবর্চ্চল লবণ সহ অভ্রকে মর্দ্দন করিয়া পিষ্টাকৃতি প্রস্তুত করিয়া বেতস বা পাচুরীর রসের দ্বারা ভাবনা দিয়া অগ্নিতে পুট প্রদান করিলে অভ্র রসের ন্যায় দ্রবণশীল হয়।

(১৩শ) "জারণ"—প্রথমতঃ পাত্রের অধোভাগে ক্ষারাদি বিড়দ্রব্য দিয়া তদুপরি পারদ রাখিয়া, পুনরায় বিড়দ্রব্য দ্বারা পারদকে আচ্ছাদিত করিয়া একটী মুষার মধ্যে বদ্ধ করিবে এবং মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থান লেপন করিয়া দিবে। উক্ত মুষা জলপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া লৌহ নির্ম্মিত একখানি শরাব দিয়া হাঁড়ীটিকে বদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থান লেপন করিয়া দিবে। উক্ত হাঁড়ি বদরাগ্নির জ্বালে বসাইয়া দিবে, এইরূপ কয়েক প্রহর জ্বাল দিলে রস স্বেদিত হইল। পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্বেদনানন্তর মর্দ্দন, দ্রবণ প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা রস জারিত হয়।

(১৪) "রাগ বা রঞ্জন"—তাম্র ও রসদ শোধিত করিয়া, এতদুভয়ের তিনগুণ পারদকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বদ্ধমুষায় পুট প্রদান করিলে পারদ স্বর্ণবৎ বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

(১৫) "সারণ"—সারণার নিমিত্ত মণ্ডূকাদির বসা প্রভৃতি হইতে বিশেষ বিধানে প্রস্তুত তৈল, ঈষদুষ্ণ করিয়া দীর্ঘ মুষায় স্থাপন করিয়া উক্ত তৈলে পারদ নিক্ষেপ করিতে হয়, এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও নিক্ষেপ করিতে

হয়, ইহাতে পারদের কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(১৬শ) "ক্রামণ"—অন্নাদি এবং ঔষধাদি যেরূপ, অনুপান জলাদির সহ শরীরস্থ সপ্ত ধাতুতে প্রবেশ করে, সেইরূপ পারদ ক্রামনার্থ দ্রব্য চুম্বক বিষ ও হিঙ্গুলাদির সাহায্যে ধাতু সমূহের মধ্যে প্রবেশ করে।

(১৭শ) "বেধ"—বেধ বিধান দ্বারা পারদ স্বকীয় গুণ প্রকাশ করে। ব্যবায়ি-ভৈষজ্য-যুক্ত দ্রব্যে রসকে নিক্ষেপ করাকে বেধক্রিয়া কহে। উক্ত বেধ বহু প্রকার, তন্মধ্যে শতাংশ বেধের কথা লিখিত হইল। যথা:—৯৮ ভাগ রৌপ্য, স্বর্ণ ১ ভাগ এবং পারদ ১ ভাগ একত্র করিলে উহাকে শতাংশবেধ বলে। এই প্রকার বেধের দ্বারা ধাতুর বর্ণোৎকর্ষও হইয়া থাকে।

(১৮শ) "শরীরে প্রয়োগ"—ইহার বিধান অনেকাংশে কুটী প্রাবেশিক রসায়ন বিধানের ন্যায়, অর্থাৎ শরীরকে শুদ্ধ ও পথ্যাদির বিশেষ বিশেষ নিয়ম রক্ষা পূর্ব্বক শরীরকে রস ভক্ষণের উপযোগী করিয়া তোলা। কারণ শরীর রসোপযোগী না করিয়া রস সেবন করিলে উক্ত রস সেবিত হইয়াও শরীরে যথাযথ রূপে স্থান লাভ করে না এবং সর্ব্বাঙ্গে রোগোৎপাদন করিতে পারে।

আজকাল যেরূপ ভাবে অবিধি পূর্ব্বক পারদ ঘটিত ঔষধ সেবিত হয়, তদ্বারাও যে নানা প্রকার রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না—তাহাই বা কে বলিতে পারে?

মাদৃশ অল্পসাধন ব্যক্তি দ্বারা পারদের বিষয় কি সম্যকরূপে বর্ণিত হইতে পারে? সিদ্ধ নিত্যনাথ অতি সুন্দর বলিয়াছেন যে, "সূতে গুণানাং শতকোটী"। আজকাল আয়ুর্ব্বেদের যাহা কিছু গৌরব তাহা পারদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই পারদের সম্যক অনুশীলন হইয়া যাহাতে আবার ঈশ্বরের মহিমার ন্যায় জগৎ ব্যাপ্ত করিতে পারে—এই আশা আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাই শিশুর আবেগময়ী অসংলগ্ন কথার ন্যায় আমার আজিকার এই প্রবন্ধ লেখা। তবে শিশুর ব্যাকুলতা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি যেমন তাহার বক্তব্য সমবেত লোককে বুঝাইয়া দেন, সেই রূপ রস বিষয়ে কৃতশ্রম কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-শিরোমণি—পারদের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণতার সহিত প্রকাশ করিয়া, জগতের কল্যাণ সাধন ও আমার ক্ষোভ-নিবারণ করুন—ইহাই প্রার্থনা। রস সম্বন্ধে আরও বহু প্রয়োজনীয় তথ্য এবং রসসংস্কারাদির মতান্তর ভেদে বিধানভেদ থাকিলেও আজ পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় এইখানেই প্রবন্ধ সমাপন করিলাম, সজ্জনবর্গ গুণলেশ গ্রহণ করিবেন—ইহাই বাসনা।

যক্ষ্মারোগের জীবাণু-কারণবাদ।*

[শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত কবিরঞ্জন]

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যক্ষ্মারোগী সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ অথবা তাহার চিকিৎসার বিষয়ও অন্য কোনও আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ইহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইব যে, আয়ুর্ব্বেদে জীবাণুতত্ত্বের কোনও আভাস পাওয়া যায় কিনা এবং পাশ্চাত্য মনীষীগণই বা তাহার কতটা কি ভাবে সমর্থন করেন। যদি যক্ষ্মাকে বাস্তবিকই জীবাণুজাত ব্যাধি বলিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করেন, তথাপিও আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্ট ভাবে জীবাণুর উল্লেখ দেখা যায় না বলিয়া আমাদের কোনও ক্রমেই ক্ষুব্ধ হওয়া সঙ্গত হইবে না যে, আয়ুর্ব্বেদের ঋষিগণের গবেষণা এতদূর সূক্ষ্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও নিরাকরণে ব্যর্থ হইয়াছিল, অথবা যদি প্রকৃতই আয়ুর্ব্বেদে ঐ তত্ত্বের সন্ধান না মিলে, তবে ইহাও প্রমাণ করিবার সামর্থ্য বোধ হয় আমাদের নাই যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান ভ্রান্ত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের সকল সিদ্ধান্ত আমাদের আর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। প্রাসঙ্গিকতার অনুরোধে একটী উদাহরণ দিতে বাধ্য হইতেছি। আপনারা সকলেই জানেন যে, মহর্ষি সুশ্রুত শোষ চিকিৎসায় বলিয়াছেন—"অজাশকৃন্মূত্র পয়োঘৃতাসৃঙ্‌মাংসাসালয়ানি প্রতিসেবমানঃ। স্নানাদি নানাবিধিনা জহাতি মাংসাদ শেষং নিয়মেন শোষং॥" শোষরোগী ছাগবিষ্ঠা, ছাগমূত্র, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, ছাগরক্ত ও ছাগ মাংস এবং ছাগের বাসস্থান সেবন করিলে এবং স্নানাদির নিয়ম যথাবিধি পালন করিলে এক মাসে তাহার সর্ব্বপ্রকার শোষ নিবারিত হয়। এই ছাগমূত্র, ছাগবিষ্ঠা ও ছাগের বাসস্থানে এমন কি শক্তি আছে যে, তদ্বারা যক্ষ্মার ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি নিবারিত হইতে পারে? ইহার এক মাত্র উত্তর আমরা আয়ুর্ব্বেদে ইহাই পাই যে—(সুশ্রুত)

অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ॥
প্রত্যক্ষ লক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৌষধী হেতুর্ভি বিদ্বান পরীক্ষেতে কদাচন॥

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার এক জন চিকিৎসক প্রকাশ করিয়াছেন যে, যক্ষ্মার জীবাণু কেবল ছাগদেহেরই কোন ও ক্ষতি করিতে পারেনা, কিন্তু হয়ত বিজ্ঞান একদিন প্রচার করিবে যে, শুধু তাহাই নহে, নরদেহের যক্ষ্মার বীজাণুও ছাগের যে কোনও প্রকার সংস্পর্শে আসিলে ধ্বংস হইয়া যায়। অবশ্য এ আমার অনুমান মাত্র। হেতু দ্বারা পরীক্ষা না করিলে কোনও বিষয়েরই প্রকৃত জ্ঞান হয় না, আর ইহাও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইতে পারে না যে, আমরা কেবল শাস্ত্রের সকল কথাই বিনা বিচারে মানিয়া লইব, যে হেতু "অযুক্তং যৎ পরিত্যাজ্যং অপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা"। আমার মনে হয়—শাস্ত্র-

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

কারগণ কতকগুলি সত্য বিচারের জন্য সহজ বোধে আমাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন চিকিৎসক আজ চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণা করিয়া থাকেন—যাহা দ্বারা শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব সকলের মীমাংসায় পৌঁছান যায়?

আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণের বংশধর বলিয়া তাঁহাদের বহু তপস্যালব্ধ অমূল্যরত্ন সকলের উত্তরাধিকারী হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে গর্ব্বানুভবের কারণ থাকিলেও নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় কিছুমাত্র নাই, পক্ষান্তরে কোন কল্পনাতীত যুগে যে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, আমরা তাহার কোনও উন্নতি করিতে সক্ষম হই নাই। ইহা অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও অপরিবর্দ্ধনীয় বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। জগদ্বরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যাহাকিছু প্রাণবান তাহাই পরিবর্ত্তনশীল, যাহা প্রাণহীন তাহা নহে"। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আয়ুর্ব্বেদের কোনও উন্নতি করিতে সক্ষম না হই ততক্ষণ উত্তরাধিকারী বলিয়া শ্লাঘার কোনও কারণ নাই। এ বিষয় আজ আর অধিক বলিতে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে মনে করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণায় নিযুক্ত হইতেছি। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিশারদ ও জীবাণুতত্ত্বজ্ঞগণ যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা জীবাণুকেই এই ব্যাধির হেতু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার ভীষণতা সম্বন্ধে তাঁহারাও আমাদের সহিত একমত। এমন কি (Bunyan) বানিয়ান ইহাকে (Captain of the men of death) মৃত্যুর সেনাপতি আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, সমগ্র মৃত্যুসংখ্যায় ⅐ অংশ কেবল যক্ষ্মাদ্বারা সাধিত হয়। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে শুধু যক্ষ্মায় মৃত্যুসংখ্যা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৫৪৪৩৫ হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মোট মৃত্যুর ⅐ অংশ যক্ষ্মারোগে হইয়া থাকে। নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বিলাতের যক্ষ্মায় মৃত্যুর সংখ্যা বুঝা যাইবে ;—

১৮৭১—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে যক্ষ্মায় মৃত্যু			২১৯
১৮৮১—১৮৯০	,,	,,	১৭৮
১৮৯১—১৯০০	,,	,,	১৩৯
১৯০১—১৯১০	,,	,,	১১৭

এই চল্লিশ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, যক্ষ্মায় মৃত্যু সংখ্যা শত করা পঞ্চাশ হিসাবে কমিয়া আসিয়াছে। লণ্ডন সহরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাতে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৩৩ জন কমিয়াছে। এই চল্লিশ বৎসরে যে যক্ষ্মায় মৃত্যুসংখ্যা ঠিক অর্দ্ধেক হইয়াছে—তাহার কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার অস্‌লার (Osler) বলেন (১) সামাজিক অবস্থার উন্নতি, বাসগৃহ ও খাদ্যদ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন, এবং নৈতিক উন্নতি (২) উন্নত শিক্ষা সাধারণ্যে প্রচার বশতঃ স্বাস্থ্যকর প্রণালীতে জীবিকানির্ব্বাহ, মদ্যপানহ্রাস, অল্পস্থানে বহু লোকবাস প্রথার পরিবর্ত্তন, উৎকৃষ্টতর বায়ু ও খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ, প্রকাশ্য স্থানে নিষ্ঠিবন ত্যাগের অভ্যাস নিবারণ। এই সকল সতর্কতা অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বত্র রোগজীবাণু বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। (৩) সুস্থ

ও অসুস্থদের পৃথক্‌করণের দ্বারাও সুস্থদিগকে রক্ষা করা হইয়াছে। ঐ সুস্থ ও অসুস্থদিগের একত্র সমাবেশ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে শতকরা ২০॥০ জন এবং লণ্ডন সহরে শতকরা প্রায় ৪৩।০জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সত্য আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীর পক্ষেও খাটে। (৪) রোগ হইবামাত্রই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে বলিয়া অধিকাংশ যক্ষ্মাই মারাত্মক হইতে পারে না। Baldwin বলেন যে,—আমেরিকায় এ রোগ নিমিত্ত আর্থিক ক্ষতি প্রতি বৎসর প্রায় ২০ কোটী ডলার অর্থাৎ প্রায় যাটকোটী টাকা।

যক্ষ্মারোগ যে জীবাণু হইতে উৎপন্ন—ইহাই ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের মত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মানীতে কচ্ (Koch) নামক জনৈক চিকিৎসক এই মত প্রচার করেন। যক্ষারোগে যে সংক্রামক তাহা অনেকেই জানিতেন, কিন্তু ১৮৮৪ সালে বার্লিন সহরে কচ দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে যক্ষার জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কচ অনুসন্ধান দ্বারা দুইটী বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন (১) দৈহিক পেশীর ভিতর জীবাণুর অবস্থান (২) মানব দেহের বাহিরেও জীবাণুর উৎপত্তি।

এখানে যে সকল জীবাণু হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে শরীরে নানা ব্যাধির উৎপত্তি হয়—তাহাদের আকার ও প্রকার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তাঁহাদের মতে মানুষের শরীরের ভিতর একপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু জন্মে। উহাদের আকার এত সূক্ষ্ম যে, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে খোলা চক্ষে সে গুলি লক্ষ্য করিবার উপায় নাই। একটী জীবাণুর আকার হয়ত এক ইঞ্চির ২৫০০০ ভাগের এক ভাগ। কোন কোন জীবাণু গোলাকার, কোনটী সরল, কোনটী বক্র কিম্বা বর্ত্তুলাকার। জরদেহ যে জরাংশের সমষ্টি তাহাকে Proto plasm বা জৈবনিক বলে। জীবাণুর ভিতরও এই জৈবনিক আছে। জৈবনিকের চারিদিকে একপ্রকার ঝিল্লী (Membran) আছে। জীবাণু এত সূক্ষ্ম যে, উহার উপাদান নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। অণুবীক্ষণের সাহায্যেও উহা সম্যকভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এইজন্য কৃত্রিম উপায়ে ঐ সকল জীবাণু রঞ্জিত করিয়া উহাদের গতিবিধি ও কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করা হয়। যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় যথেষ্ট সতর্কতার সহিত জীবাণুর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া থাকেন, তথাপি এই সকল ব্যাপার এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে, তাহারা কোনও বিষয়েই নিঃসন্দেহ হইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

কচ্ সাহেব যক্ষ্মার গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল বাধা তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ অন্যান্য ব্যাধির জীবাণু যে রং দ্বারা রঞ্জিত করা হয়—সেই রঙ্গের দ্বারা যক্ষ্মার জীবাণুর কোনও রূপান্তর হয় না। ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে তিনি ঐ জীবাণু রঞ্জিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ প্রাণীবিশেষের শরীরের ভিতর যক্ষ্মার জীবাণু কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করিতে তাঁহাকে বিস্তর প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। দশদিন

চেষ্টার পর তিনি জীবাণু উৎপাদন করিতে সক্ষম হন। ইহার পর বহুপ্রকার পরীক্ষার পরে তিনি জীবাণু গঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার ফলে যখন এক প্রকার জীবাণু গঠিত হইল—তখন তিনি প্রমাণ করেন—কি প্রকারে এক জাতীয় জীবাণু হইতে ক্ষতের উৎপত্তি হয়। তিনি ইহাও সিদ্ধান্ত করেন যে, সন্ধিস্থলে স্ফীতি ও গণ্ডমালার উৎপত্তিও যক্ষ্মার জীবাণুর পরিণতি।

যক্ষ্মারোগ যে কেবল মানুষের উপর মারাত্মক আক্রমণ করে এমন নয়। অন্যান্য জন্তুও যক্ষ্মার আক্রমণে বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। গবাদি পশুর ভিতর এই রোগ বহুল পরিমাণে দেখা যায়। প্রথমতঃ যক্ষ্মারোগীর ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হয়। ফুস্‌ফুসের ভিতর এক প্রকার গোলাকার গ্রন্থি দেখা যায়, বলা বাহুল্য যে, উহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। ঐ গ্রন্থিগুলির মধ্যভাগ কোমল, কিন্তু উহার চারিধারে দৃঢ় ঝিল্লী থাকে। এই ঝিল্লীর প্রদাহ হইয়া কখন গ্রন্থির উপর সরু সরু দানা জন্মায়। ইহার পর পাকাশয়ের যন্ত্রাদিতে আক্রান্ত হয়। গবাদি পশুর রুগ্নাবস্থায় স্তনের ভিতরও ক্ষত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পশুর রোগে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। যেমন শূকরের রুগ্নাবস্থায় মাংসপেশীতে ক্ষত হয় না। অশ্বের পাকস্থলীতে উপসর্গ উপস্থিত হয়, প্লীহা বৃদ্ধি পায়। মেষ ও ছাগলের শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু কদাচিৎ দেখা যায়। কুকুর, বিড়াল, প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর প্রায়ই এই রোগ হয়। বানরের এই ব্যাধি প্রায়শঃই হইয়া থাকে। ইহাদের ক্ষত হইতে কখন কখন পূয নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, যক্ষ্মার জীবাণু ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর দেহে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ জন্মায়। মানুষের শরীরের উপর এই সব জীবাণুর কার্য্য-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই জীবাণুসম্বন্ধে যে দুইটী সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা এই যে, এক জাতীয় জীবাণু কেবল মানুষের শরীরে ক্ষয় জন্মায়, আর এক প্রকার জীবাণু পশুর শরীর রুগ্ন করে। শেষোক্ত জীবাণু কখন কখন মানুষের শরীরও ব্যাধিগ্রস্ত করে।

যক্ষ্মার জীবাণুর-লবণ অতি সূক্ষ্ম। ইহার দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ অতি অল্প। জীবাণুগুলির আকার কখনও সোজা, কখনও বাঁকা থাকে। কখন কখন উহাদের দুই প্রান্ত একটু স্ফীত থাকে জীবাণুগুলি রঞ্জিত করিলে উহার কতকাংশ সাদা থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় নাই যে, কতকাংশ রঙ্গের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণের মত এই যে, যে সকল জীবাণু অপরিণত সেই গুলিই রঞ্জিত হইতে পারে। পরিণত জীবাণুগুলির রঙ্গ পরিবর্ত্তিত হয় না। জীবাণুগুলি মাংসপেশীর ভিতর বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ান থাকে। তাহারা দলবদ্ধভাবে থাকেনা। কখন কখন দুইটী এক জোড়ায় থাকে মাত্র। দুইটী জীবাণু কখন কখন পরস্পরে সংলগ্ন থাকিয়া স্থূলভাবে অবস্থান করে, যক্ষ্মার জীবাণু স্বেচ্ছায় নড়াচড়া করিতে পারে না।

যক্ষ্মার জীবাণুর জীবনীশক্তি সুপ্রচুর। ইহা দীর্ঘকাল শরীরের বাহিরে থাকিলেও ধ্বংস হয় না। যক্ষ্মা রোগীর শুষ্ক নিষ্ঠিবনে দুই মাস কাল পর্য্যন্ত এই জীবাণু জীবিত অবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছে। অনেক রোগের

জীবাণু অবস্থাবিশেষে পচিয়া যায়, কিন্তু যক্ষ্মার জীবাণু সহজে পচেনা। যক্ষ্মার ক্ষত অন্য মাটির নীচে বহুদিন পুঁতিয়া রাখিলেও উহা অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ১০০ ডিগ্রি উত্তাপ প্রয়োগ করিলেও এই জীবাণুর অবস্থান্তর হয় না। একমাত্র কার্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে এই জীবাণু ধ্বংস হয়। ডাক্তার কচ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই জীবাণু সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে পারেনা।

মাংসপেশীর ভিতর যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করিলে প্রথমে কতকগুলি ফুস্কুড়ী উঠে, পরে শরীরের কোষের ভিতর উহারা একপ্রকার বিষের উৎপাদন করে ও আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ জন্মে। পরে মাংসপেশীগুলির ক্ষয় হইতে থাকে।

যক্ষ্মারোগে এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়,—জ্বর এবং ঘর্ম্ম ও ক্ষয়। শরীরের ভিতর যে বিষ উৎপন্ন হয়—তাহা হইতেই এই সব উপসর্গ জন্মে। রোগীর নিষ্ঠিবনের ভিতর যক্ষ্মার জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। যক্ষ্মার শিশ্নাদি যন্ত্র আক্রান্ত হইলে মূত্রের সহিতও জীবাণু নির্গত হয়।

যক্ষ্মার জীবাণু পশুর দেহে প্রবেশ করাইয়া তাহাদিগকে ঐ রোগগ্রস্ত করা যায়। জীবাণু গুলি মাংসপেশীর ভিতর পিচকারীর দ্বারা ঢুকাইয়া দেওয়া যায় অথবা খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গেও মিলাইয়া দেওয়া যায়। অনেক সময় বায়ুর সহিত যক্ষ্মার জীবাণু মিলাইয়া পশু গুলিকে শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত উহা গ্রহণ করান হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পশুর শরীরে যক্ষ্মার বীজ ঢুকিলে ক্ষত জন্মে ও পারিপার্শ্বিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি স্ফীত হইয়া উঠে।

যক্ষ্মার জীবাণু মরিয়া গেলেও যদি তাহা মানবদেহে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে সংক্রামিত করে। যক্ষ্মারোগী যে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করে তাহার মধ্যে জীবাণু থাকে। নিষ্ঠিবন শুকাইয়া গেলে ঐ সব জীবাণু বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। যক্ষ্মারোগী যে ঘরে থাকে—তাহার বায়ু ঐ জীবাণুতে পূর্ণ থাকিতে দেখা গিয়াছে। যক্ষ্মারোগীর মূত্রের সহিতও ঐ জীবাণু থাকে, কাযেই যক্ষ্মারোগীকে সাবধানে রাখিতে হয়। তাহার নিষ্ঠিবন ন্যাকড়া বা কাগজের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। যদি কোনও পাত্রে নিষ্ঠিবন নিক্ষিপ্ত হয়—তবে তাহা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

গবাদি পশুর স্তনে অনেক সময় যক্ষ্মার জীবাণু দেখা যায়। সেই পশুর দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরা রোগাক্রান্ত হয়। যক্ষ্মার জীবাণু শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত অথবা ভুক্ত দ্রব্যের সহিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

উল্লিখিত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র মতে যক্ষ্মার ক্ষতে এই জীবাণু বর্ত্তমান থাকে, বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের ক্ষতের অবস্থায় কাসি ও রক্তে অসংখ্য জীবাণু বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যেখানে বহু জন সমাগম হয় সেইখানেই যক্ষ্মার বীজ বর্ত্তমান থাকে। প্রধানতঃ দুই উপায়ে ইহার বিস্তার ঘটে—প্রবল ফুসফুস রোগগ্রস্থ ব্যক্তির কফনিষ্ঠিবন এবং যক্ষারোগগ্রস্থ গরুর দুগ্ধপান। আরও বহুবিধ উপায়ে ইহার বিস্তার হইয়া থাকে। নিক্ষিপ্ত শ্লেষ্মা শুকাইয়া গেলে জীবাণু গুলি বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। বহুবার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, হাসপাতাল, সভাগৃহ, বড় রাস্তা, রেলগাড়ী

এবং বহু লোকালয়ের ধূলী-কণায় ঐ জীবাণু বর্ত্তমান থাকে—যাঁহারা সহরে অল্প দিন এমন কি এক সপ্তাহও বাস করেন, তাঁহা-দেরই শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে কণ্ঠেও বায়ু প্রবেশ পথে ঐ রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিবে। ঐ জীবাণু আহারীয় সামগ্রীও দূষিত করিয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীদের হস্ত সর্ব্বদাই ঐ বীজ দুষ্ট থাকে। পাদুকা, পরিচ্ছদ ও গৃহপালিত কুকুরের গাত্রলোমের সঙ্গেও বাহির হইতে ঐ বীজ গৃহে আসিতে পারে। যক্ষ্মা রোগী দ্বারা স্বাস্থ্যকর স্থানের ধূলী রাশিতে জীবাণুর অস্তিত্ব নীত হইতে পারে। গরু হইতে যক্ষ্মার জীবাণু প্রধানতঃ দুগ্ধ সহ মানব দেহে প্রবেশ করিলে ও মাংস ভক্ষণ ও গাত্র সংস্পর্শ দ্বারা ও কদাচিৎ প্রবেশ করিতে পারে। পূর্ণবয়স্কগণ দুগ্ধ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু শিশুগণের যক্ষ্মায় মৃত্যুর প্রায় দশমাংশ এই উপায়ে হইয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, সুস্থ মানব দেহ যক্ষ্মার বীজাণুর উপযুক্ত চর্ম্মক্ষেত্র নহে।

এ স্থানে আর একটী বিষয়ের অবতারণা প্রমাণিক বোধে করিতেছি। গত বর্ষের ভাদ্রসংখ্যার "প্রবাসী"তে চৌরীমুখু নামক একজন প্রবীণ ভারতসন্তানকে বিলাতের মেন্ডিপহিল্‌স্ স্বাস্থ্যাগারের যক্ষ্মারোগের প্রধান চিকিৎসকরূপে দেখিতে পাই। তিনি ইউ-রোপের বহু চিকিৎসা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং গত একুশ বর্ষ ধরিয়া কেবল যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা ও গবেষণাই করিয়া আসিতেছেন। কাজেই তাঁহার এ সম্বন্ধে মতামত খুব মূল্য-বান। এখানে তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত হইল, কৌতুহলী পাঠক গত ভাদ্রের প্রবাসীতে তাঁহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পারেন। তিনি বলেন:—(১) সভ্যতার প্রভাবে, অত্যন্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, উত্তাপ ভোগ, মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদ প্রভৃতি কারণে, মানবের প্রকৃতিগত স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। (২) নির্দ্দোষ বায়ু ও আলো-কের অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণে মানুষের প্রকৃতির সহজ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় ও ভুক্ত খাদ্যের বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মারোগের মূলে এই সব কারণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান। রোগের জীবাণুতত্ত্ববিদ—যক্ষ্মার বীজ আছে—একথা স্বীকার করিলেও ঐ বীজ বাহির হইতে আসিয়া কিরূপে এই রোগ বৃদ্ধি করে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতের অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান। অনেক স্থলে যক্ষ্মা ফুসফুসে জন্মায় এবং বিশেষ পরীক্ষা দ্বারাও তাহার কোনও বীজ দেখা যায় না। ডাক্তারেরা না কি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিতেছেন যে, যক্ষ্মারোগের জীবাণুর পার্শ্বেই দেখা যায় ভুক্ত দ্রব্যের বিকৃত পরিপুষ্টি, তার পরেই মানসিক বিকৃতি। অপর কথায় এই দাঁড়ায় যে, যাকে যক্ষ্মায় আক্রমণ করে, তা'র শরীর রোগ গ্রহণের পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই অনুকূল হইয়া থাকে। লোকের ভিতরটা সুস্থ ও সবল থাকিলে প্রবলতম জীবাণু ও আক্রমণে সফল হয় না। অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া-ছেন যে,এ রোগ অস্বাস্থ্যকর পরিসেবনার জন্য ইহা যত শীঘ্র উৎপন্ন হয়, জীবাণুর আক্রমণে তত হয় না। বিলাতের "ল্যান্‌সেট" পত্রিকায় সম্প্রতি তিনি লেখেন যে, যক্ষ্মার জীবাণু ব্যতীত ও যক্ষ্মারোগী পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতি-

স্থিত মেন্ডিপ্‌হিল্‌স স্বাস্থ্যাগারে যে সব রোগী আসিয়াছে—তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩০ ত্রিশ জনের ফুসফুসে জীবাণু দেখা যায় না। আবার এমন লোকও তিনি দেখিয়াছেন—যা'দের শরীরের গ্রন্থিতে জীবাণু দেখা গিয়াছে অথচ যা'দের মধ্যে যক্ষ্মার অন্য কোনও লক্ষণই দেখা যায় নাই। এ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান সিদ্ধান্ত গুলি এই:—(১) প্রকৃতি গত দৌর্ব্বল্য, শৈশবে মাতৃস্তন্যের অভাব, কৃত্রিম উপায়ে পুষ্ট হওয়া, শৈশবে-যৌবনে বা জীবনের অন্য অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা খাদ্য পরিপাক করিবার অক্ষমতা, প্রভৃতি যক্ষ্মারোগের মূল কারণ। অন্যান্য কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, মাদক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রভৃতি। (২) যে রোগীর দৌর্ব্বল্য যত বেশী—তার উপর যক্ষ্মার আক্রমণ তত প্রবল। (৩) রোগীর দেহের আভ্যন্তর যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া রোগ গ্রহণ ক্ষম না হইলে জীবাণুতে রোগ সৃষ্টি করিতে পারে না। (৪) জীবাণু অপেক্ষা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক নানা অবস্থার প্রভাবে এই রোগ জন্মে। তাঁহার হিসাবে প্রতি বৎসরে ৯।১০ লক্ষ ভারতবাসী যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ভারতীয় চিকিৎসা রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—তিনি দেখিয়া বিস্মিত হন যে, ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসকেরা মানুষের প্রকৃতির গুপ্ততম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিবিধ রোগের হেতু অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া রোগনিবারণের এমন কতকগুলি বিশদ প্রণালী আবিষ্কার করেন—যাহা আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা অবধি যুক্তিযুক্ত ও বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। ইত্যাদি।

যদিও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যক্ষ্মানিদানে স্পষ্ট ভাবে জীবাণুর কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে জীবাণুকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, আনুসঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক কারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া উভয় শাস্ত্রই একমত। জীবাণু-কারণ তত্ত্বকে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য এই জন্য যে, জীবাণুতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার "কচ্‌" জীবাণুজাত ব্যাধি নির্দ্ধারণের যে আইন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহার সকল সর্ত্তগুলিই এই রোগ সম্বন্ধে প্রযুজ্য। অথচ আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। যথা:—সংসর্গাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ। কুষ্টং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষান্দ এবচ। উপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্‌। (সুশ্রুত, নিদান স্থান, ৫ম অধ্যায়) ইহা দ্বারা যক্ষ্মার সংক্রামকতা আয়ুর্ব্বেদে স্বীকৃত হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধি মাত্রেই যে জীবাণুসম্ভূত—একথা হৃদঙ্গম করা প্রমাণের অপেক্ষা না করিলেও পাশ্চাত্য জীবাণুতত্ত্বগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

যক্ষার নিরুক্তি:—বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক যক্ষিত (পূজিত) হয় বলিয়া যক্ষা, রাজা চন্দ্রের প্রথমে এই রোগ হইয়াছিল বলিয়া অথবা অনেক

রোগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া রাজ যক্ষা, দেহও ঔষধের বীর্য্য ক্ষয় করে বলিয়া বা দেহও ঔষধের ক্ষয় কারক অন্যান্য রোগ হইতে উৎপন্ন হয়, বলিয়া ক্ষয়, রসাদি সপ্তধাতুকে শোষণ করে বলিয়া শোষ এবং সকল, রোগের প্রধান বলিয়া রোগরাজ নাম হইয়াছে।

যক্ষারোগের নিদান:—৪টী যথা:— বেগরোধ, ক্ষয়, সাহস ও বিষমাশন

বেগরোধ:—(১) বাত মূত্র ও পুরীষের বেগরোধ, যক্ষা রোগের একটী কারণ, ঐ বেগত্রয় ধারণ হেতু বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে উদীরিত করিয়া উর্দ্ধদিকে, অধোদিকে ও তির্য্যকভাবে বিচরণ করিয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শূল জন্মায়, পুরীষকে ভেদ বা শোষণ করে, পার্শ্বদ্বয়ে স্কন্ধদ্বয়ে, কণ্ঠে ও বক্ষে বেদনা জন্মায় এবং মস্তককে উপহত করে, এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, স্বরভেদ ও প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। এই সব শোষণ কারক উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

যক্ষার নিদান:—ক্ষয়:—(২) অতিরিক্ত শোক, চিন্তা, ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিদ্বারা, কৃশ শরীরে রুক্ষ অন্নপান, দুর্ব্বল শরীরে অল্পাহার বা অনাহার প্রভৃতি দ্বারা হৃদয়স্থ রস ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। অত্যন্ত স্ত্রী প্রসঙ্গ হেতু শুক্র-ক্ষয় হইবার পরেও যদি নিবৃত্ত না হওয়া যায় তবে বায়ু ধমনী আশ্রয় করিয়া রক্তবহা শিরা হইতে রক্তস্রাব করায় এবং বায়ু সংসৃষ্ট রক্তই শুক্রমার্গ দ্বারা নির্গত হয়, সেই শুক্র ও শোণিত ক্ষয় হইতে রুক্ষতা, দেহের শৈথিল্য, দুর্ব্বলতা ও বায়ুর প্রকোপ হয়। সেই কুপিত বায়ু সেই দুর্ব্বল শরীরে বিচরণ করিয়া রক্ত ও মাংস শোষণ করে, পিত্ত ও শ্লেষ্মাচ্যুত করে; পার্শ্ব-বেদনা জন্মায়, স্কন্ধ, কণ্ঠ ও বক্ষ পীড়িত করে, মস্তক-বেদনা জন্মায়, উৎক্লিষ্ট শ্লেষ্মা দ্বারা মস্তক প্রতিপুরণ করে, সন্ধি পীড়ন করিয়া অঙ্গমর্দ্দ জন্মায়, আমাশয়স্থ পিত্ত শ্লেষ্মাকে উৎক্লিষ্ট করিয়া অরুচি ও অবিপাক জন্মায় এবং বায়ু প্রতিলোম হওয়ায় জ্বর কাস, স্বর-ভেদ ও প্রতিশ্যায় জন্মায়। এই সকল উপদ্রব দ্বারা রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

যক্ষার নিদান:—সাহস:—(৩)

দুর্ব্বল পুরুষ বিষম বা অতিমাত্র ব্যায়া-মাদি অভ্যাস করিলে সেই অতিমাত্র কর্ম্মদ্বারা বক্ষের মধ্যস্থল ছিঁড়িয়া গিয়া বায়ু সেস্থানে ক্ষত উৎপাদন করিয়া উরুস্থ শ্লেষ্মাকে পেষণ পূর্ব্বক (উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যকভাবে বিচরণ করিয়া নানারূপ উপসর্গ উৎপাদন করে। যথা—)

সন্ধি সমূহে প্রবেশ করিয়া জৃম্ভণ, অমর্দ্দন, জ্বর, আমাশয়ে প্রাপ্ত হইয়া উরঃস্থ রোগ সকল ও অরুচি, কণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠস্বর নাশ ও স্বরাবসাদ, প্রাণ বহ স্রোতঃ সকল প্রাপ্ত হইয়া শ্বাস ও প্রতিশ্যায়, মস্তকে অবস্থান করিয়া শিরোরোগ সকল আনয়ন করে। উরঃক্ষরণ ও বায়ুর বিষমগতিহেতু, কণ্ঠের রোগহেতু কাস হয়—কাস হইতে উরঃক্ষয় ও হইতে রক্তস্রাব হয় এবং রক্তের আগমন বশতঃ মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং এই সকল শোষণকারক উপদ্রব দ্বারা রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

(৪) যক্ষার নিদান:—বিষমাশন।—

চরক বিমান স্থানে উপদিষ্ট আট প্রকার আহার বিহার আয়তন উল্লঙ্ঘন করিয়া

চর্ব্ব্য চোষ্যাদি সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া শরীর আশ্রয় করিয়া স্রোতঃ সকলের মুখ আবৃত করায় সেই আহার্য্য সকল কেবল মল, মূত্রকেই বৃদ্ধি করে—পুরীষের বাধকতাহেতু অন্যান্য ধাতুর বৃদ্ধি হইতে পারে না। কুপিত বায়ু শূল, অঙ্গমর্দ্দ, কণ্ঠোদ্ধংশ (গলাভাঙ্গা) পার্শ্বশূল মাংসক্ষয়, স্বরভঙ্গ ও প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে, কুপিত পিত্ত জ্বর, অতিসার ও অন্তর্দাহ আনয়ন করে এবং কুপিত শ্লেষ্মা প্রতিশ্যায় কাস ও অরুচি জন্মায়। কাস-প্রসঙ্গ হেতু দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় এবং এই কুপিত ত্রিদোষজাত উপদ্রব সকল হইতে ক্রমশঃ রোগী শুষ্ক হইতে থাকে।

যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ :—

প্রতিশ্যায়, হাঁচী, সর্ব্বদা শ্লেষ্মাপ্রসেক, মুখমাধুর্য্য, অন্নদ্বেষ, ভোজনকালে আয়াস বোধ, অদোষ বা অল্পদোষ দ্রব্যে দোষ দর্শন, পাত্র, জল, অন্ন, সূপ, পিষ্টক, চাটনি, ও পরিবেশক, অল্প দোষ যুক্ত হইলেও বিরক্তি প্রকাশ, আহারান্তে হৃল্লাস ও বমন, মাঝে মাঝে মুখ ও পাদ শোষ, সর্ব্বদা হস্ত দর্শন, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, বাহুদ্বয়ের মাপ জানিবার ইচ্ছা, অতিঘৃণা, দেহে বীভৎসদর্শনতা এবং জলশূন্য জলাশয়, শূন্যগ্রাম নগর ও জনপদ দর্শন, শুষ্ক দগ্ধ ও ভগ্ন বস্তু সমুদয়, অরণ্যানী, কৃকলাশ, ময়ূর বানর শুক, সর্প, কাক, উলূক প্রভৃতি দ্বারা সংস্পর্শন, অশ্ব, উষ্ট্র, খর, ও বরাহ বাহিত যানে—আরোহণ, কেশ, অস্থি, ভস্ম, তবুও অঙ্গার রাশির উপর আরোহণ, এই সকল দর্শন করিয়া থাকে।

যক্ষ্মার রূপ :- বা লক্ষণ :—

(১) মস্তকের প্রতিপূর্ণতা (শূল ও গৌরব) কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, শ্লেষ্মা বমন, রক্তনিষ্ঠীবন. পার্শ্বশূল, অংসশূল, জ্বর, অতিসার ও অরুচি। (চরক)

(২) অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাস শোণিত দর্শন, স্বরভঙ্গ (সুশ্রুত)

যক্ষ্মার সাধ্যাসাধ্যত্ব :—সাধ্যত্ব (১)

মাংস ও শোণিত ক্ষয় না হইলে ও রোগীর বল থাকিলে এবং অরিষ্ট লক্ষণ সকল না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত একাদশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও রোগ সাধ্য হয়। কারণ বল ও বর্ণের আধিক্য থাকিলে ব্যাধি ও ঔষধের বল সহ্য হয় এবং বহুলিঙ্গও অল্পলিঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অসাধ্যত্ব (২)

রোগীর দুর্ব্বলতা এবং রক্ত ও মাংসের অত্যন্ত ক্ষয় হইলে বহু লক্ষণ না থাকিলেও বহু লক্ষণ সদৃশ হয়, কারণ রোগীর ব্যাধি ও ঔষধের বল সহ্য করিতে অক্ষম হয়।

যক্ষ্মায় অরিষ্ট লক্ষণ ;—

রোগীর চক্ষু শুভ্রবর্ণ, অন্নে অরুচি, ঊর্দ্ধশ্বাস, কষ্টের সহিত বহু পরিমাণে শুক্রক্ষরণ, এই সব অরিষ্ট লক্ষণ।

যক্ষ্মারোগী যদি অল্প বয়স্ক হয়, এবং সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয় এবং এক সহস্র দিবস অতিক্রান্ত হয়—তবে তাহার জীবনের আশা করা যায়। ইহাই আয়ুর্ব্বেদের যক্ষ্মানিদানের সার মর্ম্ম।

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি]

হিষ্টিরিয়া ফিটে।—মনঃশিলা, রসাঞ্জন, গোময়, পারাবতের বিষ্ঠা—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে হিষ্টিরিয়ার ফিট উপশমিত হয়। ফিটের সময় ভিন্ন স্থায়ী উপকারের জন্য শতমূলীর রস ও দুগ্ধ অথবা ব্রাহ্মীশাকের রস ১ তোলা—মধুর সহিত মিশাইয়া তাহাকে প্রত্যহ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। প্রত্যহ বচের গুঁড়া অর্দ্ধআনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবনেও হিষ্টিরিয়া রোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধুর গুঁড়া দুই আনা, এক ছটাক সাঁচিকুমড়ার রস, শীতল জলের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলেও হিষ্টিরিয়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

শ্বাস বা হাঁপানি রোগে। (১) বহেড়া চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাসকষ্ট দূরীভূত হয়। (২) আদার রস ২ তোলা, মধুর সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে শ্বাসকষ্ট বিদূরিত হয়। (৩) পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল সমান ভাগে মিশাইয়া তিন সপ্তাহ সেবন করিলে শ্বাসরোগ আরোগ্য হয়। (৪) জটামাংসী চূর্ণ এক আনা, কুড়চূর্ণ এক আনা, তুলসীপাতার রস ২ তোলা—একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ পান করিলে শ্বাসরোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। (৫) শুঁঠ, বামনহাটি, কণ্টকারী ও হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য আধতোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া এই কাথ সেবনে শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়। (৬) ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম ৩ রতি, পিঁপুলের গুঁড়া একআনা, মধুর সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে বহুকালজাত শ্বাসরোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

প্রমেহ।—(১) শতমূলীর রস ২ তোলা, যজ্ঞডুমুর ফলের বীচির চূর্ণ একআনা ও মধু ১০।১২ ফোঁটা একত্র প্রত্যহ সেবন করিলে প্রমেহ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। (২) হিঞ্চে শাকের রস এক ছটাক, কাঁচা দুগ্ধ এক ছটাক—একত্রে মিশাইয়া কয়েক দিন পান করিলে প্রমেহের জালা-যন্ত্রণার নিবৃত্তি এবং পূয নির্গম বন্ধ হইয়া থাকে। (৩) কাঁচা হরিদ্রার রস ২ তোলা, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে সপূয মেহ নষ্ট হইয়া থাকে। (৪) আরবি গঁদ চারি আনা ও মিছরি চারি আনা, আধ পোয়া জলে ২।৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া তাহা সেবন করিলে প্রস্রাবের জ্বালা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (৪) হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—আঁটি বাদ দিয়া প্রত্যেক দ্রব্য এগার আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আ।পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রত্যহ সেবনের ব্যবস্থা করিলে বহুকাল জাত মেহ রোগ ও নষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তস্রাবে। (১) অশোক ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া—এই কাথ

পান করিলে বহুকালজাত রক্তপ্রদরও প্রশমিত হয়। (২) রসাঞ্জন ও ন'টে শাকের মূল একআনা বাটিয়া চাউল ধোয়া জল ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্ব প্রকার প্রদর নষ্ট হয়। (৩) কুশমূল—তণ্ডুল ধৌত জল সহ পেষণ করিয়া তিন দিন পান করিলে প্রদর উপশমিত হয়।

বাধকে।—শুঁঠ, মরিচ, পিঁপুল, যবক্ষার, সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার গরম জলের সহিত সেবনে বাধক বেদনা প্রশমিত হয়।

ক্ষতে। (১) নিম পাতা ও তিল—সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া গব্য ঘৃত সহ ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত স্থান শুষ্ক হয়। (২) যষ্টি মধু ও তিল পেষণ করিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত স্থান শীঘ্র পূরণ হয় (৩) শামুক চূর্ণ ও গব্য ঘৃত সম পরিমাণে এক সঙ্গে বগড়াইলে যে মলম হয়, উহা ব্যবহারে সর্ব্ববিধ ঘা নিশ্চয় আরোগ্য হয়। (৪) গব্যঘৃতে নিম পাতা ভাজিয়া সেই ঘৃত ব্যবহারে ঘা সত্বর শুকাইয়া যায়। (৫) মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র জ্বাল দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নালী ঘায়ে প্রয়োগ করিলে ক্ষত প্রশমিত হয়। (৬) কাটা ন'টের মূল এবং তাহার চতুর্থাংশ আদা—একত্রে বাটিয়া ক্ষত স্থানে পটী দিলে পচা মাংস দূর করিয়া যাবতীয় ঘা আরোগ্য হয়।

ক্রিমিতে। —(১) ভাঁট গাছের ডাঁটা ৪টি, জাঙ্গী হরীতকী চারি আনা ও সৈন্ধব লবণ চারি আনা—শীতল জলের সঙ্গে বাটিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে বহুকালজাত ক্ষুদ্র ক্রিমি সকল নষ্ট হইয়া থাকে। (২) দাড়িমের শিকড়, বিড়ঙ্গ, পল্‌তার বীজ, হরীতকী—ইহাদের মাত্রা প্রত্যেকটি আধ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই ক্বাথ সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া ক্রিমির যন্ত্রণায় আশু উপশম হয়।

রোগাণু-বিরুদ্ধবাদ।

(Anti-Bacillus theory)

[ডাঃ এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস,]

—:o:—

যে সর্ব্বদিক প্রসবিনী শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যস্ত প্রত্যেক পদার্থে তাহার অণু পরমাণুতে, কি জীবে, কি উদ্ভিদে, কি জলে, কি স্থলে, বায়ুতে, কি অগ্নিতে, কি সূর্য্যে কি চন্দ্রে, কি গ্রহে, কি নক্ষত্রে সেই আমোঘ শক্তির ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী। ইহাদিগের

মধ্যে কতক গুলি স্থূল মানব চক্ষুর গোচর এবং কতক গুলি তাহার অতীত। অন্ত সেই স্থূল চক্ষের বিষয়ীভূত ত্রিগুণ সমষ্টির আধার—যাহাতে একাধারে মনের কল্পনায় পূর্ব্ব হইতেই স্বত্ব, রজঃ তম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়, বায়ু, অগ্নি, জল, বাত, পিত্ত, কফরূপে বিরাজমান--সেই ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে সমুদ্ভূত যে ভগবানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি—সেই বাতশ্লেষ্মসংযুক্ত অগ্নিময় মূর্ত্তির বর্ণনা করিব। সেই মূর্ত্তি, সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্ত পর্য্যন্ত দেদিপ্যমান রহিয়াছে। সেই মূর্ত্তিই সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। পাঠক বুঝিলে কি? এই মূর্ত্তি কি এবং কোথায়? ঐ দেখ পাঠক! সূর্য্যরশ্মি বিগলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ মথিত করিতেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক বিন্দু হইতে জল কণা আকর্ষিত হইয়া মরুৎ সহযোগে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। উত্থিত জলকণা ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হইতেছে। আরও উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ঘনীভূত স্তর আরও ঘনীভূত হইতেছে। জলকণা যতই স্তরে স্তরে ঘণীভূত হইতেছে, ততই লোক-লোচনের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িতেছে। ঐ দেখ সূর্য্যরশ্মি সম্ভূত মরুৎ সংযোগে ঘনীভূত সেই জলরাশি উৎকট গর্জ্জনের সহস্র অস্ত্রে মুখে আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্‌গীরণ করিতেছে। কি অদ্ভুত! কি অলৌকিক রহস্যময় প্রকৃতির ক্রীড়া কৌশল। যে বুঝিয়াছে সেই মজিয়াছে, তুমি আমি বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত, তোমার আমার 'ঠগ' বাজিতেই জীবন কাটিয়া যাইবে। পাঠক! একবার দেখ কি বিষম বিমিশ্রণ; জল, মরুৎ কিরূপ এক প্রাণে এক তানে মিশিয়াছে। এক অন্য হইতে পৃথক নহে। এক অন্যের ভিতর ডুবিয়া রহিয়াছে। একের সত্বা অন্যের সত্বায় পরিণত হইয়াছে। তিনিই এক, আবার পৃথক ভাবে দেখিলে তিনিই পৃথক বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট! এক অন্যের বিপক্ষ! কোন দিনই সাপেক্ষ নহে। কিন্তু হায়! ভগবানের সৃষ্টি-কৌশলে বিরুদ্ধ শক্তি সম্পন্ন এক অন্যে পরিণত হইয়াছে। আবার এক, তিনে পরিণত হইতে পারে। মেঘস্থ বায়ু—মানব দেহস্থ বাত, অগ্নি—পিত্ত এবং জল শ্লেষ্মা। মেঘ ভাঙ্গিয়া যখন জলে পরিণত হয়, জল, অগ্নি ও বায়ু পৃথক হইয়া যায়, আবার মেঘ গড়িয়া উঠিলে যেমন এই তিনটী শক্তিও কেন্দ্রীভূত হয়, মানব দেহেরও সেই রূপ গতি। জীবের মৃত্যুতে বাত পিত্ত কফাশ্রিত পঞ্চভূত ভাঙ্গিয়া এক হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং জন্মমাত্র শক্তিপঞ্চ -বাত পিত্ত কফ রূপে পুনর্ব্বার কেন্দ্রীভূত হয়—ইহাই জগতের ব্রহ্মাণ্ড সংযোগ এবং বিয়োগ—যাহা হইতে এই সুবৃহৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জাগতিক ক্রিয়া কলাপও সেই নিয়মের বাহির নহে। এককে এক সংযোগ করিলে দুই হয়। আর দুইকে ভাঙ্গিলে দুইটী এক বাহির হইয়া এই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রস্তর জন্মে এবং পুনরায় মিলিত হয়—যে নিয়মে ফল ফুলপত্র বৃক্ষ দেহে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে সুশোভিত করে এবং পুনরায় ভূপতিত হয়—সেই নিয়মেই মানব দেহের স্বাস্থ্য, রোগ ও জরা আনিয়া থাকে।

উপরোক্ত কার্য্যগুলির বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে, রস সংযোগ ও রস-বিয়োগই ইহাদিগের উত্থান ও পতনের কারণ। পৃথিবী হইতে রস সঞ্চালিত হইয়া প্রস্তরখণ্ড, ফল, ফুল এবং পত্রকে জীবিত রাখে;

আবার সেই রসের বিয়োগেই উহাদিগের বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। অতএব রসের পরিবর্ত্তিত এবং বিকৃতাবস্থাই ইহাদিগের মৃত্যুর কারণ। তবে জীব-দেহে তাহা না হইবে কেন? একখণ্ড প্রস্তর নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তাহাতে ঢেউগুলি উত্থিত হইয়া চক্রাকারে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং অবশেষে নদী সৈকত-গাত্রে বারংবার আঘাত করে—যেমন মেঘমালা সুদূর কোন্ নিভৃত কোণে উত্থিত হয়, কিন্তু তাহার ঝঞ্চাবায়ু দূরবিস্তৃত গৃহপল্লী আন্দোলিত করে,—সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন সীমান্তে অতি সামান্য চঞ্চলতার সূত্রপাত হইলেই তাহার আন্দোলন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত খণ্ডে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কারণ সকলই এক অনাদি পরম পুরুষের বিকার মাত্র। পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে সৌরজগৎই শ্রেষ্ঠ। এই জগতের কেন্দ্র তেজস্বান, ভাস্কর, যাহার দেহাভ্যন্তর হইতে মঙ্গলময় রশ্মিধারা নিঃসৃত হইয়া বাতশক্তিকে বায়ুরূপে সঞ্চালিত এবং জীবজগতের প্রাণরক্ষা করিতেছে। যাঁহার মঙ্গলময় কিরণ-সুধায় বৃক্ষ,লতা,ফল, ফুলাদি বিধৌত হইয়া তাহাদিগের মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণের ক্ষমতার বিকাশ এবং তাহাদিগের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন হইতেছে। যে তেজঃপুঞ্জ উত্থিত জলরাশিকে মেঘে পরিণত এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে ভূপতিত করিয়া প্রাকৃতিক সমতা রক্ষা করিতেছে -সে তেজঃরাশি দৈনিক ব্যাধি এবং ত্রৈমাসিক উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা বিধান এবং সমতায় বিপর্য্যয় আনয়ন করতঃ বাহ্যিক প্রকৃতিকে পুনঃ সুস্থ এবং পুনঃ ক্লিষ্ট করিতেছে। সেই তেজোরাশি প্রকৃতির মধ্য দিয়া জীব জগতের অভ্যন্তরে সমতা এবং অসমতার প্রবর্ত্তন করিতেছে।

উপযুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে একটু প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করিলাম। স্থূলতঃ প্রতিদিন চতুর্দ্দশ দিবসে কিম্বা প্রতিতিন মাসান্তরে সূর্য্যদেব কখন নিকটবর্ত্তী, কখন বা দূরবর্ত্তী হইতেছেন। সূর্য্যদেবের আগমনে ও দূরগমনে পৃথিবী এক সময় উত্তপ্ত এবং অন্য সময় শীতল হইতেছে। এই উত্তাপ এবং শৈত্য জনিত পরিবর্ত্তন জীবজগতে অনুভূত হয়। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যখন সূর্য্যদেব সমতলের বহুনিম্নে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার ঊর্দ্ধে বিকীর্ণ কিরণের উত্তাপরশ্মি গগনমার্গস্থিত প্রতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বায়ু কণিকা হইতে প্রতি নিয়ত প্রতিফলিত হইয়া জীব-জগতের উপর পতিত হয় এবং জীব-জগৎ সেই উত্তাপ রশ্মির ক্রমবিকাশের সহিত নব ফোটনোন্মুখ পুষ্প কলিকার মত জাগিয়া উঠিতে থাকে। সূর্য্যদেব যতই ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন, ততই জীবের স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া উত্তেজিত হয়। এবং তৎসহ জীবের নাড়ীর গতি ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সূর্য্যদেব যখন আকাশের চরম ঊর্দ্ধে উপনীত হন, তখন জীবের শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া চরম সীমায় উপনীত হয়। সূর্য্যদেব যখন আবার তাঁহার ঊর্দ্ধতম হইতে নিম্নে স্খলিত হইতে থাকেন, তৎসহ জীবদেহের উত্তাপের হ্রাস ও শৈত্যের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সূর্য্যদেব যখন পৃথিবী হইতে অতি দূরে প্রস্থান করেন, যতই সন্ধ্যার অন্ধকার ছায়া পৃথিবীর উপর পতিত হইতে থাকে, ততই শৈত্যের জলোচ্ছ্বাসময়ী শীতলতা জীবদেহকে আলিঙ্গন করিতে

থাকে। তৎপরে রজনীর ক্রমবৃদ্ধির সহিত রজনীর গাঢ়তা শীতলতা আসিয়া ক্রমশঃ জীব-দেহকে মুমুর্ষু করে ক্রমে জীবজগত জাগ্রত হইয়া উঠে। সূর্য্য দেবের উত্থান ও পতনের সহিত জীব জগতের নাড়ীর গতি ও শারিরীক উত্তাপের উত্থান ও পতন হইয়া থাকে। আবার দ্বিপ্রহর অতীত হইলেই শৈত্য জীব-দেহে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। দিন যতই একাদশী ও অমাবস্যার দিকে অগ্রসর হয়—সূর্য্যদেব ততই পৃথিবী হইতে দূরে-আরও দূরে অবস্থান করিতে থাকেন। সেই অনুপাতে জীব-জগতের শারীরিক উত্তাপ ও মন্দীভূত হইয়া আসে ও শৈত্যের ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ণিমাতেও উত্তাপ অপেক্ষা শৈত্যের ভাগ অধিক। চন্দ্র সূর্য্যের উত্তাপ রশ্মিগুলির পথ রোধ করতঃ তাঁহার শীতল রশ্মিগুলি পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে, ঋতু পরিবর্ত্তনে ও উত্তাপ এবং শৈত্যের সাময়িক চঞ্চলতা আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। দৈনিক, পাক্ষিক কিম্বা ত্রৈমাসিক উত্তাপ এবং শৈত্যের বিধান এইরূপ। এই ত্রিকালেই উত্তাপ—শৈত্যে এবং শৈত্য—উত্তাপে পরিণত হইয়া একটী সাময়িক অসমতায় সৃষ্টি করে। আমরা জানি যে, এ জগতে কেহই তাহার স্বীকার আধিপত্য ত্যাগ করিতে স্বীকৃত নহে, (Authority never forgeats a clying king Teungson)। রাজা রাজ্যের, গৃহ-স্বামী গৃহের। উত্তাপ শৈত্যের, শৈত্য উত্তাপের শীত—গ্রীষ্মের এবং গ্রীষ্ম—শীতের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহে না। এক অন্যের নিকট হইতে এই আধিপত্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে লইতে অগ্রসর হইলেই একটা ওলোট-পালট, একটা যুদ্ধবিগ্রহ, একটা জয়, পরাজয়, একটা অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, শীতও গ্রীষ্ম এবং উত্তাপ ও শৈত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। যখন শীতের ক্ষমতা অমোঘ এবং প্রতাপ অজেয়, যখন শীত তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তখন গ্রীষ্ম শীতের নিকট অগ্রসর হইতে ভীত, কিন্তু শীতের উপর আধিপত্য বিস্তারে প্রতিক্ষণ চেষ্টিত রহিয়াছে। দিন কাহারও কখন সমান যায় না। সুখ-দুঃখ, আলো-ছায়া, জয়-পরাজয়, সংযোগ-বিয়োগ, ইত্যাদি লইয়াই জগৎ,—যে যতই করুক না কেন, যে যতই আপনাকে অপরাজেয় ও বলবান মনে করুক না কেন রোম রাজ্যেরও পতন হইয়াছে, রাম রাজ্যের চিহ্নমাত্র নাই, সুকৌশলী আকবরের রাজ্যেরও সেই দুর্দ্দশা—একদিন না একদিন পতন অবশ্যম্ভাবী। শীতের শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল এবং সুবিধা বুঝিয়া গ্রীষ্ম ও তাহাকে গ্রাস করাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে শীত ও গ্রীষ্মে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কখন শীত জয়ী, গ্রীষ্ম পরাজিত, কখনও বা গ্রীষ্ম জয়ী, শীত পরাজিত। ক্রমশঃ গ্রীষ্ম তাহার আধিপত্য বিস্তার করিলে শীত পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। শীত এবং গ্রীষ্মের সঙ্গমস্থলে উত্তাপ এবং শৈত্যের অসমতা পরিলক্ষিত হয়। কখন শীত—কখনও বা গ্রীষ্ম আসিয়া বাহ্য প্রকৃতিকে আন্দোলিত এবং রুগ্ন করিয়া তুলে। শীত এবং গ্রীষ্মের সঙ্গমস্থলে যেমন শৈত্য এবং উত্তাপের ব্যত্যয় ঘটে, দৈনিক এবং পাক্ষিক সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমরা সাধারণতঃ দিনের ও রাত্রির শেষভাগে এবং একাদশী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রোগাদির

আক্রমণও বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া থাকি। প্রভাতকালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত রোগের আক্রমণ ও বৃদ্ধি বিরল, কারণ তখন জীবনীশক্তি প্রভাতসূর্য্যের নবকিরণ সম্পাতে স্ফূর্ত্তিমান ও রোগশক্তি নিবাকরণে সমর্থ। আমরা প্রায়শঃ দেখিয়া থাকি যে, নাড়ীহীন রোগীর নাড়ী ঐ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতেই তির তির করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু উক্ত সময়ে রোগের আক্রমণ বিশেষ ভয়াবহ, কারণ সে অবস্থায় জীবনীশক্তির পূর্ণ অধঃপতন বুঝিতে হইবে। একটু ধীর এবং স্থিরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, দৈনিক, পাক্ষিক কিম্বা ত্রৈমাসিক পরিবর্ত্তন হইতে এক বাহ্যিক অসমতার উৎপত্তি হয় এবং সেই অসমতা জৈবিক দেহে বা স্বাভাবিক ও ব্যভিচার জাত কৈশিক Cellalar) অসমতাকে রোগ-বীজ উৎপাদন করে।

খেলা।

[ডাঃ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(ব্যাটবল খেলা)

হাডু ডুডু, গোল্যাছুট, চিবুড়ি, কপাটী দাড়ে-খোট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত ক্রীড়া কোন্ যুগের প্রবর্ত্তিত ঠিক জানিনা, তবে এটুকু নিশ্চয় ঐ সমস্ত ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন কালেও প্রাণা য়ামের আদর লোপ পায় নাই। কারণ প্রায় সকল খেলাতেই শ্বাস আবদ্ধ রাখিবার বাহা-দুরি আছে; যিনি যতটা শ্বাস আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম – তিনিই ততটা ভালো খেলোয়ার হইয়া দাঁড়াইবেন। এই খেলার ফলে বুকের শক্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পায়; হৃদরোগ, শ্বাসকাশ, যক্ষা প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইবার স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।পূর্ব্বে দেশে হৃদরোগ —বুক ধঁাপা, বুকের মধ্যে ধড়ফড় করা প্রভৃতি নিতান্ত কম ছিল, যক্ষা কদাচিৎ শ্রমবিমুখ রাজরাজড়ার ঘরে রাজরোগরূপে দেখা দিত; আজকাল বালক ও যুবক হাঁপাইতেছেন, হৃদ-রোগ যুবকের রোগে পরিণত হইয়াছে, 'যক্ষা দেশে অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশীয় খেলা লোপ পাওয়া যে ইহার একটী প্রধান কারণ এবিষয়ে আপত্তি করিবার কিছুই নাই।

দেশীয় খেলায় কোন ব্যয় ছিল না, খেলার পাছে যে ব্যয় আবশ্যক,একথা —বর্ত্তমান বালক গণের—তথাকথিত অশিক্ষিত অভিভাবকগণের জানা নাই। অধিকাংশস্থলেই অভিভাবকগণ বাধা দিতে কুণ্ঠিত হওয়ায়, দরিদ্র দেশে ঘোর অনিষ্ট ঘটিতেছে; বাধা করিতে না পারিয়া খেলা ধুলা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ব্যয় করিয়া ফুটবল, ব্যাটবল টেনিস প্রভৃতির প্রচলন হওয়ায়, বিনাব্যয়ে আড়ম্বর শূন্য স্বাস্থ্য-প্রদ খেলাগুলি লোপ পাইতেছে। টেনিস খেলা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের খেলা; যখন শরীরের

বৃদ্ধি শেষ হয় নাই, তখন ঐ খেলার প্রশ্রয় দেওয়া একবারেই অসঙ্গত।

ড্যাম্বেল প্রভৃতি নিতান্ত অনিষ্টকর, উহাতে আবদ্ধ বায়ুতে গোপনে পরিশ্রম দ্বারা শরীর বৃদ্ধির চেষ্টা শিক্ষা দেয়। হৃদরোগ ও যক্ষা প্রভৃতির আশঙ্কাও ইহাতে অবশ্যম্ভাবী। ইহা দ্বারা মাংসপেশীগুলিকে বৃদ্ধি করা যায়; কিন্তু জীবনীশক্তির লোপ করিয়া মাংসপেশীর বৃদ্ধি কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দেশীয় কুস্তি এবং খোলা বাতাসে মুগুরভাঁজাও উহা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

Atheietic Heart নামে যে এক-প্রকার কঠিন হৃদরোগ আছে—তাহা আটকা বাতাসে ডাম্বেল, জিমষ্টিক প্রভৃতি দ্বারা জীবনী শক্তির লোপ করিয়া মাংসপেশীর দৃশ্যত বৃদ্ধির পরিণামফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিশেষতঃ এই দরিদ্র দেশের পক্ষে দরিদ্র এবং তথাকথিত অশিক্ষিত বিধার খেলা উপ-লক্ষে বা অভিভাবকগণের অধীনস্থ সুকু-মারমতি বালকগণকে নানারূপ ব্যয়সাধ্য আড়ম্বরপূর্ণ খেলার প্রলোভনে মাতাইয়া চৌর্য্যবৃত্তির প্রথম উদ্যম শিক্ষা দেওয়া অথবা খেলা ধূলার একেবারে লোপ করিয়া দিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য-হানি করান যে কতদূর সঙ্গত হইতেছে, তাহা স্কুলের শিক্ষকবর্গ এবং সমস্ত খেলার উৎসাহদাতৃগণ চিন্তা করিবেন।

কল্যাণী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অবকাশ।—কলিকাতা-আয়ুর্ব্বেদ মেডি-কেল কলেজের পূজাবকাশ হইয়াছে ১৫ই আশ্বিন হইতে ১৭ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত। ১৮ই কার্ত্তিক কলেজ খুলিয়া পুনরায় পূর্ণোদ্যমে অধ্যাপনা চলিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় — যশোহরে যে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা সেখানকার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে হই-য়াছে, তাহা আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সংপ্রতি খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ঐরূপ একটী চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়েরই এক-জন কৃতবিদ্য ছাত্র সেখানে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জমীদারের সাহায্য।—মানভূম গোদাবেরো নামক স্থানের জমীদার শ্রীযুক্ত রাজাগোপালা-চারিয়ার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে পারিবারিক চিকিৎসক-রূপে সংপ্রতি নিযুক্ত করিয়াছেন। দেশের কুবের সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপর পতিত হওয়া আশার কথা।

চরম পরীক্ষার ফল।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজ হইতে এবার নিম্নলিখিত ৬টি ছাত্র চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—ইহাদিগকে ভিষগরত্ন, এল, এ, এম, এস উপাধি প্রদান করা হইবে—

১। শ্রীমান্ রাজসিংহ বুদ্ধ দাস।
২। ,, ডি. এল বিমলাজীউ।
৩। ,, জীতেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত।
৪। ,, ধনঞ্জয় সেনগুপ্ত।
৫। ,, অবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৬। ,, অশ্বিনীকুমার সাহাচৌধুরী।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

হেমন্ত-চর্য্যা।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, এইচ, এম, বি]

—:০:—

কোনো কোনো মতে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসকে যে হেমন্তকাল বলে, সে কথা "শরতে কর্ত্তব্য" প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসকেই হেমন্ত কাল বলিয়া থাকে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম—এই তিন ঋতু উত্তরায়ণ ও অবশিষ্ট তিন ঋতুর নাম দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণ কাল প্রতিদিন মনুষ্যগণের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করে, এইজন্য উত্তরায়ণ কালের অপর নাম আদান কাল এবং দক্ষিণায়ণ কাল মানবদিগকে বল বিসর্জ্জন অর্থাৎ প্রদান করে বলিয়া দক্ষিণায়ণ কালের নাম বিসর্গ কাল। আদানকালে সূর্য্য ও বায়ু অতিশয় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্য গুণ নাশ করে। এই সময় শীত ঋতুতে তিক্ত, বসন্ত ঋতুতে কষায় এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে কটুরস বীর্য্যশালী হয়, এজন্য আদান কালকে আর্য্য-ঋষিগণ আগ্নেয়কাল বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন।

হেমন্ত ও শীত—উভয়ই শীতল ঋতু, এই ঋতুতে মনুষ্যদিগের অধিক পরিমাণে বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই ঋতুতে শীত-সংযোগে লোমকূপাদি রন্ধ্র সকল সঙ্কুচিত হওয়ায় দৈনিক উষ্মা নির্গত হইতে না পারায় কোষ্ঠাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া উহাকে বলবান করে। এজন্য এই ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য গ্রহণ আবশ্যক, উপযুক্ত পরিমাণে ভোজ্য প্রাপ্ত না হইলে উহা বায়ু-সংযোগে প্রদীপ্ত হইয়া ধাতু সকলকে পাক করে। স্বাদু, অম্ল এবং লবণাস্বাদ দ্রব্য ভোজন করাই এইকালে প্রশস্ত, এই সমস্ত ভোজ্য গ্রহণে ধাতুপাক নিবারিত হয়। মেদস্বী পশুর মাংস, গুড়জাত মদ্য, প্রসন্না

সুরা, গোধূম চূর্ণ, মাষকলাই, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বসা ও তিল তৈল—এই সমস্ত দ্রব্য সেবনের জন্য শাস্ত্রকার এই ঋতুতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এই ঋতুতে দিবামানের হ্রাস ও রাত্রি-মানের বৃদ্ধি নিবন্ধন প্রাতঃকালেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এজন্য প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মলোৎসর্গাদি সমাপনান্তর কিয়ৎকাল ব্যায়াম করিয়া তদনন্তর মস্তকে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানান্তে গাত্রে কস্তূরী ও কুমকুম বিলেপন কর্ত্তব্য।

উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্রসেবা, স্বেদ গ্রহণ এবং সর্ব্বদা টুকিং ও জুতা ব্যবহার এই কালে কর্ত্তব্য। রাঙ্কব-কৌষেয় বসন পরিধান, গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র ও বনাত দ্বারা আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন এইকালে কর্ত্তব্য।

কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য, লঘু পাচ্য দ্রব্য ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন, বায়ু সেবন এবং দিবা নিদ্রা প্রভৃতি এইকালে একান্তই পরিত্যজ্য। সকল প্রকার মিষ্টান্ন ভক্ষণ এবং স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে উষ্ণ জল ব্যবহার এই ঋতুতে হিতকর।

দম্পতী-জীবন।

"ঋতু"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন ধন্বন্তরি, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

—:•:—

রজো নিঃসরণ হওয়ার পর গর্ভধারণের উপযুক্ত স্ত্রীলোকের যে অবস্থাবিশেষ, তাহাকে "ঋতু" বলে। যে দিন হইতে বাহিরে রক্ত প্রকাশ হয়, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ষোল দিন পর্য্যন্ত নারীকে ঋতুমতী বা গর্ভ-গ্রহণের উপযোগিণী বলা যায়। স্ত্রীলোকের ঐ রক্তকে রজঃ বা আর্ত্তব বলে, রজঃ কাহারও তিন চারিদিনেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কাহারও বা পাঁচদিন পর্য্যন্তও বাহিরে প্রবর্ত্তমান থাকে। এইরূপ কাল স্বাভাবিক, ঐ সময়ের বেশী দিন রজোনির্গম হইলে তাহা রোগ বলিয়াই জানিতে হইবে। যাহাদের রজঃ পরিমাণে বহু এবং অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, তাহাদের নিবৃত্তি হইতে পাঁচদিন লাগে, আর যাহাদের আর্ত্তব অপেক্ষাকৃত অল্প বা অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হয়, তাহাদের চারিদিনের মধ্যেই নিবৃত্তি হইয়া যায়। যেমন দিবস অতিক্রান্ত হইলে পদ্ম মুকুলিত ও দিবসে প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ ঋতুকাল অতীত হইলে স্ত্রীলোক-দিগের গর্ভাশয় সঙ্কুচিত এবং ঋতুকালে বিকশিত হইয়া থাকে। সেই কারণে ঋতু-কাল ভিন্ন অন্য সময়ে বীজাধান করিলে গর্ভা-

শয়ের মুখ বন্ধ থাকায়, গর্ভাশয়ে বীজ পৌঁছিতে পারে না ও গর্ভ হয় না।

রক্ত দর্শনের প্রথম দিন স্ত্রী চণ্ডালী তুল্য, অর্থাৎ গৃহকার্য্য বা স্বামীর নিকট গমনের অযোগ্য, দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনীর তুল্য অব্যবহার্য্যা, তৃতীয় দিবসেও রজকীতুল্যা অস্পৃশ্যা, চতুর্থ দিবসে স্নানান্তে পবিত্রা হইয়া গৃহকার্য্যের উপযোগিনী ও স্বামির স্পৃশ্যা হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ সংহিতায় রজঃসম্বন্ধে একটী পুরাবৃত্ত আছে। পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইতে কৌতূহল হওয়ায়, তাহা উদ্ধৃত করিলাম, "পূর্ব্বে ইন্দ্র ত্রিমস্তকধারী ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে বিনাশ করিলে তিনি পাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তখন সকল প্রাণী ইন্দ্রকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। এইজন্য ইন্দ্র স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—হে নারীগণ, তোমরা আমার ব্রহ্মহত্যা পাপের তিন ভাগের একভাগ গ্রহণ কর, স্ত্রীলোকেরা ইন্দ্রকে বলিল, "আমরা যদি তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপের অংশ গ্রহণ করি, তাহা হইলে তুমি আমাদের কি উপকার করিবে?" প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র বলিল, তোমরা যে বর লইতে ইচ্ছা কর, আমি সেই বর দিব। তাহারা এই বর চাহিল—যেন আমরা ঋতুকালে সন্তানোৎপাদিনে সমর্থ হই এবং প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত পুরুষদিগের সহিত সঙ্গ করিতে পারি। এই আমাদের বর। ইন্দ্র ঐ বর দিলে নারীগণ তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপের এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিল। সেই ব্রহ্মহত্যা মাসে মাসে আবির্ভূত হয়। ঐ রজঃ ব্রহ্মহত্যার কঞ্চুকতুল্য। যাহাই হউক ধর্ম্মশাস্ত্র পাপের ভয় দেখাইয়া যে সমস্ত কার্য্য পরিহার করিতে আদেশ করিয়াছেন—তাহা কেবল শরীরের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার জন্য। শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালন না করিলে আমাদিগের সতত রোগ-শোকে প্রপীড়িত হইতেই হইবে। শাস্ত্রে যে ঋতুর প্রথম তিন দিন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ আছে, তাহার কারণ এই যে, "যদি সে সময়ে কোনরূপ উন্মাদনা আসিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি করতঃ উভয়ের সম্মিলন ঘটায়, তাহা হইলে পুরুষ ও স্ত্রীর দুরারোগ্য রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

প্রথম তিন দিনে মাসের সঞ্চিত দুষ্ট রক্তসমূহ নির্গত হয়, সে সময়ে সঙ্গ হইলে শুক্রপতনের বেগে আর্ত্তবের নির্গমন শক্তি নষ্ট হইয়া যায় ও শুক্রের দ্বারা পথ রুদ্ধ হওয়ায় বাহিরে আসিতে পারে না, সঞ্চিত আর্ত্তব যথাসময়ে নির্গত না হইলে স্ত্রীলোকদিগের বাধক ও অন্যান্য যোনিরোগ উৎপন্ন হয়। দুষ্ট রক্তের সহিত সংযোগ হইলে পুরুষগণেরও উপদংশাদি রোগ জন্মিতে পারে। রজস্বলা নারীকে উপভোগ করিলে পুরুষের প্রজ্ঞা, বীর্য্য, বল ও আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং দর্শন শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে, আরও যদি প্রথম তিন দিন সঙ্গ করার পর বীজ কোনরূপে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করায় গর্ভ হয়, তাহা হইলে সে গর্ভ কখনও স্থিতিশীল হয় না, প্রথম দিনের সঙ্গে যে গর্ভ জন্মে, তাহা প্রসবকালেই মৃত হয়, দ্বিতীয় দিনের আহিত গর্ভও প্রায় প্রসব সময়ে নষ্ট হইয়া যায়, সে সময়ে নষ্ট না হইলেও সূতিকাগৃহে থাকিতে থাকিতেই গর্ভও প্রায় মৃত হয়, না মরিলেও সে সন্তানের সকল অবয়ব পূর্ণ হয় না, এবং অল্পায়ু হয়, এই সমস্ত নানারূপ

বিপাকাশাস্ত্রে মুনিগণ ঋতুর প্রথম তিন দিবস স্ত্রীলোককে স্পর্শেরও অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রজঃস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে স্নানের পর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির দ্বারা বিভূষিতা হইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে কাল যাপন করিবেন এবং সুন্দর সুন্দর বস্তু অবলোকন করিবেন।

কোন কোন স্ত্রীলোকের বহির্দ্দেশে রজঃ প্রকাশ হয় না, কিন্তু তাহাদেরও উপযুক্ত বয়সে মাসে মাসে আর্ত্তবাধার বিবৃত হইয়া গর্ভাশয়ে আর্ত্তব পৌঁছিয়া থাকে, তাহাদিগকে অগু ঋতুমতী বলে। অগু ঋতু অবস্থায় গর্ভাধান করিলে তাহাদের গর্ভ উৎপন্ন হয়। যাহাদের বাহিরে রজোদর্শন হয় না,—নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখিয়া তাহাদেরও ঋতুকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। যথা—মুখের প্রসন্নভাব ও অপেক্ষাকৃত ভারি ভারি দেখা, দন্তে অধিক ময়লা লাগা, মধুরালাপ, পুরুষের সঙ্গ করিতে ইচ্ছা, উদর, নয়ন ও কেশের শিথিলতা, হস্ত, স্তনদ্বয়, নিতম্ব, নাভি, উরু ও ফিকদেশ প্রভৃতির স্পন্দন, সকল বিষয়েই আনন্দ ও ঔৎসুক্য।

দুষ্ট আর্ত্তব পরীক্ষা।

যেমন দধি অথবা মূত্রের সংযোগ হইলে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ দূষিত আর্ত্তবের যোগে বিশুদ্ধ শুক্রও দূষিত হইয়া থাকে। যেমন উত্তম বীজ ঊষর ক্ষেত্রে বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ নির্ম্মল শুক্রও দুষ্ট আর্ত্তবযুক্ত গর্ভাশয়ে নিপতিত হইলে গর্ভোৎপাদনে অনুপযোগী হইয়া যায়। আহার-বিহারের দোষে আর্ত্তব, বায়ু অথবা পিত্ত বা শ্লেষ্মা অথবা দুষ্টরক্ত অথবা বায়ু ও কফ এই উভয় অথবা পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই উভয় অথবা পিত্ত ও বায়ু এই উভয়, অথবা বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা যুগপৎ এই তিনটীর দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে।

বায়ুর দ্বারা আর্ত্তব দূষিত হইলে তাহার বর্ণ লাল-কাল্‌চে হয় এবং স্রাবকালে তলপেটে সূচী বিদ্ধের ন্যায় ভেঙ্গে দেওয়ার ন্যায় নানারূপ বেদনা হয়। পিত্তের দ্বারা দূষিত আর্ত্তবের বর্ণ হলুদে বা নীল হয়, এবং স্রাব সময়ে যোনিতে আগুনে পোড়ার মত জ্বালা উপস্থিত হয়, এবং মরা মানুষের মত আর্ত্তব দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।

শ্লেষ্মা দূষিত আর্ত্তবের বর্ণ ঈষৎ শ্বেত হয় এবং স্রাবকালে তলপেট যোনি প্রভৃতি দেশে কণ্ডূ (চুলকানি) হইয়া থাকে।

রক্তদূষিত আর্ত্তবের গন্ধ মৃত শরীরের মত, এবং স্রাব বহু পরিমাণে হয়।

বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয়ের দ্বারা দূষিত আর্ত্তব গাঁট দেওয়া মত থকাথকা হয়।

পিত্তশ্লেষ্মা উভয় দূষিত আর্ত্তব দুর্গন্ধ পুঁযের তুল্য

বায়ু-পিত্ত দূষিত আর্ত্তবের পরিমাণ অল্প হয়।

ত্রিদোষ দূষিত আর্ত্তবের গন্ধ—মল ও মূত্রের ন্যায়। দ্বিদোষের দ্বারা দূষিত আর্ত্তবের যে বিশেষ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—তাহা [illegible] ভিন্নও আর্ত্তবের বর্ণ, বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেক দ্বারা দূষিত হওয়ায় যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ হয়, দ্বিদোষের দ্বারা দূষিত হইলে সেইরূপ দুইটী বর্ণ একত্রে দেখা যায়। বেদনাও দুইটী দোষের মত হইয়া থাকে।

আর্ত্তবের দোষ ব্যতীতও যোনিরোগ বা

গর্ভাশয়ের দোষবশতঃ স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না, বিংশতি প্রকার দুশ্চিকিৎস্য যোনিরোগ আছে, সন্তানপ্রার্থী-সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ তজ্জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের উপর চিকিৎসা ভার প্রদান করিবেন।

বিশুদ্ধ আর্ত্তব।

যদি মাসান্তরে আর্ত্তব নির্গত হইয়া পাঁচ রাত্রির অধিককাল না থাকে, আর যদি তাহা পিচ্ছিল, দাহযুক্ত বা নানাবিধ বেদনা যুক্ত অধিক বা নিতান্ত অল্প না হয়, তবে সেই আর্ত্তব বিশুদ্ধ। যাহার বর্ণ কুঁচ বা রক্তপদ্ম বা গুবুরে পোকার মত সে আর্ত্তব বিশুদ্ধ।

প্রকৃতি ভেদে আর্ত্তব কাহারও শশকের রক্ততুল্য, কাহারও বা লাক্ষারসের (লাহার মত) বর্ণবিশিষ্ট হয়, যে রজঃ কাপড়ে লাগিলে ধুইলে উঠিয়া যায়, কাপড়ে কোনরূপ রং লাগিয়া থাকে না তাহা বিশুদ্ধ ও গর্ভের উপযোগী।

দূষিত শুক্র।

যেমন অকাল বৃষ্টি কীট বা অগ্নির দ্বারা দূষিত বীজ উত্তমক্ষেত্রে পড়িলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ দূষিত শুক্র বিশুদ্ধ গর্ভাশয়ে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে অপত্য উৎপন্ন হয় না। আর্ত্তব ও শুক্র ইটীই দোষ শূন্য হইলে তাহা হইতে সন্তান জন্মে, দূষিত শুক্র আট প্রকার, যথা ফেনিল, তনু, রুক্ষ, বিবর্ণ, পূতি (দুর্গন্ধযুক্ত) পিচ্ছিল, অন্য ধাতু মিশ্রিত ও অবসাদী।

বায়ু শুক্রকে দূষিত করিলে, উহা ফেনিল (ফেনাযুক্ত) তনু (পাতলা) রুক্ষ ও অতি কষ্টে অল্প নির্গত হয়।

পিত্তদোষে শুক্র বিবর্ণ অর্থাৎ ঈষৎ নীল বা পীতবর্ণ ও পূতিগন্ধযুক্ত হয়, এবং তাহা অত্যুষ্ণ, নিঃসরণকালে লিঙ্গের মধ্যে জ্বালা হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মার দোষে শুক্র অতীব পিচ্ছিল হয়, এবং পতন সময়ে লিঙ্গদেশে কণ্ডু জন্মায়।

অতিশয় স্ত্রীগমন অথবা অন্য কোনরূপে আঘাত লাগা, অথবা ধাতুক্ষয়বশতঃ শুক্রপ্রায় রস রক্তাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। এইরূপ শুক্রকে অন্য ধাতুমিশ্রিত বলা যায়।

পতনকালে বেগধারণহেতু শুক্র নির্গম-মার্গে বায়ু কর্ত্তৃক আটকগ্রস্ত ও গ্রথিত হইয়া অতি কষ্টে নির্গত হয়, ইহাকে অবসাদী শুক্র বলে।

দূষিত শুক্র ও আর্ত্তবের লক্ষণ উক্ত হইল, স্বাস্থ্যকামী মনুষ্য উপযুক্ত চিকিৎসককে জানাইয়া ইহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহার বিশেষ চিকিৎসা লিখিতে গেলে গ্রন্থ বিশাল হইয়া পড়িবে। তবে মোটা-মুটি বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ ও শিলাজতু ব্যবহার করিলে শুক্র ও আর্ত্তবের অনেক দোষ নিরাকৃত হয়। (পরিশিষ্টে ইহার চিকিৎসা লিখিবার ইচ্ছা রহিল)

বিশুদ্ধ শুক্র।

স্নিগ্ধ, ঘন, ঈষৎ পিচ্ছিল, মধুর, অবিদাহী ও স্ফটিক সদৃশ শ্বেতবর্ণ শুক্রকে নির্দোষ বলিয়া জানিবে।

প্রকৃতি বিশেষে বিশুদ্ধ শুক্র কাহারও তিল তৈলের মত কাহারও বা মধুর মত হয়,

শুদ্ধ শুক্রের গন্ধ, মধুর গন্ধের মত। এইরূপ নির্দ্দোষ শুক্র হইতে গর্ভ সঞ্চার হয়।

ঋতুকালে নারীগণের কর্ত্তব্য।

যে দিন প্রথম আর্ত্তব দেখা যায়—সেই দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকগণকে ব্রহ্মচারিণীর মত, হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জন ও হবিষ্যান্ন করিয়া থাকিতে হয়, ভূমির উপর কম্বলাদি শয্যা পাতিয়া বালিশ না লইয়া বাহুপাধানে শয়ন করা কর্ত্তব্য। সে সময়ে কোমল শয্যায় শয়ন বা পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ভোজন বা স্বামীর সহিত সম্ভাষণ করাও উচিত নহে। প্রথম তিন দিন এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত দুষ্ট রক্ত সমূহ নিরাপদে নির্গত হইয়া যায়, কঠোরতা জন্য শরীরের রসাংশ অল্প হওয়ায় শরীরের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আর্ত্তব বিশুদ্ধ ও পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কিছু কম হয়, আর্ত্তব কম হইলে পর বীজাধান করিলে বীজভাগ অধিক হওয়ায় কন্যা না হইয়া পুত্র জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

ঋতুকালে নারীগণের ক্রন্দন, তৈলমর্দ্দন, স্নান, নখছেদন, গাত্রে চন্দনাদি বা এসেন্সাদি লেপন, চক্ষুতে অঞ্জনদান, দিবানিদ্রা, ছুটাছুটির কাজ, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, উচ্চ হাস, বেশী কথা বলা, ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা, পর্য্যটন, মাথা আঁচড়ান, প্রবল বাতাস লাগান, এবং বেশী আয়াসের কাজ করা উচিত নহে।

সে সময়ে ক্রন্দন করিলে যদি তৎকালীন আর্ত্তবের যোগে গর্ভ হয়, তাহা হইলে সে গর্ভের সন্তানের চক্ষু খারাপ হইয়া যায়। তৈল মাখিলে সন্তান কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, স্নান বা চন্দনাদি লেপন করিলে নানারূপ রোগযুক্ত হওয়ায় সন্তান চিরদুঃখী, নয়নে অঞ্জন দিলে সন্তান অন্ধ, দিবানিদ্রায় সন্তান নিদ্রালু, ছুটাছুটি করিলে সন্তান চঞ্চল, বেশী কথা বলিলে সন্তান প্রলাপী, বাচাল, হাসাহাসিতে সন্তানের তালু জিহ্বা, দন্ত ও ওষ্ঠদেশে কাল কাল দাগ, ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে সন্তান কালা, মাথা আঁচড়াইলে সন্তানের টাকপড়া, খুব পরিশ্রম, বা জোর বাতাস লাগাইলে সন্তান উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। নখ কাটিলে সন্তানের নখ খারাপ হয়।

নারীগণ ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নানের পর ভাল ভাল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া সতত প্রহৃষ্ট মনে থাকিবেন, এবং মনোহর বস্তু দর্শন করিবেন, সুরুচিপূর্ণ ভাল ভাল পুস্তক পাঠ ও সৎ আলোচনাদির দ্বারা কাল যাপন করিবেন। ঋতুকালে স্ত্রীলোকের মন যেরূপ উন্নত বা অবনত হইবে, সন্তানের হৃদয়ও তদ্রূপ উচ্চ বা হীন হইয়া থাকে, এমন কি, গর্ভগ্রহণ সময়ে স্ত্রীলোকের মন যেরূপ দেবতা, যেরূপ মনুষ্য বা সদৃশ প্রাণীর চিন্তা করিবে, সন্তানও সেইরূপ দেবতার মত সেইরূপ মনুষ্যের মত, সেইরূপ প্রাণীর মত, শরীর ও মন লাভ করিবে।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণ।

[ডাঃ শ্রীশরৎকুমার দত্ত এল, এম, এস]

আমি গত প্রবন্ধে জীবনীয়গণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদের গুণাবলীর বিষয় সাধারণ ও পৃথক পৃথকভাবে কিছু আলোচনা করিব।

দ্রব্যগুণে অষ্টবর্গ ও জীবনীয়গণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে :—

অথাষ্টবর্গঃ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে।
অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥
অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদুর্বৃংহণঃ শুক্রলোগুরুঃ।
ভগ্ন সন্ধানকৃৎ কামবলাস বলবর্দ্ধনঃ।
বাতপিত্তাস্রতৃড় দাহ জ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ॥

অষ্টবর্গ শীতল, মধুর, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক গুরু, ভগ্নসন্ধানকারক, কামবর্দ্ধক, কফজনক বলকারক এবং ইহা বাতরক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়নাশক।

জীবনীয়গণ অর্থে যাহাদের দ্বারা জীবন ধারণ করা যায় তাহাই বুঝায়। আমি প্রাণী শরীরস্থিত যে পদার্থগুলির উল্লেখ করিয়াছি (Pituitary body, Adrenals, Thyroid Thymus. Liver, Spleen. Kidneys, Pancreas, Intestines, Qovary an l testide) তাহাদের দ্বারাও জীবনধারণ হইয়া থাকে; এমন কি ইহাদের অনেকগুলির মধ্যে প্রত্যেকটীকে জীবশরীর হইতে বহিষ্কৃত করিলে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। আর একটী কথা এই যে, যেমন জীবনীয়গণের মধ্যে দুই দুই দ্রব্যের ক্রিয়া একরূপ বর্ণনা আছে, যথা—মেদ ও মহামেদ, জীবক ও ঋষভক, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি ইত্যাদি, তদ্রূপ প্রাণী শরীরস্থিত উক্ত জিনিস গুলির মধ্যেও দুই দুইটী জিনিসের যে একরূপ ক্রিয়া, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

অথ জীবকর্ষভকৌঃ।

জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ।
রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ॥
জীবকঃ কূর্চ্চকাকার ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ।
জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ॥
ঋষভো বৃষভো ধীরো বিষাণীদ্রাক্ষ ইত্যপি।
জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্র কফপ্রদৌ।
মধুরৌ পিত্তদাহস্র কার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ॥

এই দুই দ্রব্য বলকারক শীতবীর্য্য শুক্র, কফবর্দ্ধক, মধুররস এবং ইহারা পিত্ত, দাহ, রক্তদুষিত, কৃশতা, বায়ু ও ক্ষয়রোগপ্রশমক।

এই জীবক Pituitary body এবং ঋষভক Adrenals বলিয়া মনে হয়। যেরূপ জীবক ও ঋষভক উভয়েরই ক্রিয়া প্রায় একরূপ তদ্রূপ Pitnitary body এবং Adrenals উভয়েরই ক্রিয়ায় সামঞ্জস্য আছে। উভয়েই Vasomoter Contre কে উত্তেজিত করিয়া Blocd Pressure বৃদ্ধি করে এবং উভয়েই জ্বর উৎপত্তি করে। Adrenals দ্বারা শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং Pitnitary body যে উত্তাপের

কেন্দ্র ও Adrenal কে পরিচালিত করে তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। Pitnitary body মস্তিস্কের ভিতরে (At the base of the brain) ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তীস্থানের সমান্তরালভাবে অবস্থিত এবং Adrenals দুইটী নাভির দুই পার্শ্বে এবং পশ্চাৎভাগে অবস্থিত। Adrenals splandenic nerves এবং Semileenar gangtion দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলী পাইয়া থাকে। ইহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, ঋষভকের আকৃতিও বৃষশৃঙ্গের ন্যায়। Adrenals ২টী আকারে যেরূপ ক্ষুদ্র তাহার পরিমাণে ইহাদের স্নায়ুমণ্ডলী অতি বৃহৎ। এই নাভিপ্রদেশের চতুঃপার্শ্বে সমান বায়ুর মধ্যে (Splanclenic area) জঠরানল অবস্থিত আছেন। যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে এই সূর্য্যমণ্ডলের ভিতরে Solar plexur জ্যোতিঃ আবরণের মধ্যে একটী রমণীমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমোনমঃ॥"

আমাশয় এবং শূল ব্যারামে এই জঠরানলের বিকৃতি ঘটে, তজ্জন্য ঐ সব ব্যারামে নাভির চতুঃপার্শ্বে মোচড়ান বেদনা অনুভূত হয়—ইহা সকল চিকিৎসকই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

যদিও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Pitnitary body যে Heat centre এবং Adrenals দ্বারা জ্বর উৎপত্তি হয় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজ পর্য্যন্ত কি প্রকারে জ্বর উৎপত্তি হয় (Mechanism of fever) তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে শরীরকে বিষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটী Ante-antitoxin যে জ্বররূপে আবির্ভাব হয় তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ দিব্য-জ্ঞানপ্রভাবে শরীরেই সমস্ত কার্য্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্বর যে জঠরানলের বিকৃতি এবং জঠরানলই যে উষ্মারূপে বহিঃপ্রদেশে আসিয়া জ্বর উৎপত্তি করে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের নিদান সম্বন্ধে লিখিত আছে—

দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধঃ রুদ্রনিশ্বাসসম্ভবঃ।

আয়ুর্ব্বেদের টীকাকারগণ দক্ষ এবং রুদ্র কথার সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই, তবে দক্ষের অপমান দ্বারা রুদ্রের ক্রোধ হইয়াছিল। ক্রোধে পিত্ত বিকৃত হয়, জ্বরেও পিত্ত বিকৃতি হইয়া উষ্মারূপে বহিঃপ্রদেশে (Surface of the body) আসে—তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। দক্ষ এবং রুদ্র আমাদের শরীরে কোথায় অবস্থিতি আছেন এবং তাঁহারা কিরূপে জ্বরোৎপত্তি করেন তাহা বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই।

আমাদের শরীরে সপ্তধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধাতুর নাম শুক্র। ব্রহ্মা—জগৎ সৃষ্টি মানসে প্রজাপতি দক্ষকে সৃষ্টি করেন, এবং দক্ষ হইতেই প্রজাবৃদ্ধি হয়। আমাদের শুক্র (sperm ও overi secration) দ্বারাই প্রজাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা, সর্ব্বসময়ে শরীরের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত থাকে। বিপরীত আহার বিহারাদি এবং দূষিত বায়ু, খাদ্য ইত্যাদি সেবনের ফলে এই ধাতুর বিকৃতি ঘটে এবং তদ্বারা আমাদের শরীরে রুদ্র যিনি ভ্রূব্যোমধ্যে অবস্থিত আছেন (Pituitary boby) তিনি

ক্রোধযুক্ত হন এবং তাঁহার নিশ্বাস অর্থাৎ প্রাণবায়ু বা নিশ্বাসবায়ু দূষিত হইয়া জ্বর উৎপত্তি করে। সকলেই লক্ষ করিয়াছেন যে জ্বরের প্রথম অবস্থায় নিশ্বাসবায়ুর বিকৃতি ঘটে। এই splanchnic area হইতে spermatic plexus দ্বারা অণ্ডকোষ এবং Hepatic plexus দ্বারা Liver (যকৃৎ) স্নায়ুমণ্ডলী পাইয়া থাকে। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় এই শুক্রধাতু (দক্ষ) হইতে Afferent sensation রুদ্রে (Pituitary body) যাইয়া তাঁহাকে ক্রোধিত করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে Pituitary body, Adrenalকে পরিচালিত করে। সুতরাং Pituitary bodyর কার্য্য বিকৃত হইলে তদ্দ্বারা জঠরানলেরও বিকৃতি ঘটে তজ্জন্য তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না ও তাহা দ্বারা Hepatic plexus ও বিকৃতি ঘটে, যকৃতের কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন হয় না এবং এই পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া বহিঃপ্রদেশে জ্বররূপে প্রকাশ পায়। ঔষধাদির দ্বারা জঠরানল পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পিত্ত-নিঃসরণও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং জীব শরীর সুস্থ হয়।

এই জীবনীয়গণ রসায়ন ঔষধ অর্থাৎ ইহাতে সর্ব্ব ঔষধেরই গুণ আছে। যে জ্বরে জীবক ও ঋষভকের বিকৃতি ঘটিয়া জঠরানল বিকৃত হয় তাহাতে ঐ জিনিষ যে জ্বরনাশক তাহা সহজে অনুমেয়।

(ক্রমশঃ)

সেই আঁখি।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

—:•:—

ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে ধীরে,
সেই আঁখি তোর সেই আঁখি,
পলক পলক আন্‌তো পুলক—
আজ্‌কে সে হায় দেয় ফাঁকি।
শৈশবে সে কাজল মাখা,
মায়ের স্নেহের চুমায় আঁকা,
চাঁদকে দেখা,—চাঁদকে ডাকা—
আর কি মনে নাই না কি ?

২

এরাই কি সেই চপল আঁখি—
সেই বিজলি জল ভরা,
প্রেমের দেশের পান্থ-পাদপ
শিখলে কোথায় ছল করা।
সেই যে শুভ দৃষ্টি করে,
আনলে পীযূষ বুকটী ভ'রে,
কান্না-হাসির ইন্দ্রধনু—
আজকে সে যে যায় ঢাকি।

৩

এরাই কি সেই টান্‌তো মধু,
ফোটার আগেই ফুল থেকে,
দূর সাগরের কনক তরী
দেখতে পেত কুল থেকে।
বিনা তারের খপর দিয়ে
নি'ত চাঁদের পীযূষ পিয়ে,
ছায়া ছবির নাচের গৃহ
আঁধার হ'তে নাই বাকি।

৪

এ নয় ত সে তমাল ছায়া
এ নয় ত সে মেঘ করা
কালিন্দীর এ আঁধার লহর
ভাসিয়ে নেওয়ার বেগ ভরা।
ওই ছায়া হায় মায়ার ছলে
কমলকে আজ মুজতে বলে,
সামনে ঝিঞার ফুল ফুটেছে
যায় ডুবে ওই যায় চাকি।

আয়ুর্ব্বেদ প্রতিভা।

(দৃশ্যকাব্য)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—:o:—

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

[স্থান—বারাণসী—দিবোদাসের আশ্রম।

সময় প্রাতঃকাল।

দিবোদাস, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবতঃ করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যগণ]

দিবোদাস।—(সুশ্রুতের প্রতি) বৎস সুশ্রুত, তুমি ঋষিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। পরোপকার রূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য তোমার পিতা তোমাকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ আমার নিকট প্রেরণ ক'রেছেন। এক্ষণে তোমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হ'য়েছে। তুমি লোকহিতার্থে ঋষি ব্রাহ্মণোচিত স্বণাদি ত্যাগ করে স্বহস্তে শবচ্ছেদ করে শারীর জ্ঞান উপার্জ্জন করে এবং নানাপ্রকার শস্ত্রকর্ম্মের চর্চ্চা করে, নিজের জ্ঞানকে যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছ, তাহা বৈদ্য-চিকিৎসকের পক্ষে অতি উচ্চ আদর্শ। কিন্তু বৎস! আজ বিদায় কালে আমি তোমাকে একটী উপদেশ দিব। তুমি এত পরিশ্রমে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছ, ভবিষ্যতে শিষ্য পরম্পরায়, সেই বিদ্যার গৌরব যা'তে চিরকালই সমুজ্জ্বল থাকে, তা'র জন্য তোমাকে একখানি সংহিতা প্রণয়ণ ক'র্‌তে হবে। আমি আচার্য্য হিসাবে তোমাকে বর প্রদান ক'র্‌ছি—তোমার রচিত সেই সংহিতা সর্ব্ব জগতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

সুশ্রুত।—গুরুদেব! আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য। আমি অতি শীঘ্রই গুরু মুখ

নিঃসৃত উপদেশাবলী অবলম্বনে যথাসাধ্য এ কার্য্যের জন্য শক্তি প্রয়োগ ক'রবো।

দিবোদাস।—হাঁ বৎস! অতি শীঘ্র এ কার্য্য সম্পন্ন করা চাই। তোমার রচিত সংহিতায় চিকিৎসায় সকল কথা বিবৃত থাকলেও উহা শল্য চিকিৎসা প্রধান আদর্শ সংহিতা হ'বে। শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূত বিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র সমগ্র আয়ুর্ব্বেদকে এই অষ্টাঙ্গে বিভক্ত ক'রে তোমাকে সংহিতাখানি রচনা ক'রতে হ'বে। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমাদিগকে যে ব'লেছি—শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরুপদেশও প্রত্যক্ষ অনুভব এই তিনটী দৃঢ়স্থলীয় উপর সর্ব্বদা নিজের জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োগ দ্বারা যে জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয়জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। কেবল ঐন্দ্রিয় জ্ঞানই অতীন্দ্রিয় বস্তু বিষয়ে পর্য্যাপ্ত হয় না, এজন্য অনুমানেরও আবশ্যকতা আছে। অনেকস্থলে এই উভয়ের কোন জ্ঞানই সম্ভব নহে, সেজন্য আমাদেরই শরণাগত হইতে হয়। অতএব বৎস! এই ত্রিবিধ উপায়ে সাবধানে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইবে। বিশেষতঃ দেহ বিজ্ঞান ও শাস্ত্রাদি ক্রিয়া বিষয়ে প্রতক্ষ্যজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন কোন প্রকারে তত্ত্বাববোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিহীন শাস্ত্র প্রয়োগোদ্যত চিকিৎসক শাস্ত্রপাণি আততায়ী বা সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ ভয়ানক।

সুশ্রুত।—যথা আজ্ঞা প্রভো! আমি যথাসাধ্য গুরুপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রতে চেষ্টা কর্ব্বো।

দিবোদাস।—আর একটা কথা সর্ব্বদা মনে রা'খবে, দেহের অস্থি, পেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, ত্বক, রস, রক্ত, মাংস মেদ ও মজ্জা প্রভৃতির আকৃতি, প্রকৃতি ও সংস্থিত বিষয় অবগত হ'তে হ'লে শবচ্ছেদ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শারীরস্থানের জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক শবচ্ছেদ ক'রে সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ না করলে সে চিকিৎসক কখনই যথার্থ রোগ নির্ণয়ে ও শস্ত্রাদি ক্রিয়ায় সমর্থ হ'তে পারেন না। এই শবব্যবচ্ছেদ করতে পারেন নি ব'লেই ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত, ও পুষ্কলাবত প্রভৃতি শিষ্যগণকে এখনো পর্য্যন্ত আমি শল্যতন্ত্রের সম্পূর্ণ উপদেশ প্রদান করি নাই।

ঔপধেনব প্রভৃতি শিষ্যগণ।—গুরুদেব! আমাদের ভ্রম দূর হয়েছে! শবচ্ছেদ লব্ধ জ্ঞান যখন এতদূর প্রয়োজনীয়, তখন আমরা আর বিতৃষ্ণা না ক'রে অতঃপর শবচ্ছেদ ক'রবো। আপনি দয়া প্রকাশে আমাদিগকে প্রত্যক্ষ মূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ক'রে দিন।

দিবোদাস।—উত্তম, বৎসগণ! তোমাদের সুমতি দেখে আমি সন্তুষ্ট হ'লাম। যে চিকিৎসক শারীর স্থানের শিক্ষালাভ করেন নি, তিনি কখনই সুচিকিৎসক পদবাচ্য হ'তে পারেন না। ব্রহ্মার ছিন্ন শিরঃসংযোজনের ব্যবস্থা কিম্বা ছিন্নজঙ্ঘা বিশপ্লার নূতন জঙ্ঘা নির্ম্মাণ কি শারীর স্থানে জ্ঞানলাভ না থাকলে কখনো হ'তে পারতো? কার্য্যক্ষেত্রে এমন অনেক রোগ রাক্ষসের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে হ'বে যে, সে সময় শুধু কায় চিকিৎসায় কুলাইয়া উঠবে না। তখন শস্ত্র চিকিৎসার একান্তই আবশ্যক হ'বে। এই শস্ত্র চিকিৎসা এক সময়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট এক অপূর্ব্ব

কীর্ত্তিছটা বিস্তার করতে সমর্থ হবে। স্মরণ রাখিও—আমার পরম সৌভাগ্য যে প্রথমেই তোমাদের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী ছাত্র পেয়েছি। আজ তোমাকে পরীক্ষা করে, বড়ই প্রীত হ'য়েছি। এখন লোকহিতকর ব্রতে নিযুক্ত করবার পূর্ব্বে তোমাদের প্রতি আমার কিছু উপদেশ দিবার আছে। মন দিয়ে শ্রবণ কর।

যস্তূভয় জ্ঞোমতিমান্ স সমর্থোঽর্থ সাধনে।
আহবে কর্ম্ম-নির্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা॥

যিনি উভয় কর্ম্ম শিক্ষা ক'রে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই রণভূমিতে দ্বিচক্র রথের ন্যায় কার্য্য সাধনে সমর্থ হন।—থাক্, এখন বেলা অধিক হ'য়ে প'ড়ল, এখনকার মত এ প্রসঙ্গ স্থগিত রাখা যাক।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান—আত্রেয়ের কুটীর। সময় পরাহ্ন। আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষীরপাণি, হারীত প্রভৃতি ঋষিগণ]

আত্রেয়।—প্রিয় শিষ্যগণ! এতদিনে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে,পরদুঃখকাতর মহর্ষি ভরদ্বাজ—যেদিন দেবতাদের নিকট হইতে পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা অধ্যয়ন করে এসে আমাদের সঙ্ক্ষেপে অল্পকথায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ করে দিলেন সেইদিন হইতে আমি এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছি। প্রথমত স্মরণ রেখ—আমরা যে বিদ্যা অর্জ্জন ক'রেছি, তাহার অনুশীলন মহাদায়িত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন মরণের দায়ীত্ব—ইহা খেলার কথা নহে। আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য—সকল প্রাণীর শুভ চিন্তন। সর্ব্বপ্রকারে নিজের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ক'রে এবং বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে কায়মনোবাক্যে রোগীর আরোগ্যের নিমিত্ত সতত আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসাশাস্ত্র ধনোপার্জ্জনের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই। যদি কেহ চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে, তবে সে নিতান্তই দুর্ভাগ্য। কেননা চিকিৎসা-পুণ্যফলে সে প্রায় সর্ব্বতোভাবেই বঞ্চিত হয়। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"নাত্মার্থং নাপি কামার্থময় ভূতদয়াং প্রতি। বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে। বর্ত্ততে কুর্ব্বো যেতু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসা পণ্য বিক্রয়ম্। তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশু পপিমুপাসতে।

অতএব বৎসগণ! স্মরণ রাখিও—এ চিকিৎসা বৃত্তিদ্বারা ধনোপার্জ্জন স্বর্ণমুষ্টির পরিবর্ত্তে ধূলি-মুষ্টি গ্রহণ মাত্র। যদি কাকেও বাধ্য হয়ে চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে হয়, তবে প্রাণান্তেও যেন আতুরকে ক্লিষ্ট ক'রে তা'র নিকট থেকে অর্থ দোহন করা না হয়। তৃতীয়তঃ লোকালয়ে গিয়ে তোমাদিগকে কতকগুলি সদাচার পালন করতে হবে। পরস্ব গ্রহণ ও পরস্ত্রী প্রলোভনের চিন্তা যেন কখনো তোমাদের মনে স্থান না পায়। সর্ব্বদা নির্ম্মল চরিত্র, অনুদ্ভূত ও শান্তবেশধারী হ'বে। সত্য, হিত ও পরিমিত বাক্য দেশকাল বিবেচনা ক'রে প্রয়োগ কর্ব্বে। স্মৃতিমান্ হ'য়ে সর্ব্বদা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হ'বে। রাজা ও মহাত্মাদিগের বিদ্বেষভাজন লোক সকলের আমরা চিকিৎসা কর্ব্বো না। স্বামী বা অন্য কোনো অধ্যক্ষের অসন্নিধানে স্ত্রীজাতির—বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীর রোগ প্রতীকারে আমরা

প্রবৃত্ত হ'ব না। বিনা অনুমতিতে রোগীর বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ কর্ব্বো না। স্ত্রীজাতির সহিত একত্র উপবেশন, আলাপন, ও পরিহাস পরিহার করা চিকিৎসকদিগের যে অবশ্য কর্ত্তব্য—এ কথাটি আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। রোগীর রোগ আরোগ্যের চিন্তাই আমাদের ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত হ'বে। আমাদের মনে রাখিতে হ'বে—

মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ।
অর্থৈতানভি শঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাস মেতিচ॥
বিসৃজত্যাত্মনাত্মানং নচৈনং পরিশঙ্কতে।
তস্মাৎ পুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্॥

অর্থাৎ রোগী—পিতা, মাতা, পুত্র ও বন্ধু সকলকেই শঙ্কা করে, কেবল চিকিৎসককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে থাকে এবং নিঃসন্দেহে ও নির্ভয়ে তা'র নিকট আত্ম বিসর্জ্জন করে, অতএব রোগীকে পুত্রবৎ বিবেচনা ক'রে তা'র রোগ প্রতীকারার্থ সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল থাকা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

জতুকর্ণ।—মহাভাগ! সেদিন যে আপনি বল্‌ছিলেন, কালে—এই পৃথিবীতে দুইরকম চিকিৎসক আবির্ভূত হ'বেন,—সে কথাটার সেদিন সমাপ্তি হয় নি, আজ সেই কথাটা দয়া ক'রে ব'ল্‌লে আমরা সকলেই শুনে উহার অর্থ উপলব্ধি ক'রতে পারি।

আত্রেয়।—হাঁ বৎস! সেই কথাটাই আজ ব'লবো। কালক্রমে এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার চিকিৎসকের আবির্ভাব হ'বে,—এক প্রকার প্রাণাভিসর ও রোগনাশক, অপর রোগাভিসর ও প্রাণনাশক। প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসকগণ প্রশস্তকুল জাত, মার্জ্জিত শাস্ত্র, জ্ঞান সম্পন্ন, কৃতকর্ম্মা, কার্য্য দক্ষ, শুচি, জিতহস্ত, জিতাত্মা সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিবেত্তা হ'য়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বেন। সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগ সমস্তের উৎপত্তি, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, যাতনা ও উপশম জ্ঞানে সন্দেহ শূন্য থাকবেন। সকল প্রকার দ্রব্য বিজ্ঞান অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে সেই সকলের ক্রিয়া সম্পন্নের নিয়ম সকল অবগত হ'বেন। এর বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বৈদ্যগণ রোগাভিসরও প্রাণনাশক। এরা বৈদ্য বেশ ধারণ ক'রে অতিশয় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ক'রে জনপদ সমূহে বিচরণ ক'রবে। কাহারো পীড়া শুন্‌লে মাংসলোভী গৃধ্রের ন্যায় যে কোন উপায় অবলম্বন ক'রে তাকে আত্ম চিকিৎসার মধ্যে আন্‌বার চেষ্টা কর্ব্বে। রোগীকে শুনাইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে আপনার বৈদ্যগুণ কীর্ত্তন কর্ব্বে। যদি অপর কোন চিকিৎসক সেই রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকেন, তা, হ'লে মুহুর্মুহু তাঁর দোষ কীর্ত্তন ক'রবে। আতুরের মিত্রগণকে নানা উপায়ে আপনার আয়ত্ত ক'রতে চেষ্টা কর্ব্বে। আর এইরূপ প্রকাশ কর্ব্বে যেন ঐ রোগীকে চিকিৎসা করতে তা'র আদৌ আগ্রহ নাই, কেবল অনুরুদ্ধ হ'য়েই তা'র চিকিৎসায় উদ্যত হচ্ছে। রোগী কিন্তু হস্তগত হওয়ার পর ক্রিয়া প্রয়োগ ক'রে মুহুর্মুহু ক্রিয়ার ফলের প্রতিই লক্ষ্য ক'রতে থাক্‌বে। রোগীকে সুস্থ ক'রতে না পারলে আপনার দোষ ঢাকবার জন্য তা'কে উপকরণ বিহীন, অত্যাচারী ও সত্ত্ব শূন্য ব'লে নির্দ্দেশ কর্ব্বে। রোগীকে গতাসু হ'তে দেখলে বিপদের সম্ভাবনায় কোন একটি ছল ক'রে অন্য দেশে পলায়ন কর্ব্বে। এরা সাধারণ লোকদের কাছে অকুশলের ন্যায় আপনার,

কৌশল ও অধীরের ন্যায় আপনার ধৈর্য্য প্রকটন ক'রবে, কিন্তু বিদ্বৎ সমাজ দর্শনে যেরূপ পথিকগণ ভীষণ কান্তার পরিত্যাগ করে এরাও তদ্রূপ আচরণ ক'র্ব্বে। কে এদের আচার্য্য, কে এদের শিষ্য, কে এদের সহাধ্যায়ী, কেই বা বৈবাদিক—কিছুই জানবার উপায় থাকে না। যেরূপ ব্যাধ সকল বাগুরা সমভিব্যাহারে বনে প্রবেশ পূর্ব্বক যথার্থ পক্ষিসকল অন্বেষণ করে তদ্রূপ এই ভীষক ছদ্মচারী চিকিৎষকগণ কোনো জনপদে উপস্থিত হ'য়ে আতুর কুলের অন্বেষণ ক'রতে থাকবে। এরা প্রণিধানপূর্ব্বক কখনো কোনো চিকিৎসার বিবরণ শ্রবণ ক'রবেনা, চিকিৎসার অবসর বুঝবে না, ঔষধাদির মাত্রা নির্ণয়ে জ্ঞান লাভ ক'রবেনা। ফল কথা এরা সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ হ'য়ে মৃত্যুর চর স্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকবে।

অগ্নিবেশ।—প্রভো! সেদিন যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের কথা ব'লছিলেন।

আত্রেয়। হাঁ, আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন তো চিকিৎসা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমি যে সকল শিক্ষা দান ক'রেছি, তা' অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ নয়,—অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিবার ক্ষমতাও আমার নাই, কারণ আমি কেবল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের কয়েকটি অঙ্গ—কায় চিকিৎসা মাত্রই শিক্ষা ক'রেছি দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে একথা ব'লে দিয়েছিলেন। বারাণসী ধামে দেব ধন্বন্তরি মহর্ষি দিবোদাস-রূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ তাঁহারই আয়ত্ত। বিশ্বামিত্র পুত্র মহর্ষি সুশ্রুত সেই বিদ্যায় সম্পূর্ণ অধিকারী হ'য়েছেন। আমার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যা'দের ইচ্ছা আছে—প্রবৃত্তি আছে,—শক্তি আছে, সামর্থ আছে, আমি তা'দের মহর্ষি সুশ্রুতের নিকট গিয়ে সেই শিক্ষা আয়ত্ত করতে উপদেশ দিই। আজ স্থির মনে চিন্তা ক'রে আগামী কল্যই সকলে এ বিষয়ের ব্যবস্থা ক'রবে—আমি এর জন্য আদেশ দান ক'রেছি। আমার শিষ্যগণের মধ্যে যা'রা মহর্ষি সুশ্রুতের আয়ত্তবিদ্যা অর্জ্জন ক'রতে সক্ষম হবে—তা'দের দ্বারা এই বিশ্বজগতের মহান্ উপকার সাধিত হ'বে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নেই।

[সুকন্যা ও চ্যবন প্রবেশ করিলেন। আত্রেয় চ্যবনকে অভিবাদন ক'রে সুকন্যাকে বলিলেন]

এস মা, নিখিল বিশ্ব রক্ষার নিমিত্তভূতা ধাত্রী স্বরূপিণী জননী আমার! তোমারই কল্যাণে আজি বিশ্বজগতে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা চ'লছে। তুমিই আমাদের জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়ে দি'ছলে। তোমারই পরামর্শে আমরা ইন্দ্রের নিকট থেকে এ বিদ্যা শিক্ষা লাভ ক'রতে সক্ষম হইছি। তুমি ঋষিপত্নী, কিন্তু আমাদের আশীর্ব্বাদের পাত্রী। তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ ক'রবো,—যতদিন চন্দ্রসূর্য্য জগতে প্রকাশমান হ'বেন, যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে,—যতদিন সনাতন আয়ুর্ব্বেদের নাম জগতের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকবে, ততদিন মা! তোমার এই বিশ্বরক্ষার কীর্ত্তি কাহিনী—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—ত্রিলোকের মাঝে চিরদিনই বিদ্যমান থাকবে। নশ্বর এ মর জগত নশ্বর আমরা;—কালে এ মরজগত, আমা-

দের দেহ, সকলি লয় হ'য়ে যা'বে বটে, কিন্তু মা! তোমার কীর্ত্তি কাহিনী কখনই বিলুপ্ত হ'বে না;—গতানুগতিক ভাবে পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনশীল জগতেও তোমার এই কীর্ত্তি অতি পবিত্রভাবেই ঘোষিত হ'বে। মা! তোমার মত সতী সাধ্বী বিশ্বরক্ষার মূলভূত রমণীরত্ন যুগে যুগে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করুক, তোমার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ ক'রে ভারতের রমণী সমাজ ধন্য মনা হউক,—তোমার শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে, তোমার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ভারতবর্ষের কর্ম্মকুশল পুরুষ সমাজ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে চিত্তনিয়োগ করুক—ইহাই আমি কায়মনোবাক্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, আত্রেয়ের ইহা ভিন্ন অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।

(স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবকুমার দ্বয়ের আবির্ভাব)

গীত।

নমামি আয়ুর্ব্বেদ।
নিখিল বেদের শ্রেষ্ঠ যেটুকু
সেটুকু তোমারি মেদ।
তোমারি রসে সকল তন্ত্র,
তোমারি মজ্জা যতেক মন্ত্র,
শাস্ত্র সকল অস্থি তোমারি—
থাকুক যাতনা ভেদ।
তোমামি মাংস তোমারি রক্ত
আগম নিগমে সুষ্ট ব্যক্ত
তুমি ত্রিলোক বরেণ্য পরম ধন্য,
চিরকল্যাণকর বেদ।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

স্তন্য ও রজঃ।

[কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন]

—:০:—

স্তন্যং—স্তনে সম্ভবং যৎ,—স্তনরস বা স্তন জাত দুগ্ধ। আহার রস হইতে স্ত্রীলোকের স্তন্য তদ্দিরসে উৎপন্ন হয়।

"রসপ্রসাদমধুরঃ পক্কাহার নিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নদেহাৎ স্তনৌপ্রাপ্য স্তন্যমিত্য ভিধিয়তে॥"

পক্কাহার হইতে উৎপন্ন রসের তেজোময় বা উৎকৃষ্ট মধুর সারাংশ সমস্ত শরীর হইতে স্তনদ্বয়ে উপস্থিত হইলে, স্তন্য নামে অভিহিত হয়। শুক্র যেমন অদৃশ্যভাবে সর্ব্বশরীরে অবস্থান করে, স্তন্যও তদ্রুপ স্ত্রী শরীরে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে। শুক্র ইষ্ট কামিনীর দর্শন, স্মরণ, স্পর্শন ও আলিঙ্গনহেতু হর্ষদ্বারা চ্যুত হয়, এস্থলে সুপ্রসন্ন মনঃই হর্ষণের কারণ। স্তন্যও আহার রসযোনি হেতু সর্ব্বশরীরে ব্যপ্ত

থাকে, সন্তানের দর্শন, স্মরণ, স্পর্শন ও শরীর গ্রহণ এই হেতুচতুষ্টয়ের জন্য শুক্রের ন্যায় প্রবল হয় অপত্যের প্রতি স্নেহই স্তন্য প্রস্রবনের হেতু।

"আহার রসযোনিত্বাদেব স্তন্যমপি স্ত্রিয়াঃ।
তদেবাপত্য সংস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি॥"
গ্রহণাচ্চ শরীরস্য শুক্রবৎ সম্প্রবর্ত্ততে
স্নেহ নিরন্তর স্তন্য প্রস্রবে হেতুরুচ্যতে।

স্ত্রীলোকে পয়োধর যুগল স্তন্যের আশয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ৩টী আশয়ের – গর্ভাশয় ও স্তনযুগল আধিক্যহেতু স্তন্য ও রজঃ এই দুইটি উপধাতু অধিক।

মাতা যাহা আহার করেন সন্তান পরোক্ষ-ভাবে তাহারই সারাংশ স্তন্যরূপে পান করে। মাতার আহারের ইষ্টানিষ্ট ফল সন্তান ভোগ করে। মাতার আহারের ব্যতিক্রম হইলে সন্তান পীড়িত হয় ইহা প্রত্যক্ষ। সন্তান পীড়িত হইলে মাতারও দ্রব্য বিচার করিয়া খাইতে হয়, অনেক সময় সন্তানের পীড়ার জন্য মাতাকে উপশম করিতে হয় এবং স্তন্যপায়ী শিশুর আরোগ্যের জন্য মাতাকে ঔষধাদি ও খাইতে হয়।

মিথ্যাহার বিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়াঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন শারীরা ব্যধয়ঃ শিশোঃ।

মিথ্যা আহার বিহারিণী স্ত্রীর বাতাদি দোষ সকল দূষিত হইয়া স্তন্যকে দূষিত করে। তাহাতে শিশুর ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য যে স্ত্রীলোক বিদগ্ধ অন্ন বা বিরুদ্ধ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে তাহার স্তন্যপান করাইবে না। অপিচ, ক্ষুধিতা, শোকার্ত্তা, শ্রান্তা, প্রদুষ্টধাতু, গর্ভিণী, জ্বরিতা, অতিক্ষীণা বা অতি স্থূলা স্ত্রীর স্তন্যপান করাইবে না।

স্তন্য মধুর ও জীবন ইহা রসের ন্যায় সৌম্য গুনবিশিষ্ট। যে স্তন্য শীতল অমল, তনু, শঙ্খের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট জলে নিক্ষেপ করিলে ভিন্ন না হইয়া একইভাব প্রাপ্ত হয়, ফেনিল বা তন্তুযুক্ত না হয় এবং না ভাসে ও না মগ্ন হয় তাহাই বিশুদ্ধ স্তন্য, তদ্দ্বারাই শিশুর আরোগ্য, বল বর্ণ ও শরীরোপচয় হইয়া থাকে।

ক্রোধ, শোক ও অবাৎসল্যবশতঃ স্ত্রীদিগের স্তন্য নাশ হয়। স্তন্য উৎপাদন করার জন্য স্ত্রীদিগের সৌমনা উৎপাদন করিয়া – যব, গম, শালি ও ষষ্ঠিকধান্যের অন্ন মাংসরস, সুরা, মাংসের অঙ্গরস, মৌরীরস, তিলবাটা, রসুন, মৎস্য, কেশুর, পানিফল, শতমূলী, কলমীশাক, পদ্মের ডাটা, লাউ, মুথা, কিসমিস ও দুগ্ধ প্রভৃতি খাওয়ান উচিত।

গর্ভিনী স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ হৃদিস্থ স্তন্য বহা স্রোত সমূহ রুদ্ধ থাকায় স্তন-দুগ্ধের অভাব বা অল্পতা হয়।

প্রসবের ৩।৪ দিন পরে হৃদিস্থ স্তন্যবাহী ধমনী সমূহের পথ উন্মুক্ত হয়—তজ্জন্য তৎকালে স্তন্য প্রস্রবন উপস্থিত হয়।

ধমনীনাং হৃদিস্থানাং বিবৃতত্বাদনন্তরং।
চতুঃরাত্রাৎ ত্রিরাত্রাদ্বা স্ত্রীনাং স্তন্যং প্রবর্ত্ততে।

স্ত্রীলোক গর্ভিণী না হইলে তাহাদের স্তন্যে দুগ্ধের সঞ্চার হয় না। গর্ভাবস্থায় মাতা যাহা আহার করেন, তাহা তিনভাগ হয়। এক ভাগে গর্ভিনীর শরীর পুষ্ট হয় এক ভাগ স্তন্য পোষণ করে; গর্ভস্থ ভ্রূণের যতদিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ না হয় ততদিন গর্ভের নাভি নাড়ী মাতার রসবহা নাড়ীতে সম্বদ্ধ থাকে—সেই গর্ভনাড়ী মাতার অবশিষ্ট একভাগ আহার রসবীর্য্য গর্ভশরীরে বহন করে তদ্দ্বারা গর্ভ বর্দ্ধিত হয়। অঙ্গ

ঋত্যস্ত সম্পূর্ণ হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়—বিধাতার অচিন্ত্য কৌশলে মাতার হৃদিস্থ ধমনী সকল প্রস্ফুটিত হয়; মাতার আহার রস স্তন্যরূপে গ্রথিত হইয়া শিশুর জীবন রক্ষা করে।

রজঃ ও রক্ত উভয়ে রস হইতে উৎপন্ন হয়। আহার-রস সৌম্য হইলেও আর্ত্তবে ও রক্তে অগ্নি-গুণাধিক এবং উভয়ের বর্ণ প্রায় একরূপ, ইহা বলিয়াই রজো রক্তের অন্তর্গত বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে বর্ণনা দেখা যায় না। "এবং মাসেন রসঃ শুক্রী ভবতি, স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি।" রস একমাসে শুক্ররূপে পরিণত হয় এবং স্ত্রীদিগের আর্ত্তবরূপে প্রকাশ হয়। আহার-রস হইতে আর্ত্তব রক্তের ন্যায় সপ্তাহ মধ্যে (৫ দিন ১৷৷০ দণ্ড) উৎপন্ন হয়। রক্ত মাংস প্রভৃতিকে পোষণ করিয়া এক মাসে শুক্ররূপে পরিণত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের আর্ত্তবমাংসাদি ধাতু পোষণ করে না;—মাসাবধি সঞ্চিত হয়, তৎপরে স্বভাবতঃ উপচিত পুরাতন আর্ত্তব তিন দিন স্রাব হইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হয়। তৎপরে স্রাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ঘৃত যেমন অগ্নি সংযোগে গলিয়া যায়, সেইরূপ নারীর আর্ত্তবও পুরুষ-সমাগমে গলিয়া বিসর্পিত হয় এবং শুক্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভোৎপাদন করে। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ষোড়শ রাত্রি। চতুর্থ দিবসাবধি ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুমতী স্ত্রীলোকের গর্ভাধানেরই প্রশস্তকাল। তৎপূর্ব্বে বা পরে নিন্দনীয় কাল। ঋতুকাল অতীত হইলে স্ত্রীলোকের যোনি স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হয়, তজ্জন্য বীজ গ্রহণে অসমর্থ হয়। এবং পথরুদ্ধ হওয়ায় রজঃ স্রাব হয় না—সঞ্চয় হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের ঋতু হয়, কিন্তু স্রাব দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে তাহাদের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ হয়; যথা:—

"পীন প্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখদ্বিজাং
নরকামা প্রিয়কথা স্রস্তকুক্ষ্যক্ষিমূর্দ্ধজাং
স্ফুরদ্ভুজ কুচশ্রোণি নাভ্যূরুজঘনস্ফিচং
হর্ষোৎসকপবাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি॥"

ঋতুমতী স্ত্রীলোকের বদন প্রসন্ন ও পীন (সম্পন্ন) হয়। তাহাদের দেহ, মুখ ও দন্ত মাংস বিশেষরূপে ক্লিন্ন (আর্দ্র) হয়। সে নরকামা হয় এবং তাহার কথা সকল প্রিয় হয়। তাহার কুক্ষি, চক্ষু ও কেশ অধঃনমিত হয়। উহাদের বাহু, স্তন, শ্রোণি, নাভি, উরু, জঘন ও স্ফিচে ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং রতি ক্রিয়াতে অতিশয় অভিলাষ জন্মে। স্ত্রীলোকের আর্ত্তব নিয়মিত স্রাব না হইলে, নানা প্রকার রোগ হয়। রক্ত মাংস শুক্রাদি ধাতু, যেমন দোষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দুষ্টিত হয়, স্ত্রীলোকের আর্ত্তবও তদ্রূপ দূষিত হয় এবং স্বতন্ত্র ব্যাধি সকল উৎপন্ন করে।

"আর্ত্তবমপি বিভিদোষৈঃ শোণিত চতুর্থৈ
পৃথক্দ্বন্দ্বৈঃ সমস্তৈরূপসৃষ্টং অবীজং ভবতি।"

শুক্রের ন্যায় আর্ত্তবও বায়ু পিত্ত কফ, শোণিত, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্ত ও শ্লেষ্ম-সান্নিপাত—এই আট প্রকারে দূষিত হয়। শুক্র এই আট প্রকারে দূষিত হইয়া সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হয়। আর্ত্তব এই আট প্রকারে অবীজ হয়।

শোণিত চতুর্থৈঃ—এই আট প্রকারের মধ্যে শোণিতকেও আর্ত্তব-দুষ্টির অন্যতম হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর্ত্তব দূষিত হইলে শোণিতজ রোগ সমস্ত উৎপন্ন হয় না। অস্-

কদরকে শাস্ত্রে রক্তজ ব্যাধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ উক্ত ব্যাধি রক্তপিত্তের অন্তর্গত এবং উহার চিকিৎসাও রক্তপিত্তের ক্রম অনুসারে উক্ত হইয়াছে।

রক্ত জীবিতের শরীরে দেখা যায়, মৃতের শরীরে দেখা যায় না, এইজন্য শোণিতকে জীবরক্ত কহে। ইহার ক্রিয়া, বর্ণপ্রসাদন, মাংসপোষণ ও জীবন এবং ইহার আশয় ভিন্ন ও শরীরে সঞ্চারের পথ সকলও স্বতন্ত্র। আর্ত্তবে জীবের বীজ অবস্থান করে, কিন্তু ইহা জীবতুল্য রক্ত নহে। ইহার অভাবে জীবন ধারণে কোন ব্যাঘাত হয় না। ইহার আশয় ভিন্ন অবং সঞ্চারের পথও ভিন্ন। আর্ত্তবের ক্রিয়া—স্ত্রীলোককে ঋতুমতী করা, গর্ভোৎপাদন এবং স্তনপোষণ। সুশ্রুতের টীকায় ডল্বনাচার্য্য রজঃ ও স্তন্যকে রস হইতে উৎপন্ন উপধাতুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"তথা এভ্যঃ (ধাতুভ্য) এবোপধাতবঃ স্বভাবাদুৎপদ্যন্তে, ন পুনঃ অস্থ্যাদিভ্যঃ তথাহি রসাৎ স্তন্যং আর্ত্তবঞ্চ রক্তাৎ কণ্ডরা, মাংসাৎ বসা ত্বচঃ, মেদসঃ স্নায়ুসন্ধীতি।"

অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ব্যতীত অন্যান্য ধাতু হইতে স্বভাবতঃ উপধাতু সকল উৎপন্ন হয়। যথা রস হইতে স্তনদুগ্ধ ও আর্ত্তব, রক্ত হইতে কণ্ডরা, মাংস হইতে ত্বক ও বসা এবং মেদ হইতে স্নায়ু ও সন্ধি উৎপন্ন হয়। গৃহীতগর্ভা স্ত্রীদিগের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না—কারণ আর্ত্তববহা স্রোত সমূহের পথ গর্ভ কর্ত্তৃক রুদ্ধ থাকে। 'আর্ত্তব অধোদিগে এইরূপ প্রতিহত হওয়াতে উর্দ্ধগত হইয়া সঞ্চিত হয় ইহাকে অপরা বা ফুল বলে। অতিরিক্ত আর্ত্তব আরো উর্দ্ধগত হয় এবং স্তনযুগল প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য গর্ভিণীরা পীনোন্নতা পয়োধরা হইয়া থাকে।

কায়চিকিৎসা-ক্রমোপদেশ বা

Practice of medicine.

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাসাধিকার।

কাস পাঁচ প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ (অর্থাৎ উরঃক্ষত) এবং ক্ষয়জ। ইহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর অর্থাৎ একটির পর আর একটি যথাক্রমে বলবান জানিবে। যেরূপ কাসরোগই উৎপন্ন হউক, তাহা উপেক্ষা করিয়া অচিকিৎস্য থাকা কর্ত্তব্য নহে, কারণ অচিকিৎসার পরিণামে কাসরোগ—যক্ষ্মারোগে পরিণত হইতে পারে।

বাতজ কাসের চিকিৎসা—

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ।৶১০ আনা। জল ।৸০ শেষ৵০ পোয়া - এই কাথে এক আনা পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবে। দুই এক দিন এই কাথ সেবন করাইয়া তাহাতে রোগের প্রশমন না হইলে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, বামনহাটি, মুথা, দুরালভা, ও পুরাতন গুড়—এই কয়েকটী দ্রব্য সমান ভাগে মিশাইয়া এক বা দুই আনা মাত্রায় প্রাতে একবার ও বৈকালে একবার সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে অথবা শুঁঠ, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শঠী ও চিনি—এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঐরূপ প্রাতে দুই আনা ও ও বৈকালে দুই আনা মাত্রায় কিম্বা বামনহাটি, দ্রাক্ষা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, শুঁঠ ও পুরাতন গুড়—এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। এই যোগ কয়টির সকলগুলিই কিঞ্চিৎ তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিও।

বাস্তব শাক, কাকমাচীশাক, শূল্যক, সুষুনিশাক, তৈলাদি স্নেহ, ইক্ষুরস ও গৌড়িকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, দধি, আরনাল, অম্লফল, প্রসন্না এবং মধুর, অম্ল ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য মাত্রেই বাতজ কাসে উপকারী।

পিত্তজ কাসের সাধারণ চিকিৎসা—

বৃহতী, কণ্টকারী, কিসমিস, বাসক, কর্পূর, বালা, শুঁঠ ও পিঁপুল মিলিত দুই তোলা, জল ।৸০ সের, শেষ ৵০ পোয়া—এই কাথ চিনি ও মধুর সহিত সেবনে পিত্তজ কাস প্রশমিত হয়। কিম্বা বৃহতী, বালা, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা—ইহাদিগের কাথ মধু ও চিনির সহিত সেবন করাইবে।

এই কাসে কফের তরলতা লক্ষিত হইলে ইক্ষুচিনির সহিত তেউড়ীচূর্ণ এবং কফের ঘনতা দৃষ্ট হইলে তিক্ত দ্রব্যের সহিত তেউড়ী চূর্ণ প্রয়োগে বিরেচনের ব্যবস্থা করা উচিত।

পিণ্ডখেজুর, কিসমিস এবং ইক্ষুচিনি - পিত্তজ কাসে বিশেষ হিতকর। এইসকল দ্রব্য পথ্যস্বরূপ ব্যবস্থা করিবে। এই সকল দ্রব্য সহ কয়েকটি যোগ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা আছে। নিম্নে সে গুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

কিসমিস, আমলকী, পিণ্ডখেজুর পিঁপুল ও মরিচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া রোগীর বলাবল ও বয়স অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে পিত্তজ কাস প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মজ কাসের সাধারণ চিকিৎসা—

পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মা সমুদ্ভবে।
পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তং দশমূলী জলং পিবেৎ।

অর্থাৎ দশমূলের কাথ—পিঁপুলচূর্ণ সহ পান করিলে পার্শ্ববেদনা, জ্বর, শ্বাস ও শ্লেষ্ম জন্য কাসরোগ প্রশমিত হয়।

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্।
পায়য়েচ্ছাস কাসঘ্নং প্রতিশ্যায় কফাপহম্।

অর্থাৎ—আদার রস, মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতং ক্ষীরং কফঘ্নং তব শস্যতে
শ্বাস কাস জ্বর হরং বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনম্।

পঞ্চকোল অর্থাৎ পিঁপুল, পিঁপুলমূল,

চই, চিতামূল ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ জল ⁄॥০ দুগ্ধ ৵০ পোয়া, শেষ ৵০ পোয়া —এই কাথ পানে কফজ কাস উপশমিত হয়।

ক্ষতজ কাস বা উরঃক্ষতের চিকিৎসা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ক্ষয়কাসে পুষ্টিকর এবং যাহাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অর্জ্জুন ঘটিত ঔষধ এইরূপ অবস্থায় উপকারক। অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালচূর্ণ—বাসকের রস দ্বারা শতবার ভাবনা দিয়া মধু, ঘৃত ও মিছরি সহ লেহন করিলে ক্ষয়কাস ও রক্তোদগীরণ নিবৃত্ত হয়।

কাসের সাধারণ চিকিৎসা—

কণ্টকারী কৃত কাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা।

কণ্টকারী কাথে পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ কাস নষ্ট হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎ পরিবেষ্টিতম্॥
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্য বিধারিতম্॥

বহেড়ার ফলে ঘৃত মাখাইয়া গোময় দ্বারা বেষ্টন করিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে সিদ্ধ করতঃ বীজ ফেলিয়া মুখে ধারণ করিলে কাস রোগ প্রশমিত হয়।

বাসকস্য রসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা।
পিত্তশ্লেষ্ম কৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ।

বাসক পত্রের রস ২ তোলা,—মধুসহ পানে পিত্ত শ্লেষ্মজ কাস ও রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

কাস রোগের প্রথম অবস্থায় যদি ঘনীভূত কাস উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে সেই রোগীকে তালীশাদি চূর্ণ, সমশর্কর চূর্ণ বা যক্ষ্মারোগ অধিকারে যে "সিতোপলাদি লেহে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোন একটির ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধগুলির যে কোনোটি উপযুক্ত মাত্রায় সমস্ত দিনে ২।৩ বার অবলেহ করিবার ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঔষধ গুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

তালিশাদি চূর্ণম্।

তালীশ পত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধ ভাগিকে।
পিপ্পল্যষ্ট গুণা চাত্র প্রদেয়া সিত শর্করা॥

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিঁপুল ৪ তোলা বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ॥০ তোলা ও ছোট এলাইচ ॥০ তোলা। চিনি ৩২ তোলা। এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে

তালীশপত্র—

তালীশং লঘুতীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাস কাস কফানিলান্।
নিহন্ত্যরুচি গুল্মাম-বহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্॥

ইহা লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণ, ও উষ্ণবীর্য্য। শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয় রোগনাশক।

মরিচ শ্বাসনাশক। শুঁঠ—শ্বাস ও কাসঘ্ন। পিঁপুল বাতশ্লেষ্মঘ্ন। বংশলোচন—কাস, শ্বাস, ও জ্বরঘ্ন। দারুচিনি—কাস্নাশক। ছোটএলাইচ—শ্লেষ্মঘ্ন। চিনি—রক্তপিত্তনাশক ও শ্লেষ্মঘ্ন।

সমশর্কর চূর্ণম্।

লবঙ্গ জাতীফল পিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষ সমানমীষাম্। পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দত্ত্বাৎ পলানি চত্বারি মহৌষধস্য। সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রমহ্য রোগানি শ্বানাশু বলাদ্বিহন্যাৎ। কাস জ্বরারোচক মেহ গুল্ম শ্বাসাগ্নিমান্দ্য গ্রহণী প্রদোষান্।

লবঙ্গ ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৩২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের সম পরিমাণ চিনি মাত্রা এক আনা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—

লবঙ্গ—

দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্র নাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ লবঙ্গ—কটু তিক্ত রস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক ও রুচিকারক। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগ আশু বিনাশ করিয়া থাকে।

জাতীফল—

কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্।
নিহন্তি মুখবৈরস্যং মল দৌর্গন্ধ্যং কৃষ্ণতাঃ॥
ক্রিমি কাস বমি শ্বাস শোষ পীনসহৃদ্রুজঃ॥

জায়ফল—তিক্ত, কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য রুচিকারক, লঘু, অগ্নিদীপক, মলসংগ্রাহক ও স্বরপ্রসাদক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মানাশক। মরিচ শ্লেষ্মঘ্ন। শুঁঠ—বাতশ্লেষ্মনাশক। চিনি—কফনাশক।

কাস রোগের প্রথমাবস্থায় ঘনীভূত কাসে এই সকল ঔষধ দিয়া ফল না পাইলে ব্যাঘ্রী-হরীতকী বা বাসাবলেহ একবার করিয়া প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

ব্যাঘ্রী হরীতকী।

সমূল পুষ্পচ্ছদ কণ্টকার্য্যাস্তুলাং জল দ্রোণপরিপ্লুতাং।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ্ বিপচ্য সম্যক চরণাবশেষম্
গুড়স্য দত্বা শতমেবমগ্নৌ বিপক্বমুত্তীর্য্য ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকস্য দ্বিপল প্রমাণং পলানি ষট্ পুষ্প রসস্য তত্র।
ক্ষিপেচ্চতুর্জাত পলং যথাগ্নি প্রযুজ্যমানো

বিধিনাবলেহঃ।

মূল পুষ্প ও পত্র সহিত কণ্টকারী ১২॥০ সাড়ে বার সের এবং বস্ত্রখণ্ডে পুট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টা। এই উভয় দ্রব্য ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়ে বার সের গুলিয়া তাহাতে বীজরহিত হরীতকীগুলি একত্র করিয়া পাক করিবে। এবং পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, ও নাগেশ্বর—প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু মিশাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ।০ হইতে ॥০ তোলা, অনুপান গরম জল।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—

কণ্টকারী—

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান॥
নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্॥

কণ্টকারী—সারক, তিক্ত কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নিবারক।

হরীতকী—

হরীতকী পঞ্চরসাঽলবণা তুবরা পরম্।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী॥
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমনী।
শ্বাস কাস প্রমেহার্শঃ কুষ্ঠ শোথোদর ক্রিমীন্॥
বৈস্বর্য্য গ্রহণী রোগ বিবন্ধ বিষম জ্বরান্।
গুল্মাধ্মান তৃষাচ্ছর্দ্দি—হিক্কা কণ্ডূ হৃদাময়ান্।

কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥

হরীতকী—পঞ্চরস বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কফঘ্ন রসযুক্ত, ইহাতে লবণ নাই। এই পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে ইহাতে কষায় রসেরই আধিক্য থাকে। হরীতকী—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর বিপাক (পাকে মধুর রস) রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ, অনুলোমক অর্থাৎ মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক।

পুরাতন গুড়—

গুড়োজীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নি পুষ্টিকৃৎ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক প্রসাদনঃ॥

পুরাতন গুড়—লঘু,হিতকর, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্তের প্রসন্নতা-কারক।

শুঁঠ—শ্লেষ্মঘ্ন। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। মরিচ—কাস নাশক। দারুচিনি—শ্লেষ্মঘ্ন। তেজপত্র—কাস ও শ্বাসনাশক। ছোটএলাইচ—কাসনাশক।

নাগেশ্বর—

নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বাম পাচনম্।
জ্বর কণ্ডূ তৃষা স্বেদ ছর্দ্দি হৃল্লাস নাশনম্॥
দৌর্গন্ধ্য কুষ্ঠ বীসর্প কফপিত্ত বিষাপহম্॥

নাগেশ্বর—কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু ও আমপাচক। ইহা জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক।

মধু—

মধু শীতং লঘু, স্বাদু, রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধন রোপনম্।
সৌকুমার্য্য করং সূক্ষ্মং পরং স্রোতো বিশোধনম্।
কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদ জনকং পরম্॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শঃ কাস পিত্তাস্র কফ মেহ ক্লমক্রিমীন্
মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাস হিক্কাতীসার বিড়গ্রহান্।
দাহ ক্ষত ক্ষয়াংস্তত্তু যোগবাহ্যল্প বাতলম্।

মধু—শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎ কষায় সংযুক্ত, মধুর রস, রুক্ষ, ধারক ও কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দীপক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণরোপক ও ব্রণ শোধক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, সূক্ষ্ম স্রোতোগামী. স্রোতঃ সমূহের বিশোধক, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণ প্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক।

বাসাবলেহঃ।

বাসক স্বরস প্রস্থে শাণিকা সিতশর্করা॥
পিপ্পলী দ্বিপলং দত্বা সর্পিষ্চ পচেচ্ছনৈঃ।
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্র পলাষ্টকম্।
দত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥

বাসকপত্রের রস চারি সের। চিনি ৴১ এক সের। ঘৃত ১৬ ষোল তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া পাত্রস্থ পদার্থ লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে পিঁপুল চুর্ণ ১৬ ষোল তোলা মিশাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু একসের মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে মাত্রা।০ হইতে॥০ তোলা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে

বাসকপত্র—

বাসকো বাতকৃৎস্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্র নাশনঃ।
তিক্ত স্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়ৰ্ত্তিনুৎ।
শ্বাসকাস জ্বর ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠক্ষয়াপহঃ।

বাসক—বায়ুজনক, স্বরবর্দ্ধক, তিক্তকষায় রস, হৃদয়গ্রাহী. লঘু ও শীতবীর্য্য। ইহা কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা রোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

চিনি—

সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি জ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥

চিনি—অতিশয় মধুর রস রুচ্য, শীতবীর্য্য শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বরনাশক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক। মধু—আগ্নেয়।

তরল কাসে আমাদের ঘরের "স্বল্প লক্ষ্মী-বিলাস" নামক একটি ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। এই ঔষধটি জলকাসিতে, সর্দ্দিকাসিতে এবং শ্লেষ্মজ জ্বরে আমরা সাধারণতঃ গরম জল অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকি। এই ঔষধের উপাদান—

- সোহাগার খই ১ তোলা।
অমৃত ॥০ তোলা।
মরিচ ৩ তোলা।
জলদ্বারা মর্দ্দন। ২।৩ রতি বটি।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে সোহাগার খই কফঘ্ন। অমৃত—ত্রিদোষনাশক। মরিচ—শ্লেষ্মঘ্ন।

চন্দ্রামৃত বটি নামক ঔষধটি সকল প্রকার কাসেই বিশেষ উপকারী। এই ঔষধের উপাদান—

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্য জীরক সৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ গোলয়েৎ॥
রসগন্ধক লৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্।
টঙ্কনস্য পলং দত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্॥
নব গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, ধনে, জীরা ও সৈন্ধব লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা। পারদ, গন্ধক ও লৌহ—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা এবং সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া ৯ রতি বটী। এখনকার দিনে কিন্তু ৯ রতি বটি সাধারণতঃ কাহারও সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, এজন্য ৪।৫ রতি বটিকা করা উচিত।

শাস্ত্রকার এই ঔষধ রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলত্থকলায় অথবা আদার রস কিম্বা পিঁপুল চূর্ণ ও মধু অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা—

একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপল রসপ্লুতাম্।
নীলোৎপল রসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা।
পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবের রসেন বা।

শাস্ত্রকার অনুপানের এরূপ ব্যবস্থা দান করিলেও যদি কোনরূপ অনুপানের অভাব হয়, তাহা হইলে দুইবেলা চুষিয়া এই ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দিবে এবং তাহাতেই যথেষ্ট উপকার পাইবে।

শাস্ত্রকার এই ঔষধ সেবনের পর নিম্নলিখিত পাচনটী সেবনের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন—

• বাসা গুড়ূচী ভার্গি চ মুস্তকং কণ্টকারিকা।
সেবনান্তে প্রকর্ত্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥

বাসক ছাল, গুলঞ্চ, বামনহাটি মুথা ও কণ্টকারী। প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ ওজন। জল ৵॥০ সের শেষ ৵০ পোয়া।

শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উল্লিখিত

পাচনটী সেবনে ঔষধের বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে শুঁঠ, কফনাশক, পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। মরিচ শ্লেষ্মঘ্ন। হরিতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—ত্রিদোষনাশক। বহেড়া—কফঘ্ন। চই—শ্লেষ্মঘ্ন। ধনে—আগ্নেয়। জীরা—আগ্নেয়। সৈন্ধব লবণ—ত্রিদোষঘ্ন। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। লৌহ—রসায়ন। সোহাগা—শ্লেষ্মঘ্ন। মরিচ—শ্লেষ্মঘ্ন।

ছাগী দুগ্ধ।

ছাগং কষায় মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাস জ্বরাপহম্।
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটু তিক্তাদি সেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্ব রোগাপহং বিদুঃ।

ছাগ দুগ্ধ—কষায়, মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাস ও জ্বরনাশক। ছাগের অল্পকায়ত্ব হেতু এবং তাহারা কটু তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অল্পজল পান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

এই চন্দ্রামৃতবটি সেবনের পর শাস্ত্রকার বাসকাদি পাচনটি সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের একটা বক্তব্য আছে। যে কাসে শোষকক্রিয়ার প্রয়োজন, সে স্থলে বাসকাদি পাচনে বিশেষ ফল হইবে না। কারণ বাসকাদি পাচনের যে কয়টি উপাদান, তাহার মধ্যে বাসক ছাল—শোষক নহে, বাসকপত্র শোষক।

বাসক—

বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্র নাশনঃ।
তিক্ত স্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়ার্ত্তিনুৎ।
শ্বাসকাস জ্বর চ্ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠ ক্ষয়াপহঃ

বাসক—বায়ুজনক, স্বরবর্দ্ধক, তিক্ত, কষায় রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও শীতবীর্য্য। ইহা কফ, রক্তপিত্ত তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগনাশক।

গুলঞ্চ—

গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদু পাকা রসায়নী।
দোষত্রয়াম তৃড় দাহ মেহ কাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্।
কামলা কুষ্ঠ বাতাস্র জ্বর ক্রিমি বমীন্ হরেৎ।
প্রমেহ শ্বাস কাসার্শঃ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ বাতনুৎ।

গুলঞ্চ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুর বিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক, ও অগ্নিদীপক। ইহা ত্রিদোষ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদ্রোগনাশক।

বামনহাটী—

ভার্গীরুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।
দীপনী তুবরা গুল্ম-রক্তনুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
শোথ কাস কফশ্বাস পীনস জ্বর মারুতান্।

বামনহাটী—রুক্ষ, কটু, তিক্ত, কষায় রস, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু ও অগ্নিদীপ্তিকর। ইহা রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ুনাশক।

মুথা—

মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপন পাচনম্।
কষায়ং কফপিত্তাস্র তৃড় জ্বরারুচি জন্তুনুৎ।

মুথা—কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য, ধারক, অগ্নির দীপক ও পাচক। কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি রোগ—ইহা সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে।

কণ্টকারী—

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বরানিলান্।
নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়া ক্রিমি হৃদামযান্।

কণ্টকারী—সারক, তিক্ত-কটু-রস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নিবারক।

কাজেই প্রমাণিত হইতেছে যে; এই পচনটীর মধ্যে শুধু যে বাসকছালই শোষক নহে, তাহা নহে, গুলঞ্চ, বামনহাটী ও কণ্টকারী- এ তিনটিও শোষক নহে, কেবল মাত্র মুথার শোষণ-ক্রিয়ার ক্ষমতা আছে। গুলঞ্চ, তিক্ত রসের জন্য, বামনহাটি তিক্ত ও কটু রসের জন্য এবং কণ্টকারীও তিক্ত ও কটু রসের জন্য কফনাশক, কিন্তু তিক্ত, কটু ও কষায় রস যেমন কফনাশক, সেইরূপ বায়ু-বর্দ্ধক, কাজেই বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য কখনো শোষক গুণ সম্পন্ন হইতে পারে না। মুতা কটু-তিক্ত-কষায় রস বলিয়া কফনাশক হইলেও শীতবীর্য্য। এজন্য—

যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষ্বৈ।
স্নেহগৌরব শৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং তদা॥

অর্থাৎ কফনাশক রসে যদি স্নিগ্ধতা, গুরুত্তা ও শীতলতা গুণ থাকে, তবে ঐ রস শ্লেষ্মা নষ্ট করিতে অক্ষম হয়।

যাহা হউক যেখানে কাস রোগে শোষক-ক্রিয়ার আবশ্যক, সেখানে উল্লিখিত পাচনটির ব্যবস্থা নাই করা হইল। সেখানে ব্যবস্থা কর—"পঞ্চকোল কষায়"। ইহার উপাদান গুলি—

পিপ্পলী পিপ্পলী মূল চব্য চিত্রক নাগরৈঃ।

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ। প্রত্যেক দ্রব্যের ওজন ।৴১০। জল ৴॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। এই দ্রব্যগুলির গুণ,—পিঁপুল—মধুরবিপাক, কটু। মধুর রসের জন্য ইহা বায়ু নাশক। কটু রসের জন্য শ্লেষ্মা নাশক।

পিঁপুলমূল—

দীপনং পিপ্পলী মূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু।
রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।
আনাহ প্লীহ গুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাস ক্ষয়াপহম্॥

পিঁপুলমূল—অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক। কফ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয়নাশক।

চই—

কণামূল গুণং চব্যং বিশেষাদ্ গুদজাপহম্।

ইহার গুণ—পিঁপুল মূলের মত, অধিকন্তু ইহা গুহ্যদেশজাত রোগ বিনাশক।

চিতা—

চিত্রকঃ কটুক পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণো গ্রহণী কুষ্ঠ শোথার্শঃ ক্রিমিকাসনুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরোগ্রাহী বাতার্শঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ॥

ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও মল সংগ্রাহক। গ্রহণী রোগ, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ, শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রশমক।

শুঁঠ—কাস ও শ্বাস নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

পঞ্চকোল কষায়ের দ্রব্যগুলির সংমিশ্রণে নিম্নলিখিত গুণ হইয়া থাকে—

পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্।
তীক্ষোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ॥
গুল্ম প্লীহোদরানাহ শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্।

ইহা রসে ও পাকে কটু, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, অত্যন্ত পাচক, অগ্নিদীপ্তি-

কারক ও কফ-বায়ুনাশক। গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ ও শূলপ্রশমক ও পিত্ত প্রকোপক।

কাসের শোষণকার্য্যের জন্য "শৃঙ্গারাভ্র" নামক ঔষধটি বিলক্ষণ ফলপ্রদ। ইহার উপাদান—

শুদ্ধংকৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং
যদন্যৎ কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা
তেজপত্রং লবঙ্গম্। মাংসীতালীশচোচে
গজকুসুম গদং ধাতকী চেতিতুল্যং পথ্যাধাত্রী।
বিভীতং ত্রিকটু অথ পৃথক তর্দ্ধশানং দ্বিশাণম্॥
এলাজাতীফলাখ্যাং ক্ষিতিতল বিধিনা শুদ্ধ
গন্ধাশ্ম কোলং। কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদ
বিহিতং পিষ্টমেকত্রমিশ্রম্। পানীয়েনৈব
কার্য্যাঃ পরিণত চণক স্বিন্নতুল্যাশ্চ বটাঃপ্রাতঃ
খাদ্যাস্তত্রস্তদনু চ কিয়চ্ছৃঙ্গবেরং সমর্পণম্॥

জারিত অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী. বালা, গজ পিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ. জটামাংসী, তালীশ পত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাই ফুল—ইহাদের প্রত্যেকের ৷৷॰ তোলা, হরীতকী. আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকের ।॰ আনা, ছোট এলাইচ ও জাতীফল—প্রত্যেক ১ তোলা, এবং পারদ ৷৷॰ তোলা। সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বটি।

শাস্ত্রকার এই ঔষধ প্রাতঃকালে আদা ও পানের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন; আমরা কিন্তু ইহা দারুচিনির গুঁড়া ও মধুসহ সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকি। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাসে ইহা বেশী ফলপ্রদ।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে অভ্র—ত্রিদোষনাশক। কর্পূর—কফঘ্ন। জৈত্রী—শ্লেষ্মঘ্ন। বালা—অগ্নিদীপক। গজপিঁপুল—শ্লেষ্মনাশক। তেজপত্র—শ্লেষ্মঘ্ন। লবঙ্গ—পাচক। জটামাংসী—ত্রিদোষনাশক। তালীশপত্র—শ্বাস ও কাসনাশক। দারুচিনি—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক। নাগেশ্বর—কফ ও পিত্তনাশক।

কুড়—

কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রল স্তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্র বীসর্প কাসকুষ্ঠমরুৎ কফান্॥

কুড়—উষ্ণবীর্য্য, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক, তিক্ত ও লঘু। ইহা বাতরক্ত, বিসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফনাশক।

ধাইফুল—

ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃত্তুবরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতীসার পিত্তাস্র বিষ ক্রিমি বিসর্পজিৎ॥

ধাইফুল—কটু, শীতবীর্য্য, মদকারক, কষায় ও লঘু। ইহা তৃষ্ণা, অতীসার, পিত্ত রক্তদুষ্টি, বিষদোষ, ক্রিমি ও বিসর্প প্রশমক।

হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—ত্রিদোষঘ্ন। বহেড়া—কফ প্রশমক। শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ—কফঘ্ন। ছোট এলাইচ—শ্বাস ও কাসনাশক। জাতীফল—শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। গন্ধক—রসায়ন। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন।

পুরাতন কাসে, যক্ষ্মাধিকারে যে "চ্যবনপ্রাশে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা ১ বার করিয়া করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। তবে চ্যবনপ্রাশের প্রয়োগে সদ্যঃ উপকারের আশা করা যায় না, অন্ততঃ ২ সপ্তাহ এই ঔষধ সেবন না করিলে এই ঔষধ সেবন নিষ্প্রয়োজন।

ময়ুর পুচ্ছ ভস্ম ও পিঁপুল চূর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ রতি মাত্রায় মকরধ্বজের সহিত সেবনে সকল প্রকার কাসেই বেশ ফল পাওয়া যায়। পুরাতন কাসে অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থার সহিত একবার করিয়া মকরধ্বজের ব্যবস্থা করা ভাল। মকরধ্বজের পরিচয় রসায়ন অধিকারে দেওয়া যাইবে। [ক্রমশঃ]

বিষ-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

[কবিরাজ শ্রীব্রজ বল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

—:০:—

সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাটীতে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, আমি রোগী দেখিতে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম—ডাক্তারদের হাতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর, রীতিমত 'ওঝার'ও আমদানী হইয়াছে! তখন ও দু' একজন অহিতুণ্ডিক বসিয়া আছেন। কেহ বিষ-চিকিৎসার বিষম ওস্তাদ,—পেশা—গো-যানের গাড়োয়ানী! কেহ মুসলমান-ফকির,—কর্ণে শুভ্র স্ফটিক মাল্য দোদুল্যমান! কেহ বৈচী গ্রামের "জগৎ, গৌরী দেবীর" সেবক—জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে—উজ্জ্বল সিঁদুর বিন্দু, মহেশ ভালে শশি-নেত্রের মত জ্বলিতেছে! হাতে সাগ্নিক স-কলিকা নূতন হুঁকা—ডম্বুরুর ন্যায় শোভা পাইতেছে! ইঁহারা স্ব স্ব চিকিৎসা-সাফল্যের গল্প করিতেছিলেন, এবং প্রথমে ডাক্তার ডাকাই অন্যায় হইয়াছে—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, গৃহস্থের এই মারাত্মক ভ্রমের প্রতিকার এই সকল ওস্তাদের সাধ্যাতীত। রোগীকে আসল কালে দংশন করিয়াছে! কাজেই—ওস্তাদদের অব্যর্থ মন্ত্র তন্ত্র—এই বাটীতেই এই প্রথম বিফল হইয়া গিয়াছে! !

বাস্তবিক এই সকল ওস্তাদ নিজ নিজ বিদ্যা জাহির করিতে কোন ত্রুটি করেন নাই। রোগার গৃহের সম্মুখ ভাগের দালানে—কত

"সাত সতীনের সাদা চুল,
ইঁদুরের আঁত,
শ্বেত করবীর তাজা ফুল,
বাঘ-কুমীরের দাঁত,
নূতন হাঁড়ি, রাঙা জবা,
আকন্দের আটা,
কাল তিল, তুলসী পাতা,
বেল-বাবলার কাঁটা।"

জড় হইয়া রহিয়াছে! এ গুলি—সাধন-রহস্যের কীর্ত্তি-চিহ্ন! কৌতুহলী নেত্রে এই সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে, কৌরব সভায় ঘোর অভিষঙ্গ মুখে নিক্ষিপ্ত দৌপদীর মত আমি রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলাম।

গৃহমধ্যস্থ আরামস্নিগ্ধ-সেবাশীতল-শয্যার উপর রোগী শুইয়া ছিলেন। তাঁহার শিয়রে—তাঁহার মাতৃদেবী বসিয়া ছিলেন,—স্নেহময়ী দেবীমূর্ত্তি! মূর্ত্তির নয়নপল্লবে ঘন পক্ষ্মরাজির উপর জলবিন্দু তখনও কাঁপিতেছিল। রোগীর পদতলে প্রকৃতি-দুহিতা উষার ন্যায় সুশ্রূষা-রতা পত্নী, বালিকার মুখ মলিন—নিরাশ্রয় অনাথার আকুলতায় পূর্ণ!

রোগীর দক্ষিণ পার্শ্বে—দেহ ও মনের বিপুল অবসাদ লইয়া বৃদ্ধ শম্ভুচন্দ্র একখানি আরাম-কেদারায় মূর্ত্তিমান ঔদার্য্যের মত বসিয়াছিলেন। নিমেষের তরে, দুর্গোৎসবের মঙ্গল শান্তির মধ্যে—এই করুণ দৃশ্য আমি একবার দেখিয়া লইলাম। তা'রপর রোগীর শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িলাম।

হায়! আজ আমি কঠোর সমস্যার মীমাংসায় উপনীত। আজ আমার মুখের একটী কথায় এই গৃহের সমস্তই ওলট পালট হইয়া যাইতে পারে। তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চ'ক্ষে কেন্দ্রীভূত করিয়া আমি রোগীকে দেখিতে লাগিলাম। বুকে হাত দিলাম, বার-ম্বার নাড়ী পরীক্ষা করিলাম। আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না—রোগীর দেহে প্রাণ-স্পন্দন বহুক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সে শরীর কঠিন শীতল-হিম শিলায় পরিণত হইয়াছে। সাধের অনুষ্ঠান অসমাপ্ত রাখিয়া, প্রথম যৌবনেই —মনোমোহন নিরুদ্দেশ-যাত্রার দূর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন। বিষ-জর্জ্জরিত মুখে— নীলকণ্ঠের মৃত্যু-নীলিমা, সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্পন্দ —স্থির; শিবনেত্রের উপর শ্বেত জাল; এই তো মৃত্যু! এই তো সকল বাসনার সমাপ্তি! এই তো জীবনাগ্নির মহানির্ব্বাণ!

অনেকগুলি চক্ষু—আমার কার্য্যের উপর পাহারা দিয়া 'ওত' পাতিয়া বসিয়াছিল, আমার মুখের ভাব দেখিয়া, মর্ম্মযাতনার বুক ফাটা ক্রন্দন—গৃহের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়া উঠিল। ভাগ্য-দেবতার ইঙ্গিত পালনের জন্য গৃহস্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন! মধ্যাহ্ন আকাশে—পূর্ণগ্রাসী সূর্য্য গ্রহণের মত, তীব্র আলোকের মাঝখানে, অকস্মাৎ একি বিরাট অন্ধকার। দশমীর দগ্ধ প্রভাত—আজ শম্ভু-চন্দ্রের গৃহেই বুঝি বিজয়ার দৈন্য হাহাকার পূর্ণ করিয়াছে! এ যেন হৃদয়ভেদী জীবন্ত ট্র্যাজিডি!!

আমার চ'খে জল আসিল। স্খলিত-জড়িত-মত্ত চরণে আমি বাহিরে আসিলাম। জড়িত কণ্ঠে সিদ্ধেশ্বর বাবুকে বলিলাম—"আর কেন? রোগীকে গঙ্গায় লইয়া যান। কামনার আকুল আগ্রহ—দেহকে বক্ষে চাপিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ধরিয়া রাখা যায় না। রোগী অনেকক্ষণ পৃথিবীর বুকে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছে।"

পার্শ্বে—হুগলীর প্রসিদ্ধ উকিল শিবচন্দ্র দে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শিববাবু শম্ভুচন্দ্রের অগ্রজ। মেঘ ছায়া সমাচ্ছন্ন আকাশের মত তাঁহার হৃদয়ও আজ দুর্নিবার দুঃখে ভারা-ক্রান্ত। আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া, শিববাবু বলিলেন—"রোগী প্রায় ১২ ঘণ্টা—একইভাবে রহিয়াছে। উহার শরীরে জীবনের কোনও চিহ্ন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস—মৃতদেহ অল্পক্ষণ পরেই শক্ত হইয়া যায়। মনোমোহনের দেহ এখনও কোমল, এখনও পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণ বন্ধ হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রে সর্পাঘাতের রোগীকে দগ্ধ করা নিষিদ্ধ। আমরা রোগীকে গঙ্গায় লইয়া যাইব না। আজিকার দিনও প্রতীক্ষা করিব। কবিরাজ! তুমি কোনও বিষ-নাশক ঔষধের ব্যবস্থা কর, ইহাই আমার অনুরোধ।"

আমার মনে হইল—শিব বাবুর এ আশা নিতান্তই মায়ার মোহ। কিন্তু এই মোহ লইয়াই তো মানুষের সংসার! আমি তাঁহার

অনুরোধ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। এ যে আমারও মায়ার মোহ! শিবচন্দ্রের বিশ্বাস—গুপ্ত দেহশ্রী কাঁটালী চাঁপার মত রোগীর দেহে এখনো জীবনের সুরভিশ্বাস বর্ত্তমান; আমি কেন এই শান্তিভরা স্থির বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই? বাস্তবের উজ্জ্বল আলোকে, আমি কেন অপরের হৃদয়-গগনের সুখ-কল্পনার ইন্দ্রধনু নষ্ট করি? বিষের উপর আমি কেন আর প্রাণান্তকারী বিষ-কণিকা ছড়াই?

বিষ প্রসূন যেমন শরতের প্রথম রবিকর স্পর্শে প্রাণভরা সৌরভ লইয়া বিকশিত হইয়া উঠে, আমার হৃদয়ও তেমনি শিবচন্দ্রের কথায় উৎসাহের রক্তরাগে ফুটিয়া উঠিল। তখন সম্ভব অসম্ভবের দিকে চাহিবার প্রবৃত্তিও আমার ছিল না। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার শক্তি কত ক্ষুদ্র, আমি বিষ-চিকিৎসার জানি কি?—এ সকল ভাবিবারও অবকাশ পাইলাম না! আমি ছুটিলাম। শকট নেমীর ঘর্ঘর নাদে—পল্লীপথ মুখর করিয়া আমি ছুটিলাম। চুঁচুড়ায় আসিলাম—ধর্ম্মপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। সেখান হইতে কতকগুলি পাতাল গরুড়ী গাছ সংগ্রহ করিলাম। আবার উর্দ্ধ শ্বাসে হুগলীতে উপস্থিত হইলাম।

শিবচন্দ্র আমার অধীর প্রতীক্ষায়—একটী অপর মীনবহীন অলিন্দে পাদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম—এই গাছগুলি কাহাকেও বাটিয়া দিতে বলুন। তখনই আদেশ প্রতিপালিত হইল। সেই পাতাল গরুড়ীর কল্কে ঘৃত ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া আমি রোগীর চক্ষে, নাসারন্ধ্রে, ক্ষত মুখে, বুকে, ব্রহ্মতালুতে,—প্রলেপ দিলাম। পাতাল গরুড়ীর রস—রোগীকে কিঞ্চিৎ পান করিতেও দিলাম। কিন্তু সে তাহা গলাধঃকরণে সমর্থ হইল না। তাহার মৃত্যুছায়া মলিন মুখের দুই কষ বহিয়া,—রস বাহির হইয়া পড়িল। তথাপি, আশা, মোহ ও দুরাকাঙ্ক্ষা—আমাকে পরিত্যাগ করিল না। অর্দ্ধ ঘটিকা অপেক্ষা করিয়া আমি আবার অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম।

অসিতকান্তি ব্যূঢ়োরস্ক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সেদিন আমাদের "মধ্যাহ্ন ভোজনের" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর আপ্যায়নেরও ত্রুটী ছিল না। আমরা মহামায়ার 'মহাপ্রসাদ' গ্রহণে জন্ম সফল করিলাম। তাহার পর আবার অভিনয় দেখিতে বসিলাম।

তখন নাটকের পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হইতেছিল। অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমাকাশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, রুধিরাপ্লুত আসন্ন মৃত্যু অবসন্ন সেনানীর মত ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল।

সহসা সিদ্ধেশ্বর বাবুর পুনরাবির্ভাব। এবার তাঁহার মুখ প্রসন্ন। তাঁহাকে রোগি-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—"রোগীর গা গরম বোধ হইতেছে। আপনি আর একবার চলুন।"

আমি উঠিলাম। দ্রুতপদক্ষেপে পথ অতিক্রম করিয়া রোগীর গৃহে উপস্থিত হইলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম—সত্যই তাহা অদ্ভুতপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল।

আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল! এ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! রোগীর তুষার শীতল তনু—উষ্ণস্পর্শ। এত উষ্ণ যে, তাপমান

যন্ত্রে মাপিলে বোধ হয় সে উত্তাপের পরিমাণ ১০৫ ডিগ্রী! আমি তো বিস্ময়ে অবাক্! অতীত যুগের পবিত্র তপোবনের অনাবিল শুচিতা যেন স্বপ্নের মত আমাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল, ক্ষুদ্র পাতালগরুড়ীর এ কি মহিয়সী শক্তি! এ যে বিশ্বাস করা চলে না! এইজন্যই বুঝি উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মাণ্ডের এক মহাসত্যকে সাধনদুর্লভ দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করিয়া, বিশ্ব দেবতাকে বনস্পতির মাঝে প্রণাম করিয়াছিলেন—

"য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।"

আমিও আর্য্যঋষির অভয়চরণে নতজানু হইয়া পাতালগরুড়ীকে নমস্কার করিলাম।

শিববাবু আর সে রাত্রে আমায় বাটী ফিরিতে দিলেন না। শিশু কন্যাকে জহর বাবুর সঙ্গে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আমি শম্ভুচন্দ্রের আতিথ্য স্বীকার করিলাম। রজনীতে আর একবার রোগীকে পাতাল গরুড়ীর রস সেবন করিতে দিলাম। এবার আর রস বাহির হইয়া আসিল না। মনে হইল—অনেক কষ্টে রোগী সে রসটুকু গিলিতে পারিয়াছে।

অতি প্রত্যূষে—সকলে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই—পদব্রজে আমি বাটীত ফিরিয়া আসিলাম। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আয়ুর্ব্বেদের বিষ-চিকিৎসা অধ্যায় পড়িতে লাগিলাম।

আমার কাছে একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম—'সিদ্ধযোগ"। পুঁস্তকখানি—হস্তলিখিত, জীর্ণ, কীটাকুল। প্রণেতার নাম—"বৃন্দ"। এই বৃন্দ—চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। চক্রপাণি—বৃন্দের অনেকগুলি যোগ আপনার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব বৃন্দের "সিদ্ধ যোগকে" চিরদিন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। আয়ুর্ব্বেদের "বিষ-চিকিৎসা" অধ্যায় আলোচনা করিতে বসিয়া, প্রথমেই আমার দৃষ্টি "সিদ্ধ যোগের" প্রতি আকৃষ্ট হইল। আমি সিদ্ধযোগ পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম বৃন্দ বলিতেছেন;—

"স্বরসঃ রুদ্র জটায়াঃ
মাক্ষিক ঘৃত সংযুতঃ।
সর্পদষ্ট বিষং জিত্বা
সঞ্জীবয়তি মানবং॥"

ঠিক এই সময়, "তারকনাথ-গ্রন্থাবলীর" প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত। আমাকে পুঁথি পাঠে তন্ময় দেখিয়া, বিশ্বাস মহাশয় একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। বিজয়ার সাদর সম্ভাষণে তাঁহার সঙ্কোচ তিরোহিত হইল। একটী সর্পাঘাতের রোগী লইয়া সম্প্রতি আমি যে একটু বিব্রত,—একথা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনিও বলিয়া ফেলিলেন—"শঙ্কর জটাগাছ—সাপের বিষের অব্যর্থ মহৌষধ।" কথাটা বড় ভাল লাগিল। বৃন্দ বলিতেছেন—রুদ্রজটার রস—মধু ও ঘৃতের সহিত পান করিলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। তারক বাবুও শঙ্কর জটাকে সর্প বিষঘ্ন বলিতেছেন। রুদ্রজটা ও শঙ্কর জটা—একই বৃক্ষ, কেবলই নামের একটু 'মারপ্যাঁচ' মাত্র। কিন্তু এখন করি কি? রুদ্রজটা বা শঙ্করজটা কোথায় পাই? বলা বাহুল্য, প্রকৃত শঙ্করজটার গাছ আমি নিজেই চিনি না। অতএব কেমন করিয়া

উহা সংগ্রহ করিব? তারক বাবুকে মনের কথা জানাইলাম, তিনি বলিলেন—"শঙ্কর জটা আমি চিনি। কিন্তু এ দেশে আছে কিনা জানি না, বর্দ্ধমানের নূতনগঞ্জে "শ্রীনারায়ণ লজে" উহা পাওয়া যায়।" *

কথাবার্ত্তা—এই পর্য্যন্ত। বেলা প্রায় ৯টা বাজিল। শম্ভুবাবুর লোক গাড়ী লইয়া হাজির। আমি হুগলী যাত্রা করিলাম।

রোগী তখনও অজ্ঞান অচৈতন্য। প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার ন্যায়—শয্যাপ্রান্তে লীন। শরীরের বিকাশ-বিন্যাস নাই, ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ-উল্লাস নাই। কেবল গাত্র উষ্ণস্পর্শ, ধমনী—রক্তস্রোতে ঈষচ্চঞ্চল। কালের কৃষ্ণ যবনিকা ঠেলিয়া সে গৃহে আলোক প্রবেশ করিয়াছে; আর পল্লব-রাগ-তাম্র-তপনের লোহিত কিরণ—রোগীর স্পন্দহীন শরীরে পতিত হইয়া, তাহাকে যেন জীবিত ও রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। রোগীকে সেই পাতাল গরুড়ীর রস খাওয়াইতে বলিয়া আমি বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আহারান্তে একটু বিশ্রাম না করিয়াই, তারক বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সেদিন আমাদের সাহিত্যগুরু আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তারক বাবুকে বলিলাম—"কাল আপনাকে লইয়া বর্দ্ধমানে যাইব, শঙ্করজটা আনিতেই হইবে।" তিনি স্বীকৃত হইলেন। আমিও বাটী ফিরিলাম। সহসা আমার মনে পড়িল—বর্দ্ধমানের নূতনগঞ্জ স্থিত "শ্রীনারায়ণ লজ"—আমার অপরিচিত নহে। এই বাটীতে শিবদাস তেওয়ারী মহাশয়ের চিকিৎসার জন্য বর্ষকাল পূর্ব্বে—আমি আহূত হইয়াছিলাম। চুঁচুড়া প্রবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ আমাকে সঙ্গে করিয়া এই বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন।

সেই রাত্রেই আমি কানাই বাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। বর্দ্ধমানে "শ্রীনারায়ণ লজে" যাইব, তাঁহাকে আমার সঙ্গী হইতে হইবে, কানাই বাবুকে এইরূপ অনুরোধ করিলাম। তিনি অতি সদাশয় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তখন হুগলীর কাছারী—পূজাবকাশে বন্ধ, সুতরাং কানাই বাবুর আপত্তির কোন কারণও ছিল না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে—তারক বাবু, কানাই বাবু ও আমি এই তিন মূর্ত্তি একসঙ্গে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলাম। সুন্দরের প্রাণে বিদ্যালাভের আশা জাগিয়াছিল, তাই তিনি "একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন"—এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া, একাকী বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন। আমার আশা শঙ্করজটা লাভ, কাজেই দুইজন আমার সঙ্গী হইলেন।

বেলা দশটার পূর্ব্বেই আমরা বর্দ্ধমান ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশন হইতে 'নূতনগঞ্জ' একক্রোশ দূরে। আমরা অশ্বযানে আরোহণ করিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইলাম।

যেখানে—রাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির "আস্তাবোল"—কক্ষাবলী শেষ হইয়াছে, সেই স্থানের সীমান্তে একটী সঙ্কীর্ণ গলি পথে—"শ্রীনারাণ লজ" অবস্থিত। আমরা "শ্রীনারায়ণ লজে" উপস্থিত হইবামাত্র—

* আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উদ্যানে 'লক্কাশিজ' বা জটাজঙ্কার গাছ রুদ্রজটা বলিয়া রোপিত হইয়াছে।—এটা মারাত্মক ভ্রম।—লেখক।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস তেওয়ারী মহাশয় পরম সমাদরে—আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। অতবড় বড়লোক, অথচ কি উদারতা, কি বিনয়, কি সহজ-সারল্যের শিষ্টাচার! ইহারা পশ্চিম প্রদেশের ব্রাহ্মণ, ব্যবসায় উপলক্ষে—বহুকাল পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন। সোনার বাংলায় বাস করিয়া কথায় বার্ত্তায় ঠিক্ বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছেন।

দুর্গাদাস বাবুকে আমি আমার প্রয়োজনের কথা বলিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"আগে আপনাদের আহারাদি হউক, তা'র পর শঙ্করজটার গন্ধমাদন—তারকবাবু ও কানাইবাবুর মাথায় তুলিয়া দিব।" তারক বাবুও সহাস্যমুখে উত্তর দিলেন—"বটেই ত। এ যে স্বয়ং সুসেনের প্রয়োজন।" রহস্যটা কিস্কিন্ধাকাণ্ডেরই অনুরূপ।

ষোড়ষোপচারে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দুর্গাদাস বাবু বড় সৌখীন, বড় অমায়িক,—রাজ সংসারেও তাঁহার প্রভাব আছে। উদ্যান-রচনায় তাঁহারা দুই ভাই সিদ্ধ হস্ত। আমরা তাঁহাদের উদ্যান দেখিলাম। কি সুন্দর—পুলক-দীপ্ত পুষ্পোদ্যান। এ যেন বোগদাদের স্বপ্নপুরী! উদ্যানের প্রত্যেক তরু, প্রত্যেক গুল্ম, প্রত্যেক লতাটী উদ্যান স্বামীর সৃষ্টি কুশলী প্রতিভার প্রাণপাত পরিশ্রমে—শত সুষমার বর্ণরাগে সমুজ্জ্বল! এই তো কবি হৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুশীলন! উদ্যানের মধ্যস্থলে—একটী কৃত্রিম নির্ঝরকে বেষ্টন করিয়া—দ্বিধা বিভক্ত রক্তকঙ্করময় পথ! নির্ঝরের বারি রাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, সূর্য্য কর মাখিয়া—রঙ্গিল রামধনুর স্বপ্নে—কুতক-গুলি নৃত্যশীল-মর্ম্মর-শিশুর উপর ঝরিয়া পড়িতেছে! তাহারই চারিদিকে শঙ্করজটার শ্রেণী। এরূপ গাছ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। গাছের পাতা—রোমশ, শ্বেত শিরায় চিত্রিত, অনেকটা বন চাঁড়ালের পাতার মত—অবিরল পত্র স্তূপ ভেদ করিয়া এক একটী জটা বাহির হইয়াছে জটাগুলি তালজটার মত রন্ধ্রময়ী, প্রত্যেক রন্ধ্রমুখে নীল বর্ণের পুষ্প স্তবক সজ্জিত! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। তেওয়ারী মহাশয়ের মুখে শুনিলাম—তাঁহাদের এক ভৃত্য, বর্দ্ধমান ষ্টেশনের দুই জন কুলী, কৈলাস ঠাকুর নামধেয় একজন মিষ্টান্ন বিক্রেতা—এই শঙ্কর জটার পাতার রসের মহিমায়, সর্পদংশনে মৃতকল্প হইয়াও—পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় প্রসন্ন হইয়া, এক জটা বল্কলধারী সন্ন্যাসী এই গাছ তাঁহাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। গাছের বিষঘ্ন শক্তির পরিচয় পাইয়া কত দেশের কত লোক আসিয়া ইহার চারা লইয়া গিয়াছে।

এই সকল ইতি কাহিনী শুনিতে শুনিতে, আমি কতকগুলি সংগ্রহ করিলাম। পাছে পাতাগুলি শুকাইয়া যায়—সেই সন্দেহে তেওয়ারী মহাশয়—তাহা সিক্ত বস্ত্রখণ্ডে ও শাল পত্রে বাঁধিয়া দিলেন। আরও দিলেন—একটী মৃত্তিকা পূর্ণ ছোট টবে—বসাইয়া দুইটী শিতত বহুশাখ ছোট চারা।

তাঁহাদের নিকটে বিদায় লইয়া ২টার ট্রেণে আমরা চুঁচুড়ায় ফিরিলাম। সন্ধ্যার পর পাতাগুলি লইয়া হুগলী যাত্রা করিলাম। ছোট চামচের দুই চামচ রস—রোগীকে খাওয়ান হইল। এক ঘণ্টা পরে রোগীকে একটু উষ্ণ

দুগ্ধ পান করাইবার উপদেশ দিয়া—আমি চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে গিয়া শুনিলাম—রাত্রে রোগী ৩ বার বমি করিয়াছে—বমন নীলবর্ণের অথচ তরল কফমিশ্রিত। ক্ষত-মুখ হইতেও কতকটা নীলবর্ণের ক্লেদ নিঃসৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠ দিবসে—অহোরাত্রের পরিবর্ত্তন-প্রবাহে, রোগীর অনেকটা উন্নতি দেখিলাম। হৃদপিণ্ডের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে,—শরীরে নূতন জীবনের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে, কোটর প্রবিষ্ট নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, পরিচিত অপরিচিত সকলের দিকেই সে তাকাইয়া দেখিতেছে। তাহার সমস্ত শিরা-উপশিরায়—একটা অননুভূত কম্পনে—যেন তড়িতের তরঙ্গ ছুটিতেছে বেশ বুঝিলাম—, এ সেই মৃত্যুভীতিহরণ, অশরণের শরণ-ভগবানের দয়া। তাঁহারই অযাচিত করুণায় ক্ষুদ্র "শঙ্কর জটা'—যাদুকরীর মায়া যষ্টি স্পর্শে—শব-দেহকে নিশ্বাস ও ভাষা দিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে!

ঋষিকীর্ত্তির অম্লান অমর রশ্মি-রেখায়—আজ আমার দেহেও জীবনের বিচিত্র স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। আজ আমি আপনার মধ্যে আপনি অতীত পূজার বিপুল আনন্দ অনুভব করিলাম। সে আনন্দে—আমার হৃদয়ের শূন্যতা ভরিয়া উঠিল। আমার ভাব দেখিয়া—শিববাবুর মুখে একটু হাসি ফুটিল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—

'বুঝিয়াছ তো, কেন শাস্ত্রকর্ত্তা সর্পদষ্টকে দগ্ধ করিতে নিষেধ করেন? মৃত্যুর ছায়াতেই যে জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকাইয়া থাকে।" এ কথার আর কি উত্তর দিব? আমার সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছে। আমার আমিত্ব—ক্ষুণ্ণ গর্ব্বের অনল শ্বাস!

আমি লজ্জিত হইলাম। নিজের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান স্মরণ করিয়া, প্রাণে ধিক্কার আসিল। পুরাতনকে মর্য্যাদা দিতে শিখি নাই বলিয়া অনুতাপে—প্রবল ঝটিকায় দুর্ব্বল দেবদারুর মত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিবচন্দ্রের অমূল্য বিদ্রূপে, আমার নির্লজ্জ আত্মাভিমান—আজ সত্য সত্যই বিজিত বন্দীর মত মাথাবনত করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই—মনোমোহন সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। লোকে আমাকে 'পাকা ওঝা' বলিয়া একটু তারিফ করিতে লাগিল। সেই দিন হইতে আমিও বিষ-বিজ্ঞানের আরাধনায় আত্মসমর্পণ করিলাম। ইহাই আমার বিষ-বিজ্ঞানের "অবতরণিকা"।*

(ক্রমশঃ)

---

* আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে আমি এই পাতালগরুড়ী ও শঙ্কর জটার গাছ চিনাইয়া দিয়াছি। আমার আশা আছে—সর্পাঘাতের রোগীর উপর, তাঁহারা এই উভয় বৃক্ষের প্রভাব পরীক্ষা করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনও বিষবৈদ্যের বিরাট ব্রত গ্রহণ করিলে, আমি কৃতার্থ হইব।—লেখক।

চেতনার সাড়া।

[শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত]

—:*:—

হে বিমুগ্ধ বঙ্গবাসি! ঋষি দত্ত-সুধা
না নিবারি ব্যাধি-ক্লিষ্ট শরীরের ক্ষুধা
প্রতীচ্যের মোহে অন্ধ মূঢ়ের মতন
পান কর হলাহল! মাতৃস্তন্য ফেলি'
দেবতার আশীর্ব্বাদ গর্ব্বে অবহেলি'
ধাত্রীর দূষিত দুগ্ধে কর নিবারণ
চির-তৃষ্ণা অন্তরের। দেখনা ভাবিয়া
পীঠভূমি এই দেহ পূত "ব্রহ্মপুর"
ধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্র দুজ্ঞেয় বঁধুর
মিলন-মন্দির নব! হেথায় বসিয়া
দিতে হবে কর্ম্ম-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান
প্রতি পলে প্রতি শ্বাসে! হ'য়ে বলহীন
কেমনে লভিবে বল গূঢ় গুহাসীন
অক্ষয় আত্মায় আহা! আনন্দে মহান্
জাগ আজি দিব্য তেজে! যাহা আপনার-
হোক্ তাহা ক্ষুদ্র তুচ্ছ, তবু কল্যাণের—
ধ্রুব গৌরবের সে যে! বুভুক্ষ প্রাণের
আকাঙ্ক্ষিত নিধি যেন।
স্বদেশ মাতার
জেগেছে আহ্বান আজি মহাত্মা গান্ধীর
পুণ্য-পূত কণ্ঠ মাঝে, পশ্চাতের পানে
নিরখে ভারতবাসী, মরা-গাঙ্গ-বাণে
ভ'বে গেল অকস্মাৎ! অমার রজনীর
চির-অবসান ঘোষি' হাসে প্রাচ্যাকাশে
দেশাত্মবোধের রবি! এ আলোকে আজ
নিয়ে এস পূজা-অর্ঘ্য দীপ্ত বিশ্ব মাঝ
সুশ্রুতাদি মহর্ষির পাদপদ্ম পাশে
বিশ্বাসী ভক্তের সম! গায় উচ্চে 'জয়'
নিঃশেষে ঘুচিবে ক্ষণে জরা-মৃত্যু-ভয়!

"চা"

(প্রতিবাদ)

[ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ]

—:o:—

গত বর্ষের শ্রাবণমাসের "আয়ুর্ব্বেদে" ডাক্তার শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয় "চা" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহার অধিকাংশ অসম্পূর্ণ, কতক বা ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ।

প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন, "কি সহরে কি পল্লীতে শতকরা ৯৫ জন লোকে চা পান করিয়া থাকেন।" কলিকাতার ন্যায় সহরে অবশ্য চা পানের প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে এরূপ হিসাব প্রদান লেখকের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র, যাহা হোক ইহা একটা কথার কথা ধরিয়া লইলে ততটা দোষের হয় না।

চায়ের পরিচয় লেখক লিখিয়াছেন, চা বৃক্ষ সচরাচর ৪।৫ ফিট হইয়া থাকে। চীনা-গাছ ৬।৭ ফিট উচ্চ হইতে পারে কিন্তু আসামী জাত গাছ ১৫ হইতে ১৮ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, কিন্তু পাতা সংগ্রহের জন্য গাছকে এত উচু রাখা হয়না। প্রতিবৎসর শীতকালে গাছগুলিকে নিয়মানুসারে ৩২, ২৪, ২৬, ১৮, ১২, বা ৬ ইঞ্চি ইত্যাদি পরিমাণ উচ্চে ছাটিয়া দেওয়া হয়, কোন কোন গাছ মাটি সমান করিয়া কাটা হয়, ইহাকে কলম দেওয়া বলে, এরূপ করিলে নূতন শাখা প্রশাখা এবং অপর্য্যাপ্ত পাতায় গাছগুলি শীঘ্রই ভরিয়া উঠে, কুলিদের পক্ষে পাতা লইবারও সুবিধা হয়, চা বৃক্ষে সাদা ফুল হয় বটে, কিন্তু সে ফুলে কখনও সুগন্ধ পাই নাই।

লেখক চা প্রস্তুত প্রণালী কোথায় পাইয়াছেন জানি না, এরূপ গল্প সাধারণ লোকের মুখে শুনা যাইতে পারে।

সকল পাতায় চা হয় না, উৎকৃষ্ট চায়ের জন্য একটী কুঁড়ী ও তৎসংলগ্ন দু'টী কচি পাতাই সংগৃহীত হইয়া থাকে, এইরূপে পাতা তুলিয়া লইলে, সেখান হইতে পুনরায় কুঁড়ি ও পাতা বাহির হয়, এবং নিয়মানুসারে একটী কিম্বা দু'টী পাতা ছাড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় একটী কুঁড়ি ও দু'টী কচি পাতা তুলিয়া লওয়া হয়। এইজন্যই মার্চ হইতে নবেম্বর-ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাতা তুলার কার্য্য চলিতে থাকে, সংগৃহীত পাতাগুলি শীতল স্থানে পাতলা করিয়া ছিটাইয়া রাখিয়া নরম করা হয়, পাতায় বেশী সময় ধরিয়া রৌদ্র লাগিলে অথবা অতিরিক্ত গরম পাইলে পাতা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া উঠে এবং সেই পাতা হইতে প্রস্তুত চা অত্যন্ত খারাপ হয়, পাতা নরম হইলে ঘানিতে (Rolling machine) দিয়া কিছু সময়ের জন্য মলাই (Roll) করা হয়, পরে সেইগুলিকে শুকনাই কলে (Drying machine) দুইবারে (বার আনি+চারি আনি) শুকান হইয়া থাকে, শুকনাইকলে কয়লা অথবা কাঠ যে কোন ইন্ধনই ব্যবহার করা যাইতে পারে, এই চা হইতেই অরেঞ্জ পিকো (Orange Pekoe) ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো (Broken-orange Pekoe) পিকো (Pekoe) পিকো সুসাং (Pekoe Souchang) পিকো ডাষ্ট (Pekoe Dust) ডাষ্ট (Dust) ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ করা হয়, অরেঞ্জ সুসাং এর নাম আমরা শুনি নাই।

"চা" এর প্রস্তুত প্রণালী-সম্বন্ধে ইন্দুবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহারও অর্থ সুস্পষ্ট হয় না, উষ্ণজলে সিদ্ধ করার দুইরূপ মানে হইতে পারে, বাস্তবিক উনানের উপর জল চড়াইয়া তাহার মধ্যে চা ছড়িয়া সিদ্ধ করিবার রীতি নাই, জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া একটা পাত্রে ঢালিয়া তাহার মধ্যে চা ছাড়িয়া দিয়া ৫ মিনিট ঢাকিয়া রাখিতে হয়, এক পেয়ালার জন্য সিকিভরি পরিমাণ চা (কাহারও কাহারও

মতে দুয়ানি পরিমাণ). চা চামচের এক চামচ দুধ ও এক চামচ চিনি যথেষ্ট।

কি দেশীয় কি বিদেশীয় কোন চিকিৎসকই চায়ের সামান্য উপকারিতাও স্বীকার করেননা, "বেশ একটু স্ফূর্ত্তি বা স্বচ্ছন্দতা অনুভব" উপকারিতার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয় না অথবা যাহা ঔষধরূপে কোন ব্যাধিকেও কথঞ্চিৎ দমন করিতে পারে না, তাহার উপকারিতা স্বীকার করা যায় না। ইন্দুবাবু লিখিয়াছেন, "চা-পানে মূত্রনিঃসরণ, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের উত্তেজনা, শ্রান্তিনাশ, শারীরিক অবসন্নতা নষ্ট হইয়া থাকে ও একটু প্রফুল্লতা আনিয়া থাকে," এ স্থলে ভাষার ত্রুটী থাকিলেও তাঁহার বক্তব্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, চা-পানে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় সত্য কিন্তু ব্যাধি বিশেষে প্রস্রাব বৃদ্ধির জন্য চা-পান করা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ বর্ত্তমান, হৃদপিণ্ডের কার্য্য বৃদ্ধি কি ভাবে হয় তাহা বলা যায় না, চা উত্তেজক, সুতরাং হৃদপিণ্ডকে উত্তেজিতই করিতে পারে, মস্তিষ্কের উত্তেজনা উপকারিতার মধ্যে গণ্য হইতে পারেনা, শ্রান্তিনাশ,—শারীরিক অবসন্নতার বিনাশ অথবা প্রফুল্লতার আগমন-চাপায়ীদের মতে উপকারী হইতে পারে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে বেলের পানা বা মিছরির সরবতের উপরে চায়ের আসন ঠিক করিয়া দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক তিনি অপকারিতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এবং কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তারের যে কোটেশন দিয়াছেন—তাহা যথেষ্ট। সাহেবে বলিয়া থাকেন—চা পান করিয়া বাঙ্গালীদের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়, তাহার কারণ তাহারা অত্যন্ত গরম গরম পান করেন, তাঁহাদের মতে চা একটু ঠাণ্ডা হইলে মিছরির সরবতের ন্যায় এক চুমুকেই খাইয়া ফেলা উচিত। কিন্তু আমরা বলি, ভারতবাসীর জন্য চা পানের সপক্ষে কোনরূপ যুক্তি গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য নহে। উষ্ণপ্রধান দেশ, ভারতের অধিবাসীদের পক্ষে চা অত্যন্ত অপকারী, এমন কি চা পান বিষ ভক্ষণের তুল্য বিবেচিত হওয়া উচিত।*

---

* 'চা' সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ লেখক ও তাহার প্রতিবাদ-লেখক যে সকল কথা বলিয়াছেন, সম্বন্ধে সে আমাদের বক্তব্য 'চা'—আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, বিশেষতঃ 'চা'য়ের প্রচলন কলিকাতা সহরে এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানেও এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এখনকার লোক যে অতিশয় অজীর্ণপ্রবণ, তাহার অনেকগুলি কারণের মধ্যে ইহাও একটি বিশেষ কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া চায়ের যে কোনো গুণই নাই এমন নহে। যে বিষ সেবনে মানুষ মরণের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে, উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে তাহাও অমৃতের কার্য্য করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে "চা"য়ের গুণ এইরূপ বর্ণিত আছে :—ইহার পত্র কফঘ্ন, স্বেদজনক, বলবর্দ্ধক, প্রতিশ্যায় নিবারক, জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক ও শরীরের জড়তা নাশক। ইহার কাথ চিনির সহিত সেবনীয়। যথা—

"শ্লেষ্মারি গিরিভিচ্ছ্যামপর্ণ্যা তন্ত্রী প্রিয়ামুতে।
শ্লেষ্মারি পত্রং কফহৃৎ স্বেদনং বলবর্দ্ধনম্।
প্রতিশ্যায় হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্।
কাস সংহরণং বহ্নিদীপনং জাড্যনাশনম্।
কাথোঽস্য সিতয়াযুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা।"

—আঃ সং।

সমালোচনা।

চিকিৎসাম্বিত্র। ১ম ও ২য় ভাগ। চতুর্দ্দশ সংস্করণ। ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রলাল সুর, এম, ডি, প্রণীত। ১০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ৮৲ স্থলে ৫৲ টাকা। এখানি নামে হোমিও-প্যাথিক পুস্তক হইলেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার হোমিওপ্যাথি বহু পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই পুস্তকে 'রোগ নিরূপণতত্ত্ব' 'স্বাস্থ্যরক্ষা-বিবরণ, 'জ্বরচিকিৎসা' 'সাধারণ রোগ সমূহের চিকিৎসা,' 'আমাশয় চিকিৎসা' প্রভৃতি অনেক রোগেরই চিকিৎসা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'দেশীয় মতে কফ, পিত্ত ও বায়ুর পরিচয়'ও এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন 'এলোপ্যাথিক মতে জ্বর চিকিৎসা,' 'কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা,' 'শারীর তত্ত্ব' (Physiology) ও 'অস্থিতত্ত্ব' (Anatomy) সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জলভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের দ্বারা পল্লী চিকিৎসকদিগের ও জনসাধারণের অনেক উপকার সাধিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

ক্লিনিক্যাল হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যবিধান।—১ম ও ২য় খণ্ড। ডাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত। ৮৪ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মিঃ এ, কে, মৈত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ম খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা, ২য় খণ্ডের মূল্য ৩৷৷০ আনা মাত্র। স্বর্ণাক্ষরে অতি সুন্দর বাঁধাই। এই পুস্তক দুইখানি আমরা অনেক দিন হইল পাইয়াছিলাম, কিন্তু একজন হোমিও-চিকিৎসক পড়িতে লওয়ায় এতদিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই পুস্তকখানি উপকারে আসিবে। এই পুস্তকে 'হোমিওপ্যাথির ইতিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্য ঋষিদিগের সহিত হোমিওপ্যাথির তুলনা ও হোমিও-ফার্ম্মাকোপিয়া বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এক একটি ঔষধ লইয়া তাহার যত প্রকার ব্যবহার-প্রণালী আছে তাহাও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিশেষে একটী ঔষধের সহিত যতগুলি ঔষধের তুলনা হইতে পারে তাহাও ইহাতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

—:০:—

মাননীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক
মহোদয়ের সদনে।

শ্রাবণ মাসের আয়ুর্ব্বেদে (৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায়) মাননীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ" প্রবন্ধের নিম্নলিখিত স্থানের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক "আয়ুর্ব্বেদে" স্থান দিবেন।

"শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয় আধুনিক উপায়ে লৌহাদি ভস্ম করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করতঃ দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে বসিয়াছেন। সহৃদয়ের কথার মত কথা বটে। ঔষধের মূল্য বাবদে এদেশের লোককে এ দেশীয় চিকিৎসকদিগকে যাহা দিতে হয় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর।

দুই চারিজন ভেণ্ডার অব মেডিসিনের মূল্য নিরূপণ তালিকা দেখিয়া আর দুই চারিজন অতিলোভী কবিরাজের কর্ম্ম দেখিয়া নিয়োগী মহাশয় শিহরিয়া উঠিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, দেশের লোক কত অল্প ব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসিত হয়, এদিকে প্রতিবারে ডাক্তারেরা ১৬৲ টাকা ৩২৲ টাকা ভিজিট লইতেছেন। রোগ আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করাইয়া এই দরিদ্রদেশের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন—তদ্বিষয় নিয়োগী মহাশয় একটুও বাঙ্ নিষ্পত্তি করেন নাই কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

পরন্তু হিসাবে উচিত মূল্যে খাঁটি কবিরাজী ঔষধ যাহার নিকট পাওয়া যায়. এবং যাঁহারা নির্লোভী ও খাঁটিভাবে থাকিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের নামের তালিকা "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশ করা হউক। তাহা হইলে ভেণ্ডার অব মেডিসিন ও লোভী কবিরাজের নাম না বলিলেও সাধারণে চিনিয়া লইতে পারিবে।

সুদূর মফঃস্বলে অল্পব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসিত হওয়ার ব্যবস্থা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সহরেও কি তাহাই ?

গত বৎসর আষাঢ় মাসে আমার একজন মামাত ভাই বাতের চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। সার্কুলার রোডের অতি নিকটে বেনেপুকুর লেনে উঁহার বাসা ছিল। ঢাকা-সোণারঙ্গ নিবাসী জনৈক কবিরাজ উক্ত রোগীর বাড়ীর চিকিৎসক এবং এই কুচবেহার-মেখলীগঞ্জে চিকিৎসাদি করিয়া থাকেন, তিনি কলিকাতায় রোগীর সঙ্গে ছিলেন। উক্ত কবিরাজ মহাশয় রোগীকে দেখাইবার নিমিত্ত কলিকাতার একজন প্রথিত নামা কবিরাজকে ডাকিতে গিয়াছিলেন। তিনি দর্শনী ৩২৲ টাকার কমে ঐ স্থানে আসিতে রাজি হয়েন নাই। অথচ মেডিকেল কলেজের কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার অল্প দর্শনীতে উক্ত স্থানে আসিয়া রোগীকে দেখিয়া-

ছিলেন। এস্থলে আমার বক্তব্য আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে প্রথিত নামা কবিরাজ-দিগের পক্ষে ধনী-দরিদ্রের বিচার রাখা একটু কর্ত্তব্য। আমি আয়ুর্ব্বেদের হিতার্থি হইয়াই এ কথাটি বলিতেছি।

শ্রীবসন্তকুমার সিংহ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

প্রতিবাদ।—গত আশ্বিন মাসের "আয়ুর্ব্বেদে" "বৈদ্যসভা" শীর্ষক একখানি রিপোর্টারের পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সহরের একজন কবিরাজ উহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। ঐ প্রতিবাদে তিনি জানাইয়াছেন—"বিদ্যাসাগর কলেজে যে আয়ুর্ব্বেদ সভার অধিবেশন হইয়াছিল—সেই আয়ুর্ব্বেদ সভা ১৮৬০ সালের ১১ আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্টের নিকট রেজেষ্ট্রীকৃত। ঐ আয়ুর্ব্বেদ সভাই ঢাকার প্রসিদ্ধ রোহিতকারিষ্টের মোকদ্দমার সময় গভর্ণমেণ্টের সহিত লেখাপড়া করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত আসব ও অরিষ্টের লাইসেন্স রহিত করেন এবং ঐ আয়ুর্ব্বেদ সভাই কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের আয়ুর্ব্বেদিক প্রাক্‌টীসনার্স বিলের প্রতিবাদ সভা আহ্বান করতঃ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কুমার বাহাদুরকে এই বিল ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করা হইতে বিরত করান।" আমরা ঐ আয়ুর্ব্বেদসভার চেষ্টায় এতগুলি জনহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার সংবাদে সুখী হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি—ঐ আয়ুর্ব্বেদ সভায় কলিকাতার বহুসংখ্যক কবিরাজই সংশ্লিষ্ট নহেন, সেইজন্য আমাদের রিপোর্টার উহার অস্তিত্বের বিষয় যে অবগত ছিলেননা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দোষ হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস—অনেক কবিরাজ এখনও পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব অবগত নহেন।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—কুমারটুলীর কবিরাজ মহাশয়দিগের চেষ্টায় গ্রে ষ্ট্রীটে যে "আয়ুর্ব্বেদ সভা"টি স্থাপিত আছে—দেশের বহুসংখ্যক কবিরাজ সেই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত। প্রতি মাসেই সেই সভার ২।৩টি অধিবেশনে অনেকগুলি বৈদ্য চিকিৎসক সম্মিলিত হইয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদের অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধও ঐ সভায় পঠিত হয়। এ অবস্থায় "আয়ুর্ব্বেদ সভা" বলিলে যে কুমারটুলীর প্রতিষ্ঠিত সভাই উপলব্ধি হইয়া থাকে তাহা আমাদের রিপোর্টারের অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যাহা হউক একই বিষয়ের দুইটি সভা না রাখিয়া সমগ্র বৈদ্য-চিকিৎসকের সম্মেলনে কলিকাতায় একটি বিরাট আয়ুর্ব্বেদীয় সভা

স্থাপনের ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় সেই "আয়ুর্ব্বেদ সভা" হইতে জনহিতকর অনেক কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারা যায়। এরূপ হইলে সমগ্র বৈদ্য-চিকিৎসকের সম্মেলনে জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। উভয় সভার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা এ বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

অবান্তর প্রসঙ্গ।—ঐ প্রতিবাদ-প্রেরক কবিরাজ বৈদ্যসভা সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সম্বন্ধে কতকগুলি অবান্তর প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে সহরের প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যয়নাধ্যাপনার প্রবর্ত্তন করা উচিত ছিল বলিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদুত্তরে ইহা জানান আবশ্যক বোধ করিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রতিষ্ঠাতাগণ সে চেষ্টা খুব বেশী করিয়াই করিয়াছিলেন, তাহা সহরের ছোট বড়—কোনো চিকিৎসকেরই জানিতে বাকী নাই, এখনও পরিচালকবর্গ সে সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট নহেন। যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিচালকবর্গ আন্তরিকই কৃতজ্ঞ, কিন্তু যাঁহারা বহু চেষ্টাসত্ত্বেও অদ্যাপি ইহার সংস্রবে আসিতে পারেন নাই—তাঁহাদের জন্য অভাব অনুভূতি ভিন্ন আর কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? ফলে এ সম্বন্ধে যে আয়ুর্ব্বেদ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের কোনো অপরাধ নাই—তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

স্বেচ্ছায় সেবাগ্রহণ।—তা' ছাড়া আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণ রীতিমত রেজেষ্ট্রি করিয়া এই কলেজকে যে সাধারণকে দান করিয়াছেন, পত্রপ্রেরক মহাশয় তাহা কি অবগত নহেন? এ অবস্থায় ইহার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠাতাগণকে আর বলিতে হইবে কেন? সকলেরই নিজের জিনিষের উন্নতির ব্যবস্থা তো সকলেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠায়—লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির প্রয়াসে যে মহাপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এস না দেশের আয়ুর্ব্বেদ উপাসক সেবকমণ্ডলী! তোমরা এই মহাপূজার হোমকুণ্ডে তোমাদের অর্জ্জিত বিদ্যার আহুতি প্রদান কর,—সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীর ঐকান্তিক সাধনায় সনাতন আয়ুর্ব্বেদের বিনষ্ট গৌরব আবার ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বসংসারে এক অভাবনীয় ও অপূর্ব্ব আলোকসুধা বিতরণে সমর্থ হইবে। হে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী-আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকামি-মহাপুরুষ! স্বেচ্ছায় এই পরম কল্যাণকর সেবাব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে কি ভাই? পারিলে কিন্তু তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া বৈদ্য-সমাজে বরণীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ
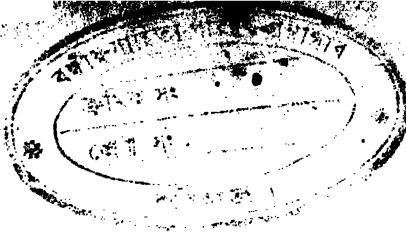
৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা।

বিষ-বিজ্ঞান।

—:০:—
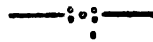
(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

সর্পের জন্ম বিবরণ।

'সৃপ' ধাতুর উত্তর 'অল্ প্রত্যয় করিয়া সর্প শব্দের উৎপত্তি। ইহার অর্থ যে জীব বক্ষে ভর দিয়া দ্রুত গমনে সমর্থ, তাহাকে সর্প বলে। সংস্কৃত অভিধানে সর্পের ৩৩৫টী নাম আছে। সকল নামের উল্লেখের আবশ্যকতা দেখিনা। আমরা কেবল কতক গুলি নামের ব্যাখ্যা করিব।

১। অকর্ণ (যাহার কর্ণ নাই)

২। অহি (যে সকলের হিংসা করে)

৩। আশীবিষ (যাহার দন্তে বিষ থাকে)

৪। উরগ (যে বুকে ভর দিয়া গমন করে)

৫। কঞ্চুকী [যাহার কঞ্চুক (খোলস আছে]

৬। কাকোদর (যাহার বক্রগামী উদর)

৭। কুণ্ডলিনী (যে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে)

৮। গূঢ় পাদ (যাহার পদ লুক্কায়িত)

৯। চক্রী (যাহার চক্র আছে)

১০। চিকুর (ব্রহ্মার কেশ হইতে উৎপন্ন)

১১। জিহ্মগ (যাহার জিহ্ম অর্থাৎ বক্র গতি)

১২। তার্ক্ষ্য (যে গমন পটু)

১৩। দর্ব্বীকর (যে ফণা বিস্তার করে)

১৪। দন্দ শূক (পুনঃ পুনঃ দংশনশীল)

১৫। দ্বিজিহ্ব (যাহার জিহ্বা দ্বিধা বিভক্ত)

১৬। দৃক্ শ্রুতি (চক্ষুই যাহার কর্ণ)

১৭। নাগ (প্রাণ নাশক)

১৮। পন্নগ (যে পা দিয়া চলে না)

১৯। পবনাশন (বায়ু ভুক্)

২০। প্রচলাকী [যাহার প্রচলাক (চক্র) আছে]

২১। ফণী (যে ফণাধর)

২২। বিষাস্য (যাহার মুখে বিষ)

২৩। ভুজঙ্গ (বক্রগামী)

২৪। ভেক ভুক (ভেক ভক্ষণকারী)

২৫। ভোগী [যাহার ভোগ (ফণা) আছে]

২৬। মরুতাশন (যে বায়ু ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে)

২৭। লেলিহান (যে পুনঃ পুনঃ লেহন করে)

২৮। শরৎ (শীতল স্পর্শ)

২৯। সরীসৃপ।

৩০। হগর (প্রাণ ঘাতক)

সর্পের অন্যান্য পর্য্যায় তাহার প্রকৃতি দেখিয়া রচিত। পাঠকগণ অভিধান পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অগ্রিয়েণাস্য তান্ দৃষ্ট্বা কেশাঃ
সীর্য্যস্তু বেধসঃ।
হীনাঃ স্বশিরসো ভূয়ঃ
সমরোহন্ ততঃ শিরঃ।
সর্পণাত্তেহ ভবন্ সর্পা হীনত্বাদ হয় স্মৃতাঃ॥

পুরাণের মতে ইহাই সর্পের জন্ম বিবরণী। আমরা বহ্নি পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। হিন্দুর ছেলে—পুরাণের গল্প—"গল্প" হইলেও তাহাকে হাস্যাস্পদ বাচালতা মনে করিতে পারি না। যাক্ পুরাণের কথা, এখন সর্প-জাতির জন্মের কথা বলি।

যৌবনোদ্গমে, সকল জীবেরই যৌন সম্মিলনের আকাঙ্খা হইয়া থাকে। ক্ষুৎ পিপাসার পরেই—এই দুর্দ্দমনীয়া প্রবৃত্তির স্থান। সঙ্গমকাল উপস্থিত হইলে সকল শ্রেণীর প্রাণীই—অধীর, উন্মত্ত, ভীষণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। সর্পজাতিও এই নিয়মের অধীন। আমাদের দেশে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সর্পজাতির যৌন সম্মিলনের ইচ্ছা প্রবল হয়। এই সময় তাহারা উন্মত্তের মত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে এবং সর্প ও সর্পিণী পরস্পরকে দেখিবা মাত্র—মিলিত হয়। পুরাণকারও বলেন—

'মাসি জ্যৈষ্ঠে তথাষাঢ়ে প্রমাদন্তি
ভুজঙ্গমাঃ।
ততো নাগো নাগিনী চ
মৈথুনং সংপ্রপদ্যতে।"

সাধারণতঃ সর্প স্বজাতীয়া সর্পিণীর সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে। স্বজাতীয়ার নিতান্ত অভাব ঘটিলে, ভিন্ন জাতীয়ার সহিতও সহবাস করে। এ যেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী না পাইলে ক্ষত্রিয়ানী, তদভাবে বৈশ্যানী, ইহারও অভাব ঘটিলে শূদ্রপত্নী গ্রহণ করেন। তাহাতে বাধা নাই। সর্প সমাজেও এই রীতি। গোক্ষুরা ও কেউটিয়া সাপ—স্বজাতীয় পুরুষে সম্মিলিত হয়, স্বজাতি না পাইলে ঢোঁড়া বা ডাঁড়াশ সাপকে খুঁজিয়া

নয়,। অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, সার্পের ও মাছের পুরুষ নাই। ইহাদের সমস্তই স্ত্রীজাতি। বর্ষাকালে মাছ ধরিলে—প্রায় সমস্ত মাছের পেটেই ডিম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সর্পের ভিতরও দেখা যায় সর্পিণীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু প্রাণি তত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন—মাছ ও সাপের ভিতর পুরুষ এমন কি নপুংসক পর্য্যন্ত আছে, তবে তাহার সংখ্যা অত্যল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন—সর্পজাতি আপনার বাচ্ছা আপনিই খাইয়া ফেলে;—পুরুষ-সর্প—পুরুষ বাচ্ছা দেখিলেই ভক্ষণ করে। মাছের স্বভাবও এই প্রকার। প্রাণিজগতের রহস্য বুঝা ভার, বানরবানরীর পুরুষ সন্তানকে সংহার করে। বিড়াল—বিড়ালীর পুরুষ বাচ্ছাকে মারিয়া ফেলে। এই জন্যই এই সকল প্রাণীর ভিতর মদ্দার চেয়ে মেদীর সংখ্যা বেশী। আবার দু' এক জন এমন কথাও বলেন—সৃষ্টিকর্ত্তার এই রূপ নিয়ম—যে, মাছের ও সাপের ডিমে স্ত্রীর ভাগ বেশী, পুরুষের ভাগ কম থাকে, এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত কিনা জানিনা, বিশেষজ্ঞেরাই তাহা বলিতে পারেন।

জীব-প্রবাহ রক্ষার জন্য যৌন সম্মিলনের লালসায়—চিরদিনই জীবজগতে উন্মত্ত চেষ্টা ও নিদারুণ প্রতিযোগিতা; সঙ্গম ঋতুতে স্ত্রীলাভের জন্য অতি নিরীহ জীবও মরণান্তক যুদ্ধের আয়োজন করে। ক্রূর প্রকৃতি সর্পের তো কথাই নাই। সহবাস কাল সমাগত হইলে, প্রবৃত্তির উত্তেজনায়—সর্পজাতিও উন্মত্ত হয়। পুরুষ দর্ব্বীকর, স্ত্রী দর্ব্বীকর না পাইলে—স্ত্রী মণ্ডলী বা রাজী মণ্ডের সহিত, উপগত হইয়া থাকে। আবার মণ্ডলীও স্বজাতীয়ার অভাবে স্ত্রী দর্ব্বীকর বা স্ত্রী রাজী মণ্ডের প্রেম ভিক্ষা করে। এইরূপ বিজাতীয় সহবাসে—যে সকল সর্প জন্মগ্রহণ করে—তাহারা দো-আঁসলা, তাহাদের নাম বৈকরঞ্জ, বক্তরা প্রভৃতি। এই জাতীয় সর্প, কেহ বা পিতৃস্বভাব কেহবা মাতৃস্বভাব পায়। রমণ কালে সবিষ সর্পও নির্বীষ সর্পকে হিংসা করে না,—বরং আশাতিরিক্ত অনুরাগ ও আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সর্প জাতির মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সুতরাং ইহাদের ভাগ্যে বিজাতীয় সংসর্গ অবশ্যম্ভাবী। গোখুরা, কেউটিয়া প্রভৃতি দর্ব্বীকর সর্পিনী, ঢোঁড়া ও দাঁড়াশকে অধিকাংশ সময় পতি নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্য অনেকের বিশ্বাস—যে সকল সর্প কৃষ্ণবর্ণ ও চক্রহীন,—সর্প জাতির মধ্যে তাহারাই পুরুষ। আর যাহাদের বিষদন্ত ও ফণা আছে, তাহারা স্ত্রী জাতীয়া। কেহ কেহ আবার এমন ভ্রান্ত ধারণাও পোষণ করেন যে, তাঁহাদের মতে কেবল দাঁড়াশ জাতীয় সর্পই পুরুষ। আর সমস্ত সর্পই স্ত্রী জাতীয়া। এই দাঁড়াশের ঔরসেই—সর্ব্ববিধ বিষধর ও বিষহীন সর্পের জন্ম। বলা বাহুল্য ইহাও ভ্রমাত্মক ধারণা।

অনেক সময় বিষধরী—সঙ্গমের পর বিষহীন স্বামীকে দংশন করিয়া ক্ষত বিক্ষত করে, সে দংশনে স্বামী মরিয়া যায়। এমনি প্রেম!!

অজ্ঞ লোকের চক্ষে—সর্পের সঙ্গম বড় পবিত্র ব্যাপার। যদি কেহ এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে, প্রাণান্তেও সে ইহা অন্যের

কাছে প্রকাশ করে না, পরন্তু আপনাকে মহা ভাগ্যবান বলিয়া মনে করে। পল্লী-বাসিগণ সর্পের সঙ্গমকে "জোড় খাওয়া" বা 'সঙ্গ লাগা' বলে। "সঙ্গলাগা" দেখিবামাত্র—তাহারা একখানি শুভ্র বস্ত্র বা উত্তরীয় সর্প মিথুনের পুরোভাগে পাতিয়া দেয়। সর্প জাতি শ্বেত বর্ণ প্রিয়। সম্মুখে শুভ্র বস্ত্র বিস্তীর্ণ দেখিয়া, যদি সর্প মিথুন তাহার উপরে আসিয়া ক্রীড়ামত্ত হয়, তাহা হইলে বস্ত্রের অধিকারী কৃতার্থ হয়। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—ঐ বস্ত্র বা উত্তরীয় সঙ্গে রাখিলে সর্ব্বজয়ী হওয়া যায়। দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, নর লোক—সর্ব্বত্রই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। নিরক্ষর ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা—ঐ বস্ত্র মাঙ্গলিকের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে। ঐ বস্ত্রের নাকি রোগ-শোক-বিপদ-বিনাশের অপূর্ব্ব শক্তি আছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ—সকলের কাছেই উহা পূজিত এবং সমাদৃত। প্রবাদ—মহারাজা মানসিংহের কাছে নাকি এইরূপ "মঙ্গলাগার" বস্ত্র ছিল, তিনি ঐ বস্ত্রের উষ্ণীষ ধারণ করিতেন,—তাই সম্রাট আকবর সাহ মানসিংহকে অত সমাদর ও সম্ভ্রম করিতেন। কিন্তু কোন আবুল ফজল ফৈজ বা গোলাম হোসেন স্বরচিত ইতি-হাসে একথা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

সহবাসের অব্যবহিত পরেই সর্পিণীর গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে। সর্পিণীর প্রসব কাল লইয়া প্রাণি-তত্ত্ববিদগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন গর্ভ সঞ্চা রের ১ মাস পরে, কেহ বলেন, ২ মাস পরে, কেহ বা বলেন ৩ কি ৪ মাস পরে সর্পিণী অণ্ড প্রসব করে। পৌরাণিকগণ বলেন—

"চতুরো বার্ষিকান্ মাসান নাগী গর্ভ মধারয়ৎ"

অর্থাৎ চারিবৎসর চারিমাস পর্য্যন্ত নাগিণী গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। শেষ—

"ততঃ কার্ত্তিক মাসেতু হ্যণ্ডকানি প্রসূয়তে।"

কার্ত্তিক মাসে অণ্ড প্রসব করে। আবার—

"অণ্ডকানাস্ত বিজ্ঞেয়ং দ্বেশতে দ্বেচ বিংশতি"

সেই অণ্ডের সংখ্যা - এককালীন দুইশত চল্লিশটী! আধুনিক মতে—সর্পিণী এককালে ৮০ আশীটির বেশী ডিম্ব প্রসব করে না। গোখুরা ও কেউটে সাপ ১৬ টা হইতে ৫০ টা, কখন কখন ৬০ টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে।

পুরাণের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের যথেষ্ট মত বৈষম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এক শ্রেণীর সাপুড়িয়া ও সাঁওতালদের মুখে শুনিয়াছি—"সর্পিণী জ্যৈষ্ঠের শেষে গর্ভবতী হয়, এক বৎসর গর্ভধারণ করে, পর বৎসর জ্যৈষ্ঠের শেষেই অণ্ড প্রসব করে। প্রসূত অণ্ডের গাত্রে জল লাগিলে—তাহা পচিয়া নষ্ট হয়।" ব্যবসায় উপলক্ষে ইহারা সর্প পালন করিয়া—এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের কথা সত্যও হইতে পারে।

প্রসূত অণ্ডগুলি মধ্যস্থলে রাখিয়া সর্পিণী তাহার চতুর্দ্দিকে স্বশরীর বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলাকারে কিছুদিন ধরিয়া অণ্ডে তাপ দিতে থাকে। সর্পের শরীর স্বভাবতঃই তাপহীন, তাহার রক্ত শীতল, কেবল ঈশ্বরের নিয়ম বৈচিত্র্যে—এই সময় সর্পের দেহে তাপের সঞ্চার হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের তাপ এবং মাতৃ দেহের উষ্ণতা যুগপৎ মিলিত হওয়ায়—ডিম্বগুলি অচিরে প্রস্ফুটিত হয়। পুরাণকার বলেন—

"ততো নিবৃত্তি চাণ্ডানি ষণ্মাসেন হি গৌতম্!"

ইহার অর্থ সাপের ডিম ফুটিতে ছয় মাস সময় লাগে।

সর্পের ডিম্ব ক্ষুদ্রাকার, কখনও গোল, কখনও লম্বা,—হংস ডিম্বের মত শুভ্রবর্ণ। কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে দেখিলে উহাতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ও গঠন-বৈচিত্র্য লক্ষিত হইয়া হইয়া থাকে। এই সকল ডিম্ব হইতে, পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক—এই তিন প্রকার সর্পপিণ্ড জন্মগ্রহণ করে। অণ্ডের বর্ণভেদে - সর্পেরও জাতিভেদ ঘটিয়া থাকে।

পুরাণের মত—

সুবর্ণার্ক বর্ণনিভাৎ পুমান্ সংজায়তেহণ্ডকাৎ।

* * * * *

অর্কোদক সুবর্ণাভাৎ দীর্ঘ রাজীব সন্নিভাৎ।
তস্মাদুৎপদ্যতে স্ত্রী বৈ অণ্ডাদ্ ব্রাহ্মণসত্তম।
শিরীষ পুষ্প বর্ণাভাদণ্ডকাৎ স্যান্নপুংসকং।

যে সকল অণ্ড সুবর্ণ ও সূর্য্য সদৃশ আভা বিশিষ্ট, সেই সকল অণ্ড হইতে পুরুষ সর্প জন্মগ্রহণ করে। যে গুলি সূর্য্য, জল বা স্বর্ণের আভা বিশিষ্ট,অথচ দীর্ঘাকার ও রাজীব সন্নিভ, তাহা হইতে স্ত্রী সর্প এবং যে অণ্ডের বর্ণ শিরীষ পুষ্পের মত সেই অণ্ড হইতে নপুংসক সর্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তবে ভরসার মধ্যে এই—সকল ডিমই ফোটে না, অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যায়, ডিম্ব নিচয় দৈবাধীন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, দৈবাধীন রক্ষা পায়। ইহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিতে হইবে। নতুবা সকল ডিম হইতে সর্পশিশু জন্মিলে পৃথিবী সর্পময়ী হইত, - অন্যান্য জীব আর বাস করিতে পারিত না। কিন্তু সর্পিণী এত অণ্ড প্রসব করে যে, তাহার সহস্রাংশের একাংশ রক্ষা পাইলেও সর্পের জীব প্রবাহ অব্যাহত থাকিবার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

জগদীশ্বরের উদার করুণায় সর্পডিম্ব স্বভাবতঃই ধ্বংসপ্রবণ। উন্মুক্ত বাতাতপে—উহা নষ্ট হয়, জল স্পৃষ্ট হইলেও পচিয়া যায়। আমাদের দেশের জনশ্রুতি "দশহরার" দিন বারিপাত হইলে সর্পডিম্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। তাহার জননশক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মঙ্গলময়ের মঙ্গলকর বিধানে সর্পিণী নিজেও নিজের অনেক অণ্ড ধ্বংস করে। প্রসবের পর নাগিণীর উদরে এমন পাচকাগ্নির "খাণ্ডব দাহণ" উপস্থিত হয়। সে ক্ষুধার তাড়নায় এত অধীরা হইয়া উঠে যে, রাক্ষসীর মত নিজের অণ্ডগুলিই খাইয়া ফেলে। পৌরাণিকের এমন বিশ্বাস—সর্পিণী ক্ষুধাতুরা হইলে স্বগর্ভজাত অণ্ডের একভাগ মাত্র রাখিয়া বাকী ৩ ভাগ উদরসাৎ করে।

"তামেব ভক্ষয়েৎ সাতু ভাগৈকং ঘৃণয়া
ত্যজেৎ।"

তথাপি ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই! তখন সর্পিণী করে কি? সেই একভাগ অবশিষ্ট অণ্ড হইতে যে সকল শিশু বহির্গত হয় তাহাদের ধরিয়াই গলাধঃকরণ করে। ইহার মধ্যেও সর্পিণীর বাহাদুরী আছে—সে বাছিয়া বাছিয়া পুরুষ ও নপুংসক বাচ্ছাই খাইয়া ফেলে, স্বজাতীয়া অর্থাৎ স্ত্রী সন্তুই গুলিকে ছাড়িয়া দেয়!

"সর্পা গ্রসন্তি সুতৌ তান্
বিনা স্ত্রী পুং নপুংসকান্।"

এ সিদ্ধান্ত অগ্নিপুরাণের। পাঠকগণ ইহা বিশ্বাস করুন আর না করুন—তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যে—সর্পজাতি স্ব-সমা-

সেরূপ শুভাকাঙ্ক্ষী নহে। তাহারা নিজের ঔরস বা গর্ভজাত অণ্ড ও শিশুগুলিকে ভক্ষণ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যে সকল শিশু কোনও প্রকারে পলাইতে পারে, তাহারাই মাতাপিতার করাল কবল হইতে রক্ষা পায়। সর্পাদি সরীসৃপের যৌনসম্মিলন—জনন প্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত। ইহাদের দাম্পত্য মিলন ক্ষণস্থায়ী। পিতামাতা কেহই অপত্যপালন বা সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে না। পিতার কার্য্য—জনন প্রক্রিয়া, মাতার কার্য্য প্রসব প্রক্রিয়া – কেবল এইটুকুই সর্পসমাজের সনাতনী নীতি।

অজগর ['অজ' ছাগ, "গর" ভোজন—যে সাপ—ছাগলকে গিলিয়া খায়, তাহার নাম অজগর] বোড়া, চিতি, ইলি, প্রভৃতি কতিপয় জাতীয় সর্প—বিষধর নহে। 'অজগরের' নামের অর্থ—ছাগভক্ষণকারী হইলেও – ইহারা গো, মহিষ, এমন কি বন্য হস্তীকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। এত বড় বিরাটকায় সর্প জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। চলিত কথায় ইহারই নাম "পাহাড়ী বোড়া"। ইহাদের স্ত্রী একটী মাত্র অণ্ড প্রসব করে, সেই অণ্ড কৌরব জননী গান্ধারীর গর্ভস্থিত অণ্ডের মত বহুধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং তাহার ভিতর হইতে অনেকগুলি "বাচ্ছা" বাহির হয়। সাধারণ বোড়া, চিতি এবং ইলি সাপ—অণ্ড প্রসব করে না, ইহাদের জরায়ু হইতে একেবারেই 'বাচ্ছা' বহির্গত হইয়া থাকে। ইলি ও চিতির পূর্ণগর্ভাবস্থায়—ইহাদের মুখের উপর গোময় চাপা দিলে—বাচ্ছা বাহির হইয়া পড়ে এবং চারিদিকে ছুটিয়া পলায়। এ দৃশ্য বড় কৌতূহলোদ্দীপক।

সর্পশিশু পূর্ণাবয়বে জন্ম গ্রহণ করে না। ডিম্ব হইতে বাহির হইলে—তাহাদের চক্ষু কর্ণ ও দন্তের অভাব থাকে, সুতরাং এ সময় তাহারা দেখিতে শুনিতে ও দংশন করিতে পারে না। অগ্নিপুরাণের মতে—"উন্মীলতে-ঽক্ষি সপ্তাহাৎ—" ৭ দিন পরে সর্প শিশু চক্ষুষ্মান্ হয়, দন্তও বিকশিত হয়। দন্তোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বিষের সঞ্চার ঘটে। কিন্তু সে বিষ স্থায়ীভাবে দন্তে অবস্থিতি করে না। কখনও আবির্ভূত কখনও বা তিরোহিত হয়।

"সপ্তাহে তু ততঃ পূর্ণে দংষ্ট্রানাস্তু বিরোহণং।
বিষস্যাগমনং তত্র বিক্ষেপশ্চ পুনঃ পুনঃ॥"

আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদেরা একথা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—সর্পশিশু সদন্ত অবস্থাতেই অণ্ড হইতে বাহির হয়। সুতরাং এক দিবস বয়স্ক বিষধর শিশুরও দংশনের ক্ষমতা থাকে, সে দংশনেও মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে।

পুরাণকর্ত্তার সিদ্ধান্ত—সপ্তাহান্তে সর্প শিশুর বিষদন্ত বাহির হয় বটে, কিন্তু সে দন্তে যথেষ্ট বিষ থাকে না; পূর্ণ বিষ প্রাপ্তির সময়—একবিংশতি রাত্রির পর। সে বিষও তত তীব্র হয় না, পরে পঞ্চবিংশতি রাত্রি পূর্ণ হইলে—সর্প শিশুর দন্ত-বিষে সদ্য প্রাণনাশক শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।* এই সময়, সর্প শিশু স্বাধীন হয়, মাতার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, আহারের চেষ্টায় ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, পিতামাতার ক্রূর স্বভাবেরও অধিকারী হইয়া উঠে।

---

* এক বিংশতি রাত্রেণ বিষং দংষ্ট্রাসু জায়তে।
নাগী পার্শ্ব সমাবর্ত্তী কাল সর্পস্তু উচ্যতে॥
পঞ্চ বিংশতি রাত্রস্তু সদ্যঃ প্রাণহরো ভবেৎ।
ষণ্মাসাজ্জাত মাত্রস্তু কঞ্চুকং বৈ প্রমুঞ্চতি॥
—ভবিষ্য পুরাণ।

ছয় মাস পরে সর্প শিশু 'খোলস' ছাড়ে, ইহাকে "বৃত্তি-মোচন" বলে। বৃত্তি মোচনের কিছু পূর্ব্বে ও পরে—সর্প জাতি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আহারান্বেষণের উদ্যম থাকে না, চ'খেও দেখিতে পায় না। গর্ত্তের ভিতর নিস্পন্দ ভাবে—শুইয়া নিদ্রা যায়।

সর্প শিশুকে কোনও দেশে "সোলুই" কোনও দেশে "জাওয়ালী", কোনও দেশে "ভেক" আবার কোনও দেশে "ড্যাম" নামে অভিহিত করে। গ্রীষ্মের শেষে, বর্ষার প্রথমে—সর্প শিশুগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সেই সময় ইহারা মানবের নেত্রপথে পতিত হয়। সর্প শিশুগণ অত্যন্ত চঞ্চল ও হিংস্র স্বভাব,—অকারণে মানুষকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। ইহাদের বিষও বড় সাপের বিষের চেয়ে তীব্র। ইহারা এতদূর সাহসী যে, বহুজনাকীর্ণ স্থানে উজ্জ্বল দিবালোকে বাহির হইতেও ভয় পায় না। একটুতেই রাগিয়া উঠে, কাষ্ঠ লোষ্ট্রে ছোবল মারে—ইহারা একা থাকে না, দল বাঁধিয়া বেড়ায়। একটু অসাবধান হইলেই ইহারা মানুষকে কামড়ায়। বড় সাপের দংশনে—দংশিত স্থানে ভীষণ প্রদাহ উপস্থিত হয়, শিশুসর্পের দংশনে ততদূর জ্বালা করে না; কীট বা পিপীলিকার দংশন বলিয়া অনুভূত হয়; কাজেই ইহাদের দংশন সামান্য মনে হওয়ায়—প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রমে দংশিত ব্যক্তি যখন বিষ-বেগে ঢলিয়া পড়ে—তখন বুঝা যায় সে দংশন বড় সাধারণ নহে—কালের দংশন। তখন আর প্রতিকারের পথ থাকে না। দংশিত ব্যক্তি মরিয়া যায়। অতএব, পূর্ণ বয়স্ক সর্পর চেয়ে শিশু সর্প—অতি সাংঘাতিক। এই জন্যই নিধু বাবুর টপ্পায় আছে—"যেমন ভুজঙ্গ শিশু মন্ত্রৌষধি মানেনা।" (ক্রমশঃ)

ম্রিয়মাণ বঙ্গপল্লী।

[শ্রীক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

জগতে বাঁচিয়া থাকা বড় সহজ নহে, বিশেষতঃ আজিকালিকার যুগে। এই দারুণ জীবন-সংগ্রামে একটু দুর্ব্বল হইলেই ভূতলশায়ী হইতে হইবে। এই ভীষণ গতির মধ্যে একটু বেচাল হইলেই অমনি তৎক্ষণাৎ কক্ষচ্যুতি ঘটিবে। কোন একটী systemএর অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে হইলে উপযুক্ত শক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। যেমন সবাই থাকে, তোমাকেও তেমনি ভাবে চলিতে হইবে। নচেৎ ব্যতিক্রম হইলেই তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য, বর্ত্তমান যুগের শিল্পবিজ্ঞান-কুশলী মানবের কাছে মান্ধাতার আমলের ধর্ম্মপ্রাণ বা কৃষিজীবী অল্পে সন্তুষ্ট অনভিজ্ঞ জীব আর টিকিতে পারেনা। মহা-

বৃক্ষের আওতায় গুল্মলতাদি অল্পপ্রাণ উদ্ভিদগুলি প্রায়ই শুকাইয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

নগরগুলি ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী ও শ্রীসম্পন্ন হইতেছে—গ্রামগুলি ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। নগরগুলি আধুনিক শিল্পবিজ্ঞান কৌশলে বাহ্যতঃ জীবন্ত, গ্রামগুলি প্রাচীন রীতি পদ্ধতি বক্ষে ধারণ করিয়া ধ্বংসসাগরে নিমজ্জমান। নগরে যাইলেই দেখা যায়, জীবনের চিহ্ন—রজোগুণের ক্রিয়া, গতি ও কোলাহল; গ্রামে নীরব নিৰ্জ্জীবতা—বিষাদ ও জড়তা। চতুর্দ্দিকে কেবল পেচক-ঘুঘু-ঝিল্লী ও শিবারব দিবারাত্র পল্লীর নির্জ্জনতা ঘোষণা করিতেছে। অবশ্য মৃত্যু সর্ব্বত্রই আছে—সহরে, নগরে, গ্রামে, পল্লীতে দিন দিন শত শত যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বালক-বালিকা কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তবে সহরে জনস্রোতের মধ্যে মালুম হয় না—গ্রামে বেশ বুঝা যায়। সহরে প্রকৃতির দু'টী ক্রিয়া যুগপৎ প্রায় সমভাবে চলিয়াছে—জন্ম ও মৃত্যু, নির্ম্মাণ ও ধ্বংস, ভাঙ্গা ও গড়া। কোথাও প্রকৃতির বিশ্বপালিনী মধুর আকৃতি—কোথাও বা ভয়ঙ্করী সংহারিণী মূর্ত্তি। কোথাও হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে—কোথাও গভীর দীর্ঘনিশ্বাস, মর্ম্মস্পর্শী করুণ ক্রন্দন।

কিন্তু বঙ্গপল্লী আজ ম্রিয়মাণ—তাহার সাড়াশব্দ নাই—গভীর নিস্তব্ধতা। দেখিলেই পরমেশ্বরের নাশিনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জলাশয়গুলির চৌপাড়ে নানাবিধ গুল্মলতাদি জন্মিয়া জল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—কচুরীদল শ্যাম পানা ঠেলিয়া অতি কষ্টে জল লইতে হয়। কোথাও পাতা পচিয়া জল দেশীয় মসীর ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মানব এখানে নিস্তেজ। যে মানব শক্তিদ্বারা বহুক্রোশব্যাপী সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিবিড় জঙ্গল ও পর্ব্বত সমাকীর্ণ প্রদেশ এখন বক্ষে রেলবর্ত্ম ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে, যে মানব-বুদ্ধি দ্বারা সুবিশাল জলাভূমি এখন উর্ব্বরশস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, যে মানব-মস্তিষ্ক পর্ব্বতমধ্যে সুড়ঙ্গ কাটিয়া রেলপথ লইয়া গিয়া বিজ্ঞানের কৌশল ঘোষণা করিতেছে, সেই জ্ঞানবিজ্ঞান দীপ্ত মানুষের অভাবেই আজ বঙ্গপল্লী ম্রিয়মান। যে দিকে যাই, কেবল বন, জঙ্গল পানা ও দুর্গন্ধ—প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী করাল মূর্ত্তি। যে কয়টী শৃগাল-চতুর-মানব দৃষ্ট হয়, তাহারা জীবিত বা প্রেতদশাপ্রাপ্ত—ভাল করিয়া না দেখিলে জানা যায় না। মূর্ত্তিমতী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী যেন ভূতলে বিচরণ করিতেছে। এই চির রোগীদিগের আর কোন শক্তি নাই—কেবল হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, মনোমালিন্য ও মোকদ্দমা-প্রিয়তা। মুখজোর যথেষ্ট আছে, কিন্তু শরীরে সামর্থ্য নাই—মনে বল নাই। কুড়ের বাদসাহ—আর যেখানে আলস্য ও উদ্যম-হীনতা, সেইখানেই ঔদাস্য, দৌর্ব্বল্য ও পরশ্রী কাতরতা। দিবাভাগে মাছধরা, তাস, পাশা, দাবা খেলা, বা মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া, সারারাত্রিতে আড্ডায় বসিয়া নানাবিধ ধূমপান ও যাত্রা থিয়েটারের আক্রা দেওয়া। অনেক গ্রামে স্কুল পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা ও থিয়েটারের জন্য প্রতিবৎসরে অনেক টাকা ব্যয় হয়। সহরের এই কুরুচি পোষক অর্থশোষক সংক্রামক রঙ্গরস অতি ক্ষুদ্র পল্লী সমাজেও

প্রবেশ করিয়াছে। পল্লীর বিড়ালটীও নেবু-গুলার সুরে ডাকে। রাখাল বালকও দশ আনা ছয় আনা চুল ছাঁটে ও বিড়ি মুখে দিয়া আলিবাবার গান ধরিয়া মাঠে গরু চরাইতে যায়। ঘরে ভাত নাই, তথাপি চোখে চশমা ও হাতে ঘড়ি চাই; সকালে উঠিয়া হাতমুখ না ধুইয়া অশুচি অবস্থায় বিছানায় বসিয়াই চা-বিস্কুট খাওয়া চাই। এইরূপ অনেক সহরে নিত্য নূতন ঢং, বিদেশী কায়দা, বাবু-গিরি, কৃত্রিমতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ঔদ্ধত্য, ব্যবসাদারী, জুয়াচুরী, বাহ্যাড়ম্বর, বাজেখরচ ও ফুটনবাবী ঢুকিয়া নির্ম্মল পল্লী জীবনের অকৈতব সরলতা, অমায়িকতা, প্রেমভক্তি, নম্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ নষ্ট করিয়াছে ও সমাজ বন্ধন বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অন্ধদাসবৎ অনুকরণের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। সহরের কুরীতি ও কদভ্যাসগুলি পল্লীগ্রামে সংক্রমিত হইয়াছে, কিন্তু যে গুণগুলি অনুকরণ করিলে বিশেষ বিশেষ উপকার হইত—উহার একটীও পল্লী শিখে নাই—যেমন উচ্চাভিলাষ, কর্ম্মপটুতা, শ্রমশীলতা, তৎপরতা, পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। কেবল কতকগুলি সেকেলে কুসংস্কার ও আধুনিক সহুরে ফ্যাসান লইয়া পল্লী মোহাচ্ছন্ন। গ্রাম বাঁচিয়া আছে মাত্র, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য জগতে যাহাকে জীবন বলে তাহার লক্ষণ খুব কম। নচেৎ সজীব মানব কি কখনও গাছ পাথরের কাছে পরাভূত হয়?

অরণ্য যেন গ্রাম খানিকে নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে। তাই চতুর্দ্দিক হইতে দ্রুত গতিতে আসিয়া বাড়ীগুলিকে গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। কোনও বাড়ীতে হয়ত একটী জরাজীর্ণা বিধবা আছেন। তিনি আর কাহার জন্য, কিসের লাগিয়া কোমর বাঁধিয়া সংসার করিবেন? যাহার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন চলিয়া গিয়াছে—সে ত অনাথা—দুনিয়ায় তাহার আর আস্থা কই? কাজেই তিনি আর কেমন করিয়া বুনো জঙ্গলের সহিত লড়াই করিয়া বাড়ীটিকে শ্রীমান্ রাখিবেন? সকাল সাঁঝে গৃহটীতে এক একবার প্রদীপ দেখান মাত্র। রান্নাঘরটীর যে অংশটুকুতে রাঁধেন, শয়ন কক্ষের যে স্থান টুকুতে শয়ন করেন, উঠানের যেখানে তুলসী মঞ্চ আছে, দরজার যেটুকুতে পা দিয়া যাতায়াত করিতে হয়—সেই সব জায়গা ব্যতীত আর কোথাও মানবহস্তকৃত কার্য্যের চিহ্ন নাই—আর সব যেন জঙ্গলের রাজ্য। বিধবাটী সাধ্যমত উপরিউক্ত স্থানগুলিকে মার্জ্জনা ও গোময় লেপন করতঃ পবিত্র ও পরিষ্কৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি আর কত কাল বাঁচিবেন? আর কয়দিনই বা এইরূপে প্রাণপণে জঙ্গল ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন? তাঁহারও মৃত্যু হইবে, জঙ্গলেরও জয় হইবে। অরণ্য তখন নির্ব্বিবাদে অবাধে গৃহটীকে গ্রাস করিয়া ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল সর্প প্রভৃতি বন্যজন্তুর লীলাভূমি করিয়া তুলিবে।

কোন কোন পল্লী এমন ঘনবনাবৃত যে দূর হইতে একটী কুটীরও পরিলক্ষিত হয় না। বাহির হইতে রাস্তা আছে কি না জানিবার উপায় নাই। নিকটে যাইলে তবে দুইপার্শ্বে নিবিড় বন, মধ্যস্থলে এক অতি সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকেই কেমন একটা বুনো দুর্গন্ধ—সেরূপ পূতিগন্ধ সহরে বা নগরে কোথাও অনুভূত হয় না। কোনও স্থানে গোগাড়ীর পথের ধারে এমন কণ্টকাকীর্ণ

ঝোপ দুইদিক হইতে চাপিয়া পড়িয়াছে যে, শকট চালক অতিকষ্টে সেই দুর্গম পথে যাতায়াত করে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া সকলে মিলিয়া কাঁটাগাছগুলি কাটিয়া রাস্তা সাফ রাখিবার মতলব কাহারও মনোমধ্যে উদিত হয় না। দুইবেলা কত ক্লেশসহকারে সেই পথে গতাগতি করে, তথাপি কষ্ট নিবারণের চেষ্টা কাহারও নাই। কাজ করিবে কি, কাজের ধারণাও মনে স্থান পায়না। ভগবান্ কত প্রকার জীবই সৃষ্টি করিয়াছেন! কেহ কাজের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে—নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই; কেহবা অলসের রাজা—শুইয়া, বসিয়া, হাঁই তুলিয়া কোনরকমে কালাতিপাত করে। উন্নতির চেষ্টা—বাঁচিবার জন্য যত্ন, প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিকতা নাই। সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে—দিনের পর দিন আসিতেছে, বারমাস, ছয়ঋতু যথানিয়মে ঘুরিতেছে—সবই দেখিতেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে যে তিল তিল করিয়া আয়ুঃক্ষয় হইতেছে সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। কতশত আত্মীয়বন্ধু চোখের উপর প্রতিনিয়ত অকাল মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতেছে. কিন্তু যাহারা জীবিত বা জীবন্মৃত তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। কি আশ্চর্য্য ভগবদ্ মায়া! মনের আনন্দে বনবাস-সুখ উপভোগ করিতেছে। বনের মধ্যে বাস—বনের মধ্যে যাতায়াত, বনের মধ্যে আমোদ প্রমোদ। বন তাহাদের বড় প্রিয়, তাই এই বন মানুষগুলি জঙ্গল কাটিয়া ফাঁকা মাঠ করিয়া বিশুদ্ধ ও মুক্ত বায়ু সেবনে সম্পূর্ণ নারাজ। কি রুচির পার্থক্য! একই রক্ত মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি উপকরণে গঠিত মানব দেশ ও কালভেদে কত পৃথক্! এক-স্থানের মানুষ যাতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য প্রকাণ্ড খাল কাটিয়া দু'টী বৃহৎ সাগরকে সংযুক্ত করে; আর এক স্থানের মানুষ একতা ও সহযোগিতার অভাবে ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে পারে না;—জঙ্গল ও পানা ঠেলিয়া প্রত্যহ স্নান করে, তথাপি জলাশয়গুলির সংস্কার বা বন পরিষ্কার করিতে কাহারও উৎসাহ নাই। এইরূপ উদ্যমহীন নিশ্চেষ্ট মানবের দ্বারা জগতের কোনও উপকার সাধিত হয় না। এইরূপ মানব আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বন ভুলিয়া, হাত পা ছাড়িয়া স্রোতের শৈবালের মত দ্রুতবেগে ধ্বংসসাগরের দিকে ভাসিয়া যায়। তাহারা মানুষ, তাহাদিগের অচল অটল প্রতিজ্ঞার কাছে অভ্রভেদী পর্ব্বত পথ দিতে বাধ্য—সাগর তাহাদের বীরত্বের কাছে পরাভূত,—গহন কানন তাহাদিগের কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মনোহর শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত,—কোলাহল মুখরিত সুন্দর জনপদে সুশোভিত। এমন বীর না হইলে কি, ধরিত্রী উপভোগ করা যায়? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সাহস, প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় বলে মানব আজ জড় জগতের অধীশ্বর। জড় বিজ্ঞানে মানবের আজ ত্রিভুবনে অব্যাহত গতি। তাহাই সুসম্পন্ন হইবে—যাহা তুমি প্রাণের সহিত করিবে। না করিলে কি কোন কার্য্য আপনা হইতে সংসাধিত হয়? কল্পনায় আকাশকুসুম—ভাবে হৃদয়স্পর্শী কবিতা রচিত হয়। কিন্তু জাগতিক কল্যাণ সাধন করিতে হইলে শুধু কল্পনা রাজ্যে ভাবসাগরে সাঁতার দিলে চলে কি? মানুষ হইতে হইলে কেবল ভাবপ্রবণতায় চলিবেনা। পরিশ্রম

ও দৃঢ় প্রযত্ন সহকারে কর্ম্মপথে অগ্রসর হও, হাতে-পায়ে মনের জোর লাগাইয়া, কাস্তে-কোদাল-কুড়ুল ধরিয়া সবলে আঘাত কর। দেখ, বসুমতী তোমায় সোণা ফলাইয়া দেয় কি না। দেখ, তুমি এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পার কি না। মানুষ মানুষকে বশ করে, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ, গাছপালা, গুল্মলতা, বন জঙ্গলকে পরাজিত করিতে পারেনা। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

গ্রামে কত বড় বড় বাড়ী ঘনবনাচ্ছন্ন হইয়া যেন ধ্যাননিমগ্ন! কত সাধ—কত আশা—কত আহ্লাদ ভরে মানুষ এই প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মনের সুখে স্ত্রীপুত্র পৌত্রাদি লইয়া বাস করিবে। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! মানুষ কি ক্ষণভঙ্গুর! তাহার কত সাধের বাসভবন, উদ্যান-বাটিকা, পুষ্করিণী যেন তাহাদের প্রভুর মৃত্যুতে জগতের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বিষয়ে গভীর চিন্তাপরায়ণ। মানবের সৃষ্টবস্তু পড়িয়া আছে, কিন্তু স্রষ্টা কই? জড় জগৎ কতকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—কত যুগব্যাপী মহাপ্রাণ বট ও অশ্বত্থ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। কিন্তু যিনি রোপন করিয়াছিলেন সেই বুদ্ধিজীবী মানব কই? প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে যে সুদৃঢ় দুর্গ আছে, উহা দেখিলেই মনে হয়—"আহা! সেই মহাত্মা আকবর কোথায়—যিনি হিন্দুমুসলমান সকলকে প্রেমডোরে বাঁধিয়াছিলেন; যাঁহার রাজত্বে ভারত আবার সেই প্রাচীন কালের নির্ম্মল সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি উপভোগ করিয়াছিল?" বীর মানসিংহের অম্বরে যাও, দেখিবে—মানের জড়ভোগবিলাসের উচ্চ প্রাসাদ, উদ্যান প্রস্রবন—সবই আছে, কেবল রাজপুত-কেশরী মান নাই। মানুষ কত কায়েমী ঘর বাড়ী বাগান প্রভৃতি তৈয়ারী করে, কিন্তু বহুকাল ভোগ করিতে পার না। কালের কত আঘাত সহ্য করিয়া এই সব ইট-কাঠ-পাথর দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মানুষ কি কোমল—কি ঠুনকো! একটু ধাক্কা লাগিলেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। মানব জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর বটেই—চীনে মাটীর বাসনের ন্যায় ঠুনকো, কলির মানব যেন জলবুদ্বুদ অপেক্ষাও ক্ষণ স্থায়ী। এই আছে, এই নাই।

গৃহের পার্শ্বে একটী করিয়া ডোবা রাখা যেন তখনকার প্রথা ছিল। অবশ্য তখন লোকের অবস্থা এত হীন হয় নাই—শরীরে সামর্থ্য ও মনে বল ছিল। সেজন্য কর্ত্তারা এই পুকুর গুলির মধ্যে মধ্যে পঙ্কোদ্ধার করিতেন ও গাছপালা কাটিয়া দিতেন। এখন সেই বাড়ীর পার্শ্বে ডোবাগুলিই ম্যালেরিয়া বিষের ডিপো হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষাকালে জল বাড়িলে বাড়ীর উঠান পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়—পানা-শেওলা ও অন্যান্য জলজ গুল্মলতাদি আসিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে। ঘরের মেঝে অত্যন্ত সাঁতসেতে হয়—ও চারিদিকেই একটা পচা দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। এই ডোবা-তেই বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তরকারী ও মাছ ধোওয়া প্রভৃতি অনেক কার্য্য সাধিত হয়। পাতা পচিয়া জলের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে ও চৌপাড়ে বনজঙ্গল জন্মিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল কারণ মশক বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে। কোন কোন জেলার অনেক গ্রামে এই সব

রোগের কুঠী—পচা পুকুর ও ডোবা ভরাট করিবার উপায় নাই। তাহা হইলে জলকষ্ট হইবে। কারণ সেদিকে কূপ বা ইদারার বেওয়াজ নাই। কাজেই লোকে ডোবার জল ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। স্থানে স্থানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রদত্ত অর্থদ্বারা ২।১টী পুকুর ও কূপ খনন করা হইয়াছে। অনেকেই উহাতে স্নান করে ও উহার জল পানীয় রূপে ব্যবহার করে। কিন্তু যাহাদিগের বিচার শক্তি নিতান্ত কম, তাহারা সেই পুরাতন গর্ত্ত বা ডোবার বিষাক্ত জল ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করেনা, কাজেই তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া শেষে সমগ্র গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। [ক্রমশঃ]

আয়ুর্ব্বেদ প্রতিভা।

(দৃশ্যকাব্য)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩য় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য।

আতুরালয়, সময়—পরাহ্ন।

সুকন্যা।

সুকন্যা।—এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে। ঋষিবৃন্দের মনোরথ পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই হ'ছল কিন্তু আমি তা'তেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হ'তে পারিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, পিতাকে ব'লে তাঁ'র বিশাল সাম্রাজ্যের সাহায্য নিয়ে এই আতুরালয়ের প্রতিষ্ঠা করা। পিতা আমার সে অভিলাষ পূর্ণ ক'রেছেন। ঋষিবৃন্দ ইহার পরিচালনার ভার নিয়েছেন, আমি এতদিনে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। আতুর সেবার ন্যায় মহান্ ধর্ম্ম জগতে আর কি আছে? দম, দয়া ও দান এই তিনটি বিষয়—আমার বিশ্বাসে সর্ব্বধর্ম্মের প্রধান। দম অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে চিত্ত সংযম, জীবে দয়া এবং সহায়সম্পদ বিহীন অনাথগণকে দান ক'রতে পা'রলে আত্মার যেরূপ তৃপ্তিলাভ হয়, সেরূপ তৃপ্তি তো আর কিছুতেই হ'তে পারে না। দানের মধ্যেও যত প্রকার দান আছে, তা'র মধ্যে আতুরের জীবন দানের মত ধর্ম্ম আর কি আছে? একটি মৃতকল্প রোগীর জীবন রক্ষা ক'রতে পা'রলে কালে তা'র দ্বারা জগতের কত প্রকার হিতসাধনই না হ'তে পারে! পিতা দয়া ক'রে এই আতুরালয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছেন, ঋষিরা রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রছেন, আর আমি—আমার আর কি শক্তি আছে? আমি তা'দের সুশ্রূষানিরতা হ'য়ে এই নরজীবনে ধন্যমনা হ'তে পা'রছি। এতেই আমার পরম সুখ। ভগবান্! আমাকে জন্ম জন্মান্তরে যেন এইরূপ সুখে সুখিনী ক'র, তোমার চরণে ইহাই প্রার্থনা।

(অনুজন শল্যবিদ্ধ আতুরকে লইয়া কয়েকটি লোকের প্রবেশ)

প্রবেশকারী ১ম।—মা! এই লোকটির দক্ষিণ হস্তে ভীষণভাবে শল্যবিদ্ধ হ'য়েছে। এক কিরাত তা'র পশুবৃত্তি চরিতার্থ ক'রতে গিয়ে এই ভীষণ অনর্থ ঘটিয়েছে। মা! আহত স্থান দিয়ে ভীষণ ভাবে রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আহত ব্যক্তি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছে। তাই মা, আপনার এই আতুরালয়ের নাম শ্রবণ ক'রে আমরা ধরাধরি ক'রে একে নিয়ে এসেছি। আপনি একে রক্ষা করুন, চিকিৎসার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

[সুকন্যা শল্যবিদ্ধ আতুরের অবস্থা সন্দর্শনে বড়ই কাতরা হইলেন, তাহার পর বলিলেন]

সুক।- ইহাকে ঐ পার্শ্বের কক্ষে লইয়া চল। আমি ঋষিবৃন্দকে ডেকে এখনি এর চিকিৎসার বন্দোবস্ত ক'রছি।

(পটপরিবর্ত্তন)

[কয়েকটি রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি শায়িত রহিয়াছে, আত্রেয়, চ্যবন, প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন সেই সময় শল্যবিদ্ধ আতুরকে লইয়া অনুচরেরা প্রবেশ করিল, সুকন্যাও তাহাদের পশ্চাতে আসিলেন]

সুকন্যা।—মহর্ষিগণ। এই আতুরটির দক্ষিণহস্তে শল্যবিদ্ধ হ'য়েছে। আপনারা দয়া ক'রে এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

[ঋষিবৃন্দ আতুরটির অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর আত্রেয় বলিলেন]

আত্রেয়।- এ তো মা! আমাদের সাধ্যে কুলাইবে না। ইহার শল্যোদ্ধারের জন্য শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক। সে শস্ত্র প্রয়োগের শিক্ষা আমরা কেহই যে অবগত নহি। কি করিব মা! ইহার রোগ-প্রতীকারে আমরা একান্তই অসমর্থ।

সুকন্যা।—তবে কি আপনারা একটা চিকিৎসার ভান মাত্র অবলম্বন ক'রে চিকিৎসা বিদ্যা প্রচারে অগ্রসর হ'য়েছেন? শস্ত্র প্রয়োগে আপনাদের অভিজ্ঞতা নাই ব'লে রোগ-রাক্ষসগণ তো ব'সে থাক্‌বে না। তা'রা প্রাণীদিগকে উৎপীড়ন করবার জন্য নানামূর্ত্তিতেই তা'দের আক্রমণ ক'রবে। যা'হোক, এখন এই আতুরের জীবনরক্ষার উপায় কি বলুন। যেরূপ রক্তনির্গত হ'চ্ছে তা'তে অতি শীঘ্র যদি এর প্রতীকারের ব্যবস্থা না হয়, তা'হ'লে অচির-কাল মধ্যে এ ব্যক্তির যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘ'টবে, সে বিষয়ে তো সন্দেহ মাত্র নেই। আপনারা শস্ত্রসাধ্যকর্ম্মে অভ্যস্ত নন, কিন্তু শুনেছি, মহর্ষি সুশ্রুত তো এ বিদ্যায় যশস্বী হ'য়েছেন। এই মুহূর্ত্তে তাঁকে কি পা'বার কোনো উপায় নাই!

আত্রেয়। স্থির হও মা। আমি ধ্যান নিরত হয়ে আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে তাঁকে এখনি এখানে আনয়ন ক'রছি। তুমি ঠিকই ব'লেছ—তাঁর দ্বারাই এ আতুরের জীবন রক্ষা হ'বে।

[এই বলিয়া মহর্ষি আত্রেয় সমাধিস্থ হইলেন এবং অল্পকাল পরেই মহর্ষি সুশ্রুত কয়েক প্রকার শস্ত্র হস্তে সেই আতুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া উৎফুল্ল

হইলেন এবং প্রণাম ও অভিবাদন করিলেন। তাহার পর আত্রেয় বলিলেন]

আত্রেয়।—ঋষি প্রবর! আমরা চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইছি বটে, কিন্তু সকল প্রকার চিকিৎসার শক্তি আমাদের নাই। সংপ্রতি এই আতুরালয়ে এই শল্যবিদ্ধ আতুরের উপস্থিতিতে আমরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আপনাকে স্মরণ ক'রেছি। আপনি এক্ষণে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা ক'রে আমাদিগকে সুখী করুন।

[সুশ্রুত রোগীর অবস্থা উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন]

সুশ্রুত।— এর অবস্থা যেরূপ ভীষণ হ'য়ে প'ড়েছে, তা'তে প্রতীকারের উপায় বড় শক্ত। বহুক্ষণ অচিকিৎসায় শল্য যেরূপ ভাবে এর মর্ম্ম সকলে প্রবিষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে, তা'তে একে রক্ষা করতে হ'লে এর আহত স্থান থেকে হস্তের সমস্ত প্রদেশ একেবারে বাদ দিয়া ফেলতে হ'বে। তা'র পর ঐ হস্ত পূর্ব্বাকৃতি প্রাপ্ত হ'তে পারে—যদি আর এক জন নিজ হস্ত কর্ত্তন ক'রে ওকে তা' দান ক'রতে পারেন। যিনি এর জন্য নিজের হস্ত দান ক'রবেন, তাঁর প্রাণ বিনাশের কোনো আশঙ্কা নাই, কিন্তু চিরদিনের জন্য তাঁ'কে হস্ত হীন হ'য়ে থাকতে হ'বে। আপনাদের মধ্যে এই আতুরের জন্য কি কেহ সেরূপ কর্'তে সমর্থ আছেন?

[ঋষিবৃন্দ সুশ্রুতের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন]

সুকন্যা।—মহর্ষি! আমি প্রস্তুত আছি। আমি এই আমার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ ক'রে দিচ্ছি—আপনি এই মুহূর্ত্তে আমার হস্ত ছেদন ক'রে পীড়িতের জীবন রক্ষা করুন।

[সমবেত ঋষিবৃন্দ অবাক হইয়া পড়িলেন। সুশ্রুতও আশ্চর্য্য অনুভব করিলেন]

সুকন্যা।—মহর্ষি! দ্বিধা বোধ ক'রবেন না। আর বিলম্ব ক'রলে এর যে মৃত্যু হ'বে, তা' নিশ্চয়। তখন আপনি সহস্র চেষ্টা ক'রেও আর জীবন রক্ষা ক'তে পা'রবেন না। এই আমার হস্ত প্রসারণ ক'রে রই'ছি—শীঘ্রই আপনি ইহা কর্ত্তন ক'রে পীড়িতের হস্তে যোজনা করুন।

চ্যবন। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) না মহর্ষি! ঐ পবিত্র হৃদয়া পরোপকার ধর্ম্ম নিরতা-সতী সাধ্বী মহিলার হস্ত ছেদন ক'রবেন না। ওঁর পরিবর্ত্তে আমি আমার এই হস্ত প্রসারণ ক'রে দিচ্ছি, আপনি আমার হস্ত ছেদন ক'রে আর্ত্তব্যক্তির জীবন রক্ষা করুন। আসুন, আর দ্বিধা বোধ কর্ব্বেন না, আমি এই হস্ত প্রসারণ ক'রে রইলাম।

সুকন্যা।—না প্রভো! আপনার ঐ বাহু আমি কিছুতেই নষ্ট ক'রতে দিবনা। আমি আপনার সহধর্ম্মিণী, রমণী জাতির জন্ম কি শুধু নিজের বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য? রমণী সর্ব্ব প্রকারে স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্যকারিণী হ'বে—ইহাই রমণী জাতির জীবনের উদ্দেশ্য। আপনি যখন এই বিপন্নের রক্ষার জন্য স্বীয় বাহুর ছেদনে পরম ধর্ম্ম মনে ক'রছেন, তখন আপনার সহধর্ম্মিণী উপস্থিত থাকতে উহা আপনার কার্য্য নহে, উহা তাহারই কার্য্য। আমি আপনার এই মতি প্রবৃত্তি দেখে যেরূপ উৎফুল্ল হই'ছি, আমার বাহু শূন্য হ'লে তজ্জনিত কোনো প্রকার যন্ত্রণাই

অনুভূমি হ'বেনা। আসুন মহর্ষি! আর কাল বিলম্ব না ক'রে—আসুন, শীঘ্র আমার হস্ত ছেদন করুন।

সুশ্রুত।—মহর্ষি চ্যবন! লোক হিতব্রতে ব্রতী চ্যবন পত্নী! আপনাদের উভয়ের এইরূপ আচরণে কিন্তু যথার্থই চিকিৎসার সময় নষ্ট হ'চ্ছে। আপনারা এরূপ ক'রলে তো চ'লবেনা। উভয়ে পরামর্শ ক'রে কা'র হস্ত ছেদন করা হ'বে—স্থিরনির্ণয় করুন। নতুবা এই বিলম্বিত সময়ের জন্য সত্যই রোগীকে রক্ষা করা কঠিন হ'বে।

সুকন্যা।—আমার হস্ত ছেদন করুন।

চ্যবন।—আমার হস্ত ছেদন করুন।

সুকন্যা।—প্রভো! নিরস্ত হউন; আমি কিছুতেই আপনার হস্ত নষ্ট ক'রতে দিবনা।

এই বলিয়া সুকন্যা স্বীয় দক্ষিণ হস্ত সুশ্রুতের নিকট বিস্তারণ করিলেন। সুশ্রুত উহা ছেদনে উদ্যত হইলেন। এমন সময় স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহসা আবির্ভূত হইয়া সুশ্রুতকে বলিলেন]

১ অঃ কুঃ।—মহর্ষি! কাহারো হস্ত ছেদনের প্রয়োজন হ'বেনা। আপনি এই ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা পীড়িতের শল্য উদ্ধারে সচেষ্ট হউন। উহাতেই কৃতকার্য্য হ'বেন।

(সুশ্রুত ও সমবেত ঋষি মণ্ডলী অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে প্রণাম করিলেন এবং সুশ্রুত যথা আজ্ঞা বলিয়া ব্রীহিমুখ অস্ত্র সাহায্যে নিমেষের মধ্যে পীড়িত ব্যক্তির শল্য উদ্ধার করিয়া রক্ত নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুকন্যার মস্তোকোপরি আবার পুষ্প-বৃষ্টি হইল এবং দেব কুমারদ্বয় আবার আবির্ভূত হইয়া সঙ্গীতের রোল তুলিলেন)

গীত।

ধন্য গো ভারত রমণী।
যুগে যুগে তুমি ধন্য করিছ,
হইয়া আর্য্য বরণী॥
স্নেহ দিয়ে তব হৃদয় গড়া,
যত দয়া রাশি পরাণে ভরা,—
যা' কিছু ধর্ম্ম তোমারি মর্ম্মে,
ওই মধুর উজ্জ্বল বরণী।
তুমি পুণ্যময়ী—পুণ্যে তোমার
ধরণী সহিছে এত পাপভার,
মিলিবেনা আর তোমার মতন
খুঁজিলে সমগ্র অবনী।
(দেবকুমার দ্বয়ের প্রস্থান)

[ক্রমশঃ]

শিশুদের যকৃৎরোগ।

(Infantile Liver.)

[ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ।]

—:•:—

ইতিপূর্ব্বে পত্রান্তরে দেখাইয়াছি, ভারতে তথা বঙ্গে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার ক্রমাগতই বাড়িতেছে। আবার শিশু মৃত্যুর হার আলোচনা করিতে গেলে আতঙ্কে হৃদয় শিহ-

হইয়া উঠে। পল্লীর শিশুর প্রধান রোগ পেঁচোয় পাওয়া এবং কলিকাতায় শিশুর—ধনুষ্টঙ্কার ও শিশু যকৃত বা ইন্‌ফ্যাণ্টাইল লিভার। লণ্ডনে বৎসরে হাজার করা ৮০টা শিশু মরে। কিন্তু কলিকাতা নগরীতে শিশু মৃত্যুর হার হাজার করা ২৫০। আসমান জমি ফারাক। কলিকাতার অধিকাংশ শিশু যে ব্যারামে ইহলীলা সংবরণ করে সেই শিশু যকৃৎ সম্বন্ধে আজ দুচারিটী কথা বলিব।

নানারকমের পীড়ায় অধিকাংশ শিশু প্রথম বৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইন্‌ফ্যাণ্টাইল লিভার সাধারণতঃ ৫।৬ মাসের শিশু হইতে ২।৩ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের মধ্যে হইতে দেখা যায়। প্রায়ই দাঁত উঠিবার সময়ে এই পীড়ার আধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শিশুদের যকৃত অপেক্ষাকৃত বৃহতই থাকে, সুতরাং শিশু যকৃতের প্রথমাবস্থায় রোগ নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে। তবে কতকগুলি লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, শিশুর সাদা বা মেটে রঙ্গের বাহ্যে যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি জ্ঞাপক, দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময় অথবা স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent Fever) অনেক সময়ে শিশু যকৃতের সূচনারূপে—পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, শিশুর ক্ষুধা লোপ পায়, সে ভাল খায় না, খাইয়া বমন করিয়া ফেলে, দিনে দিনে স্ফূর্ত্তির হ্রাস হইতে থাকে, দুর্গন্ধ যুক্ত দমকা বাহ্যে করে, দেখিতে প্রায় ঘোলের মত, অল্প অল্প জ্বর বাড়িতে থাকে, বাড়িরে কখনও প্রকাশ পায়, কখনও পায় না।

এই ভাবে দুই চারি সপ্তাহ কাটিয়া গেলে, প্রায়ই দেখা যায়, যকৃৎটী বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ ২।৩ ইঞ্চি বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই বৃদ্ধির হার যে অত্যন্ত দ্রুত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়—অতি অল্প দিনের মধ্যেই যকৃৎ কুচকীর উপরদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে পোর্টাল সিষ্টেমের (Portal system কার্য্য অর্থাৎ রক্ত সঞ্চালনাদি রীতিমত হয় না, সুতরাং পেটের উপরকার শিরাগুলি কমল সবুজবর্ণ হইয়া যায়, ক্রমে শোথ, কামলা, অন্ত্ররোগ ও হৃদরোগ পর্দায় জলসঞ্চয় হইয়া থাকে।

এখন হইতে জ্বর প্রায়ই ২৪ ঘণ্টার জন্য লাগিয়া থাকে। প্রস্রাব হলুদবর্ণ হয়, কাপড়ে প্রস্রাবের হলুদরঙ্গের দাগ ধরে, চক্ষু, মুখ, দেহের ত্বক প্রভৃতি হলুদবর্ণ হইয়া যায়।

অধিকাংশ শিশুরই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কাহারও কাহারও হলুদবর্ণের পাতলা মল দাস্ত হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়, পা এবং পেটে শোথের লক্ষণ দেখা দেয়, পীড়া সংঘাতিক আকার ধারণ করিলে, অনেক শিশুর কালচেপানা রক্তবমন হইতে দেখা যায়, কাহারও বমনে কাফিচূর্ণের ন্যায় পদার্থ পড়িয়া থাকে, এই সময় হইতে শিশুগণ নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে, তাহাদের আর চঞ্চলতা থাকে না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই থাকে, শোণিত পিত্তবিষে দূষিত হয়, ক্রমে শিশুর চৈতন্য ও জ্ঞানের লোপ ঘটে, মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন কোন শিশু ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অস্থিরতা, শিরোলুণ্ঠন, শ্বাসকষ্ট এই জ্বরের শেষ উপসর্গ।

শবচ্ছেদ পরীক্ষায় জানা যায়—এই পীড়ায় মৃত্যু হইলে যকৃতের সূত্রময়বিধানের (Fibrous tissue) সংখ্যা বাড়িয়া তাহাদের প্রচাপনে কোষগুলিকে (Cells) এক কালীন

দুগ্ধ করিয়া দেয়, এই সমস্ত Fibrous tissue যকৃতের কোষগুলির চারিদিক বেষ্টন করিয়া থাকে, সুতরাং যকৃতের আকার বাড়িয়া উঠে, যকৃতের উপরিভাগ হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশচয় (লবিউল) দৃষ্ট হইয়া থাকে, পিত্তকোষ সঙ্কুচিত হয়, সেজন্য তাহাতে পিত্ত থাকে না।

ইহার কারণতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই—কলিকাতা মহানগরীতেই এই ব্যারামের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় এবং দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের সন্তানেরাই এই পীড়ায় বেশী পরিমাণে আক্রান্ত হইয়া থাকে, বিকৃত দুগ্ধই ইহার প্রধানতম কারণ বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। কলিকাতার দুগ্ধ এত অধিকমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, যে, সে দুগ্ধ সংগ্রহ করা গরীবদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তানদের মুখে একটু দুগ্ধ দিতে না পারিলেও তাহাদের অক্ষমতা পরিণামে 'শাপে বর' হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিক কলিকাতা সহরে শিশু-যকৃতের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বিহারীলাল ভাদুড়ী অনেককেই উপদেশ দিতেন, 'ছেলেকে বার্লি খাইতে দিও', এই উপদেশ শুনিয়া এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—"শুধু বার্লি খাইয়া ছেলে কেমন করিয়া বাঁচিবে, বার্লি খাইতে চাহেনা, ছেলে কাঁদে"। ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন —"বার্লি খাইয়া ঘোড়ারা গাড়ি টানে, তোমার ছেলে বাঁচিবে না? এখন ছেলে কাঁদে, পরে তোমরা কাঁদবে" যাহা হোক এ তর্কের মীমাংসা আমরা পরে বিস্তারিত ভাবে করিব। এইক্ষণে দুগ্ধ কিরূপে বিকৃত হয় তাহারই কিছু আলোচনা করা যাউক।

যে সমস্ত গাভী উন্মুক্ত ময়দানে বিচরণ করিতে পায় না, সর্ব্বদাই অন্ধকার গৃহে বা একস্থানে আবদ্ধ থাকে, তাহাদের দুগ্ধ কখনও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না, কলিকাতায় স্থানীয় দুগ্ধ মাত্রেই যে এই দোষে দুষ্ট তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, ইহা ভিন্ন অসভ্য-ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য গোয়ালাদের জন্য কলিকাতায় ফুকাদেওয়া দুগ্ধের প্রচলন অত্যন্ত অধিক। এইরূপ দুগ্ধ শিশুদেহে বিষের ন্যায় কার্য্য করে। দুগ্ধ নিকটস্থ পদার্থের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের গৃহ এবং গোশালার চতুর্দ্দিকস্থ পচা নর্দ্দামা ইত্যাদি দুর্গন্ধ দুগ্ধে মিশ্রিত হইয়া নানারূপ—বিশেষতঃ এই ব্যাধির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

মফস্বলের অশিক্ষিত দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা দুগ্ধের মধ্যে পচা খানা ডোবার বিবিধ জীবাণু মিশ্রিত জল মিশাইয়া দুগ্ধকে যে কিরূপ অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না।

অম্লপীড়া, পারদ বা উপদংশ দোষযুক্ত প্রসূতির দুগ্ধ পানে শিশুর যকৃত রোগ হইতে পারে। অতিরিক্ত দুগ্ধপান জনিত অজীর্ণতাও ইহার অন্যতম কারণ। অনেক প্রসূতি মনে করিয়া থাকেন—ছেলেকে পেট পুরিয়া দুধ না খাওয়াইলে সে মোটা সোটা হওয়া তো দূরের কথা —অধিকদিন বাঁচিবেই না। অশিক্ষিতা মেয়েদের সহিত এ বিষয়ে কোন তর্কও করা যায় না, কারণ তাঁহারা হয়ত মনে করিয়া বসেন, দুধের খরচ কমাইবার ইহা এক নূতনতর ফন্দী। শিশুদের যথেচ্ছ হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে না দিয়া অনবরত

কোলে কোলে রাখাও বিশেষ অন্যায়, ইহাতে তাহাদের অঙ্গগুলি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না, শিক্ষিত আখ্যাধারী ধনী ও অশিক্ষিত 'চাষা'। দরিদ্র ঘরের শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার পরিণাম ফল বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়। (ক্রমশঃ)

দম্পতী-জীবন।

"সন্তান"

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন, ধন্বন্তরি, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ দৈবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃ-ঋণ এই তিনটী ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাহার মধ্যে পূজা-যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া যেমন দৈবঋণ হইতে, শাস্ত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি দ্বারা যেমন ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয় সেইরূপ সন্তানোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। বংশ রক্ষা না হইলে সে বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণের "পিণ্ড" ও তর্পণাদি ক্রিয়া সকল লুপ্ত হওয়ায় অধোগতি ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু গৃহস্থের সুসন্তান একটী পরম আদরের বস্তু। সন্তান গৃহস্থাশ্রমের মূলীভূত কারণ। গৃহ সাজাইবার অনন্ত সাধারণ উপকরণ ও দম্পতী-বিটপীর সমধুর ফল শাখা। প্রশাখা যুক্ত মহাবৃক্ষ যেমন পুষ্প-ফলের দ্বারা সমৃদ্ধ হইলে শোভা পায়—সেইরূপ সম্পদ্ যুক্ত দম্পতীরও সুসন্তানের দ্বারা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। যে পর্য্যন্ত পুত্র উৎপন্ন না হয়—ততদিন ঋতুকালে ভার্য্যা গমন পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ভ্রূণ হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সন্তানোৎপাদন দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ড রক্ষা এবং বংশ রক্ষাই বিবাহের ফল, তবে শরীর অসুস্থ হইলে বা নিকটে না রহিলে অথবা অন্য কোনরূপ বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে ঋতু কালে গমন না করিলেও প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয় না।

সুস্থ সন্তান জন্মাইতে হইলে দম্পতীর পরস্পর ঔৎসুক্য ও মানসিক হর্ষ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পরস্পর অনুরাগ, ঔৎসুক্য এবং হর্ষের উদ্রেক না হইলে গর্ভের উপাদান শুক্র ও আর্ত্তব শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষরিত হয় না। শুক্র ও আর্ত্তব অল্প পরিমাণে ক্ষরিত হইলে উহার সংযোগে যে গর্ভ হয়, সে গর্ভ বিশেষভাবে পুষ্ট হইতে পারে না, এইজন্য যাহাতে হর্ষ, ঔৎসুক্য পরিস্ফুট হয়, তাহা সম্পাদন করা প্রয়োজন।

দম্পতীর শয্যা দুগ্ধফেননিভ ধবল, কোমল বিস্তীর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্যে সৌরভময়ী ও নানাবিধ পুষ্প দ্বারা সুশোভিতা হওয়া উচিত। পুরুষ পূর্ব্ব হইতে শুক্রবৃদ্ধিকর দ্রব্য—মোটামুটি দুগ্ধ ও ঘৃতপক্ব দ্রব্য এবং স্ত্রী রজোবর্দ্ধক দ্রব্য মৎস্য-তৈলপক্ব দ্রব্য-মাষকলাই প্রভৃতি ভক্ষণ করিবেন। উভয়েই শুভ্রবস্ত্র পরিধান, চন্দন অগুরু

প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য অনুলেপন, পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া নানা বেশভূষায় ভূষিত হইয়া পুরুষ দক্ষিণপদে এবং স্ত্রী বামপদে শয্যায় আরোহণ করিবেন।

রজোনিবৃত্তি হইলে ঋতুর চতুর্থ দিনেও গর্ভাধান করিতে পারা যায়, তবে চতুর্থ দিনে অনেকেরই রজঃ কিঞ্চিৎ স্রাব হয়, এইজন্য মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে চতুর্থ দিনকেও ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ রজোদর্শনে প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া, যে ষোল দিন ঋতুকাল বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি,একাদশ রাত্রি ও ত্রয়োদশ রাত্রিতে গর্ভাধান করা উচিত নহে। অন্য দশ রাত্রিতে গর্ভাধান করা প্রশস্ত।

শুক্র ও আর্ত্তব এই দুইটীর মধ্যে শুক্রের অংশ অধিক হইলে পুত্র, আর্ত্তবের ভাগ অধিক হইলে কন্যা এবং দুইটী সমান হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে।

যেমন ত্রিদোষ জন্য জ্বর সপ্তম, নবম, একাদশ প্রভৃতি দিবসে স্বভাবতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও অন্য দিবসে অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, এবং তিথি-বিশেষে যেমন জোয়ার আসিয়া জল বৰ্দ্ধিত করে ও তিথি-বিশেষে জল প্রকৃত অবস্থায় থাকে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে অযুগ্ম দিবসে রজঃ স্বভাবতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং যুগ্মদিবসে অপেক্ষাকৃত পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে, এই কারণে পুত্র সন্তান ইচ্ছা করিলে দম্পতী যুগ্ম দিবসে অর্থাৎ ঋতুর ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ দিবসে, কন্যা কামনা করিলে অযুগ্ম দিবসে অর্থাৎ পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও পঞ্চদশ দিবসে গর্ভাধান করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা পর পর দিনে অর্থাৎ পঞ্চদিন অপেক্ষা ষষ্ঠদিনে, ষষ্ঠদিন অপেক্ষা সপ্তম দিনে, সপ্তম দিন অপেক্ষা অষ্টম দিনে, অষ্টম দিন অপেক্ষা নবম দিনে— এইরূপ পর পর দিনে গর্ভাধান করিলে, সে গর্ভের সন্তান উত্তরোত্তর উত্তম স্বাস্থ্য, বল, দীর্ঘায়ু এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করে।

পুত্র ও কন্যা হইবার প্রতি যে যুগ্ম ও অযুগ্ম দিবসে দম্পতী-মিলনকে কারণ বলা হইল—ইহা সাধারণ বা স্বাভাবিক,তবে অযুগ্ম দিবসেও যদি পুরুষ শুক্রবর্দ্ধক ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য ও বাজীকরণ ঔষধাদি ভক্ষণ করতঃ শুক্র বৃদ্ধি করিয়া অধিক পরিমাণে শুক্রাংশ আধান করিতে পারে, তাহা হইলে অযুগ্ম দিবসে গর্ভাধান হইলেও পুত্র সন্তান হইবে। ঐরূপ রজোবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজনাদি দ্বারা রজোভাগ বর্দ্ধিত করিয়া যুগ্ম দিবসে সহবাস করিলেও কন্যা জন্মিতে পারে।

"গর্ভাধান রীতি"

সঙ্গের সময় দম্পতী তাম্বুল ভক্ষণ করিবে ও তন্ময় হইবে, স্ত্রী ন্যুব্জভাবে বা পাশ ফিরিয়া শয়ন করতঃ সঙ্গ করিবেনা। যেহেতু ন্যুব্জ-ভাবে শয়ন করিয়া সঙ্গ করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া স্ত্রী অঙ্গের ব্যথা উৎপাদন করে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া সহবাস করিলে শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া গর্ভাশয়কে আচ্ছাদিত করে, তজ্জন্য গর্ভ সম্ভব হয় না। বামপার্শ্বে শয়ানা হইয়া সঙ্গ করিলে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া রক্ত ও শুক্রকে দূষিত করায় গর্ভ হইতে পারে না। এই জন্য স্ত্রী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া বীজ গ্রহণ করিবে। উত্তান ভাবে শুইলে শরীরের রক্ষক বায়ু, পিত্ত ও কফ অবিকৃত অবস্থায়

নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত থাকায় গর্ভ গ্রহণের কোন রূপ বাধা উপস্থিত হয় না।

এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, কামিনীগণের তৃপ্তির জন্য ঋতু-কাল ব্যতীতও সঙ্গ করিতে পারা যায়। শরীরী প্রাণীমাত্রেরই সুরত-স্পৃহা স্বভাবতঃ আসিয়া থাকে। রজস্বলা হওয়ার পরও পনের বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে বালিকা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়, পনর বৎসরের পর বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, এবং বত্রিশের পর পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া বলে, তা'র পর ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য আসিয়া থাকে। রজঃ হওয়ার পর স্ত্রীলোক দিগের সম্ভোগ শক্তি জন্মে। বালিকা (ঋতু হওয়ার পর পনর বৎসরের) স্ত্রী সম্ভোগে পুরুষের উন্মাদনা ও শারীরিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সে সময়ের মধ্যে সন্তান জন্মিলে সন্তান বিশেষ সুস্থ বা দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হয় না। কারণ পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্তও নারীগণের শরীর সর্ব্বতঃ পুষ্ট হয় না, তরুণী সঙ্গে পুরুষের শক্তি কিছু কিছু হ্রাস হয়। প্রৌঢ়া নারী-সঙ্গে ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য আসিয়া থাকে। বৃদ্ধার সহিত সঙ্গ করিলে অচিরেই বলক্ষয় হইয়া শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

হেমন্ত ও শীতকালে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ কিছু বলশালী হয়। ঐ দুইটী ঋতুতে শীতল বাতাস ও হিমের সংস্পর্শে শরীরের মধ্যস্থিত উষ্মা বাহিরে নির্গত হইতে পারে না, সেই জন্য অন্তরের অগ্নি (পাচকাগ্নি) বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তখন অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিলেও সহজে জীর্ণ হইয়া যায় এবং শুক্র ধাতু বর্দ্ধিত হয়। এই হেতু হেমন্ত ও শীতকালে বলকারক দ্রব্য আহার এবং বাজীকরণ ঔষধ পান করিয়া শক্তি অনুসারে প্রতিদিনই সঙ্গ করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ ঐ সময় হইতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়, এই জন্য ঐ সময়ে সঙ্গ করিলে শ্লেষ্মা বাড়িতে না পারায় শরীর কিছু সুস্থই থাকে।

বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পনর দিন অন্তর সঙ্গ করিতে পারা যায়। তবে অধিক গরম বা বর্ষা হইলে একেবারেই স্ত্রীসম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে সকলেরই সারাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, শীতল স্নিগ্ধ অন্ন-পানাদির দ্বারা সেই ক্ষয় পূরণ হইলেও শরীরের সারাংশ বৃদ্ধি হইতে পায় না। ঐরূপ বর্ষাকালে ও পূর্ব্ব ঋতু গ্রীষ্ম হইতে সূর্য্যের উত্তাপে শরীর ও পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তা'র উপর মাটির সেঁত সেঁতে, সর্ব্বদা বৃষ্টি ও ময়লা জলাদির দ্বারা শরীরের ধারক বায়ু পিত্ত এবং কফ এই তিন-টিই কিছু কিছু বিকৃত হইয়া শরীরকে অসুস্থ করে। এই সকল কারণে পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলেও তাহা সুজীর্ণ না হওয়ায় ধাতু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। শুক্র বার্দ্ধত না করিয়া ক্ষয় করিলে নানারূপ দুরারোগ্য রোগ জন্মিয়া থাকে। শুক্রই পুরুষের পৌরুষ বল ও প্রাণ স্বরূপ। তাহাকে পুষ্ট রাখিতে পারিলে শরীরে সহজে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। রোগ হইলেও তাহা অনায়াসে সারিয়া যায়। আর অযথাভাবে শুক্রনাশ করিলে অচিরেই শরীর, রোগনিকরের আকর হয় এবং অল্পদিনেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মোটের উপর শরীরকে সর্ব্বথা সুস্থ ও পুষ্ট রাখিয়া,

এবং যে পরিমাণে ধাতু ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে আবার পূরণ হইতে পারে—এরূপ উৎকৃষ্ট সারযুক্ত ভোজ্য বস্তু ও বাজীকরণ ঔষধ সেবন করতঃ শক্ত্যনুসারে বিহার করিলেও শরীরের বিশেষ হানি হয় না। যাহা হউক প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা মনে রাখা উচিত যে, দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য এবং বাজীকরণ ঔষধ (যে ঔষধ পান করিলে অল্পকালের মধ্যে শুক্র জন্মিয়া থাকে ও রতিশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা) সেবন না করিয়া অধিক স্ত্রীসঙ্গ করিলে অল্পদিন মধ্যেই রাজযক্ষা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, বাতব্যধি, শূল, জ্বর, পাণ্ডু, কৃশতা, ধ্বজভঙ্গ, প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি সংযত ভাবে বিহার করে, তাহার শরীরের লাবণ্য, স্থৈর্য্য ও বল অক্ষুণ্ণ থাকে।

অতি প্রত্যূষে, সন্ধ্যার সময়, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ও মধ্যাহ্নকালে, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে এবং সংক্রান্তি দিনে বিহার করা নিষিদ্ধ।

ক্ষুধিত বা পিপাসিত হইয়া, অথবা অতিশয় ভোজন করিয়া জীর্ণ না হইলে অন্যস্ত্রীর উপর আসক্ত হইয়া, অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া ও পীড়িতাবস্থায় সহবাস করা উচিত নহে।

রজস্বলা, মলিন পরিচ্ছদধারিণী, অপ্রিয়া, বয়োবৃদ্ধা, সন্ন্যাসিনী, ব্যাধিযুক্তা, বিশেষতঃ যোনিরোগযুক্তা রমণীর নিকট গমন করা উচিত নহে, রজস্বলার নিকট গমন করিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মলিনা, অপ্রিয়া ও বয়োবৃদ্ধার নিকট গমন করিলে অধিক ভাবে শুক্রক্ষয় হয়, এবং মনের দুর্ব্বলতা জন্মে, যোনিরোগগ্রস্তা ও সন্ন্যাসিনীর সহিত সঙ্গ করিলে উপদংশ প্রভৃতি রোগের হাত হইতে এড়াইতে পারা যায় না।

মল মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া বা পুরুষ নিম্নগত হইয়া সঙ্গ করিবেনা। শুক্র পতিত হইতেছে এমত অবস্থায় জোর করিয়া তাহার বেগ ধারণ করিবে না। ঐ সকল করিলে পাথুরী রোগ জন্মে। গর্ভ হওয়ার পরও তিন মাস পর্য্যন্ত সঙ্গ করা যাইতে পারে। তিন মাস পর্য্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরিস্ফুট হয় না। চতুর্থমাসে গর্ভের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং হৃদয় পূর্ণ হয়, ও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, এই জন্য চতুর্থ মাস হইতে সহবাস করিলে গর্ভের ব্যাঘাত হইতে পারে, কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রী যদি অতীব সঙ্গ স্পৃহাবতী হয়, তাহা হইলে তাহার কামনা পূরণের জন্য পূর্ণগর্ভাবস্থাতেও বিহার করিতে পারা যায়। গর্ভকালে নারীগণের যে বিষয়ে উৎকট কামনা জন্মে, তাহা পূরণ না করিলে তাহাদের মনের ক্ষোভ বশতঃ বায়ু দুষ্ট হইয়া গর্ভের বহুবিধ বিকার জন্মাইয়া থাকে, ইহা পরে বিবৃত করা যাইবে। দেবরাজ ইন্দ্রের বর প্রভাবে নারীগণ ইচ্ছামত সকল সময়েই সহবাস করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, সেই দৈবী শক্তি বশতঃ রমণীগণের অতিশয় স্পৃহা হইলে তৃতীয় মাসের পরও সঙ্গ করিলে গর্ভের কোন বাধা হইবে না ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দু সন্তান বিশ্বাস করিতে পারেন।

সম্ভোগের পর স্নান অন্ততঃ হাত পা উদর প্রভৃতি ধৌত ও সুশীতল বায়ু সেবন করা উচিত। চিনী মিশ্রিত দুগ্ধ, মধুর রস যুক্ত অন্যান্য দ্রব্য ও মাংস রস ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইলে ধাতু পরিপুষ্ট হয়, এবং শরীরের গ্লানি বিনষ্ট হইয়া সবলতা আইসে। (ক্রমশঃ)

নিদ্রাহীন।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

ওগো নিদ্রে, মুগ্ধকরী! তোমার লাগিয়া
বিনিদ্র রজনী ছু'টী কেটেছে জাগিয়া।
মৌমাছির গুঞ্জরণ ফাল্গুনের খেতে,
নির্ঝরের ঝর ঝর জোছনার রেতে,
নিশীথ বাদল ধারা রিম ঝিম ঝিম্,
সেতারের দ্রিম দ্রিম, তাদ্রিম তাদ্রিম্,
ভাবিলাম একমনে,—ভাবিলাম খুব,
সঞ্চালি' চঞ্চল পক্ষ 'বেনে বুড়ী' ডুব—
তবু আসিলনা চক্ষে—আসিলনা ঘুম্
চৌদিকে আঁধার বিশ্ব নীরব নিঝুম।

২

যে নিশি আসিত লয়ে স্বরগের পরী
সে আসে চেড়ীর মত কলরব করি।
ছিল যাহা বিশ্রামের পঞ্চবটী বন,
হ'ল আজি ভীতিময় অশোক কানন।
ভাসিত ময়ুর পঙ্খী যেথা মিলি ডানা,
রণতরী এল সেথা দিতে যেন হানা।
মেঘদূত কাব্য হলো হিসাবের খাতা,
'ধীর সমীরের' কুঞ্জে শরশয্যা পাতা।
যুগলের উপাসক বৈষ্ণব যে আমি,
শব সাধনায় কত কাটাইব যামি'?

৩

উৎকণ্ঠায় যাতনায় করি' জোড় কর
জপিলাম হরিনাম ধরিয়া প্রহর।
বলিলাম সুদুর্ল্লভ তব দান প্রভু,
লভিয়াছি মূল্য তা'র ভাবি নাই কভু।
নিত্য তব ভিক্ষা লভি,' স্থাপিয়াছি দাবী,
আজ শুধু বারবার সেই কথা ভাবি।
অকৃতজ্ঞ ভিখারীর প্রতি করি কোপ
বিশ্বনাথ! বৃত্তি তা'র করিয়োনা লোপ।
পদ্মনাভ, দীন প্রতি কৃপা নেত্রে চাও,
শিরে মোর পদ্মহস্ত বুলাইয়া দাও।

রোগ-বিজ্ঞান।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, এইচ এম, বি]

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন—

"রোগমাদৌ বিজানীয়াৎততোহনন্তরমৌষধম্।"

প্রথমে রোগ নির্ণয় করিয়া তৎপরে ঔষধ নির্ব্বাচন করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রোগ কাহাকে বলে?

"রুজ শৌ ভঙ্গে" বা "রুজ উপতাপে" অর্থাৎ যৎ কর্ত্তৃক শরীর বা স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় বা পীড়িত হয়—তাহাই রোগ বা পীড়া, ইহাই বৈয়াকর-

পিক লিঙ্গের মত। আভিধানিকগণ রোগকে, —রুক্ রুজা, উপতাপ, ব্যাধি, গদ, আময়, আম, অম, আতঙ্ক, উপাঘাত, ভঙ্গ, অর্ত্তি, তমো বিকার, মৃত্যুভৃত্য, গ্লানি, ক্ষয়, প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেন।

রোগ কি ও কাহাকে আক্রমণ করে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

সংহিতা গ্রন্থ চরকে উক্ত হইয়াছে—

"সত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্রিদণ্ড বৎ।
লোক স্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ শরীর, মন ও আত্মার সমন্বয়ে জীব গঠিত হয়।

সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত আছে—

"তদ্দুঃখ সংযোগা ব্যাধয়ঃ"

সেই প্রাণীতে দুঃখ সংযোগ বশতঃ বিশিষ্ট লক্ষণ সমষ্টিভূত ভাবই ব্যাধি।

পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ ও আত্মা—মনের সংযোগে যে প্রাণীর সৃষ্টি হয়, সেই প্রাণীই ব্যাধির আশ্রয়। কিন্তু জড়দেহ বা আত্মার মধ্যে ব্যাধি কাহাকে দুঃখ প্রদান করে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

আত্মা যখন জড় দেহ পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন সেই পাঞ্চভৌতিক জড় দেহের সুখ দুঃখ প্রভৃতি কোন অনুভূতিই থাকে না ও তাহার পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। অতএব ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না বা দুঃখ প্রদানেও সমর্থ নহে। আত্মার ও সুখ দুঃখের জ্ঞান নাই, কারণ তিনি নির্ম্মল, নির্ব্বিকার। বৈদান্তিকের মতে

"নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।"

যে আত্মাকে শস্ত্রাদির দ্বারা ছিন্ন করা যায় না, যাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না বা বায়ু শুষ্ক করিতেও অসমর্থ, সেই নির্ম্মল বিকার শূন্য অবিনাশী, চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও ব্যাধি আক্রমণ করা অসম্ভব বা দুঃখ প্রদানেও অক্ষম।

তবে ব্যাধি কাহাকে দুঃখ প্রদান করে তাহাই কথিত হইতেছে—

যে সময় আত্মা ও জড়দেহের সম্মিলন ঘটে, সেই যোগস্থিতি কালই দুঃখ সুখ অনুভূতির কাল, যেমন ভাগীরথীর পবিত্র জলে যবনাদি শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে জাহ্নবী জলের অপবিত্রতা নষ্ট হয় না এবং কুম্ভকার গৃহেস্থিত কলস সকল আপামর চণ্ডালাদি সংস্পর্শেও অপবিত্র হয় না, কিন্তু যখন সেই কলসে ঐ পবিত্র জাহ্নবী জলপূর্ণ হয় ও তাহা কোন নীচ জাতি স্পর্শ করে, তখনই ঐ জলপূর্ণ কলস অপবিত্র বিধায় পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা ও জড়দেহের যোগস্থিতিই দুঃখাদি ভোগ করে; এই জড় শরীরই মৃণ্ময় কলস স্বরূপ, আর শুদ্ধ আত্মাই পবিত্র গঙ্গাজল সদৃশ। কিন্তু রোগ কাহাকে আক্রমণ করে?

তন্ত্রকার গণের মতে শরীরই আত্মার আশ্রয় স্থল, মন আত্মার পুত্র স্বরূপ, আত্মা জীবের মস্তিকোপরি সহস্রার নামক সহস্র দল পদ্মে পরম পুরুষ রূপে অবস্থিত এবং মন ত্রিকুটী বা উভয় ভ্রূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শতদল পদ্মে অবস্থিত করেন। সাইকোলজী বা মনোবিজ্ঞানের মতে মন অণুস্বরূপ, বায়ু হইতেও দ্রুতগামী এবং আমাদিগের সর্ব্ব কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; Motar (চেষ্টাবহা) এবং Sensesary (সংজ্ঞাবহা) Nerve কে বা নাড়ীকে ইচ্ছানুরূপ সঞ্চালন করিয়া থাকে আর আত্মা মাত্র স্বাক্ষী স্বরূপ। মিথ্যা

আহার বিহারাদি জন্ত ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অযোগ, অতিযোগ বা মিথ্যাযোগ বশতঃ যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়—তাহা মনেরই অধীন। ঈশ্বরের বিম্বাভাস স্বরূপ যেমন জীব জগৎ সমুৎপন্ন, সূর্য্যের সুমুজ্জ্বল রশ্মি স্রোতস্বিনী সলিলে নিপতিত হইয়া তাহার প্রতিবিম্ব যেমন তটস্থিত তরুতে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মার স্থান শীর্ষে হইলেও তাঁহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ আমাদের Vital force বা শরীরের বিদ্যুৎ Electrecity শরীরের সর্ব্বত্র প্রকাশমান আছে। ইহাই আয়ুর্ব্বেদে ওজঃধাতু নামে আখ্যাত।

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন—তিলে তৈলের ন্যায়, ইক্ষুতে শর্করার ন্যায় শুক্র সর্ব্বদেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যাপৃত আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। উহা কেবল আমাদের অনুধাবন শক্তির অক্ষমতা মাত্র। শুক্রের উৎপত্তিস্থান ও আশয় যে অণ্ডকোষদ্বয়—তাহা আয়ুর্ব্বেদেই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু যেমন রস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোন্নতি ক্রমে ক্রমশঃ মাসান্তে শুক্রধাতুতে পরিণত হয়, সেইরূপ শুক্র ধাতু হইতেও তাহার সৌম্য সারাংশ আকর্ষিত হইয়া ওজঃধাতুতে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা চরক সংহিতাতেও পরিদৃষ্ট হয়, যথা—

"ভ্রমরৈঃ ফলপুষ্পাভ্যাং যথা সংহ্রীয়তে মধুঃ।
এবমোজঃ স্বকর্ম্মভ্যো গুণৈঃ সংহ্রীয়তে নৃণাং"॥

অর্থাৎ ভ্রমর যেমন ফল পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ ওজঃধাতুও শরীরস্থিত অন্যান্য ধাতু হইতে সার সংগ্রহ করে, এবং ইহাই সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে আর ইহাকেই Vital force বা জীবনী শক্তি বলা যায়। আত্মার আভাস স্বরূপ এই জীবনী শক্তিই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং কতক গুলি বেদনা ব্যঞ্জক লক্ষণ নিচয়ের দ্বারা তাহা দেহের বাহিরে প্রকাশ করে।

এখন ব্যাধি কি তাহা দেখা আবশ্যক। কোন সমধর্ম্মী ভিন্ন কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না, ইহাই জাগতিক নিয়ম, আর এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই যে কোন জীবন বিশিষ্ট পদার্থ জীবনী শক্তিকে আক্রমণ করে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কোন জড় পদার্থের দ্বারা চৈতন্যের বিকাশ স্বরূপ জীবনী শক্তি আক্রান্ত হইতে পারে তাহা আমরা অনুসন্ধিৎসার দ্বারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। প্রত্যেক রোগেরই এক একটী পৃথক্ রোগ-বীজাণু আছে এবং তাহা যে সজীব তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক গুলি রোগ যে জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় তাহা স্বীকার করিতেছেন এবং অধিকাংশ রোগই যে Bacteria বা জীবাণু হইতে সমুদ্ভূত হয় তাহা যন্ত্রাদির দ্বারায় দেখাইতেছেন। Bacteria বা জীবাণু যে বহুবিধ হয় ও বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট দেখা যায় তাহাও পৃথক ভাবে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা Cocai (ককাই) Bacili (ব্যাসিলাই) ও Spirullum; আবার ককাইকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা—Stapnylo cocai. ইহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে কতক গুলি বিন্দু বিন্দু রূপে পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়; Strepto cocai ইহা .....বিন্দু বিন্দু রূপে চেনের মত লম্বা আকৃতি বিশিষ্ট; Diplo cocai : : : ইহা

যুগ্ম বিন্দু রূপে কতকগুলি একত্রে অবস্থিতি করে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে gonorrhea (বিষাক্ত মেহ) Pneumoria (শ্বসনক জ্বর) মেরিঞ্জাইটীস প্রভৃতি রোগ সমুৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত Micrococceus নামক জীবাণু ও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে Bacilai কেও কয়েক অংশে বিভক্ত করেন, যথা—Colai (কোলাই) নামক Bacilai অন্ত্রে থাকিয়া ডিসেন্ট্রি (এমিবা যুক্ত রক্তামাশয়); টাইফয়েড (সান্নিপাতিক-জ্বর) এণ্টিক ফিবার (আন্ত্রিক জ্বর) প্রভৃতি উৎপন্ন করে, আরও Bacilai দ্বারা টেটেনাস্ (ধনুষ্টঙ্কার) ডিপ্‌থিরিয়া (গলরোহিণী) টীউবারকুলোসিস্ (যক্ষ্মা) লেপ্রোসি (কুষ্ঠ) প্লেগ (গ্রন্থীক জ্বর) প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই Bactrolagy বা জীবাণুতত্ত্ব যে পাশ্চাত্যীয়েরা নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, ইহা অতি প্রাচীনকালে ত্রিকালজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী মনীষি ঋষি সম্প্রদায়ের অনুসন্ধিৎসার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা কুষ্ট রোগ তত্ত্বে কুষ্ঠ জীবাণুর পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"রক্তবাহি শিরাস্থানা রক্তজা জন্তবোর্ঽণবঃ।
অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ।

রক্তবাহিশিরা স্থিত রক্তজ কুষ্ঠের জীবাণু সকল পা বিহীন, গোলাকার, তাম্র বর্ণ, কোন কোনগুলি সূক্ষ্মতা বশতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই প্রাচীন কালেও যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল তাহা ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, নচেৎ কুষ্ঠের জীবাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতম জীবাণু আকার ও বর্ণাদির পরিচয় এবং তাহা রক্ত বাহিশিরা স্থিত প্রভৃতি যন্ত্র ব্যতীত স্থূল চক্ষুতে দর্শনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। আর সেই অনুবীক্ষণ যন্ত্র যে অতিশয় শক্তি সম্পন্ন ছিল, এমন কি পাশ্চাত্য দিগের আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণ অপেক্ষাও শক্তি বিশিষ্ট, তাহা তাহার বর্ণাদির বর্ণনেই বুঝা যায়। কেহ মনে করিতে পারেন যে, ঋষিগণ যোগবলে জ্ঞান চক্ষে দেখিয়া ছিলেন কিন্তু তাহা নহে, কারণ যদি যোগবলে দেখিতেন তাহা হইলে চরক-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বাগ্‌ভট বলিতেন না যে—

"সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিৎ অদর্শনাঃ"

যেহেতু সাধনায় দর্শনের অতীত কিছুই থাকিতে পারে না। যন্ত্র সাহায্যে দর্শন করিয়া ছিলেন তাই অতি সূক্ষ্মতা বশতঃ কতকগুলি দেখিতে পান নাই, "অদর্শনা" বলিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"কেশাদাদ্যাস্ত্বদৃশ্যাস্তে"

কেশদা প্রভৃতি জীবাণু সকল অদৃশ্য। এখানেও সেকালে অনুবীক্ষণের সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। যদি এই সকল জীবাণু অদৃশ্যই হয়, তবে দেখিলেন কি প্রকারে? ঋষিগণ যে শোণিত, কফ, মল, মূত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া জীবাণু সকল নির্ণয় করিয়া ছিলেন তাহা আয়ুর্ব্বেদে ক্রিমির জাতি নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যথা রক্তগত ক্রিমির নাম—

কেশাদা, লোমবিধ্বংসা লোমদ্বীপা, উদুম্বরা জন্তুমাতা, সৌরসা প্রভৃতি জীবাণু শোণিতবাহি শিরায় থাকে।

পাকস্থলী স্থিত জীবাণু কেঁচোর ন্যায়, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরবৎ, কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম

অন্ত্রস্থিত জীবাণু মলের সহিত পাওয়া যায় উহা পাঁচ প্রকার। কতকগুলি কৃষ্ণ বর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ বা শ্বেত বর্ণ, কতকগুলি স্থূলাকার বিশিষ্ট ; ইহার বর্ণনা প্রায়ই পাশ্চাত্য মতের সহিত মিলিয়া যায় এই গুলি Colai নামক জীবাণুর অন্তর্গত।

[ক্রমশঃ]

কায়চিকিৎসা-ক্রমোপদেশ বা

Practice of medicne.

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

—:০:—

হিক্কা ও শ্বাস চিকিৎসা।

হিক্কা ও শ্বাসের উৎপত্তি স্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয়। প্রাণ ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া বারংবার উর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে হিক্ হিক্ শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইতে থাকে। যে সকল কারণে কাস উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত কারণে এবং কাস উপেক্ষিত হইলেও শ্বাস রোগ জন্মিতে পারে। কাস মাত্রেই উষ্ণক্রিয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্বাসের কোনো কোনো অবস্থায় স্নিগ্ধ ও শৈত্যক্রিয়া করিবার আবশ্যক হয়।

হিক্কা রোগ পাঁচ প্রকার, অন্নজ, যমল, ক্ষুদ্র, গম্ভীর ও মহাহিক্কা। ইহার মধ্যে গম্ভীর ও মহাহিক্কাই প্রাণ নাশক। যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া গম্ভীর স্বরে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তৃষ্ণা, জ্বর প্রভৃতি বহু প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহার নাম গম্ভীর হিক্কা এবং যে হিক্কা নিরন্তর উদগত হইতে থাকে, উদগত হইবার সময় সর্ব্বদেহ কম্পমান করিয়া তোলে এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্ম স্থান সবল বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম মহা হিক্কা।

অপরিমিত অন্নপানীয় সেবনের জন্য কুপিত প্রাণবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া অন্নজা হিক্কা উপস্থিত হয়। যে হিক্কা দুইটী বা ততোধিক সংখ্যায় বেগের সহিত বিলম্বে উত্থিত হইয়া রোগীর মস্তক ও গ্রীবাদেশ কম্পিত করে তাহাকে যমলা হিক্কা এবং যে হিক্কা জত্রুমূল হইতে উত্থিত হইয়া অল্পবেগের সহিত বিলম্বে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা হিক্কা বলে।

শ্বাস রোগও পাঁচ প্রকার,—ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস। এই পঞ্চবিধ শ্বাসের মধ্যে ছিন্ন, উর্দ্ধ ও মহাশ্বাস নিশ্চয়ই মারাত্মক। তমকশ্বাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য হয়, নতুবা যাপ্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রশ্বাস কষ্টদায়ক, কিন্তু প্রাণনাশক নহে।

হিক্কা ও শ্বাস—উভয় রোগই বাত প্রধান কিন্তু তমকশ্বাস শ্লেষ্মা প্রধান। সাধারণতঃ তমকশ্বাসের রোগীই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। তমকশ্বাসগ্রস্ত রোগীর যদি জ্বর এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতমক শ্বাস বলে।

বায়ুর অনুলোমক অথচ উষ্ণবীর্য্য ক্রিয়া দ্বারা হিক্কা ও শ্বাসরোগের চিকিৎসা করিতে হয়। স্নিগ্ধ স্বেদ দ্বারা উভয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। হিক্কা রোগে উদরে এবং শ্বাস রোগে হৃদয়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। রোগী বলবান থাকিলে বায়ুর অনুলোমকারী মৃদু বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগের মুখ্য দোষ নিঃসরণের চেষ্টা করিলেও তাহারই ফলে হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় আকন্দের মূলচূর্ণ দুই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাইলে বমন হয়, কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে কদাচ বচনের ব্যবস্থা করিবেনা।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চন গৈরিকম্।
কৃষ্ণাধাত্রী সিতাশুণ্ঠী কাশীশং দধিনাম চ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জুর মস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধু সংযুতাঃ॥

১। কুলের আঁটির শাঁস, সৌবীরাঞ্জন, খৈ চূর্ণ ও মধু, ২। কটকী, স্বর্ণ গেরিমাটি ও মধু, ৩। পিঁপুল, আমলকী, চিনি, শুঁঠ ও মধু। ৪। হিরাকস, কয়েদ বেলের শাঁস ও মধু। ৫। পারুল বৃক্ষের ফল, পুষ্প ও মধু। ৬। পিঁপুল, খেজুরের মাতি ও মধু। এই ৬টি যোগের মধ্যে যে কোনোটি হিক্কা রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মধুকং মধু সংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড় সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবন ত্রয়ম্।

যষ্টিমধু চূর্ণ মধুর সহিত, পিঁপুলচূর্ণ চিনির সহিত এবং শুঁঠ চূর্ণ গুড়ের সহিত নস্য লইলে হিক্কারোগের শান্তি হয়।

স্তন্যেন মক্ষিকা বিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥

মাছির বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধের সহিত অথবা আলতার জলের সহিত গুলিয়া কিম্বা স্তনদুগ্ধের দ্বারা রক্ত চন্দন ঘসিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

প্রবাল শঙ্খ ত্রিফলা চূর্ণং মধু ঘৃতপ্লুতম্।
পিপ্পলী গৈরিকঞ্চেতি লেহো হিক্কা নিবারণঃ।

প্রবাল, শঙ্খ ও ত্রিফলা এবং পিঁপুল ও গেরিমাটি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্।
সদ্য এব মহাযোগঃ কাশমূল ভবং রজঃ॥

কেশের মূল চূর্ণ—মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্॥

চিনি, মরিচ চূর্ণ ও মধু—এই তিনটি দ্রব্য একত্র মিশাইয়া সেবনে হিক্কা প্রশমিত হয়।

হিক্কাঘ্নঃ কদলীমূল রসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ।

কদলীমূলের রস মধুর সহ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণামলক শুণ্ঠীনাং চূর্ণ মধুসিতান্বিতম্।
মুহুর্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কা শ্বাস নিবর্হণম্॥

হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতি প্রবৃদ্ধং জয়তি।
শিখিপুচ্ছ ভস্ম পিপ্পলী চূর্ণং মধু মিশ্রিতম্ লীঢ়ম্॥

পিপুল, আমলকী ও শুঁঠ চূর্ণ—একত্রে মধু, চিনি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয় এবং ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম, পিঁপুল চূর্ণ ও মধু একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

অভয়া নাগর কল্কং পৌষ্কর যাবশূক মরিচকল্কংবা
তোয়েনোষ্ণেণ পিবেচ্ছ্বাসী হিক্কীচ তচ্ছান্ত্যৈ॥

হরীতকী ও শুঁঠ অথবা কুড়, যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসের শান্তি হয়।

কর্ষং কলিঙ্গ চূর্ণং লীঢ়ঞ্চাত্যন্ত মিশ্রিতং মধুনা।
অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামূর্দ্ধ হিক্কাঞ্চৈব॥

ইন্দ্রযব চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

নির্ধূমাঙ্গার নিঃক্ষিপ্তো হিঙ্গুমাষভবো রজঃ।
হিক্কা পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধূমঃ পীতো ন সংশয়ঃ॥

হিং ও মাষকলায়ের চূর্ণ সমভাগে ধুম রহিত অঙ্গারে নিঃক্ষেপ করতঃ ধূম পান করিলে পঞ্চ প্রকার হিক্কা উপশমিত হয়।

হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগর সাধিতং।
মধু সৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ॥

শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত পক্ক ছাগ দুগ্ধ পান করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয়। মধু এবং সৌবর্চ্চল সমন্বিত ছোলঙ্গ লেবুর রস পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

গুড়ং কটুক তৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ॥

পুরাতন গুড় এবং সর্ষপ তৈল—সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২১ দিন সেবন করিলে শ্বাস রোগ নষ্ট হয়।

বিল্বাটরূষ দল বারি সমূল শুক্ল—
দণ্ডোৎপলোৎ পলজলং কটু তৈল মিশ্রম্।
ভার্গী গুড়ো যদি চ তত্র হত প্রভাবন্তং
শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহা প্রভাবম্॥

বিল্ব বাসকয়োঃ পত্রস্য শুক্ল দণ্ডোৎপল—
পত্রস্য চ স্বরসঃ কটুতৈলেন পেয়ঃ॥

বিল্ব পত্রের রস, বাসক পত্রের রস এবং শ্বেত থুলকুড়ি পত্রের রস ও উৎপলের রস—কটু তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্তু পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্॥

কুষ্মাণ্ডশস্য চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে সুদারুণ শ্বাস ও কাশ প্রশমিত হয়।

উপরে যে মুষ্টিযোগ গুলি বলা হইল, তদ্ভিন্ন শ্বাস রোগের আশু উপশম করিবার জন্য নিম্নে আরও কতকগুলি মুষ্টিযোগের কথা বলা যাইতেছে। এগুলি আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত ও সদ্যঃ ফলপ্রদ।

শ্বাসের প্রবল অবস্থায় অনেক সময় অনেক ঔষধ দিয়াও কোনো ফললাভ হয় না; সে অবস্থায় এই মুষ্টিযোগ গুলি বিশেষ ফলপ্রদ।

(১) কনক ধুতুরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে

ঐ শুষ্ক দ্রব্য কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম প্রবল শ্বাসের সময় পান করিতে দিবে, তাহাতে সদ্যঃ শ্বাস রোগ নিবৃত্ত হইবে।

(২) খানিকটা সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে একটুকরা সাদা কাগজ ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবে। তাহার পর তাহার নল করিয়া উহার ধূম পান করিতে দিবে। এই রূপ প্রক্রিয়ায় প্রবল শ্বাস রোগের সদ্যঃ উপশম হয়।

(৩) দেবদারু, বেড়েলা ও জটামাংসী সমান ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া তাহা দ্বারা একটি সচ্ছিদ্র বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে এবং উহা শুষ্ক করিয়া সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূমপান করিতে দিবে। ইহাতেও শ্বাসের উপদ্রব প্রশমিত হয়।

(৪) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও পিঁপুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে শ্বাসের উপদ্রব নিবৃত্ত হয়।

(৫) হরীতকী ও শুঁঠ কিম্বা গুড় যবক্ষার ও মরিচ সমানভাগে লইয়া ও একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবৃত্ত হয়।

উপরি লিখিত প্রক্রিয়া গুলির দ্বারা শ্বাস বেগ কমিয়া যাইলে রোগের স্থায়ীভাব দূরীকরণের জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে :—

(১) আদার রসের সহিত পিঁপুল চূর্ণ ৵০ আনা ও সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা।

(২) শোধিত গন্ধক চূর্ণ ঘৃতের সহিত অথবা শোধিত গন্ধকচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবনের ব্যবস্থা।

(৩) গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামনহাটি, কণ্টকারী ও তুলসী—মিলিত ২ তোলা, জল ⁄॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। ইহাদের কাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পানের ব্যবস্থা।

(৪) দশমূলের কাথ—কুড় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পানের ব্যবস্থা।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় রোগ স্থায়ীভাবে দূরীভূত না হইলে প্রাতে পিপ্পল্যাদি লৌহ, মধ্যাহ্নে হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ বা ঐ জাতীয় কোনো একটি পাচক ও আগ্নেয় ঔষধ এবং বৈকালে ভার্গীগুড় বা শৃঙ্গীগুড় সেবনের ব্যবস্থা দিবে। নিম্নে ঐ ঔষধ গুলির উপাদান লিখিত হইতেছে—

পিপ্পল্যাদিং লৌহম্।

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থি মধু শর্করা।
বিড়ঙ্গ পুষ্করৈ র্যুক্তং লোহং হন্তি সুদুস্তরাম্॥
হিক্কাং ছর্দ্দিঃ মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ।
সর্ব্ব চূর্ণ সমং লৌহং হিক্কায়ামতি প্রশস্তম্॥

পিঁপুল, আমলা, কিসমিস, কুলের আঁটির শাঁস, মধু চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড়—ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ তোলা, এবং লৌহ ৮ তোলা। এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে হিক্কা, বমি ও মহাশ্বাস —তিনরাত্রির মধ্যে বিনষ্ট হয়।

এই সকল উপাদানের মধ্যে—

পিঁপুল - শ্বাস নাশক। আমলা—রসায়ন। কিসমিস—শ্বাসনাশক। কুলের আঁটিরশাস—শ্বাস নাশক। মধু - শ্বাসঘ্ন। চিনি - শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক। বিড়ঙ্গ—আগ্নেয়। কুড়——বায়ু ও কফ নাশক।

ভার্গীগুড়।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম।
শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ.তোয়ে চতুর্গুণে॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্র পরিস্রুতে।
আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্যস্তভয়াং ততঃ॥
পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহ ত্বমাগতম্।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র ষট্‌পলানি প্রদাপয়েৎ॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ ততঃ॥
ভক্ষয়েদ ভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধ পলং লিহেৎ।
শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
স্বরবর্ণ প্রদোহেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ।
পলোল্লেখাগতে মানেন দ্বৈগুণ্য মিহেষ্যতে॥
হরীতকী শতস্যাত্র প্রস্থত্বা দাঢ়কং জলম্॥

বামনহাটীর মূল ১২৷৷ সের, দশমূল সমভাগে মিলিত ১২৷৷০ সের ও শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ হরীতকী ১০০ টা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত ১২৷৷০ সের ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া উক্ত পোট্টলীবদ্ধ হরীতকীগুলি প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দারুচিনি, ছোট এলাইচ ও তেজপত্র—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং যবক্ষার চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। তাহার পর শীতল হইলে মধু ৪৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ।০ আনা বা ৷৷০ তোলা মাত্রায় সেবন করিয়া ১টি হরীতকী সেবন করিলে শ্বাস ও পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে বামনহাটী—শ্বাসের মহৌষধ। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। শুঁঠ, পিপুল প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যগুলিও শ্বাসনাশক গুণবিশিষ্ট, এইজন্য এই ঔষধটি শ্বাসরোগের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্‌স্বরূপ।

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতা পঞ্চপলং পৃথক্।
শতবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গীদশ পলানি চ॥
গোক্ষুরং পিপ্পলী মূলং পৃথক পল সমন্বিতম্।
পাটলা ত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণ জলে পচেৎ॥
চতুর্ভাগা বশিষ্টস্তু কষায়মবতারয়েৎ।
পুরাতন গুড়স্যাত্র পলাণি দশদাপয়েৎ॥
ঘৃতস্য পঞ্চদশ্চাচ দত্বা দশপলং পয়ঃ।
সর্ব্বমেকী কৃতং পক্ত্বা চূর্ণমেষাং বিনিঃক্ষিপেৎ॥
শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতীফলং পত্রং ত্রিতোলকম্।
চতুস্তোলং লবঙ্গঞ্চ তুগাক্ষীরী পৃথক্ পৃথক্॥
গুড়ত্বগেলেচ তথা তোলকদ্বয় মাণিকে।
কুষ্ঠ তোল চতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যা স্তোলক সপ্তকম্॥
পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশঃ তোলকত্রয়ম্।
জাতিকোষং তোলকৈকং শীতেচ মধুনঃ পলম্॥
ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষ্যৈকমনুপানবিধিং শৃণু॥
কাষ্ঠমার্জ্জারিকা চূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম্॥
একীকৃত্য বটীং কুর্য্যাচ্চতুর্মাষ মিতাংভিষক্।
তামামেকাং চর্ব্বয়িত্বা পিবেদনু জলং কিয়ৎ॥
শৃঙ্গীগুড় ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগ হরং পরম্।

কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল ও গুলঞ্চ—ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা, গোক্ষুর ও পিপুলমূল প্রত্যেক ৮০ তোলা ও পারুলছাল ২৪ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ৪ তোলা ঘৃত খাঁটি

উক্ত কাথ-জল সন্তলন করিয়া পুরাতন গুড় ৮০ তোলা ও দুগ্ধ ৮০ তোলা নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জাতীফল ৩ তোলা তেজপত্র, ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিঁপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও জৈত্রী ২ তোলা—এই সকল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ নিম্নলিখিত অনুপান সহ সেব্য। কাঠ বিড়ালের মাংস চূর্ণ ১ ভাগ; মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্র করিয়া ॥০ তোলা পরিমিত বটিকা করিবে। উক্ত ॥০ তোলা ঔষধ সেবনের পর উহার ১টি বটি সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিবে।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল ও গুলঞ্চ—শ্বাসঘ্ন, শতমূলী—বায়ু ও পিত্তনাশক, বামনহাটী—শ্বাসনাশক, গোক্ষুর—শ্বাসঘ্ন, পিঁপুলমূল—শ্বাসনাশক, পারুলছাল—হিক্কানাশক। পুরাতন গুড়—বায়ুনাশক। দুগ্ধ—বায়ু ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক, কাঁকড়াশৃঙ্গী—কাসঘ্ন। জাতীফল—শ্বাসনাশক। তেজপত্র—শ্বাসঘ্ন। লবঙ্গ—বংশলোচন, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, কুড়, পিঁপুল, তালীশপত্র, জৈত্রী—প্রভৃতি সকল উপাদানগুলিই শ্বাসঘ্ন।

শ্বাসের প্রবল অবস্থায় মহা শ্বাসারি লৌহ নামক ঔষধটীও বিশেষ কার্য্যকারী। প্রাতে পিপ্পল্যাদি লৌহ এবং বৈকালে মহা শ্বাসারি লৌহের ব্যবস্থাও শ্বাস রোগীর পক্ষে বেশ করিতে পারা যায়। এই মহাশ্বাসারি লৌহের উপাদান—

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ।
সিতা কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধুকর্ষদ্বয়ং তথা॥
ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থি বংশজা।
তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গং এলা পুষ্কর কেশরম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সমাংশিকম্॥
লৌহে চ লৌহ দণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
ততো মাত্রা লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বুদ্ধা দোষবলাবলম্
ইদং শ্বাসারি লৌহঞ্চ মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ।
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী বহেড়া, যষ্টিমধু, কিসমিস, পিঁপুল, বদরী বীজের শাঁস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, একত্র মিশাইয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৩।৪ রত্তি মাত্রায় মধুর সহিত সকল প্রকার শ্বাস রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে লৌহ ত্রিদোষনাশক।

শ্বাসের প্রবল অবস্থা কমাইবার জন্য বৃহচ্চন্দনাদি তৈলটী বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নে উহার উপাদান লেখা যাইতেছে:—

চন্দণাম্বু নখং বাপ্যং যষ্টি শৈলেয় পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শট্যেলা পূতি কেশরম্॥
পত্রং তৈলং মুরামাংসী কঙ্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরু কুঙ্কুমম্।

ত্বগ্ বেণু নলিকাশ্চেতি তৈলং মস্তচতুর্গুণম্।
লাক্ষারসং সমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণ কৃৎ॥
রক্তপিত্ত ক্ষত ক্ষীণ শ্বাসকাস বিষাপনম্।
আয়ুঃ পুষ্টি করঞ্চৈব বশীকরণ মুত্তমম্॥

তিল তৈল /৪ সের দধির মাত ১৬ সের, লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, মঞ্জিষ্ঠা, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, শঠী, ছোট এলাইচ, খাটাসী, পদ্মকেশর, তেজপত্র, শিলাজতু, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাঁকোলী, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কট্‌কী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুহরিদ্রা, ও লালুকা। এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ সের। বক্ষঃস্থলে এই তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য। বায়ুর অনুলোমকর আহার-বিহারই হিক্কা ও শ্বাস রোগে সুপথ্য। বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে পুরাতন তেঁতুল ভিজান জল, লেবুর রস, মিছরীর সরবৎ পান, নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান এই রোগে হিতকর। কিন্তু শ্লেষ্মার উপদ্রব থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা বিধেয় নহে। রক্ত পিত্ত রোগে যে সকল পথ্যের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে—হিক্কা ও শ্বাস রোগে তাহাই সুপথ্য। গুরুপাক ও তীক্ষ্ণ বীর্য্যাদি দ্রব্য সেবন, দধি, মৎস্য ও লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি ভোজন, এবং রাত্রি জাগরণ এই পীড়ায় একান্তই বর্জ্জন করিতে হইবে।

পাঁচড়ার উপদ্রব ও তাহার ঔষধ।

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ]

এ বৎসর পল্লিগ্রামে পাঁচড়ার উপদ্রব অত্যধিক, বোধহয় জল বায়ুতে দোষ ঘটিয়াছে। বর্ষা আরম্ভেই পাচড়া, চুলকানি দেখা গিয়াছে, এখনও তাহার প্রাদুর্ভাব সমভাবেই আছে। শিশুদিগের ত কথাই নাই। এই রোগে এ বৎসর কয়েকটী লোক মারা পড়িতেও শুনিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে পাঁচড়ায় লোক মারা যায় তাহা জানিতামনা। পাচড়াগুলি বড় বড় হয়, তাহা হইতে সর্ব্বদা পুয নির্গত হয়, শরীরে বেদনা ও যন্ত্রণা হয়। চুলকানি গুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় ও তাহাতে বড় চুলকানি হয় চুলকাইয়া অনেকে রক্ত বাহির করিয়াও আরাম পায়না।

এই পীড়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন, কিন্তু সম্যক্ উপকার লাভ যে কোন্‌টাতে হয় তাহা কেহই বোধহয় অবগত নহেন। আমি নিম্নে একটী ঔষধ লিখিতেছি, তাহা অনেক রোগীতে প্রদান করিয়া বিলক্ষণ ফল পাইতেছি, এই ঔষধে কি যে কুফল আছে—তাহা অবগত নহি। বিশেষজ্ঞেরা এ বিষয় আলোচনা করিবেন।

ঔষধটী এই :—

নিমছাল বা নিমপাতা বাটা বা ছেঁচা /০ এক ছটাক।

সজিনার ছাল বাটা বা ছেঁচা /০ ছটাক।

লালকরবীর পাতা বাটা বা ছেঁচা /০ ছটাক

চুণ /০ "

রসুন /০ "

হরিতাল ॥০ তোলা।

মনছাল ॥০ তোলা।

গাঁজা ৵০ ওজন।

এই সকল একত্র করিয়া আধ সের সরিষার তৈল লইয়া (মাটীর পাত্রে করিয়া) জ্বাল দিতে হইবে। ঐ সকল জিনিস ভাল করিয়া ভাজা হইলে নামাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই তৈলটা পাঁচড়ায় দিতে হইবে, একদিনেই উপকার পাওয়া যাইবে। চুলকানিতে মাখিয়া দিলেও উপকার হয়। তিন চারিদিন ব্যবহারেই নির্দ্দোষ হইতে দেখা যায়। শিশুদিগের এই ঔষধে যতশীঘ্র উপকার হয় বৃদ্ধের তত শীঘ্র না হইলেও ঔষধ ব্যবহারে রোগ প্রশমিত হইবেই। বোধ হয় শিশুদের রক্ত বেশী তাজা বলিয়াই একটু পার্থক্য হয়।

এক দিন একজন নালী ঘা ওয়ালা লোক আসিয়াছিল, তাহাকে আমার এই ঔষধ ব্যবহার করিতে দিই। নালিতে ন্যাকড়ায় মিশাইয়া ঔষধ দিয়াছিলাম, ঐ ন্যাকড়া নালিতে ভরিয়া দিয়াছিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই দিনেই নালি ভরিয়া গিয়াছিল, চারি পাঁচ দিনেই সে নিরাময় হইয়াছিল। আর একবার দূষিত বড় ঘা একজনের হইয়াছিল, তাহাকেও পরীক্ষার্থ এই ঔষধ দিয়া ফল পাইয়াছিলাম। ইহার পর আরো দু'একটী ঘায়ের রোগীতে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়ায় মনে হইয়াছে ইহা একটী সাধারণ ঘা মাত্রেরই ঔষধ। মানুষ কেন,—পশু দিগের ঘাতেও ইহার ফল হইতে দেখা গিয়াছে।

ইহার কুফল কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু আমি সেরূপ কোন অবস্থাতেই খতিত হই নাই। সকল অবস্থাতেই ফল পাইয়াছি। একদিনেই ঘা লাল হইয়া শুকাইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে একটু দুর্গন্ধ আছে, সুগন্ধি কিছু বা কর্পূর মিশাইয়া দিলে ইহার দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে, অথচ ঔষধেরও কোন গুণ হ্রাস হইবে না। পাঁচড়া ও চুলকানি রোগীদের প্রত্যহ সরিষার তৈল বিলক্ষণ করিয়া মালিশ করিয়া স্নান করা উচিত। কাঁচা হরিদ্রা ও সরিষা বাটীয়া তাহাতে কিছু নিমপাতা বাটিয়া মিশাইয়া লইয়া তাহা স্নানের পূর্ব্বে শরীরে ঘসিয়া দিলে উপকার হয়। মোট কথা, ঘা গুলি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। সাবান ব্যবহার করা ভাল, সাবান ব্যবহার করিলে আগে তৈল মাখিতে নাই। স্নানান্তে তৈল দিতে হইবে। উল্লিখিত ঔষধটী দিলে সুবিধা মত দুই তিনবার লাগাইলেই হইল। মৃত্তিকা ইহার একটী উপকারী জিনিয। আটালু মাটী প্রাতে গায় মাখিয়া রৌদ্রে বসিয়া থাকিলে শরীর চট্‌চট্ করিতে থাকে। তৎপর তাহা জলে ধুইয়া সাবান ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই মৃত্তিকার মধ্যে গঙ্গামৃত্তিকার বিশেষত্ব আছে। গঙ্গার মাটীতে কিছু বেশী উপকার হয়। উপরোক্ত যে ঔষধটীর কথা লিখিলাম তাহাতে সরিষার পরিবর্ত্তে চালমুগরার তৈল দিয়া ঔষধ জ্বাল করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। কেহ কেহ এই ঔষধের সঙ্গে তুঁতে আধ তোলা জ্বালের পূর্ব্বে মিশাইয়া দিতেও উপদেশ করেন।

অন্তরতম।

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

—:o:—

তুমি নহ দূরে নাথ, তুমি নহ দূরে !
অনুক্ষণ খুঁজে তোমা মরি ঘুরে ঘুরে
বৃথা দীর্ঘ মরুপথে ! না জানি সন্ধান
প্রাণারাম তুমি মোর পূর্ণ করি প্রাণ
ব'সে আছ অন্তরের গোপন আসনে
বরাভয়-বেশে আহা ! রহে সংগোপনে
কুসুমের মধু যথা পিপাসু অলির
জুড়াতে মরম তৃষা ! মুছে আঁখীনীর
নিরখি আনন্দে আজি, তুমি যে আমার
অন্তরের চিরসাথী, প্রভু কৃপাধার,
শরণ্য বরেণ্য প্রিয় ! হ'য়ে উচাটন
কস্তূরীর গন্ধে অন্ধ মৃগের মতন
ফিরিব না বৃথা আর ! রোধি বহির্দ্বার,—
এবার সাজা'তে অর্ঘ্য দাও অধিকার !

টোট্কা ও মুষ্টিযোগ।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি]

—:o:—

কাটা ঘায়ে।—(১) দুর্ব্বা ও গাঁদা ফুল ফট্কিরি ভিজান জলে বাটিয়া লাগাইলে রক্তপতন বন্ধ হইয়া কাটা স্থান জোড়া লাগে। (২) দুর্ব্বা ঘাস চিবাইয়া কিম্বা গাঁদা ফুলের পাতা রগড়াইয়া পটী বাঁধিলে রক্ত পড়ার নিবৃত্তি হইয়া কাটা স্থান জোড়া লাগিয়া যায়।

নালী ঘায়ে।—শিয়ালমোতয়া গাছের শিকড় নালীতে ঢুকাইয়া দিলে ঘা শুকাইয়া যায় এবং ক্রমশঃ শিকড় ঠেলিয়া বাহির করিয়া ফেলে।

শিরঃপীড়ায়।—(১) পুরাতন গুড় ও শুঁঠ—সমান ভাগে মিশাইয়া নস্য গ্রহণ করিলে শিরঃশূলের শান্তি হয়। (২) কুড়, ভেরাণ্ডার মূল ও শুঁঠ—সমান ভাগে লইয়া তক্র দ্বারা পেষণ করিয়া ও অল্প গরম করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃশূলের তীব্র বেদনার শান্তি হয়। (৩) শত ধৌত ঘৃত মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃশূলের নিবৃত্তি ও মস্তিষ্কের উষ্ণতা বিদূরিত হয়।

আধ কপালে রোগে।—চিনি দুই আনা, কুঙ্কুম দুই আনা এবং গব্য ঘৃত ২ তোলা—একত্র মিশাইয়া ও অল্প গরম করিয়া নস্য লইলে আধ্ কপালে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। (২) অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড়

ও যষ্টিমধু - কাঁজিতে পেষণ করিয়া গব্য ঘৃত ও তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আধ্‌ কপালে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মুখ রোগে।—(১) জাতীফল, পুনর্ণবা, তিল, পিঁপুল, বচ, শুঁঠ, যমানী এবং হরীতকী চূর্ণ—সমানভাগে মিশাইয়া মুখে লাগাইলে সকল প্রকার মুখরোগ আরোগ্য হয়। (২) সোহাগার খই ও মধু একত্র মিশাইয়া লাগাইলে মুখ ক্ষত আরোগ্য হয়।

ঠোঁট ফাটায়।—শিশির বা মাখম লাগাইলে ঠোঁট ফাটা সারিয়া থাকে। (২) রাত্রে শয়নকালে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা নাভিতে ও গুহ্যদ্বারে তিনবার করিয়া সরিষার তৈল লাগাইয়া নিদ্রা যাইলে এই প্রক্রিয়ায় ঠোঁট ফাটা সারিয়া যায়।

জিহ্বার ক্ষতে।—এক মুষ্টি সিদ্ধ চাউল ভালরূপে চিবাইয়া এমন স্থানে ফেলিবে যেন কাকে উহা খায়। এইরূপ করিলেই জিহ্বার ক্ষত অদ্ভুতভাবে আরোগ্য হইবে। শনি বা মঙ্গলবারে এই প্রক্রিয়া করিলে অতি শীঘ্র ফল হয়।

গল ক্ষতে। সিউলি গাছের মুল চিবাইলে গলার মধ্যস্থ ক্ষত আরোগ্য হয়।

দন্তরোগে।—ভেরেণ্ডার আটা বা ভেরেণ্ডা সিদ্ধ জলের কস সৈন্ধব লবণসহ মাড়িতে টিপিলে দাঁতের গোড়ায় ফুলা ও বেদনার উপশম হয়। (২) কুমিরা লতার কচি ডগা —সৈন্ধব লবণসহ দাঁতের মাড়িতে টিপিয়া ধরিলে ফুলা ও বেদনার উপশম হয়।

তিমির রোগ বা চক্ষে কুয়াসার ন্যায় দেখায়।—(১) আহারান্তে জল দ্বারা করতল ঘর্ষণ করিয়া হস্তস্থিত জলের ফোঁটা চক্ষুতে দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়। (২) সাঞ্চি শাকের পাতার রস ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত হাতের ও পায়ের তলায় মালিশ করিলে তিমির রোগ বিদূরিত হয়। (৩) চিত্রানক্ষত্র ও ষষ্টি তিথি একত্র হইলে সেই দিন সৈন্ধব লবণ চূর্ণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অসাধ্য তিমির রোগও আরোগ্য হয়। (৪) শ্বেত পুনর্ণবার রস ও জল সমান ভাগে মিশাইয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চক্ষুর ঝাপসা কাটিয়া যায়। (৫) সকাল বেলা ঠাণ্ডাজল দ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া গণ্ডূষ দ্বারা চক্ষুর মধ্যে সেই জলের ঝাপটা দিলে তিমির এবং ঝাপসা দেখা প্রভৃতি সমূলে নষ্ট হয়।

চক্ষুতে কিছু ঢুকিলে।—চক্ষুর মধ্যে কোন পদার্থ প্রবেশ করিলে একটি পরিষ্কৃত চাউল চক্ষুর ভিতর রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিবে। এইরূপ করিলে কিছুক্ষণ পরেই প্রবিষ্ট দ্রব্যটির সহিত চাউলটি আপনিই বাহির হইয়া আসিবে এবং চক্ষুর জ্বালা-যন্ত্রণা উপশমিত হইবে।

রাতকাণায়।—গব্য ঘৃত গরম করিয়া হাত পায়ের তলায় এবং ব্রহ্মতালুলে ও চক্ষুর পাতার উপর মালিস করিলে রাতকাণা রোগে বিশেষ উপকার হয়।

চোখ উঠায়।—(১) আমের কচি ডগার রস অল্প পরিমাণে চক্ষুতে দিলে চোখ উঠা বাড়িতে পারে না এবং ক্রমশঃ রোগেরও শান্তি হয়। (২) হাতিশুঁড়া পাতার রস চক্ষুতে দিলে চোখউঠা আরোগ্য হয়। (৩) স্তন্যদুগ্ধ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে কতকগুলি ক্লেদ বাহির হইয়া চোখ উঠা আরোগ্য হয়। (৪) মধু, শামুকের চূর্ণ ও থুঁতু একত্র মর্দ্দন

করিয়া চোখের পাতার উপর প্রলেপ দিলে ২।৩ দিনে চোখ উঠা সারিয়া যায়। (৫) টাট্‌কা গোমূত্রে নারিকেল বাটিয়া চোখের চারিদিকে প্রলেপ দিলে চোখ উঠা আরোগ্য হয়।

কর্ণরোগে।—আদার রস অর্দ্ধ তোলা, মধু চারি আনা, সৈন্ধব লবণ ১ রতি ও তিল তৈল চারি আনা—সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ও অল্প গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের ভিতর কট্‌কট্‌ বোধ ও বেদনা হইলে তাহা আরোগ্য হয়। (২) বরুণ মূলের রস গরম করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে ঐ প্রকারের কর্ণ রোগ দূরীভূত হয়।

কর্ণপূঁযে।—ছাগ মূত্রের সহিত সৈন্ধব মিশাইয়া অল্প গরম করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে কাণে পূঁয এবং তজ্জনিত বেদনার শান্তি হয়।

মুখ ব্রণে।—শ্বেত সরিষা, বচ, লোধ ও সৈন্ধব—সকল দ্রব্য সমান ভাগে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে মুখ ব্রণ আরোগ্য হয়।

মাথার রুখী বা দারুণক রোগে।—(১) পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষ কলাই ও সৈন্ধব—সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ আরোগ্য হয়। (২) আম্রবীজ ও হরীতকী সমান ভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ আরোগ্য হয়।

চুল পাকা বা কেশ পকতায়।—লৌহ চূর্ণ ২ তোলা, আমের আঁটির শাঁস ১০ তোলা, আমলকী ৪ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা ও বহেড়া ৪ তোলা একত্র পেষণ করিয়া লৌহ পাত্রে ১ রাত্রি স্থাপন করিবে। ইহা মস্তকে লেপন করিলে কেশপকতা নিবারিত হয়।

অম্লপিত্তে।—(১) হরীতকী ও দ্রাক্ষা চারিআনা মাত্রায় পুরাতন গুড় সহ আহারের পর সেবন করিলে অম্লপিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। (২) পাকা জামীরের রস সায়ংকালে পান করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়। (৩) তুষ বিহীন যব, বাসক ও আমলকী - প্রত্যেক দ্রব্য ||৶০ আনা, জল অাধসের, শেষ আধপোয়া— এই কাথে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও মধু কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত এবং তজ্জনিত বমির নিবৃত্তি হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

তামাক।—বাজারের অন্যান্য জিনিসের মত তামাকেও যথেষ্ট ভেজাল চলিতেছে। ছেঁড়া মাদুর, পচা বিচালি, সাজিমাটী প্রভৃতি ভেজাল দিয়া তামাক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা হয়। এই সকল ভেজাল তামাকের ধূম সেবনে কাশ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তামাকের দরও বাজারে কম নহে; চারি আনা হইতে এক টাকা, দেড় টাকা। তামাক সেবনকারীগণ যদি তামাকের পাতা কিনিয়া আনিয়া ঘরে উহা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন উহা স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত হয়, সেইরূপ উহা সেবনে বাজারের

তামাকের অপকারিতার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং বেহারের যে সকল স্থানে তামাক উৎপন্ন হয়, সে সকল স্থানের অধিবাসীগণ এইরূপ ভাবেই ঘরে তামাক মাখিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। কলিকাতা এবং কলিকাতা অঞ্চলের সহর-ঘেঁসা অধিবাসীগণও সেই ব্যবস্থার প্রচলন করুন না।

বিড়ি ও সিগারেট। সিগারেটের ধূম পানে আমাদিগের কম অনিষ্ট হয় না। তামাকে যে নিকোটিন বিষ আছে সিগারেটে সেই বিষ অধিক পরিমাণে নিহিত। বাঙ্গালা দেশে কাশরোগের প্রাবল্যের অনেকগুলি কারণের মধ্যে সিগারেটের অবাধ প্রচলনও একটি বিশেষ কারণ। সুখের বিষয় কিছুকাল হইতে এই সিগারেটের প্রচলনটা শিক্ষিত সমাজের মধ্য হইতে অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অনেকেই এখন বিড়ি ধরিয়াছেন। এই বিড়ি—সিগারেট অপেক্ষা অনেকাংশে কম অনিষ্টকারী। তবে ধূমপায়ীগণ যদি একেবারে সিগারেট ও বিড়ি উভয়েরই ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঘরে প্রস্তুত তামাক সেবনের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেকাংশে স্বাস্থ্যহানির হাত হইতে অব্যাহত থাকা যায়

চা। —'চা' সম্বন্ধে "আয়ুর্ব্বেদে" অনেকে অনেকরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরাও ইতঃপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি, এখনো তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। সকল সামগ্রীর মধ্যেই ভাল ও মন্দ উভয় গুণই মিশ্রিত, সুতরাং 'চা'য়ের মধ্যেও যে দোষ ও গুণ উভয়ই বর্ত্তমান, তাহা বলা বাহুল্য। তবে আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান এ দেশে চা পানে আমাদের বিশেষ কোনো উপকারের তো সম্ভাবনাই নাই, অধিকন্তু অনিষ্টই হইয়া থাকে। উহার পরিবর্ত্তে ধারোষ্ণ দুগ্ধ দুইবেলা পান করিবার ব্যবস্থা করিলে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। 'চা' বিলাতী অনুকরণে আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু যাহাদের নিকট হইতে আমরা ইহার শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাঁহারা ইহা কখনো খালি পেটে পান করেন না। বাঙ্গালীর নিকট কিন্তু সে ব্যবস্থা নাই, বাঙ্গালী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই শয্যায় বসিয়া ইহার আস্বাদনে তন্দ্রার ঘোর কাটাইয়া তবে শয্যা পরিত্যাগ করেন। ইহাই তো অনিষ্টের কারণ। বাঙ্গালী সকল বিষয়ে অন্যের অনুকরণ প্রিয়। কিন্তু সবটুকুর যে অনুকরণ করিতে জানেনা, তহাই তো তাহার অনিষ্টের আরও বেশী কারণ হইয়া থাকে।

'চা' য়ের গুণ ও দোষ।—'চা' য়ের প্রধান গুণ ইহা শ্লেষ্মা নাশক। সর্দ্দি হইলে চা খাও, উপকার পাইবে, ম্যালেরিয়ার দেশে ম্যালেরিয়ার সময় চা খাওয়ার অভ্যাস রাখ—ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অনেকটা রক্ষা পাইবে। কিন্তু খালি পেটে কখনো চা খাইওনা, তাহাতে উহার যেটুকু গুণ—তাহা নষ্ট হইয়া অতিরিক্ত অনিষ্টই উপস্থিত হইবে। দোকানে গিয়া যাঁহারা চা পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরও অনিষ্টের কারণ ঘটাইয়া থাকেন। দোকানের কাফে চা পান করা কখনো কর্ত্তব্য নহে, কারণ দোকানের ঐ কাফ বা বাটী গুলি পরিষ্কারের জন্য এক বালতি জল রাখা হয়, সেই

বালতিতেই সকলের উচ্ছিষ্ট ডুবাইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, ইহার ফলে একজন রোগদুষ্ট ব্যক্তির রোগ-বীজাণু অন্যের শরীরে প্রবেশের সুবিধা হয়। তদ্ভিন্ন চা যে আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকের উপযোগী নহে এ কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এজন্য সর্দ্দি না হইলে বা ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে অবস্থিতি করিবার প্রয়োজন না হইলে ইচ্ছা করিয়া নেশার মত ইহার বশীভূত না হওয়াই উচিত। ধারোষ্ণ দুগ্ধ, বেলের পানা, মিছরির সরবৎ—গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে চায়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে।

শিশুশরীরে চা।—শিশুশরীরে 'চা' একেবারেই অনিষ্টকারী। শিশু-যকৃতের ইহাও একটি বিশেষ কারণ। অনেক শিক্ষিত পুরুষ শুধু নিজেরাই চা খাইয়া তৃপ্তি লাভ করেন না, শিশুদিগকে স্বহস্তে ঢালিয়া ইহা পান করিতে দিয়া থাকেন। চায়ের সংক্রামকতা বাঙ্গালা-দেশে এমনই করিয়াই বাড়িয়া উঠিতেছে। শিশু শরীরে এই চা বিষের মত কার্য্য করে, তাহার পাকস্থলীর ক্রিয়া-বৈষম্য ঘটাইয়া যকৃত রোগে তাহাকে যে রোগ প্রবন করিয়া তুলে, তাহাই তাহার অকালমৃত্যুর কারণে পরিণত হয়। এজন্য আমরা বিশেষ করিয়া সকলকেই সাবধান করিয়া দিতেছি, অতিরিক্ত চায়ের দাস হইয়া নিজেরা উৎসন্ন যাইতে হয়—যাও, কিন্তু কদাচ শিশুদিগকে চা পানের অভ্যাস করাইওনা, তাহাতে তাহার ঘোরতর অমঙ্গলই সাধিত হইবে। তাহার অমঙ্গলের পরিণাম তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে—ইহা বিশেষভাবেই মনে রাখিও।

শিশুর স্বাস্থ্য।—শিশুদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা অতি সাবধানেই করিতে হয়। আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার জন্য সর্ব্বতোভাবে আমরাই যে দায়ী—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার দায়ীত্ব যাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত, সেই শিশু-ধাত্রীরা যে কোনো কারণেই হউক আগেকার মত আর শিশুপালনের শিক্ষালাভ করেননা। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতিকে শক্তি নামে যে অভিহিতা করা হইয়াছে, সেই শক্তিসাধনের ভিতর স্ত্রীজাতির সাংসারিক সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভের পরিচয়ই প্রকটিত। কিন্তু সেরূপ শক্তির প্রতিমূর্ত্তি মহিলা আমাদের দেশে এখন কতগুলি পাওয়া যায়? এ দোষটাও আমাদের পুরুষদিগের। আমরা যেরূপভাবে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করিলে আমাদের দেশের মহিলা-গণ মহীয়সী শক্তি লইয়া সংসার পালনে ব্রতী হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা আমাদিগের নাই। ফলে অজ্ঞ স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের ফলেই যে দেশে শিশু মৃত্যু ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে ইহা ধ্রুব সত্য। বাঙ্গালী এ সকল কথা ভাবিবেন কি?

ডাক্তারী ঔষধ।—আমাদের দেশে শিশুদিগের পীড়া হইলে ডাক্তারি তেজস্কর ঔষধের সাহায্যে আমরা যে তৎ প্রতীকারে সচেষ্ট হই—বাঙ্গালা দেশে শিশুমৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটি প্রধান কারণ। এ সম্বন্ধে ডাক্তার দ্বারা সম্পাদিত "স্বাস্থ্যসমাচার" পত্রে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"এখনও যদি তোমরা মঙ্গল চাও—যদি ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে রক্ষা করিতে একবিন্দুও

অভিলাষ থাকে এবং তাহাদিগকে নীরোগ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবি ও সর্ব্ববিষয়ে সুখী দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে এখন হইতে তোমরা বহু পরিমাণে তোমাদের বাসগৃহের চারিদিকের বা দেশের ঔষধ ও পথ্যগুলি পুনঃ ব্যবহার করিতে অভ্যাস কর। এই কথাটি তোমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিও যে, তোমাদের প্রাণ-রক্ষক ঔষধ ও পথ্য তোমাদের গৃহের চারিদিকেই ভগবান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীনা ভারত-মহিলারা 'মুষ্টিযোগ' ঔষধ ও দেশীয় সুপথ্য দ্বারাই অধিকাংশ পীড়া আরাম করিতেন এবং এখনও অনেকে করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রবধূদিগকে প্রাচীনাদের ন্যায় মুষ্টিযোগ ঔষধ ও দেশীয় পথ্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেও—দেখিবে অচিরে তোমাদের স্বাস্থ্য আশাতীত উন্নতিলাভ করিবে।"

আয়ুর্ব্বেদের মতে শিশুদিগকে বড় ঔষধ কখনই দিতে নাই। যত সহজ ঔষধে পার তাহার রোগ প্রতীকারের ব্যবস্থা কর—ইহাই আর্য্যঋষির অমূল্য উপদেশ। আমরা বর্ত্তমান সময়ে সে উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তাহার রোগ হইলে উগ্রবীর্য্য ডাক্তারি চিকিৎসার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তবে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি! শিশুকাল হইতে আমাদের স্বাস্থ্যহানি এমনই করিয়াই ঘটিতেছে। বাঙ্গালা দেশের শিশুদিগকে রক্ষা করিতে হইলে শিশুগণকে ডাক্তারি ঔষধের ব্যবহার একেবারেই করিতে দেওয়া হইবে না, শিশু-জননীকে সেলি, সেক্স পিয়র,—বায়রণের শিক্ষায় শিক্ষিতা না করিয়া প্রাচীনা মহিলাদের মত গৃহস্থালীর শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করিতে হইবে। সংসারের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারা যাহাতে সেকালের মত টোটকা ও মুষ্টিযোগগুলির ব্যবহার বিধি বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য দেশের পুরুষদিগকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। মহিলা সমাজে এইরূপ শিক্ষার প্রচলন হইলে—আমাদের দেশ হইতে যে শিশু মড়ক কমিয়া যাইবে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যহানি।—বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ লাভ যথেষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু গল্প ও কাব্যসাহিত্যের অত্যধিক প্রচারে বাঙ্গালী সমাজে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে—সে কথা কেহ চিন্তা করিতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়। এখনকার দিনে মাসিক পত্র গুলির অধিকাংশই গল্প ও কাব্য সাহিত্যে পরিপূর্ণ, বাঙ্গালীজাতির ছাত্র পাঠকেরা সেগুলি পড়িয়া যৌবনের আরম্ভ না হইতেই এক এক জন যে বিশ্ব প্রেমিক হইয়া উঠেন, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়ার আধিক্যই তাহার কারণ সম্ভূত—এ কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ক্ষয়রোগে অধিক সংখ্যক লোক মরিতেছে, এই ক্ষয়ের প্রাথমিক কারণ ধাতু সম্বন্ধীয় ব্যাধি। বাঙ্গালী-মহিলাদিগের মধ্যে এখনকার দিনে হিষ্টিরিয়ার প্রাদুর্ভাবও এই নভেলও কবিতার অত্যধিক প্রচলন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। বাঙ্গালীজাতি এসকল কথা চিন্তা করিবেন কি?

লাইব্রেরীও রিডিংরুম। মফঃস্বলের অনেক স্থানেই এখন ছাত্রেরা চেষ্টা করিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। সে সকল লাইব্রেরীর

সংগৃহীত পুস্তকের তালিকায় গল্প ও কাব্য সাহিত্যের সংখ্যাই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে ছাত্রজীবনে অনেক বালকই গল্প ও কাব্য সাহিত্যের রসাস্বাদনে অভিজ্ঞ হইয়া নির্শীথ যোগে নায়িকাকুলের স্বপ্নদর্শন করিয়া থাকে। ঐ সকল পুস্তকাগারে যাহাতে ঐ শ্রেণীর সাহিত্যের পুষ্টি লাভ না করিতে পারে—তজ্জন্য অভিভাবক মণ্ডলীর কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত। আমরা দেশের চিন্তাশীল দিগকে একথা চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

প্রেরিত পত্র।—আমরা নিম্নলিখিত পত্র খানি পাইয়াছি।—মাদ্রাজের পশ্চিম উপকূলে মালাবার জেলায় কালিকটের ৭।৮মাইলের মধ্যে আজ তিন মাসের বেশী যে বিদ্রোহ চলিতেছে তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রায় ১ লক্ষ লোক—বালক, শিশু, মহিলা ও পুরুষ একেবারে গৃহহীন, অর্থহীন হইয়া সাহার্য্য শিবিরে (Relief Campএ) পড়িয়া আছেন। এতগুলি লোককে খাওযাইতে পরাইতে কত লক্ষ টাকার প্রয়োজন তাহা দেশবাসিগণ বুঝিতে পারিতেছেন। মাসে হারাহারি ৫৲ টাকা গড়পড়তা ধরিলে এক মাসে মোট খরচ ৫ লক্ষ টাকা। এই অবস্থা ৬ মাস পর্য্যন্ত চলিবে। সুতরাং শুধু খাওয়াপরার জন্য ৩০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ইহা ছাড়া ৬ মাসের পর সাহায্য-শিবির হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় উহাদের হাতে কিছু কিছু অর্থ দেওয়া চাই। উক্ত স্থানে বেসরকারী ২১টি সমিতি কার্য্য করিতেছে। "ভারত সেবক-সমিতি (Servants of India Society) হইতে দশ লক্ষ টাকার সাহায্য ভিক্ষা আমরা করিয়াছি। এই সমিতির সভ্য কালিকটে সাহায্য শিবিরে দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সেবায় নিযুক্ত আছেন। আর ৪।৫ জন উহাদিগের জন্য অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহার্থে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরিতেছেন। আমি আমাদের সমিতির আদেশানুযায়ী বঙ্গ এবং বিহার, উড়িষ্যার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব। বিনীত নিবেদক

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শহ ভারতসেবক সমিতির সদস্য। কটক পোষ্ট আঃ (ওড়িশা)

জলসংস্থানের জন্য আর এক খানি পত্র।—শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত উত্তর সাজড় গ্রামে ৩০০ ঘর গৃহস্থের বাস। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি নানা জাতির লোক আছেন। সকলেই অত্যন্ত গরীব। লোক সংখ্যা অনুমান ২০০০ দুই হাজার। কিন্তু এই বৃহৎ গ্রামে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। এই জল কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত একটি বড় জলাশয় খনন করা আবশ্যক। দুই হাজার জল ক্লিষ্ট নর নারীর পক্ষ হইতে হাত যোড় করিয়া আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, সকলে এই দীন দাসকে কিছু কিছু দান করিয়া কৃতার্থ করুন। শ্রীশ্রীনাথ দত্ত রায়। ৮৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

ম্রিয়মাণ বঙ্গপল্লী।

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী।)

[শ্রীক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

—:০:—

অনেক গ্রাম ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর উৎপাতে কিছুকাল জনশূন্য ছিল। পরে জঙ্গল-পাহাড় হইতে ধুনো-সাঁওতাল আসিয়া বাস করায় পুনরায় মানবস-মাগম হইয়াছে। ইহাদের আসিবার পূর্ব্বে এই সব পরিত্যক্ত নির্জ্জন পল্লী যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। দিবা-ভাগে ব্যাঘ্র-শৃগালাদি পশু অকুতোভয়ে বিচরণ করিত। রাঢ়ে অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি—“ধুনো, সাঁওতাল, ধাঙড় প্রভৃতি অসভ্যজাতি না থাকিলে অনেক জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত; কারণ ভূমি কর্ষণ করিবার যোগ্য বলশালী পুরুষ কই? কঠিন মৃত্তিকা হইতে লাঙ্গলের মুখে ধান্যগোধূমাদি ফসল উৎপাদন করা বড় আয়াসসাপেক্ষ। ম্যালেরিয়া পীড়িত, প্লীহা-যকৃত গ্রস্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির কর্ম্ম নয়।” বন জঙ্গল হইতে সব জংলা মানুষ আসিয়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামে বসবাস করিতেছে। তাহারা বনজঙ্গলে বাস করিত—এইসব ‘মোটো’ গ্রামে আসিয়া বাস করায় যে পরিবর্ত্তন হই-য়াছে, উহাতে তাহাদিগের মঙ্গল বৈ অমঙ্গল বা ক্ষতি হয় নাই। তাই তাহারা মহোল্লাসে নবীন উৎসাহে কৃষিকার্য্য করিতেছে—ম্যালেরিয়া এখনও তাহাদিগকে কাবু করিতে পারে নাই। ইহার কারণ মনে হয়, যাহারা বনজঙ্গল-পাহাড়ে বাস করে, তাহারা ত নানারূপ কষ্ট অনিয়মে অভ্যস্ত। সুতরাং নূতন করিয়া আর কোন্ বিষের দ্বারা আক্রান্ত হইবে? বিষের মধ্যে যাহারা পালিত, তাহাদের উপর বঙ্গপল্লীর ম্যালেরিয়া-বিষ এখনও সবিশেষ কার্য্যকর হয় নাই। তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম। রোগ-প্রতিষেধক শক্তি যথেষ্ট

য়াছে। গায়ের জোরে মাটি হইতে ফসল উৎপাদন করিয়া বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ম্রিয়মাণ পল্লী তাহাদের আগমনে আবার সজীব হইয়া সাড়া দিতেছে। এখন সে সব পথে চলিতে আর পূর্ব্বের মত ভয় হয় না। কিন্তু তখন সেই জনমানবশূন্য নীরব বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথ দিয়া যাইতে হইলে ভয়ে গা শিহরিয়া উঠিত। পাছে বাঘে ধরে বা চোর ডাকাতে মারিয়া ফেলে।

বিজন প্রদেশ কি ভীতিপ্রদ! মানুষের সহিত যতই কলহ করিনা কেন, মানুষ না হইলে চলেনা। ধার্ম্মিক কবি কাউপর গাহিয়াছিলেন—"সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেমডোরে আবদ্ধ হইয়া মানুষ একত্র বাস করিবে—ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত।" মানুষই জগতের লক্ষ্মী—আবার মানুষই অতি ভয়ানক মহামারী, এই সোণার সংসারকে ভীষণ মরুভূমি বা শ্মশানে পরিণত করে। আপনি যে বাড়ীতে বাস করেন, উহার কোথাও মলিনতা বা আবর্জ্জনা নাই—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, একটু সিঁদুর মাটিতে পড়িলেও খুঁটিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ২।১ মাসের প্রবাসের পর আসিয়া দেখিবেন—উই, ইঁদুর, চামচিকা, পায়রা, মশা, মাছি, বনজঙ্গলে আপনার ইন্দ্রভবনটী কিরূপ কদাকার ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। দেখিলেই মনে হইবে, উহা আর মানুষের রাজ্য নয়, ভূতপ্রেতের লীলাভূমি। মানুষই দুনিয়ার শ্রী—মানুষই দুনিয়ার আভরণ, মানুষই দুনিয়ার জীবন। এই দুনিয়া-চিড়িয়াখানার মানুষ না থাকিলে ইহার কোনও সৌন্দর্য্য—কোনও আকর্ষণ থাকে না। তবে ক্ষোভ এই হয়, কেন এই দুনিয়ার রাজা, জীবশ্রেষ্ঠ আত্মবিস্মৃত নারায়ণ—রিপুর বশে, এমন সোণার সংসার ছারখার করিয়া ফেলে? জীব মাত্রই শিব, তবে দুঃখ এই, কেন এই শিবের দ্বারা এত অশিব সংঘটিত হয়? জগতের সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি যত অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী কে? প্রধানতঃ মানুষ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদিতে আর কয়টা জীব নষ্ট করে? কিন্তু এই শিব যখন ক্রোধানলে উন্মত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহার বিকট হুঙ্কারে মেদিনী কম্পমান। জল, আকাশ, ব্যোম—ত্রিভুবন টলটলায়মান—যেন প্রলয়ের প্রাক্কাল! কি ভীষণ দৃশ্য! স্বপ্নে ভাবিলেও ভয়বিহ্বল হইতে হয়। নর-শোণিতপ্রবাহে যখন বিস্তীর্ণ প্রান্তর এক অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত হয়, হতাহতের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদে যখন চতুর্দ্দিক প্রপূরিত হয়, তখনই মনে হয়—এ শিব না অশিব—এ আবার কোন্ জাতীয় পশু?

কোন কোন গ্রামে মানুষ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে কয়টী রুগ্নজীব অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছে মাত্র, তাহাদের কাহারও পরস্পর মিল নাই। পূর্ব্বপাড়া—দক্ষিণে যায় ত, পশ্চিমপাড়া উত্তরে যাইবে। চারি পাড়ায় চারি খানি প্রতিমাপূজা হইবে। তথাপি সকলে মিলিয়া চাঁদা দিয়া একখানি জাঁকাল বারোয়ারী ঠাকুর করিবেনা! ইহা বোধহয় ভারতের আবহাওয়ার গুণ—কেহ অপরের বশে থাকিয়া কাজ করিতে চাহে না; সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এ জন্য মনে হয়, গ্রামগুলির অবনতি ও পরিণামে উচ্ছেদ একেবারে অনিবার্য্য। যেখানে একতা ও বশবর্ত্তিতা নাই,

যেখানে শাসন ও শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। একারণ আমাদের সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। বিবাহরাত্রিতে পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক খাওয়াইতে আমাদের কত গণ্ডগোল হয়। যিনি একটু কর্তৃত্ব করিতে যাইবেন, তাঁহাকে পদে পদে লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে। তবে এখানে একথাও স্বীকার করিতে হইবে, বাঙ্গালী-চরিত্রে দিন দিন ঔদার্য্যের অভাব হইতেছে। কেমন একটা নীচতা, ব্যবসাদারী ও স্বার্থপরতা আসিয়া ইহার স্থান অধিকার করিতেছে। যিনি কর্ত্তা বা নেতা হইবেন, তাঁহার প্রধান গুণ হইবে—ত্যাগ ও পরার্থপরতা। গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, কূপখনন প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য যাঁহার হস্তে সরকারী ও বেসরকারী টাকা দেওয়া হইল, তিনি হয়ত এখানে দুই কোদাল মাটি, ওখানে একটী ছোট বাঁশের সেতু দেখাইয়া বাকী অর্থটী বেমালুম আত্মসাৎ করিলেন। যিনি রক্ষক, তিনিই যদি ভক্ষক হন, তবে কেমন করিয়া লোকে তাঁহাকে বিশ্বাস করে? কাজেই দুনিয়ায় সংশয় ও অবিশ্বাস জন্মিয়া প্রেম ও শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়াছে। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, মানেও না। গুণ থাকিলে ত মানিবে? নির্গুণের আর আদর কোথায়? এই স্বার্থপরতা ও অনৈক্য হিন্দু-সমাজেই সাতিশয় বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। হিন্দু বড় আত্মসুখী ও ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অনেক গ্রামে হিন্দুপাড়া নির্জ্জন—কোথাও বা মানুষ অতীব বিরল। কিন্তু মুসলমান পাড়ার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। তাহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মক্ষম ও একতাবদ্ধ। উচ্চ জাতীয় হিন্দুর মোকদ্দমাবুদ্ধি, চাতুরীবুদ্ধি ও শেয়ালফেঁাকি বিলক্ষণ আছে, পরকে নাচাইয়া আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে সে বেশ জানে। এক কথায়, তাহার head আছে—কিন্তু body ও heart নাই,—দেহে বীর্য্য ও সামর্থ্য নাই, হৃদয়ে বল নাই। মুসলমান স্ত্রীপুরুষ গায়ের জোরে ডাঙ্গা কাটিয়া সহর করিয়া ফেলে—কঠিন মৃত্তিকা হইতে শস্য উৎপাদন করিয়া সুস্থ ও সবল দেহে সচ্ছল অবস্থায় পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া একত্র বাস করিতেছে। নিম্ন শ্রেণীর সবল হিন্দু এখনও অনেক গ্রামে রোগের সহিত লড়িতেছে। কিন্তু লেখা পড়া জানা, আঁটিতে টক, কলমপেশা, বায়সচতুর, অলস, পরমুখাপেক্ষী, ভাবভুয়িষ্ট, দুর্ব্বল, স্বপ্নপ্রধান ও বিচ্ছিন্ন (বিশেষতঃ উচ্চ জাতীয়) হিন্দু বহু-গ্রামে প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ম্যালেরিয়ার জ্বালায় গ্রাম ছাড়িয়া সহরে, নগরে আসিয়া বাস করিতেছে।

রোগের কথা অনেক বলিয়াছি। এখন প্রতিকার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। পল্লী লইয়াই ভারতবর্ষ। কারণ বড় সহরের সংখ্যা সামান্য—নখাগ্রে গণনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে পল্লী-সংস্কার যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়—একথা কোন মতেই অস্বীকার্য্য নহে। আমাদের ঔষধ দরকার হয় কখন?—যখন আমরা নিজে যন্ত্রটাকে আর মেরামত করিয়া উঠিতে পারি না,—যখন প্রকৃতির চেষ্টা ফলবতী হয় না, তখনই কৃত্রিমতার প্রয়োজন। সেইরূপ গ্রামগুলি যখন আর নিজে বাঁচিবার জন্য সচেষ্ট নহে, কিম্বা তাহাদিগের শত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনই বাহ্য সাহায্য—অপরের সহা-

থাকা অত্যাবশ্যক। আর এক কথা, বড় সহরের যাহারা মাথা—যাঁহাদিগের খ্যাতি-প্রতিপত্তি সহরে একচেটে, তাঁহাদিগের অধিকাংশই পল্লীগ্রামাগত। ২।৩ পুরুষ হইতে কেহ সহরে বাস করিতেছেন—কেহ একপুরুষে, কেহ বা স্বকৃতভঙ্গ। তাঁহাদিগের পল্লী বড় ভাল লাগেনা। না লাগিবার অনেক কারণ আছে।

(১) সহরেই রোজগার হয়, সুতরাং মানুষ আর পল্লীসহর দুইস্থানে টানাপোড়েন করিতে চাহেনা। বেশ সুখে যেখানে অর্থাগম হয়, লোকে সেইখানেই ক্রমশঃ স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকে।

(২) পল্লীগ্রামে কৃত্রিম আরাম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পূর্ণ অভাব—যেমন কলের জল, বিজলী-ব্যজন, বৈদ্যুতিক-আলোক ইত্যাদি। কলে হাসি, কলে কান্না, কলে প্রেম, কলে রান্না, কলে ওঠা, কলে নামা, কলে চলা, কলে বলা—সহরগুলি যেন কল ও কৃত্রিমতার রাজ্য। নাচ, তামাসা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের প্রবাহ সহরে নিয়তই চলিয়াছে। রাস্তাঘাট বাজার-সর্ব্বত্রই ফূর্ত্তির লহর ছুটিয়াছে। দাসদাসী, মোসাহেব, ঘোড়াগাড়ী—পয়সা ফেলিলে অমিল কোনবস্তুই নাই। যিনি প্রত্যহ মাংস খান, পল্লীগ্রামে তাঁহার একদিনও থাকা চলে না। গ্রামে দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি উৎসব ব্যতীত অন্য সময় বড় একটা ছাগ মেষের প্রাণ সংহার করা হয় না। কাজেই প্রত্যহ মাংসভোজী—সহুরে বাবুর পল্লী-জীবন এক প্রকার অসহ্য। সহরে প্রতি রাত্রে বায়স্কোপ, থিয়েটার, অপেরা, খ্যাম্‌টা, ঢপ প্রভৃতি, আমোদ চাই। পল্লীতে হয়ত বৎসরে একবার কোনও যাত্রার দল আসিয়া একটু আনন্দ দিয়া গেল। প্রত্যহ চাঁদনী রাতের জ্যোছনার মত আনন্দদায়ক জীবন গ্রামে কোথায় পাইব? গ্রামে গতি নাই—আছে স্থিতি। গ্রামে গর্ব্ব ছিলনা—ছিল বিনয়, নম্রতা ও সৌজন্য। গ্রামে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা নাই, আছে ধৈর্য্য ও শান্তি। গ্রামে রজো ছিল না—ছিল সত্ব। গ্রামে কপটতা ও কুটিলতা ছিলনা—ছিল অকৃত্রিম প্রেম ও সরলতা। গ্রামে ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণিক সুখের লালসা ছিলনা—ছিল স্থায়ী, অনাবিল, পবিত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মোদ্ভূত গভীর সুখ, আনন্দ ও শান্তি।

আজ এই সাত্বিক ঢিমেতেতালা পল্লীবাসী রজোগুণী ঘোর কলির জীবন-সংগ্রামে টিকিতে পারিতেছেনা। এখন শুধু পুণ্যধর্ম্ম করিলে—ঝোলা মালা জপিলে চলেনা। এখন চাই গায়ের জোর, মনের বল, যান্ত্রিক শক্তি ও যথেচ্ছাচার। বারবেলা বাছিতে গেলে কি রেলে যাওয়া চলে? এখন আর হাঁচি-টিকটিকি মানিলে কি পরের চাকরী করা পোষায়? এখন সন্ধ্যাগায়ত্রী জপের সময় কই? রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া যাঁহাকে স্নানাহার করিয়া অমুক দোকানে কর্ম্ম স্থানে যাইতে হইবে, তাঁহার মুখে কি আর তখন সূর্য্যস্তব—ব্রহ্মনাম আসে? তখন কোন গতিকে দু'টো ভাত মুখে দিয়া ট্রেন ধরিতে হইবে। আর রাত্রিতে সূর্য্যই বা পাই কোথা? [ক্রমশঃ]

বিষ-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

সর্পের জাতি ও আকৃতি।

——:*:——

মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার "বিষতন্ত্র" নামক গ্রন্থে—শতাধিক সর্পের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল সর্প, সবিষ ও নির্ব্বিষ উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত। নির্ব্বিষ সর্পের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল সবিষ সর্পের বিষয়ই আলোচনা করিব।

সবিষ সর্প অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কোন জাতীয় সর্প দৃষ্টিবিষ, অর্থাৎ তাহাদের চক্ষুতে বিষ থাকে, তাহারা জীব-শরীরে দৃষ্টিপাত করিলে বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায়,—সে দেহে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত স্পর্শজ্ঞান থাকে না। এই জাতীয় সর্পের নাম "দিব্য সর্প"—ইহারা ব্যোমচর অর্থাৎ আকাশে উড়িতে পারে। আর এক শ্রেণীর দিব্য সর্প আছে—তাহার নিঃশ্বাসে শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ কোন জাতীয় সর্পের লালায় বিষ, কোন জাতীয় সর্পের পুরীষ ও মূত্রে বিষ, কাহারও অস্থিতে বিষ, কাহারও বা দন্তে বিষ অবস্থিতি করে।

এই দংষ্ট্রা বিষ-সর্পই—অতি ভয়ঙ্কর। ইহাদের বিষ-সদ্য প্রাণ নাশক। এই জাতীয় সর্প ভোগী—অর্থাৎ ফণাধারী।

প্রসঙ্গ ক্রমে এ স্থলে "বিষ" শব্দের একটু ব্যাখ্যা করিব। "বিষ" কাহাকে বলে? যাহা শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—তাহাই বিষ। যে পদার্থ উদরস্থ হইলে, অথবা রক্তের সঙ্গে মিশিলে—শারীর ক্রিয়া সহসা বিপর্য্যস্ত হয় এবং মৃত্যু আনয়ন করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই বিষ বলিয়া অভিহিত করেন। বিষ—রক্তের সহিত মিশিয়া, মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়। এই ব্যাপকতাই "বিষের" বিষ নামের সার্থকতা।

বিষের উৎপত্তির উপাখ্যান এইরূপ—পুরাকালে অমৃত লাভের লালসায় দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। সেই সময় সাগরগর্ভ হইতে এক বিকট দর্শন—ভীষণাকৃতি-পুরুষ উত্থিত হন। সেই পুরুষ প্রজ্জলিত [illegible] সদৃশ প্রদীপ্ত প্রভাময়, তাঁহার চক্ষু জবা[illegible] তুল্য রক্তবর্ণ, কেশ কলাপ—হরিদ্বর্ণ, তাঁহার মুখ গহ্বরে চারিটী দন্ত বিরাজমান! এই ভীম মূর্ত্তি পুরুষকে দেখিবা মাত্র—জগৎবাসী জীবগণ অত্যন্ত 'বিষাদ' প্রাপ্ত হয়। জগজ্জীবের বিষাদ হেতু বলিয়া 'বিষ' নামে ঐ পুরুষের নামকরণ হইয়াছিল। ইহারই শক্তি 'স্থাবর' নামে বৃক্ষ লতাদিতে এবং "জঙ্গম" নামে সর্প বৃশ্চিকাদি প্রাণি-দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

গ্রীষ্ম মহামণ্ডল ভারতবর্ষে—বিষধর সর্পের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। সর্প জাতি শিশির-প্রভাব সহিতে পারে না, কাজেই শীত প্রধান দেশে বড় একটা সাপ নাই। আমাদের বঙ্গ-

[illegible] চারি প্রকার বিষাক্ত সর্প—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। গোখুরা,
২। কেউটে,
৩। কালাজ,
৪। কেরেতা।

এই চারি প্রকার সর্পের দংশনে প্রতি বৎসর ২৩ হাজার বা ততোধিক নরনারী প্রাণত্যাগ করে। শ্রীযুক্ত অনুতোষ দাশ গুপ্ত এম এ—মহাশয় সরকারী রিপোর্ট হইতে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন! কি ভীষণ ব্যাপার বুঝুন! যুদ্ধেও বুঝি এত লোক মরে না! অথচ এই দেশের দ্বাদশ জন বিষ-বৈদ্য—আলেকজাণ্ডারের আহ্বানে মেসিডনের মানব মণ্ডলীকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিতে ছুটিয়াছিলেন! হায় রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত! আজ তুমি কোথায়? একি তোমার সেই বিষবৈদ্য-নিষেবিত সুরসরিদবিধৌত-পাদ মহাদেশ? একি তোমার সেই অতীত গৌরবে গরীয়সী বিজ্ঞান প্রসবিনী রাজধানী? সে কথা বিশ্বাস করিতে যে প্রবৃত্তি হয় না! এ যে কায়ার অসার ছায়া, [illegible]ত্বের হীন পরিণতি, মহত্ত্বের মহাশ্মশান! পুণ্যক্ষেত্রের চিতা চুল্লী! রত্নদীপের নির্ব্বাণ ধূম!!!

গোখুরা সাপ সকলেই দেখিয়াছেন, ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। এ দেশে চারি রকম গোখুরা সাপ আছে। ১। কালী গোখুরা, ২। খৈরা গোখুরা, ৩। শাঁখামুটী, ৪। পদ্ম গোখুরা।

কালী গোখুরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,—দেখিতে ঢ্যাঁড়াশ সাপের মত। ইহারা কোপনস্বভাব, চঞ্চল, অত্যন্ত হিংস্রক। খৈরে গোখুরার গাত্রে—খৈএর মত শাদা শাদা দাগ আছে—ইহার চর্ম্ম মসৃণ, শ্বেত বর্ণ, তদুপরি কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু। শাঁখামুটী সুন্দরবনে বাসকরে—পীত বর্ণ, দেখিতে ঢোঁড়া সাপের মত, ইহারা অত্যন্ত রাগী—আকার বৃহৎ, কুলোপানা চক্র—রুষ্ট হইলে রক্ষা নাই, পুচ্ছে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মানুষের মাথায় দংশন করে। পদ্ম গোখুরা—দেখিতে সুন্দর বর্ণ, রক্তপদ্মের মত লোহিত আভাযুক্ত,—তাহার উপর কৃষ্ণ বর্ণের বিন্দু চিত্রিত। বিস্তারিত ফণা—যেন প্রস্ফুটিত পদ্মদল। ফণার উপরে—বঙ্কিম রেখা, যেন শ্রীকৃষ্ণের যুগল শ্রীচরণ। প্রবাদ এই—কালীয় দমন কালে কৃষ্ণ ঠাকুর যে কাল সর্পের মস্তকে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই চরণ-রাজীবের চারুচিহ্ন—এই গোখুরার চক্রের উপর চিরস্থায়ী রূপে মুদ্রিত। পদ্মগোখুরার প্রকৃতি কিছু নম্র ও ধীর; হঠাৎ রুষ্ট হয়না, অকারণে কাহাকেও কামড়ায় না। নিদ্রিত মানুষের গায়ের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। খৈরে গোখুরাও কতকটা—এই প্রকৃতির—ধীর ও শান্ত। গোখুরা সাপকে কোন কোন দেশে "খড়ীশ" বলে।

কেউটে সাপ তিন রকম। ১। কালী কেউটে। বৈদ্যগণ ইহাকেই "কৃষ্ণ সর্প" বলেন। ইহার বিষেই "সূচিকাভরণ" প্রভৃতি গরলগর্ভ মহৌষধ প্রস্তুত হয়। ইহারা দেখিতে ঠিক গোখুরার মত, বর্ণটা অধিক মলিন। গলায় কালো রঙের কাটা। মাথায় "হরি পদ্ম চিহ্ন"—অপরিস্ফুট। কেউটের বিষ—গোখুরার মত তীব্র নহে। চক্ষু রক্ত বর্ণ। ২। শাঁখিনী কেউটে—গায়ে সাদা, ও কালো সাঁট সাঁট দাগ। ৩। পেঁতীজাড়া কেউটে—

[illegible] কেউটের—অপেক্ষা কর্সা, চক্ষুও রক্ত বর্ণ রহে। কেউটের ভিতর এই গেঁড়াভাঙ্গা কেউটের উগ্র স্বভাব। ক্রুদ্ধ হইলে, ছুটিয়া আসিয়া দংশন করে। কেউটের আর একটী নাম—"আলান"।

কালাজ সর্পই—কাল নাগিনী। আকার গোখুরার মত,—হ্রস্ব, কৃশ, সর্ব্বদাই গর্জ্জন করে, কোথাও কিছু শব্দ হইলে চমকিয়া উঠে। সাহস বেশী, মানুষ দেখিলে সহসা পলায় না, ফাঁস্ ফোঁস্ করিয়া ভয় দেখায়। মা-মনসার বিশ্বস্ত অনুচর। ইহারই কোনও পূর্ব্ব পুরুষ—মনসা দেবীর আদেশে 'নখিন্দর' কে দংশন করিয়া থাকিবে।

কেরেতা—কৃষ্ণ বর্ণের নাতিদীর্ঘ সর্প। চক্র আছে—তাহাতে পদ চিহ্ন নাই। কেউটে—গোখুরার ন্যায় সুপুষ্ট গোল নহে, কিছু চ্যাপ্টা। কালাজ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, ইহার বর্ণ কিছু ক্যাকাসে, তাহার উপর বিচিত্র মণ্ডল। অত্যন্ত রাগী, যেন সর্ব্বদাই দংশনের ছল খুঁজিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত চারি জাতীয় সর্পের দংশনেই—এদেশের লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহারা সাক্ষাৎ যম। অজগর—বঙ্গদেশবাসী নহে, তাহারা পাহাড়ে থাকে। কচিৎ দু' একটা বন্যার জলে ভাসিয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন গৃহস্থের গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ—খাইতে আরম্ভ করে। মানুষের উপর বড় একটা অত্যাচার করেনা। তবে এদেশে একরকম বোড়া সাপ দেখিতে পাওয়া যায়—দৈর্ঘ্যে ৫।৬ হাত হইবে—কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মের উপর বিচিত্র বর্ণের মণ্ডল। ইহাদের মুখের লালায় বিষ আছে। সে বিষ প্রাণ নাশক না হইলেও, নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বোড়ায় কামড়াইলে, দংশিত স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয়, সে ক্ষত সহসা আরোগ্য হয় না। অজ্ঞাতসারে দুগ্ধ বা অন্য কোন খাদ্যের সহিত বোড়ার লালাবিষ উদরস্থ হইলে—মানুষের শরীরে শীতপিত্ত বা কোঠের মত ক্লেদপূর্ণ কণ্ডুযুক্ত এক প্রকার পীড়কা জন্মে—লোকে তাহাকে গরল বলে। গরল অতি কষ্টপ্রদ চর্ম্মরোগ।

চিতি সাপ বিষাক্ত নহে বটে, কিন্তু উহারও লালায় বিষ থাকে। অনেক সময়—চিতি নিদ্রিত মানুষের অঙ্গ লেহন করে। ঐ স্থানে কণ্ডু ও শোথ উপস্থিত হয়। দু' এক দিন পরে, আপনা হইতেই ভাল হইয়া যায়।

আর এক রকম সাপ আছে—তাহারা দ্বিমুখ, চর্ম্মের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত বর্ণের বিন্দু। এই সাপের নাম "সিঁদুরে বোড়া"। শরীরের কোন অঙ্গ ইহাদের নিঃশ্বাস স্পৃষ্ট হইলে জ্বালা করিতে থাকে। জ্বালা—অত্যল্প কাল স্থায়ী। এদেশে বেত আছড়া নামক আর এক রকম কৃশকায় সাপ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা বৃক্ষ শাখায় বাস করে, ভীরু স্বভাব। ভয় পাইয়া অনেক সময় বৃক্ষতলস্থিত মানুষের দেহে সহসা লাফাইয়া পড়ে। ইহারও স্পর্শে বিষ আছে, স্পৃষ্ট অঙ্গ কিছুক্ষণ ধরিয়া জ্বালা করিতে থাকে।

হরিদ্বর্ণের "লাউডগা" সাপ—অলাবু, কুষ্মাণ্ড, পুতিকা প্রভৃতি নাড়ী শাকের লতা বিতানে জড়াইয়া থাকে। ইহাদের মূত্রে বিষ আছে। এই মূত্র শরীরে স্পৃষ্ট হইলে, স্পৃষ্টস্থান অত্যন্ত চুলকায়। "হেসে" সাপ শ্বেত বর্ণের, দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ইহাদের ফুৎকার অঙ্গে লাগিলে, সমস্ত দেহ শোথ

রোগীর ন্যায় ফুলিয়া উঠে। বিশুতি সাপ—ঠিক ল্যাঠামাছের মত, দৈর্ঘ্যে আধ হাতের অধিক নহে; ক্ষেত্রে, উত্তানে, সর্ব্বদাই বেড়ায়, ইহাদের পুরীষে বিষ; পুরীষ তৃণের উপর সাবানের ফেণপুঞ্জবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মাড়াইলে পদতল চুলকাইতে থাকে, কখনও ঘা' হয়, কখনও বা, পাকুই লাগার মত হাজিয়া যায়। 'উদয় কাল' নামক কণ্ঠে কাটাশোভিত ক্ষুদ্র সর্পের অস্থিতে বিষ থাকে। ইহাদের মৃতদেহের কণ্টক পদতলে বিদ্ধ হইলে, পা ফুলিয়া উঠে—যন্ত্রণা হয়—শেষে ব্রণোৎপত্তিও হয়। ঐ ব্রণ হইতে ক্লেদস্রাব হইতে থাকে—স্রাব দুর্গন্ধ যুক্ত।

আমরা সবিষ-সর্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। প্রাণিবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়—সর্ব্ব শুদ্ধ ৬৯ প্রকার বিষধর সর্প আছে।

স্থলচর ও জলচর সর্প।

৬৯ প্রকার বিষধরের মধ্যে ৪০ প্রকার সর্প স্থলচর। অবশিষ্ট ২৯ প্রকার সর্প জলচর। এখানে "জলচর" অর্থে সামুদ্রিক সর্প বুঝিতে হইবে। কেননা সমুদ্র ভিন্ন অন্য জলে যে সকল সাপ বাস করে, তাহাদের বিষ নাই।

বিষধরের ভিতর গোখুরাই সর্ব্ব-প্রধান। ইহার বিষ অতি তীব্র ও সাংঘাতিক। এমন কি, গোখুরার দংশনে এক মিনিটের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে। গোখুরা এক বার মাত্র দংশন করিলে যে পরিমাণে বিষ নির্গত হয়, সে বিষে ১৫।২০ জনের মৃত্যু হইতে পারে। মানুষ, গোরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি জীবের রক্ত উষ্ণ, সর্প দংশনে ইহাদের মৃত্যু শীঘ্র হয়। ভেক, মৎস্য, টিক্‌টিকী প্রভৃতি জন্তুর শরীরের রক্ত শীতল—এই জন্য সাপে কামড়াইলে—ইহাদের মৃত্যু শীঘ্র হয় না। আবার উষ্ণ রক্তের জীব যদি বৃহদাকার হয়, তাহার মৃত্যু বিলম্বে ঘটে। হস্তীকে সর্পে দংশন করিলে শীঘ্র মরে না। যে টুকু বিষ রক্তে মিশিলে মানুষ মরিয়া যায়, সে টুকু বিষে হাতীর কোনও ক্ষতি হয় না।

একটা গোখুরা সাপ, অন্য গোখুরা সাপকে কামড়াইলে—সে মরে না। বিষের তেজে কিছুক্ষণ ঢলিয়া পড়ে, এই মাত্র। কেউটে সাপও গোখুরার কামড়ে মরেনা। কিন্তু কালাজের দংশনে গোখুরা এবং গোখুরার দংশনে কালাজ—বিষে জর জর হইয়া প্রাণ হারায়। কালাজের দংশনে গোখুরার মৃত্যু বিলম্বে হয়, গোখুরার দংশনে কালাজ অচিরেই প্রাণত্যাগ করে। এইজন্য অনেকের অনুমান কালাজের চেয়ে গোখুরার বিষ অত্যন্ত তীব্র।

কেউটে ভিন্ন গোখুরার বিষ অন্য কোনও সর্পের সহ্য হয় না। ঢোঁড়া, বোড়া, ডাঁড়াশ, চিতি, হেলে প্রভৃতি সাপ গোখুরার কামড়ে অনেক ক্ষণ ঝিমাইতে থাকে, পরে মরিয়া যায়। ইহাদের রক্ত শীতল বলিয়া মৃত্যুর এই বিলম্ব। অথচ সঙ্গম কালে গোখুরা, ডাঁড়াশ ও ঢোঁড়াকে দংশন করিলে, সে দংশনে ডাঁড়াশ, ঢোঁড়া মরে না। সে দংশন বোধ হয়—অনুরাগের প্রেম চুম্বন! সাপ না রাগিলে—বিষ দন্ত দিয়া দংশন করে না।

সর্পের বাসস্থান।

গোখুরা সর্প প্রায়ই লোকালয়ে বাস করে। মূষিক ভক্ষণের লোভে—ইহারা গৃহস্থের বাটীতে আসে, পরে খাদ্য প্রাপ্তির

সুবিধা দেখিয়া সেই খানেই বাসা লয়। সাধারণতঃ ইন্দুরের গর্ত্তেই ইহারা বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে। এই জন্য লোকের বিশ্বাস—সাপ নিজে গর্ত্ত খুঁড়িতে পারে না, কিন্তু এ বিশ্বাস অমূলক। সাপ দুই কসের বড় বড় দাঁত দিয়া গর্ত্ত কাটিয়া থাকে। তবে বিনা প্রয়াসে মূষিক-বিবর পাইলে, বৃথা পরিশ্রম করিতে চাহে না।

সাপ যে গর্ত্তে বাস করে—তাহার মুখ দুই তিনটী থাকে। কোনও বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে—যে কোনও মুখ দিয়া পলায়ন করে। আত্মরক্ষায়—ইহারা বড় সাবধান।

কেউটে সাপ লোকালয়ে থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা মাঠে, বিলে বাস করে। তবে গ্রামের ভিতর পুরাতন ভগ্ন ইষ্টকালয় পাইলে সেখানেও বাস করে।

কালাজ ও কেরেতা—বনে-জঙ্গলে, বৃক্ষ-কোটরে, ভূগর্ভে—বাস করে। রাত্রে আহারের অন্বেষণে—গ্রামের মধ্যে আসিয়া থাকে। হাঁস, মুর্গী, পাখী প্রভৃতি—ধরিয়া ভক্ষণ করে। ইন্দুর, ভেক পাইলেও ছাড়ে না।

চিতি, মানুষের গৃহে, চালা ঘরের চালায় বাস করে। ইনি—খাল-বিল-জলে থাকে।

বোড়া, ঢোঁড়া ও ডাঁড়াশ—ভগ্নস্তূপে এবং বনে-জঙ্গলে থাকে। জল-ঢোঁড়া জলে বাস করে।

সর্পের শীত-নিদ্রা ও চরিবার সময়।

বসন্ত-আতপ-বর্ষা—পর্য্যায় ক্রমে একে একে চলিয়া গেল। আশ্বিনের আগমনী শুনিতে শুনিতে—হাস্যমুখী শরৎ আসিল। গগনে মেঘমুক্ত বিহ্বল নীলিমা,—পবনে গন্ধমন্থর তুহিনস্পর্শ; জলে কুমুদ-কহ্লার-কমল রাশি, স্থলে—স্থলপদ্মের মধুর হাসি; ক্ষেত্রে—কনকশীর্ষধান্যসম্ভার, প্রান্তরে কাশ-কুসুমের শ্বেতাস্তরণ; শেফালীর সুরভি স্বপ্নে—শ্যামল দূর্ব্বাদলে শিশির বিন্দু ঢালিয়া জ্যোৎস্না মাখা শরৎ আসিল। এ সময় সকলেরই আনন্দ, বিষাদ কেবল বিষধরের। কেমন করিয়া তাহারা হিম সহ্য করিবে? অনন্ত ব্রতের ডোর ধরিয়া শিশির মাটিতে নামিল। বিষাক্ত সর্পের দল—বিবরে প্রবেশ করিল। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাস—এই পঞ্চমাস তাহাদের যোগ-নিদ্রা; চৈত্রমাস না আসিলে সাপের শীত-নিদ্রা ভাঙ্গে না। হিমকে সাপের বড় ভয়।

মৌন মুগ্ধ প্রকৃতির বুকে যখন মদন-সখার অবির্ভাব হয়, বসন্তরাণীর পদপল্লবস্পর্শে—বসুন্ধরার জীর্ণ কলেবর নবীন পত্র পুষ্পে—যৌবনের সুষমায় পুলকাঙ্কিত হইয়া উঠে—বিষধর তখন বিবরের বাহিরে আসে। চন্দ্রালোকফুল্ল-নিদাঘ-নিশায়—ধূলিময় গ্রাম্য পথে, শস্যক্ষেত্রের আলের উপর, সুরভি স্নিগ্ধ কুসুমোদ্যানে—নির্ভয়ে শয়ন করিয়া তাহারা বায়ু সেবন করে। বর্ষার বারিসিক্ত রজনীতে—তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। এই সময় ভেক ধরিয়া খাইবার মাহেন্দ্রক্ষণ।

এইরূপ ভুজঙ্গভীতি-ভয়ঙ্করী-বর্ষায়, মেঘ মেদুর অন্ধকারে—বাটীর বাহির হওয়া বড়ই বিপজ্জনক। নিতান্ত আবশ্যক হইলে—যষ্ঠী ও আলোক সঙ্গে লওয়া উচিত। মহর্ষি চরকের অমূল্য উপদেশ—

"ছত্রী জর্জ্জর পাণিশ্চ চরেৎ রাত্রৌ তথা দিবা।
তচ্ছায়া শব্দবিত্রস্তাঃ প্রণশ্যন্ত্যাশু পন্নগা।"

রাত্রিকালে ও দিবসে ছত্র ও জর্জ্জর শব্দ করে—এমন লাঠী লইয়া পথ চলিবে। তাহা হইলে ছায়া ও শব্দে ভয় পাইয়া সর্পকুল পলায়ন করিবে।

এই জন্য পল্লীগ্রামের লোকেরা খড়ম পায়ে দিয়া—রাত্রিকালে পথে বাহির হন। কেহ কেহ পথ চলিবার সময় হাততালি দেন। এরূপ ব্যবস্থাও নিরাপদ নহে। কেননা কর্দ্দমক্লিন্ন-গ্রাম্যপথে—খড়ম বসিয়া যায়, খট্ খট্ শব্দ হয় না। আবার পূর্ব্ব হইতে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিলে,—কেউটে ও রাজসর্প—হাত তালি শুনিয়া তাড়া করিতে পারে। অতএব সকলের চেয়ে সুব্যবস্থা—যষ্টি ও আলোক।

শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার অনেক ভদ্রলোক রজনীতে পথ চলিবার সময়—পায়ে নুপুর ও ঘুঙুর পরিতেন এবং নিম্নলিখিত "আত্মসার" ছড়ার আবৃত্তি করিতেন ;—

"চ'লে যেতে নুপুর বাজে, ঘুঙুর বাজে পায়।
পথ ছেড়ে দে বাসুকী মা ! গরুড় গোঁসাই যায়।"

সর্পদেবতা-গরুড়ের নামে সর্পভয় তিরোহিত হয়—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর এমনি সরল বিশ্বাস !!

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ প্রতিভা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—•:০:•—

৩য় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—আতুরালয়ের তোরণ সম্মুখ। সুকন্যা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঋষিগণের প্রবেশ]

১ম অঃ কু।—মহর্ষিগণ ! আপনারা শস্ত্র-চিকিৎসার অপূর্ব্ব শক্তি প্রত্যক্ষ ক'রলেন। আমাদের আগমনের প্রয়োজন ছিল না, মহর্ষি সুশ্রুত এই উপায়েই বহুক্ষণ পূর্ব্বে আহতের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা ক'রতে পা'রতেন, কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা ক'ররার জন্য এইরূপ অন্য ব্যক্তির হস্তছেদনে উঁহার হস্ত যোজনার ভান্ ক'রেছিলেন মাত্র। তাঁর সে ভানে আপনাদের সকলেরই হৃদয়ের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। আপনারা চিকিৎসা প্রচারে উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু যে চিকিৎসা শিক্ষা ক'রেছেন, তা' সম্পূর্ণ নহে, অথচ অন্য কেহ আপনাদের অসম্পূর্ণ চিকিৎসার সম্পূর্ণ সাধন ক'রতে অগ্রসর হ'লে আপনাদের এমন হৃদয় নাই—যে হৃদয় নিয়ে আপনারা নিজের কোন একটি ইন্দ্রিয় দান ক'রেও অপরকে রক্ষা ক'রতে পারেন। মহর্ষিবৃন্দ ! ক্রুদ্ধ হ'বেন না, কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসা প্রচারীর পক্ষে এটা গৌরবের কথা নহে।

২য় অঃ কু।—ঠিক এই কারণেই একদিন ভারতে এই আর্য্য-চিকিৎসার অবনতি হ'বে। মহাত্মা সুশ্রুতের কৃপায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান শল্য চিকিৎসা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তারিত হ'য়ে প'ড়বে বটে, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ হ'তে এই অপূর্ব্ব লোকহিতকর চিকিৎসা-পদ্ধতি আরব, পারস্য, তুরস্ক, গ্রীস— এমন কি সমুদ্র পারের সকল দেশের অধিবাসীগণ পরম আগ্রহ সহকারে শিক্ষা ক'রবে— ইহাও যথার্থ, কিন্তু এমন একদিন আসবে— যে দিন এই চিকিৎসার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীদিগের গর্ব্ব-গরিমা তাঁ'দের অনভিজ্ঞতার বশে একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হ'বে। আর্য্যভূমির সনাতন চিকিৎসকগণই এর হন্তারক হ'বেন। শব-ব্যবচ্ছেদ— যে শব-ব্যবচ্ছেদ ভিন্ন শারীরস্থানে জ্ঞানলাভ করা একেবারেই অসম্ভব, সেই শবচ্ছেদে আর্য্যভূমির সনাতন চিকিৎসকগণ ঘৃণা প্রদর্শন ক'রবেন। এর ফল এই ঘ'টবে যে, চিকিৎসার সাফল্য-সাধনের প্রধান উপায়, শল্য চিকিৎসা আর্য্য চিকিৎসকদিগের হস্ত হ'তে বিদেশীয় চিকিৎসকগণ একেবারে কেড়ে নিয়ে তাঁ'দের নিজেদের আয়ত্ত ক'রে ফেলবেন। ভবিষ্যতের আর্য্য চিকিৎসকগণ যত বড় পাণ্ডিত্য লাভের অধিকারীই হউক্ না কেন, এই ঘটনায় তাঁদের আর সেরূপ প্রতিপত্তি থা'কবে না, তাঁরা শল্য চিকিৎসার সর্ব্ব প্রধান আবিষ্কর্ত্তা হ'লেও লোকসমাজে বিদেশীয় চিকিৎসকদিগের অনেক নিম্নদেশে তাঁদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে।

সুকন্যা।—একি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রছেন পিতৃগণ! মুহর্ষিদিগের এত যত্নের সামগ্রীর পরিণাম শেষে কি এই হ'বে?

২য় অঃ কুঃ।—হাঁ, মা, পরিণাম এই-ই হ'বে। সে পরিণামের ফল বহুকাল অবধি ভারতবাসীকে ভোগ ক'রতে হ'বে। ভারতীয় চিকিৎসক সমাজ থেকে শল্য চিকিৎসার নাম একেবারে বিলয়প্রাপ্ত হ'বে। এমন কি, কখনো যে ভারতীয় চিকিৎসার মধ্যে শল্য চিকিৎসার প্রচলন হচ্ছলো, সে কথা পর্য্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসকগণ স্মরণ ক'রবেননা। তবে মা,—এ জগতে সকল বিষয়ই পরিবর্ত্তনশীল। এজন্য আর্য্যচিকিৎসার এবম্বিধ অতি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হ'লেও কালে আর্য্যভূমির একদল পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত অথচ আর্য্য চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রভূত চেষ্টায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের আলোচনায় আবার আর্য্য চিকিৎসার লুপ্ত গৌরব সমুজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌বে। ভারতভূমির বৈদ্যগণের সমবেত চেষ্টায় বর্ষে বর্ষে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলনে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'বে। আর্য্যকীর্ত্তি এই রূপ ভাবে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু মা! সে অনেক দিনের কথা। উপস্থিত সম্মুখে আয়ুর্ব্বেদের যে ভীষণ শোচনীয় চিত্র, তাই ভেবেই আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েছি।

সুকন্যা।—প্রভো! রক্ষা করুন,—যা'তে সেরূপ চিত্র আর্য্যভূমির অধিবাসীদিগকে দেখ্‌তে না হয়,—তা'র ব্যবস্থা করুন। আপনারা আর্য্যবাসীদিগকে যে অমূল্য রত্ন দান ক'রেছেন, সে দানের সামগ্রী নিয়ে গ্রহণকারীরা যেন চিরকালই গৌরব অনুভব ক'রতে পারে,—পিতৃগণ! কৃপা ক'রে এখন থেকে তা'র উপায় বিধান ক'রতে হ'বে।

১ম অঃ কুঃ।—তা' হ'বেনা মা,—তা' হ'তে পারেনা। আর্য্যবাসীর সব আছে;—

আর্য্যবাসীর বল আছে, বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, কিন্তু তা'দের মধ্যে যে মা, একটা জিনিস নাই, সেই জিনিসটার অভাবেই তা'দের অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

সুকন্যা।—সে জিনিষটা কি প্রভো?

১ম অঃ কুঃ। সে জিনিষটা একতা। আর্য্য দেশের অধিবাসীগণ সব অনুষ্ঠান ক'র্‌তে পারে, কিন্তু একতা ক'র্‌তে কখনো শিখবেনা। আর্য্য চিকিৎসা সম্বন্ধেও এই একতার অভাবেই উহার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। মা! এর আর কোনো উপায়ই নাই। ক্ষুব্ধা হয়োনা মা! যা। সত্যকথা, তাই আমরা আজ স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত ক'রলাম। দেখবে মা! সে ভবিষ্যৎ দৃশ্য? তা' হ'লে ঐ দেখ—

[পট পরিবর্ত্তন]

(স্থান—কলিকাতা-হেদুয়ার মোড়। সময় প্রাতঃকাল। অ্যালোপাথ, হোমিওপ্যাথ, হাকিম ও বৈদ্য চিকিৎসকগণ)

গীত।

(সকলে)

আমরা সব হালফ্যাসানের নব্য চিকিৎসক।
মোদের ধরণ ধারণ সবই আছে—যা'তে ভোলে লোক।

(বৈদ্য)

ক'বরেজ আমি নাইক টিকি,
'সিগারেট'টা সদাই ফুঁকি,
তোমরা সব দেখছ কি—আমার বিজ্ঞাপনের রোক্?

(অ্যালোপাথ)

অ্যালোপাথি বৃত্তি আমার,
গোঁফ কামান তেড়ির বাহার,
চুরুট ছেড়ে টানুছি তামাক,—যা'র যা' খুসী হোক।

(হোমিওপ্যাথ)

আমি হানিম্যানের প্রধান শিষ্য,
দেখ দেখি আমার দৃশ্য,
এক দিকের গোঁফ কামিয়ে ফেলে ভুলাই রোগীর শোক্।

(হাকিম)

আমি হাকিম সাহেব আরব ছেড়ে,
এইছি ওগো হেথায় তেড়ে,
'টিকি' রেখেছি হিঁদুর মত,—রোগী সব হাতের ভেতর হোক।

[ব্রহ্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। ওঃ!—চিকিৎসা জগতে কি দুর্দ্দশাই না হ'য়েছে। এদের এই চারিমূর্ত্তির চিকিৎসা বিদ্যা আমার এই চতুর্ম্মুখ হ'তেই নির্গত হ'য়েছিল। কিন্তু সকল চিকিৎসার মূলে একই উদ্দেশ্য নিহিত—আর্ত্তের সেবা কর, পরোপকার ধর্ম্মে ব্রতী হও,—কখনো চিকিৎসা বৃত্তিকে ব্যবসায়ের সামগ্রী ক'রনা। কিন্তু দেশের একি শোচনীয় অবস্থা! এরা চা'র জনেই চিকিৎসার মহান্ উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে চিকিৎসা কার্য্যটিকে সম্পূর্ণ ব্যবসায়ে পরিণত ক'রে রোগী সংগ্রহের জন্য স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগেও পশ্চাৎপদ হয়নি। ক'বরেজ মহাশয় ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলে হিঁদুয়ানির চিহ্ন পর্য্যন্ত টিকি ছেড়ে টেরী রেখেছেন! তাঁর হস্তে আবার লোক ভুলা'বার জন্য নপুংসক ছাগের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম নপুংসক! অ্যালোপাথ গোঁফ কামিয়ে চুরুট ছেড়ে হুঁকা টানছেন! হোমিওপ্যাথ একদিকের গুম্ফ মুণ্ডনে এক কিম্ভুত কিমাকার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রোগী সংগ্রহের চেষ্টা ক'রছেন। আর হাকিম-সাহেব শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডন পূর্ব্বক শিখা রেখে হিন্দু সেজেছেন। উঃ! চিকিৎসক

সমাজের কি ভীষণ দুর্গতিই না ইহা দ্বারা অনুমান করা যায়! লোকে অর্থের জন্ত পারেনা —এমন কার্য্যই নাই—দেখছি।

১ম অঃ কুঃ।—স্বকন্ঠার প্রতি দে'খছ মা! চিকিৎসার ভবিষ্যৎ অবস্থা! এই অবস্থার জন্তই আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েছি। থাক্ মা! সকলের বড় পুণ্যফলে স্বয়ং ব্রহ্মা আজ আমাদের এই দৃশ্ত দেখা'লেন। এস মা, এস, সকলে মিলে আজ লোকপিতামহের স্তুতি গাথা গেয়ে আমাদের মনোপ্রাণ ধন্ত করি।

(সকলের গীত)

জয় যোগীজন-বাঞ্ছিত, মুনিজন-কাঙ্খিত,
বিশ্ব সৃজনকারী—ধাতা।
কাঞ্চন কষিত, বরণ বিমণ্ডিত,
দৃশ্যমোহন—ভয়-ত্রাতা।
যা' কিছু সকলি সৃজন-তোমারি,
সুষমা সম্ভার—তোমারি মাধুরী,
জ্ঞানের গরিমা, তোমারি মহিমা,
(তুমিও) আলোক-আঁধার দাতা।
বেদের প্রচার তোমারি কারণে,
অনিল সলিল তুমি দিলে এনে,
(এই) প্রকৃতির শোভা, অতি মনোলভা,
(তারা) গাহিছে তোমারি গাথা।

[ক্রমশঃ]

রোগ-বিজ্ঞান।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্যব্যাকরণ তীর্থ, এইচ, এম, বি]

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদে সকল রোগেরই মুলে যে জীবাণু আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও কতকগুলির মাত্র প্রদর্শন করিয়া নিদর্শন স্বরূপ দিক্‌দর্শন করাইয়াছেন, সকল রোগের মূলই যে জীবাণু তাহা সূক্ষ্ম দর্শনের দ্বারা বিচার করিয়া বাহির করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। রোগের প্রথমেই জ্বর আরম্ভ করিয়াছেন, কারণ "জ্বরঃ প্রধানং রোগীণাং" জ্বরই সর্ব্ব রোগের মধ্যে প্রধান; তাই জ্বরের জীবাণুকে একটী বীভৎস রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন,—দক্ষের অপমানে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার উষ্ণ নিশ্বাস হইতে জ্বরাসুরের আবির্ভাব হয়; সেই জ্বরাসুরের আকৃতি বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ভীমস্ত্রিপাদ স্ত্রিশিরাঃ ষড়্‌ভূজো নব লোচন
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তক যমোপমঃ॥

জ্বর জীবাণুর আকৃতি ভয়ানক, ত্রিপাদ বিশিষ্ট, তিনটী মস্তক সম্পন্ন, ছয়টী হস্ত এবং নয়টী লোচন আছে এবং ধূলীকণার ন্তায় সর্ব্বত্র বিচরণশীল; কালান্তক যম স্বরূপ, কারণ "জনকঃ সর্ব্ব রোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ।"

জ্বরই সকল রোগের উৎপত্তির হেতু এবং

জরের দ্বারাই মৃত্যু ঘটে, সকল রোগেই মৃত্যু কালীন জর হইয়া থাকে। সেই জন্য জর-জীবাণু প্রবল প্রভাব সম্পন্ন ও ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদে শাস্ত্রকারগণ সংক্ষেপে এই সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ কেহ এই গুলি পৌরাণিক কল্পনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ক্রমশঃ যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পৌরাণিক ঘটনা সকলকে বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া দেখাইতে-ছেন যে, পৌরাণিক যুগের বিমান, আকাশের উপর মেঘের অন্তরালে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, জলের ভিতর যুদ্ধ ও অবস্থান প্রভৃতি সম্ভবপর কল্পনা নহে, তখন সকলেই সাশ্চর্য্যে স্বীকার করিতেছেন। এমন দিন আসিতে পারে যখন যন্ত্রাদির সাহায্যে যাবতীয় রোগের জীবাণু সকল সকলের নয়নগোচর হইবে। জর, শোষ, কাস, শোথ, ক্ষয় প্রভৃতিও যে জীবাণু হইতে সমুৎপন্ন এবং সংক্রমনশীল, অর্থাৎ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমিত হয়, দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তাহা সুশ্রুত সংহিতার নিদান স্থানে উক্ত হইয়াছে যথা—

প্রসঙ্গাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ
এক শয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জরশ্চ শোষশ্চ, নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্।”

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিলে, তাহার গাত্র সংস্পর্শ করিলে, নিশ্বাস গাত্রে লাগিলে, একত্রে ভোজন করিলে, এক শয্যায় বা আসনে শয়ন বা উপবেশন করিলে, ব্যবহৃত এক বস্ত্র, মাল্য, পরিধান করিলে, চন্দন, তৈল প্রভৃতি একপাত্র হইতে ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ, জর, শোষ, চক্ষুউঠা, প্রভৃতি ঔপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে। এবং সুশ্রুত আরও দেখাইয়াছেন যে,

“রক্তাধিষ্ঠানজান্ প্রায়ো বিকারান্ জনয়ন্তি তে”

রক্ত জীবাণু রক্তগত রোগ সকল উৎপন্ন করে। কুষ্ঠ, বীসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ সকলও যে রক্তজ জীবাণু হইতে সমুদ্ভূত হয় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং প্রদর্শন করাইয়া রোগের সংক্রমণ শক্তি নির্দ্দেশ করিয়া জনপদধ্বংসী রোগ সকলও যে জীবাণু কর্ত্তৃক সংক্রমিত হইয়া পড়ে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, একমাত্র জর হইতেই আমরা, প্লেগ বসন্তাদি ঔপসর্গিক রোগ সকল পাইতে পারি। আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যালোচনার বিষয়, তাই চরক বলিয়াছেন—

“বিমল বিপুল বুদ্ধেরপি বুদ্ধি মাকুলী কুর্য্যু
কিংপুনরল্পবুদ্ধেঃ।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন না হইলে আয়ুর্ব্বেদে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হয় না, অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে দুরূহ, তাহাকে হাস্যাস্পদের বিষয় হইতে হয়; অপরের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা বা নির্ভর করা সকলের সাধ্য নহে। তাই আবার বলিয়াছেন।

“কৃৎস্নো হি লোকো বুদ্ধিমতামাচার্য্য ভবতি”

অল্প লোকেরই জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে, অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এখন রোগ শারীরিক কোন্ পদার্থকে আক্রমণ করে—তাহাই বিবৃত হইতেছে। রোগ জীবাণু সকল শরীরে প্রবেশ করিলে যদি Vital force বা ওজঃ ধাতুকে নিস্তেজ

পায়,—তবেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে, নচেৎ মরিয়া যায় বা স্থানাভাবে বহির্গত হইয়া যায়? এই সকল জীবাণু যে শরীরে প্রবেশ করিলেই রোগ উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় তাহা-নহে। উহা বিশিষ্ট শক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যে পথে প্রবেশ করিবে সে পথটী প্রবেশের উপযোগী হওয়া উচিত এবং সংখ্যাধিক্য হওয়া চাই; এই সকল-সুযোগ-সুবিধা থাকিলেই রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, নচেৎ প্রবেশ-পথেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রবেশের পর যদি জীবনীশক্তি বা ওজঃ ক্ষীণ থাকে, তাহা হইলেই উহা ব্যাধি রূপে পর্য্যবসিত হইতে পারে, তাই চরকে সূত্রস্থানে উক্ত হইয়াছে—

"ব্যায়ামোহনশনং চিন্তা রুক্ষাল্পপ্রমিতাশনং।
বাতাতপৌ ভয়ং শোকো রুক্ষপানং প্রজাগরঃ॥
কফ শোণিত শুক্রাণামতিবর্ত্তনমোক্ষণম্।
কালভূতোপঘাতশ্চ বিজ্ঞেয়া ক্ষয় হেতবঃ॥

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনাহার, চিন্তা, রুক্ষ এবং অল্প ভোজন, অতিরিক্ত বায়ু বা রৌদ্র সেবন, ভয়, শোক, রুক্ষ পান, রাত্রি জাগরণ, কফ-শোণিত বা শুক্রের অতিশয় নিঃসরণ বশতঃ ক্ষীণ অথবা আঘাতাদির দ্বারা ওজঃ বা জীবনী শক্তি ক্ষয় হইলেই জীবাণু শক্তি কর্ত্তৃক তাহা আক্রান্ত হয়। রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইলে প্রথমে কোন যন্ত্রকে আশ্রয় লয়, পরে কোন কারণ বশতঃ ওজঃ ক্ষয় হইলে সামান্য কারণে রোগ রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন টীউবারকুলেসিস্ বা যক্ষ্মা-জীবাণু জীব শরীরে প্রবেশ করিবা জীবনী শক্তিকে দুর্ব্বল পাওয়ায় ফুস্ফুসে বা অন্ত্রে আশ্রয় লয় ও তথায় প্রসর্পিত হইয়া আশয়টীকে নিজ শক্তি দ্বারা অভিব্যাপ্ত করে ও নিজের উৎপাদনী শক্তির দ্বারায় প্রভূত জীবাণু দ্বারা পূর্ণ করে, পরে যখন ওজঃ ক্ষয় হয় তখন সামান্য কারণে রোগকে বিকাশ করে। যেমন সামান্য হিম লাগিয়া সর্দ্দি হইয়া যক্ষ্মা আরম্ভ হইল বা কিছু ভোজনের ব্যতিক্রমে উদরাময় আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহা বলিয়া কি হিম বা ভোজনের ব্যতিক্রম রোগের কারণ হইতে পারে? তবে নিমিত্তভূত কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রধান কারণ পূর্ব্বে টীউবারকুলাই ব্যাসিলাই দ্বারা যন্ত্রটী আক্রান্ত হইয়াছিল, এখন নিমিত্ত কারণে তাহা বিকাশ পাইল মাত্র। যেমন একটী জল পূর্ণ পাত্রে বিন্দু বিন্দু জল বর্ষণ করিতে থাকিলে যখন তাহা সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়, তখন শেষ বিন্দুটী তাহাতে নিপতিত হইলেই পাত্রস্থ জল পড়িয়া যায়, এখানে শেষ বিন্দুটী পতনের কারণ হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বের পূর্ণতাই প্রধান কারণ স্বরূপ।

রোগের বিকাশ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে, এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনী শক্তিকে পরাভূত করিয়া জীবাণু শক্তি তাহাতে আশ্রয় লইয়া থাকে। মহামতি মাধবকর চরকের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন—

"দিবা স্বাপাদি দোষৈশ্চ প্রতিশ্যায়শ্চ জায়তে।
প্রতিশ্যায়াদথো কাস কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।
ক্ষয় রোগস্য হেতুত্বে শোষস্যাপ্যুপ জায়তে।

দিবা নিদ্রা হইতে সর্দ্দি হয়, সর্দ্দি হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয়, ক্ষয় হইতে রাজযক্ষ্মা হইয়া থাকে। ইহার টীকায় বিশেষজ্ঞ বিজয় রক্ষিত বলিয়াছেন—

"কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয় ইতি ওজঃ
প্রভৃতীনামিতি শেষঃ।"

দিবা নিদ্রা করিলেই ক্ষয়কাস হইবে তাহার কোন কারণ নাই, তবে দিবা নিদ্রার দ্বারায় যদি ওজঃ ক্ষয় হয় ও তাহার শরীরে পূর্ব্বে টিউবারকুলাই ব্যাসিলাই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে—তবেই রাজযক্ষ্মায় পরিণত হয়, নচেৎ উপশয়ের লক্ষণে উক্ত হইয়াছে—

"দিবাস্বপ্নোত্থিতে শ্লেষ্মজে রাত্রৌ জাগরণং"

দিবা ভাগে নিদ্রা যাইয়া শ্লেষ্মা সঞ্চয় হইলে রাত্রি জাগরণ করিয়া সেই শ্লেষ্মাকে বায়ু বৃদ্ধির দ্বারা ক্ষয় করিবে। ইহাতে আরোগ্য হয়। কিন্তু পূর্ব্বে জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়া শরীর নিস্তেজ ও ওজন কম হইতে থাকিলে ওজঃ ক্ষয় বশতঃ দিবা নিদ্রা হইতেই ক্ষয়কাস হইতে পারে। আরও চরক বলিয়াছেন—

"ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশান্না বিনশ্যতি"

ওজঃ নাশেই শরীরের নাশ হয়। মনু সংহিতার টীকাকার মহামতি কুল্লুকভট্ট মনুর টীকায় বলেন—রোগ মাত্রেই সংক্রামক, জীবাণু ভিন্ন সংক্রামকতা আসিতে পারে না।

ইহাই ব্যাধি বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন—

"যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধ বিধানজ্ঞ স্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া॥"

রোগতত্ত্ব অবগত না হইয়া যে চিকিৎসক ঔষধ ব্যবস্থা করেন তাঁহার চিকিৎসাকর্ম্ম সুফল প্রসব করে না।

জীবাণু শক্তি কর্ত্তৃক জীবনী শক্তি আক্রান্ত হইয়া যে কতকগুলি বেদনাব্যঞ্জক বাহ্যিক লক্ষণাবলী পরিস্ফুট করে, সেই সমস্ত লক্ষণ-নিচয়ের পার্থক্য দর্শনে আমরা সুবিধার জন্য বা শ্রেণী বিভাগ জন্য এক একটী রোগের নাম করণ করি, সেগুলি জ্বর, অতিসার প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে রোগকে চতুঃষষ্ঠী প্রকারে পৃথক নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং বায়ু-পিত্তাদির তারতম্যানুসারে তাহাকেই একশত বিংশতিটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু রোগ লক্ষণ প্রত্যেক শরীরেই পৃথক ভাবে প্রকাশ পাওয়ায় ও অসংখ্য বিধায় বলিয়াছেন—

বিকার নামা কুশলো জিহ্রিয়াৎ কদাচন।
নহি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবাস্থিতি॥

কুশল চিকিৎসক যদি রোগের নাম করিতে না পারেন তবে লজ্জিত হইবার কারণ নাই, তিনি বিকৃতি বুঝিয়া চিকিৎসা করিবেন, সকল রোগের নামকরণ হইতে পারে না, কারণ রোগ অনন্ত। আরও বলিয়াছেন—

"নবীনা প্রাদুরাসন্তে প্রবীণা প্রবিলীয়তে।
বিভিদ্যন্তে স্থিতাশ্চাথ নৃণাংনানাবিধাগদাঃ॥

নূতন নূতন রোগ সকলের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে, যেমন প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি এবং পুরাতন রোগ সকল কালক্রমে বিলীন হইয়া যায়—যেমন জ্বরাধিকারে "কেশ সীমন্ত—কৃৎজ্বর"—এই জ্বর আসিলেই রোগীর মস্তকের চুলের উপর একটী সীঁথি পড়িয়া যায়, এই জ্বর অসাধ্য, তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অসাধ্যো বলবান্ যস্তু কেশসীমন্তকৃৎ জ্বরঃ।"

এই জ্বর অধুনা আর পরিদৃষ্ট হয় না। চরক বলিয়াছেন—

"অমী আবিষ্কৃত তমাঃ"

এই বাতব্যাধি গুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে পরবর্ত্তী সংগ্রহকার মহামতি শার্ঙ্গধর রোগবে

১২২ প্রকারে বিভাগ করিয়া শেষে পূর্ব্ব খণ্ডে ৭মঃ অধ্যায়ে ৮৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"অসংখ্যাশ্চাপরে"

ইহা ভিন্ন ব্যাধি সকল বিভিন্ন ও অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। সুশ্রুত বলিয়াছেন।

অনুক্তমপিদোষাণাং লিঙ্গৈরোগমুপাচরেৎ

যে সকল রোগের বিষয় কথিত হইল না সেই গুলির লক্ষণানুসারে দোষ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা করিবে। বায়ু পিত্ত ও কফ এই এই ত্রিদোষ জ্ঞানই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলসূত্র, তাই চিকিৎসকের ও পণ্ডিতের আর একটী নাম দোষজ্ঞ। দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে, রোগের অসংখ্যয়ত্ব হেতু নাম নির্দ্দেশ হইতে পারে না। এইরূপে জীবের নানাবিধ ব্যাধি আক্রমণ হইতে পারে। ইহাই রোগতত্ব।

অতঃপর ঔষধ পক্তির দ্বারা কিরূপে রোগ শক্তি পরাভূত হয় তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

রোগ দুই প্রকারে সমুৎপন্ন হইতে পারে প্রথমটী শারীরিক, দ্বিতীয়টী মানসিক, তন্মধ্যে শারীরিক ব্যাধি সকল ঔষধাদির দ্বারা উপশমিত হয় আর মানসিক রোগ সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি, সমাধির দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে তাই বলিয়াছেন—

"মানসংজ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য-স্মৃতি-সমাধিভিঃ।"

মানস রোগ সকল "কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ-ভয়-অভিমান-দৈন্ত-পৈশুন্য-বিষাদ ঈর্ষা, অসূয়া মাৎসর্য্য-প্রভৃতি কারণে রজো ও তমোগুণের বিকার বশতঃ উৎপন্ন হয় ও উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও সন্ন্যাস প্রভৃতি রোগে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

সমাধি প্রভৃতির দ্বারা মানস রোগের চিকিৎসা বিধি থাকিলেও সন্ন্যাস রোগটী ঔষধ ভিন্ন আরোগ্য হয় না, যথা "সন্ন্যাসং নৌষধৈ বিনা"।

সন্ন্যাস রোগটী ও মানস রোগের অন্তর্গত। কারণ মনের উত্তেজনা বশতঃ হঠাৎ হৃদয়ের রক্ত প্রবাহের মধ্যে সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ক্ষণিকের মধ্যে তন্মধ্যে একটী রক্তের ছোট জমাট বাঁধে এবং উহা হৃদয়হইতে রক্ত প্রণালীর দ্বারা মস্তকের দিকে প্রধাবিত হয়। যখন তাহা মস্তকের সূক্ষ্ম ধমনীর মধ্যে আসিয়া পড়ে ও মধ্য পথে বাধিয়া যায় তখন পশ্চাৎ হইতে রক্ত স্রোত আঘাত করিতে থাকিলে ধমনীটী বিদীর্ণ হয় ও রক্ত স্রোত নাসিকার ভিতর দিয়া বহির্গত হয়। যে সকল রোগী আরোগ্য হয় তাহাদিগের মুখে জানিতে পারা যায় যে, রোগ যখন আরম্ভ হয় তখন প্রথমে মস্তকের ভিতর গোলমাল বোধ হয়, যেন অজ্ঞানতা আসিতেছে পরে যেন একমুষ্টি বালুকা কেহ মস্তকের উপর চড়াইয়া দিল আর কিছুই মনে নাই। রক্তই মস্তিষ্কের ভিতর ঐরূপ বিসর্পিত হইয়া পড়ে। কখন কখন রোগ আরম্ভ হইয়া ও সারিয়া যায় পরবর্ত্তী অবস্থায় আর আসিতে পরেনা বা যদি অতিসূক্ষ্ম ধমনী বিদীর্ণ হয় তবে আরোগ্যও হইতে পারে।

[ক্রমশঃ]

কৃপণ-মণি।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

—:০:—

নিরাশ-ঘন আঁধার মাঝে
আশার আলো মিটি মিটি,
জল্‌ছে কভু উজল করি'
কিরণ হারা আকুল দিঠি।

অবশ হৃদি পরশ করি
জাগ্‌ছে কা'র করুণ কর,
বল-ভরসা হারিয়ে তবু
হ'তেই হবে অগ্রসর।

ঝ'র্‌ছে যেন মরুর বুকে
শীতল বারি একটি কণা,
পিপাসা তা'র মি'টছেনা যে
বু'ঝছেনা সে আপন জনা।

এমন দাতা কৃপণ-মণি!
চরণে তাঁ'র নমস্কার!

সারা জনম কেঁদেই গেল—
মু'ছ্‌ল না যে নয়ন ধার!

অহিফেন।

[কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষগাচার্য্য]

—:০—

বাঙ্গলা নাম—আফিং; হিন্দী অফিম; ইংরাজি ওপিয়ম্; সংস্কৃত পর্য্যায়—উক্তং খসফলক্ষীর মাফুকমহিফেনকম্। ভাঃ প্রঃ; অফেনং খখসরসো নিফেনংচাহিফেনকম্। রাঃ নিঃ। সংস্কৃত নাম—খসফলক্ষীর, আফুক, অহিফেন, অফেন, নিফেন, খখস রস।

আফিমের ক্ষুপ ক্ষুদ্র, দেড় কি দুই হাত মাত্র উচ্চ হয়, ইহাতে মনোহর শ্বেতবর্ণ ফুল হয়, ইহা স্বয়ংজাত বন্য বৃক্ষ নহে, যত্ন পূর্ব্বক চাষ করিয়া জন্মাইতে হয়। ইহাতে প্রায় সওয়া ইঞ্চি চওড়া একপ্রকার ফল জন্মে, তাহাকে ঢেঁড়ি বলে; ঢেঁড়ি পরিপুষ্ট হইয়া যখন পরিপাক উন্মত হয়, তখন উহার গা অল্প অল্প চিরিয়া দিলে শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার রস নির্গত হয়, সেই রস বায়ুতে শুষ্ক হইয়া পাটলবর্ণ হয়, পরে তাহা চাঁচিয়া লইয়া গোলাকার পিণ্ডের মত করে, তাহাকেই অহিফেন বা আফিং বলে।

অতি পুরাকালে আফিং ভারতবর্ষে ছিল—এরূপ বোধ হয় না, যেহেতু চরকাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সময়ের তান্ত্রিকরস-চিকিৎসার পুস্তকে ও ভাবমিশ্রকৃত সংগ্রহে আফিমের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মুসলমান বাদশাহদিগের রাজত্ব সময়ের

প্রারম্ভে ইহা এতদ্দেশে আনীত হইয়াছিল; মুসলমান নৃপতিগণ ইহা অতি প্রিয় নেশারূপে ব্যবহার করিতেন।

আফুকং শোধনং গ্রাহী শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্।
তথা খসফলোদ্ভূতং বল্কলং প্রায়শস্ত্যপি॥

আফিং শোষনকারি, ধারক, কফনাশক বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তকারক। খসফলের বল্কলও প্রায় অহিফেন তুল্য গুণকারী। শোষক বস্তু মাত্রেই ধারক হইয়া থাকে, কিন্তু আফিং অত্যন্ত ধারক—ইহা ইহার প্রভাব। আফিং প্রভাববশতঃ সমস্ত দ্বারেরই স্রাব বন্ধ করে। অহিফেন দ্বারা অন্যান্য সকল প্রকার স্রাব বন্ধ হইলেও ঘর্ম্মজনক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়।

ইহা কফনাশক—কাস রোগের তরুণাবস্থা গত হইলে যখন কফ অধিক নির্গত হইতে থাকে, তখন অহিফেন প্রয়োগ করিলে কফ নিঃসরণের লাঘব হয়। কিন্তু যেখানে ফুসফুস পচিয়া কফ মিশ্রিত পুঁজ উঠিতে থাকে, সেখানে আফিং প্রয়োগে পুঁজ আবদ্ধ হইয়া অপকার করিতে পারে। ইহা বাতবর্দ্ধক—অর্থাৎ বায়ুকে উত্তেজিত করিয়া, মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়া, মত্ততা ও অবসাদ জন্মায়, এবং ইহা পিত্তকারক—অর্থাৎ ধারক গুণবশতঃ যকৃতের পিত্ত নিঃসরণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া আবদ্ধ পিত্তের দ্বারা শরীরের উত্তাপ জন্মায়। অহিফেণের গুণ সম্বন্ধে এই শ্লোকটী গ্রন্থ বিশেষে দৃষ্ট হয়।

আক্ষেপ শমনং নিদ্রাজননং মদকারিচ
স্বেদনং বেদনাঘ্নচ্চ মূত্রাতিসার নুৎপরং
কাস শ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিত স্রুতিবারণম্॥

অর্থাৎ ইহা আক্ষেপনিবারক, নিদ্রাজনক, মাদক, স্বেদজনক, বেদনানাশক এবং ইহা বহুমূত্র, কাস, শ্বাস, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারক।

প্রয়োগ—শাস্ত্রে স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, লতা-ফল মূল-বৃক্ষ পত্রাদি হইতে যে বিষ পাওয়া যায়, তাহাকে স্থাবর এবং সর্পাদি প্রাণী হইতে যে বিষ সংগৃহীত হয়, তাহাকে জঙ্গম বিষ বলে। আফিং একটী স্থাবর বিষ। পুনশ্চ ইহা একটী উপবিষ যথা :—

"অর্কক্ষীরং স্নূহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকং
গঞ্জাহহিফেন ধুস্তূরাঃ সপ্তোপবিষ জাতয়ঃ।

অর্থাৎ আকন্দদুগ্ধ, মনসাসিজের আটা, বিষলাঙ্গলা, করবী, গাঞ্জা ও অহিফেন এই সাতটী উপবিষ। সর্পবিষ, সেঁকো বিষ প্রভৃতি অপেক্ষা ইহারা তীক্ষ্ণতায় হীনতর বলিয়া উপবিষ নামে অভিহিত হয়;

অন্যান্য উদ্ভিজ্জাদি হইতে অহিফেন প্রভৃতির বিশেষ পার্থক্য এই যে, অন্য বস্তু পরিপাকের পর তাহার গুণ প্রকাশ করে, কিন্তু অহিফেনাদি-বিষ উদরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র রিপাকের পূর্ব্বেই আত্মশক্তি প্রকাশ করে। যে বস্তু যত সত্বর প্রাণ হরণ করিতে পারে, তাহা যথাবিহিত প্রযুক্ত হইলে তত সত্বর রোগীর শান্তিদান করে। কিন্তু বিষের প্রয়োগ বড় সাবধানে করিতে হয়।

ধাতুভেদে, স্থানভেদে, বয়সভেদে অহিফেনের ক্রিয়ার তারতম্য হয়, শৈশবাবস্থায় অতি অল্প মাত্রার প্রয়োগেও মাদকক্রিয়া অধিক ভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং বিশেষ সাবধানে শিশুদের অহিফেন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। * অহিফেনের অল্প মাত্রায় প্রয়োগে

* শিশুদিগের পক্ষে অহিফেন ঘটিত ঔষধ একেবারেই ব্যবহার করা যুক্তিবিরুদ্ধ।—আঃ সং

উত্তেজনক্রিয়া এবং অধিক মাত্রায় প্রয়োগে মাদকক্রিয়া অধিকতর প্রকাশিত হয়। বেদনাজনক রোগে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় অহিফেন সহ্য হয়।

আফিং রোগবিশেষে উপকারী বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় নেশারূপে ব্যবহার করিলে বড় অনিষ্ট হয়, অতিরিক্ত অহিফেন সেবী প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতাযুক্ত, শীর্ণকায়, রুক্ষ দেহ, অনিদ্রাপীড়িত, অলস, নিরুৎসাহ ও ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন অপরিপাক, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এরূপ হয় যে, নামমাত্র আহার থাকে। পুরুষত্ব শক্তি একবারে প্রায় লোপ হয়। বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি, আত্মমর্য্যাদা প্রভৃতি উন্নতবৃত্তি সকল বিকৃত হইয়া পড়ে এবং অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নিম্নলিখিত রোগসমূহে অহিফেন বা আফিং প্রয়োগ হয়,—

এক প্রকার গৃহণী আছে—আহার দ্রব্য উদরস্থ হইবার অনতিবিলম্বে অর্থাৎ সম্যক জীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ভেদ হইয়া থাকে। রোগী উদর শূন্য ও ক্ষুধা অনুভব করে। আহার করিলে কিয়ৎক্ষণমাত্র ভাল বোধ হয় এবং আহারীয় বস্তু শরীরে শোষিত হইবার বহুপূর্ব্বে মলরূপে নির্গত হইয়া যায়। তজ্জন্য নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই প্রকার পুরাতন অজীর্ণ রোগ সাধারণতঃ ৬—১২ বৎসরের বালকদিগের প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে আহারের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে উপযুক্ত মাত্রায় অহিফেন প্রয়োগ করিলে পাকাশয় ও অন্ত্রের পেশীর ক্রিয়াধিক্য দমিত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য নির্গমনে বিলম্ব হয়, সুতরাং ভুক্তবস্তু জীর্ণ হইবার সময় পায়।

মূত্রাশয় মধ্যে অশ্মরী থাকিলে যে সকল যাতনা হয়, তন্নিবারনার্থ অহিফেন মহৌষধ। এস্থলে পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। পিচকারীর দ্বারা প্রয়োজ্য।

শূলরোগে অহিফেন দ্বারা স্পর্শানুভবশক্তির হ্রাস হয় ও স্থানিক জড়তা জন্মে, তজ্জন্যই ইহাতে বেদনা ও যাতনা দূরীভূত হয়। স্নায়ুশূল, বাযকশূল, বাধকব্যথা ও পাকাশয় শূলের আশুপ্রশমন পক্ষে ইহা প্রায় অব্যর্থ। আমজশূলে যখন আমাশয় মধ্যে ক্ষত হয় ও উদর মধ্যে সামান্য সঞ্চলন দ্বারাও বেদনা হয়, তখন অহিফেন সেই উদরের মধ্যস্থিত গতিক্রিয়া স্থগিত করিয়া বেদনা নিবারণ করে। চক্ষুতে বেদনা হইলে আফিং জলে সিদ্ধ করিয়া সেই বাষ্প চক্ষুতে লইলে বেদনা দূর হয়। প্রসবের পর বেদনায় (হেঁতাল ব্যথায়) আফিং ঘটিত মৌরি-কর্পূরাদিযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে আশু বেদনা নিবারিত হয় অথবা জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা কটিতে এবং উদরে গরম গরম স্বেদ দিলেও ঐ বেদনা যায়।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে অহিফেন মহোপকারক। রক্তস্রাব—প্রসবের কিম্বা ফুল পড়িবার পূর্ব্বে বা পরেই হউক ইহা সর্ব্বথাই প্রয়োজ্য, কিন্তু এ অবস্থায় মাত্রা বিবেচনা না করিয়া দিতে পারিলে রক্তস্রাব বন্ধ না হইয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে অহিফেন দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। যদি গর্ভস্থশিশু

মৃত বা মুমূর্ষ হওয়ার জল ভাঙ্গিতে থাকে, তবে অহিফেন প্রয়োগ কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

মেহরোগ পুরাতন হইলে আফিঙে বা আফিংঘটিত ঔষধে উপকার হয়। বহুমূত্র রোগেও অহিফেন প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়। এই রোগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত অহিফেনঘটিত হেমনাথ রস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আমাশয়ে অহিফেন বিশেষ উপকার করে। আমাশয়ের পেট কামড়ানি; মুহুর্মুহু কুন্থন সহ তরল ভেদ ও গা বমি বমি সত্বর দূরীভূত করে কিন্তু আম কিছু পরিমাণে বাহির হইয়া যাইবার পরে প্রয়োগ করা আবশ্যক নতুবা বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

যে জ্বর এক, দুই, তিন বা ততোধিক দিন পরে উপস্থিত হয় তাহাতে অহিফেন দ্বারা উপকার দর্শে।

কর্ণমূলে শোথ, কুঁচকী, হাত পা মচ্‌কিয়া যাওয়া, ব্যথাযুক্ত শোথ প্রভৃতিতে ইহার প্রলেপ তুল্য আশু উপকারী ঔষধ দৃষ্ট হয় না। ক্ষীণধাতু ব্যক্তির দেহে ইহার বাহ্য প্রয়োগেও নেশা বা নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে।

ক্ষতের পুঁয ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া আফিমের পটী ঘায়ে লাগাইলে সদ্যঃ যাতনা প্রভৃতি দূর হইয়া উহা আরোগ্য হয়। ঘায়ের ফোলা ও ক্লেদ নিবারণ করিতে এরূপ শক্তি অন্য কিছুতে দৃষ্ট হয় না।

আক্ষেপযুক্ত রোগ যথা—হুপিং কফ, হিক্কা, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি আফিং প্রয়োগে উপশমিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সব রোগে অবসাদের ভাব থাকিলে আফিং দিতে নাই। যে রূপেই আফিং প্রযুক্ত হউক—এইটী লক্ষ্য রাখা উচিত যেন অতিমাত্রা বা পশ্চাৎ অভ্যস্ত হইয়া না পড়ে। অহিফেনের এবং অহিফেন বীর্য্য সকলের গুণাদি বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করিলাম না। এক্ষণে অহিফেন ঘটিত বিবিধ রোগের কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ঔষধ বলিয়া অহিফেনের বিষয় সমাপ্ত করিব।

কর্ণমূলের শোথে অহিফেন ঃ—

মসূরির দাল ১ তোলা, মুসব্বর ॥০ আধ তোলা ও আফিং এক আনা—একত্র ধুতুরা পাতার রসের সঙ্গে বাটিয়া অল্প গরম করতঃ কাণের চারিদিকে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে আশু আরোগ্য হয়। মনসা পাতা আগুনে সেঁকিয়া তাহার রস এবং ধুতুরা পাতার রস এই উভয় রসে আফিং মিশাইয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

চাতুর্থক জ্বরে অহিফেন ঃ -

চাতুর্থক জ্বরে অর্থাৎ দুইদিন অন্তর যে জ্বর হয় সেই জ্বরে রসসিন্দূর ৪৮ রতি, আফিং ৩ রতি, লৌহভস্ম ২৪ রতি এবং কুইনাইন* ২৪ রতি - একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২৪টী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ৩ বটী মধু ও শিউলি পাতার রসের সহিত সেবন করাইলে নিবারিত হয়।

অসংবৃত মলমার্গ সঙ্কোচনার্থ

অহিফেন ঃ—অনন্তমূল ২ তোলা ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জল সহ পাক করিবে। ৪

* যদি কুইনাইনেরই প্রয়োগ করিলেন, তবে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব রহিল কৈ? কজে আমরা এ ব্যবস্থার সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। আঃ সং।

তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে আধতোলা পান্নাখয়ের ভিজাইয়া রাখিবে। খয়ের গলিয়া গেলে পুনরপি ছাঁকিয়া তাহাতে ৩ রতি আফিং গুলিয়া দিয়া এবং ৬ রতি ফটকিরি চূর্ণ মিশাইয়া তুলিকাদি দ্বারা মলমার্গে পুনঃ পুনঃ যোজনা করিলে মলদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া আইসে।

আমাশয়ে অহিফেন ঃ—

একটি, ছোয়ারার (কাবুল দেশীয় খেজুর) বীজ ত্যাগ করিয়া ইহার ভিতর এক ছোলা পরিমিত আফিং দিয়া তাহার উপর ময়দার দুই আঙ্গুল পুরু প্রলেপ দিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইবে। লেপ শুষ্ক হইলেই তুলিয়া লইবে। বেশ জুড়াইয়া গেলে ছোয়ারাটী মাত্র লইবে। বাহিরের প্রলেপ ত্যাগ করিবে। পরে ঐ ছোয়ারাটি, বাটিয়া ছোলার পরিমাণ যতগুলি বটিকা হয় প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইটী বটিকা জলের সঙ্গে গিলিয়া খাইলে সত্বর সর্ব্বপ্রকার আমাশয় বিদূরীত হয়।

গ্রহণীরোগে অহিফেন ঃ—

আফিং ।০ একসিকি, শোধিত মুলতানি হিং ।০ একসিকি ও চাখড়ি চূর্ণ ৮ তোলা একত্র মিশাইয়া ৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা মাত্রায় কাবাবচিনি ভিজান জল সহ সেবন করিলে উপকার হয়।

ক্ষতে অহিফেন ঃ—

আফিং, সফেদা, গন্ধকচূর্ণ ও শ্বেতধুনার গুঁড়া সমভাগে তাম্রপাত্রে গব্য ঘৃতে মাড়িয়া একদিন রৌদ্রপক করিয়া ব্যবহার্য্য। ভিতরের ঘা বা নালীঘায়ে আফিংযুক্ত মলম সহসা দিতে নাই।

স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ অহিফেন ঃ—

১/৪ রতি আফিং, ১/২ রতি কর্পূর ও ২ রতি কাবাবচিনির গুঁড়া একসঙ্গে মিশাইয়া রাত্রিতে শয়নকালে শীতল জলসহ সেবন করিলে ফল পাওয়া যায়।

মূত্রবাহুল্যে অহিফেন ঃ—

১ তোলা রস সিন্দুর উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহার সহিত আফিং ১ তোলা, লৌহভস্ম ১ তোলা, অভ্রভস্ম ১ তোলা, বঙ্গভস্ম ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, গুলঞ্চের পালো ১ তোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১টী বটি অড়হর পাতার রস এবং মধুযোগে প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

অহিফেনের ঔষধীয় মাত্রা ঃ—

১/৪ রতি হইতে ১ রতি। ইহার বিষাক্ত মাত্রা ১০ রতি হইতে ৩০ রতি এই বিষ মাত্রায় অহিফেন সেবনে ৪—৬ ঘণ্টায় পরে অবসাদ এবং ৬—১২ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। ১২ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু না হইলে প্রায়ই রোগী রক্ষা পায়। আফিং খাইয়া বিষাক্ত হইলে তাহাকে বারম্বার বমন করান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বমনকারক কোন বিশেষ ঔষধ নিকটে না থাকিলে তুঁতের জল, মাছধোওয়া জল, লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জল প্রভৃতির দ্বারা বমন করাইবে। যতক্ষণ স্বচ্ছ, অহিফেনের গন্ধহীন জল নির্গত না হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ উষ্ণ জল রোগীকে পান করাইবে। মস্তকে শীতল জলধারা ক্রমা-

গণ্ড প্রয়োগ করিবে। রোগীকে কদাপি নিদ্রিত হইতে দিবে না। তাহাকে ধরিয়া ক্রমাগত পাদচারী করাইবে। এ সময়ে রোগীর শারীরিক অবস্থানুসারে 'চা'এর কাথ মাজু ফলের কাথ, জামীরের রস ও কলমী শাকের রস যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করাইবে।

লাঞ্ছিতা।

(শ্রীঅনন্ত কুমার সান্যাল)

আপনার মায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে,
আপনার গৃহ মাঝ
বিমাতার তরে রচিলি আসন—
নাহি কিরে নাহি লাজ ?

যে তোরে স্তন্যপীযুষ ধারায়
রাখিল দুখের দিনে,
যাঁহার চরণ-ধূলার পরশে
লইলি জীবন চিনে,

জনক যাঁহার মহাতপা ঋষি
তোদেরি হিতের লাগি,
দিলেন বিলায়ে ত্রিদিবের সুধা ;
যাঁহারা বিশ্বত্যাগী,

যাঁহার অপার স্নেহ-পারাবার
পেলব পরাণ খানি
আজিও তেমন অগাধ উদার,
তেমনি অমিয়-খনি,

দু'টি বাহু যা'র আজিও আদরে
টানিয়া লইতে বুকে
ডাকিছে কতই 'আয় কাছে আয়'
করুণ-মলিন মুখে,

সন্তান তাঁর এমনিরে তোরা —
এত নীচ, এত হীন,
শত অনাদরে খেদায়ে তাঁহারে
শুধিছিস্ সেই ঋণ !

ম্যালেরিয়া জ্বর।

[শ্রী—পাইকর—বীরভূম]

অবতরণিকা।

ম্যালেরিয়া জ্বর আজকাল ভারতের যেরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহার করাল আক্রমণে ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা যেরূপ অকালে কালের গ্রাসে পতিত হইতে বাধ্য হইতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া শুধু এদেশবাসী

গণ কেন, আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত বিচলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এহেন মহাশত্রুর বিনাশ সাধনে কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। "এই ভীষণ জ্বরের আক্রমণে পড়িয়া কত রাজা ও মহারাজা, কত জমিদার ও মহাজন, কত ডাক্তার ও কবিরাজ, কত হাকিম ও ওঝা, কত কৃষক ও ভিখারী, এমন কি কত উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তবুও এই শত্রুরাজ ম্যালেরিয়ার বিনাশ সাধিত হইল না। তাহার বিনাশসাধনের জন্য শুধু দেশের নেতৃবর্গ কেন, স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত কত উপায় অবলম্বন করিলেন। কত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোটা বেতনে নিযুক্ত হইয়া কত মোটা মোটা রিপোর্ট লিখিলেন ও তদ্দ্বারা সরকারী সেরেস্তার কতরূপ শোভা বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু হায়! তাহার ফলে ম্যালেরিয়ার তিরোধান হওয়া দূরে থাকুক, তাহার কথঞ্চিৎ প্রশমনও দৃষ্ট হইল না। কারণ স্বাস্থ্যবিবরণী পাঠে জানা যায় যে, ম্যালেরিয়া রোগের বার্ষিক মৃত্যুর হার বরাবরই অব্যাহত। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, এই মৃত্যু সংখ্যা কোথাও কম, কোথাও বেশী। আজ যে স্থানের সংখ্যা কম, সে স্থানের সংখ্যা যে বরাবর কমই থাকিতেছে তাহা নহে, পরন্তু কালই আবার সে স্থানের মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। অন্য পক্ষে দেখা যায় যে, কোন কোন স্থানের মৃত্যু সংখ্যা একবার কিছুদিনের জন্য বাড়িয়া আবার কিছুদিন কমিয়াও যাইতেছে।

দেশের ঈদৃশ ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে এইরূপ এক প্রশ্নের উদয় হয় যে, যদি সত্য সত্যই ম্যালেরিয়ার কারণ নির্ণীত হইয়া থাকে এবং সেই কারণের মূলোচ্ছেদ জন্য যদি কর্ত্তৃপক্ষ সত্যই কোন বিহিত চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে ম্যালেরিয়া এরূপ ভাবে লুকোচুরি খেলিয়া জয়লাভ করিবে কেন? তাই আমাদের মনে ধারণা হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত মোটা বেতনের হোড়া চোংড়া লোকজন প্রকৃত 'বুড়ি' চিনাইয়া দিতে পারিতেছেন না এবং তাহার ফলে ম্যালেরিয়া স্পর্শে বাঙ্গালার শত সহস্র পল্লী, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর কুল নির্ম্মূল হইতেছে। ফলতঃ এখন সকলেই তার স্বরে বলিতেছেন, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

জয়ঢক্কার কর্ণভেদী নিনাদ ও যাত্রা থিয়েটর, ম্যাজিক, সার্কাস প্রভৃতি আমোদ উৎসবের বিরাট আড়ম্বরসহকারে আজকাল যেমন এক শ্রেণীর লোকের তামসিক পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে; বর্ত্তমান যুগের ম্যালেরিয়াধ তত্ত্বানুসন্ধান ব্যাপারটীও ঠিক তদ্রূপ কিনা তাহা আমরা সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। অন্যপক্ষে উল্লিখিত উৎসব আড়ম্বরের সাহায্য না লইয়া সাত্ত্বিকপূজক যেমন নির্জ্জনে সাত্ত্বিকপূজা সমাপন করিয়া থাকেন, আমাদের মনে হয় যে, আমাদের দেশের চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণও তদ্রূপ নিরুৎসব ধ্যান, ধারণা দ্বারা সমস্ত রোগের তত্ত্ব দর্শন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা কেহ কেহ রোগের তত্ত্বজ্ঞানী হইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ ব্যাধির তত্ত্বদর্শী হইতে সমর্থ হইতেছেন কি না, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আর্য্য ঋষিদের প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা প্রণালী

চিন্তা করিলে বাস্তবিকই মনে হয়, তাঁহারা শুধু তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না, অপিচ তত্ত্বদর্শী ছিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন, কারণই কার্য্যে পরিণত হয় (cause passes into effect); সুতরাং কার্য্য দূর করিতে হইলে কারণের তিরোধানই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কারণ বাদ দিয়া কার্য্য দূর করিলে যে পুনরায় কার্য্যোৎপত্তি হইবে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের আর একজন পণ্ডিতও কতকটা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নাম হানিম্যান। ইনিই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আর্য্য ঋষিগণ চিকিৎসা বিষয়ের যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী যে সকল মহাত্মা সেই তত্ত্বের জ্ঞানী হইয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কবিরাজ নামে অভিহিত ও ভারতবর্ষে সুচিকিৎসক বলিয়া সমাদৃত। তাঁহারা ভিন্ন দেশের নহেন, তাঁহারা এদেশেরই এবং তাঁহারাই সমস্ত রোগের নিরাকরণে সমর্থ, কিন্তু যাঁহারা ঋষিদিগের গ্রন্থগুলিকে মাত্র ভাসা ভাসা রকমে পাঠ করিয়া চিকিৎসক হইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কবিরাজ নহেন। তাঁহাদিগকে কপিরাজ নামে অভিহিত করিলেই ভাল হয়। এই শ্রেণীর চিকিৎসায় কেবল বিলের টাকাই বাড়িয়া যায়, কিন্তু রোগের কোনই প্রতিকার হয় না। অতএব আমাদের মনে হয় যে, যাঁহারা বাস্তবিকই কবিরাজ, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সম্বন্ধে একবার তাঁহাদের মতামত লওয়া আবশ্যক। বলাবাহুল্য যে, কবিরাজের মতামত বলিলে কেহ যেন তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত বুঝিবেন না। কারণ কবিরাজী মতামত বলিতে আমরা কেবল ঋষি প্রবর্ত্তিত অভ্রান্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতামতই লক্ষ্য করিতেছি।

এই প্রবন্ধে আমরা আলোচ্য ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। যে গুরুতর বিষয় দেশ বিদেশের চিকিৎসকগণ এ যাবৎ কালোচনা করিয়া আসিতেছেন, যে বিষয়ের আলোচনার জন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্ত হইয়াও আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ জটিল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিশ্চয়ই বামনের চন্দ্র স্পর্শের ন্যায় হাস্যকর। সুতরাং এস্থলে স্বতঃই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মাদৃশ ব্যক্তির আলোচনার তাদৃশ পরিণাম জানিয়াও আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি কেন? বলা বাহুল্য ইহার উত্তর অতি সহজ। আমার বিশেষ ধারণা এই যে, আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহা বালোচিত ও অজ্ঞাতমূলক জ্ঞানে কোন সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হইয়া ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত প্রকৃত তত্ত্বের আবিষ্কার করতঃ শুধু ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর একটা অভূতপূর্ব্ব ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মঙ্গল সাধন করিতে উদ্যত হইবেন এবং তৎসহ আমারও উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তবে এই অবতরণিকার উপসংহারে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যথাজ্ঞান ও যথাসম্ভব সাহায্য লইয়াই এই প্রবন্ধের অঙ্গপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

ম্যালেরিয়া একটী ইংরাজী শব্দ। ইহা ফরাসী শব্দ Mala-Aria অর্থাৎ দূষিত বায়ু হইতে নিষ্পন্ন। অপিচ লাটিন শব্দের Malus

দূষিত ও Air অর্থাৎ বায়ু হইতেও এই শব্দটী সিদ্ধ বলিয়া জানা যায়। যে ভাষা হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হউক না কেন, ইহা যে এখন দূষিত বায়ুর বোধক অর্থে ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ ইংরাজী অভিধানেও ম্যালেরিয়া শব্দের যেরূপ অর্থ লেখা আছে তাহার অর্থ আর্দ্র ভূমি হইতে এক প্রকার দূষিত বায়ু যাহা কোন কোন জেলায় সাধারণ জ্বর, কম্প জ্বর প্রভৃতি উৎপাদন করে তাহাই ম্যালেরিয়া।

যাহা হউক বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এখন আর বড় একটা উল্লিখিত মতের সমর্থন করেন না। তাঁহারা ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি বিষয়ে নীরব থাকিয়া বলিয়া থাকেন যে, এনোফিলিন নামক একপ্রকার মশক এই ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষ এক নরদেহ হইতে অপর নরদেহে বহন করে এবং তাহার ফলে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন, সৃষ্টি যেমন অনাদি, আলোচ্য ম্যালেরিয়াও তদ্রূপ অনাদি। কারণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বিষেরও উৎপত্তি হইয়াছিল।

যাহা হউক, তাঁহাদের মতামত লইয়া আর আলোচনা না করিয়া আগামীবারে আমরা আমাদের বক্তব্যেরই উল্লেখ করিব।

[ক্রমশঃ]

কায়চিকিৎসা-ক্রমোপদেশ বা

Practice of medicine.

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

—◦:o:◦—

স্বরভেদ চিকিৎসা।

কুপিত বাতাদি দোষ স্বরবহ স্রোতঃ চতুষ্টয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বর নষ্ট করে। যক্ষ্মা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই ব্যাধি ছয় প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ সান্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

তৈলাক্ত খদির কিম্বা হরীতকী ও পিপুলের গুঁড়া অথবা হরীতকী ও শুঁঠের গুঁড়া মুখে ধারণ করিলে স্বরভঙ্গের উপকার হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল—এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া মোটের উপর এক আনা মাত্রায় প্রাতে ও বৈকালে গব্যঘৃত ও মধুর সহিত লেহনের ব্যবস্থা দিবে। কুলপাতা পেষণ করিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত গব্য

ঘৃতে ভাজিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিলেও সকল প্রকার স্বরভঙ্গে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

চব্যাদি চূর্ণ—সকল প্রকার স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার উপাদান গুলি নিম্নে লেখা যাইতেছে—

চব্যাম্ল বেতস কটুত্রিক তিন্তিড়ীক তালীশ জীরক
তুগা দহনৈঃ সমাংশৈঃ। চূর্ণং গুড়ে প্রমৃদিতং
ত্রিসুগন্ধি যুক্তং বৈস্বর্য্য পীনস কফারুচিষু
প্রশস্তম্।

চই, আমরুল শাক, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, অম্লবেতস, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন ও চিতামূল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং দারুচিনি তেজপত্র, ছোট এলাইচ—এই তিনটির প্রত্যেকটি চূর্ণ।০ আনা, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বচূর্ণের সমান পরিমাণে পুরাতন গুড় মিশাইয়া দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় সমস্ত দিনে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে উপকার প্রাপ্ত না হইলে ব্যাঘ্রীঘৃত অথবা সারস্বত বা ব্রাহ্মী ঘৃত একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে—

ব্যাঘ্রী ঘৃতম্।

ব্যাঘ্রী স্বরস বিপক্বং রাস্না বাট্যাল গোক্ষুর
ব্যোষৈঃ।
সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্।

গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ মিলিত /১ এক সের। কণ্টকারীর রস ১৬ সের। যথা বিধানে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা।

সারস্বত বা ব্রাহ্মী ঘৃতম্।

সমূলং পত্রমাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা।
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।
রসে চতুর্গুণে তস্মিন ঘৃত প্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যানি তানীমানি প্রদাপয়েৎ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহ হরীতকী।
এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেষাণি কার্ষি-
কানিচ॥
পিপ্পল্যোঽথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বসমেৎ সমালোড্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥

মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করিয়া উদূখলে কুটিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। উক্ত রস ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, মালতী পুষ্প, কুড়, তেউড়ী মূল ও হরীতকী—ইহাদের প্রত্যেকটী ৮ তোলা, পিঁপুল, সৈন্ধব বিড়ঙ্গ চিনি ও বচ—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। মাত্রা।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

"ত্র্যম্বকাভ্রম্"—নামক ঔষটিও স্বরভঙ্গে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার উপাদান—

অভ্রং মেচকমারিতং পলমিতং ব্যাঘ্রী বলা
গোক্ষুরং কন্যা পিপ্পলী মূল ভৃঙ্গ বৃষকাঃ পত্রং
তথা বদরম্। ধাত্রী রাত্রি গুড়চিকাঃ পৃথগ
স্বত্বৈঃ পলাংশৈ র্যুতং সংমর্দ্দ্যাভি মনোরমং
সুবলিতং কৃত্বা যদা সেবিতম্॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিঁপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ—এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটীর ৮ তোলা রস দ্বারা ৮ তোলা অভ্র যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ব্রাহ্মীশাকের রস

অনুপানে এই ঔষধ ২ বেলা সেবনের ব্যবস্থা করিলে সকল প্রকার স্বরভঙ্গে সুফল পাওয়া যায়।

পথ্যাপথ্য—বাতজ স্বরভঙ্গে ঘৃত ও পুরাতন গুড় সহ অন্ন ভোজন, পিত্তজ স্বরভঙ্গে দুগ্ধান্ন ভোজন এবং মেদোজ ও কফজ স্বরভঙ্গে রুক্ষ অন্ন পান উপকারী। কাস ও শ্বাসরোগে যে সকল পথ্যাপথ্য বলা গিয়াছে, স্বরভঙ্গে ইহা ভিন্ন সেই সকল প্রতিপাল্য।

অরোচকাধিকারঃ।

ক্ষুধা রহিয়াছে—অথচ আহার করিবার ক্ষমতা নাই—অর্থাৎ সকল প্রকার সামগ্রীতেই বিতৃষ্ণার নাম অরোচক রোগ। ইহাও বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিজ ও আগন্তুজ ভেদে পাঁচপ্রকার।

বাতজ অরোচকে বস্তিকর্ম্ম অর্থাৎ পিচ-কারীর প্রয়োগ, পিত্তজে বিরেচন, কফজে বমন এবং আগন্তুজ অরোচক রোগে মানসিক প্রফুল্লতা উৎপাদনের চেষ্টাই অরোচক রোগের চিকিৎসা-প্রকরণ।

সকল প্রকার অরোচক রোগেই আহারের পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণের সহিত আদা ভক্ষণের ব্যবস্থা করিবে। আদার রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনেও আহারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

পাকা তেঁতুল ও চিনি—শীতল জল দ্বারা চটকাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে পরে উহার সহিত এলাইচ চূর্ণ, লবঙ্গ চূর্ণ, কর্পূর ও মরিচ চূর্ণ—অল্প অল্প মিশাইয়া লইয়া তদ্বারা মুহুর্ম্মুহু মুখে গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

রাইসরিষা, জীরা ও হিঙ্গু ভাজিয়া চূর্ণ করিবে এবং শুণ্ঠী চূর্ণ ও সৈন্ধব উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত ঔষধ যত—তত পরিমাণে গব্য দধি মিলিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর উহার সম পরিমাণ গব্য তক্র মিশাইয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ইহা সকল প্রকার অরোচকে সদ্যঃ রুচি আনয়ন করিয়া থাকে।

কুড়, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি, মরিচ চূর্ণ ও বিটলবণ, কটু তৈল ও মধুর সহিত; আমলকী, ছোট এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিঁপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল চূর্ণ, কটু তৈল ও মধুর সহিত; লোধকাষ্ঠ, চই, হরীতকী, শুঁঠ, পিঁপুল মরিচ চূর্ণ, যবক্ষার—কটু তৈল ও মধুর সহিত; আদার রস, দাড়িমের রস, জীরা চূর্ণ ও চিনি—কটু তৈল ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল গ্রহণ করিলে পঞ্চবিধ অরোচক রোগে রুচি উৎপন্ন করে।

দারুচিনি, মুথা, ছোট এলাইচ ও ধনে চূর্ণ। মুথা, আমলকী ও দারুচিনি চূর্ণ। দারু-চিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানীচূর্ণ। পিঁপুল ও চৈ চূর্ণ। তেঁতুল ও যমানীচূর্ণ, এই পাঁচ প্রকার যোগের মধ্যে কোনো এক প্রকার যোগের চূর্ণ-গুলি একত্র করিয়া জিহ্বা দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কার হইয়া অরুচি দূরীভূত হয়।

এই সকল যোগ দিয়া কোনো ফল না পাইলে "রসালা" সেবনের ব্যবস্থা করিবে। তদ্বারা সকল প্রকার অরুচি রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। নিম্নে উহা প্রস্তুতের উপাদান বলা যাইতেছে—

রসালা

অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ খণ্ডস্য
ষোড়শ পলানি শশিপ্রভস্য। সর্পিঃ পলং
মধু পলং মরিচং দ্বিকর্ষং শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি

চার্দ্ধ পলং চতুর্ণাম। শুক্লোপলে দলনয়া মৃদুপাণিঘৃষ্টং। কর্পূর চূর্ণ সুরভি কৃত ভাণ্ড সংস্থা।

অম্ল দধি /৮ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কর্পূর চূর্ণ দ্বারা সুবাসিত করতঃ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক যথাযোগ্য মাত্রায় ২ বেলা সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

"তিন্তিড়ী পানকম" নামক আর একটি ঔষধও সর্ব্বপ্রকার অরোচক রোগে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। ইহার উপাদান বলা যাইতেছে।

ভাগাস্ত পঞ্চ চিঞ্চায়াঃ খণ্ডস্যাপি চতুগু´ণাঃ।
ধান্যকার্দ্রকয়োর্ভাগং চাতুর্জ্জাতার্দ্ধ ভাগিকম্॥
দ্বিগুণং জলমেতেষামেকপাত্রে বিলোড়িতম্
পিহিতং তপ্তদুগ্ধেন ততো বস্ত্র পরিপ্লুতম্।
বিধিনা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কর্পূরবাসিতম্।
নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্যুক্ত্যা সুযোজিতম্॥

পুরাতন তেঁতুল ৪০ তোলা, চিনি ১৬০ তোলা, ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা দারুচিনি ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ১ তোলা ও নাগেশ্বর চূর্ণ ১ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমাণ জল। সমস্ত দ্রব্য একটি মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া উহার সহিত উষ্ণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া লইবে। তৎপরে ধূপিত পাত্রে রাখিয়া কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য—যে সকল আহার্য্য রোগীর অভিলষিত অথচ লঘুপাচ্য—তাহাই অরোচক রোগীর পক্ষে সুপথ্য। যে সকল কারণে মনের বিকৃতি ঘটিতে পারে—তাহাই এ রোগে বর্জ্জনীয়।

ছর্দ্দি বা বমন।

বমন রোগও পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ।

ডাবের জল, মুড়ি ভিজান জল বা পোড়া রুটি ভিজান জল—বমন নিবারণের পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। বড় এলাইচ ভিজান জল, বড় এলাইচের কাথ বা বড় এলাইচ চূর্ণ সেবনেও বমন রোগের শান্তি হইয়া থাকে। রাত্রি-কালে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পানেও অনেক সময় বমন রোগে উপকার পাওয়া যায়। অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ডুবাইয়া নিবাইবে, তাহার পর সেই জল পান করিতে দিলে সকল প্রকার বমনেরই নিশ্চয় শান্তি হইয়া থাকে। যষ্টিমধু ও রক্ত চন্দন—দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্তি হয়। মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিলে বিরেচন হইয়া বমন নিবৃত্তি হয়। ক্ষেৎপাপড়া, বিল্বমূল বা গুলঞ্চের কাথ মধুর সহিত কিংবা মূর্ব্বামূলের কাথ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এক তোলা আমলকীর রস, এক তোলা কয়েতবেলের রস—কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে প্রবল বমনেরও

শান্তি হইয়া থাকে। সচল লবণ, চিনি ও মরিচ চূর্ণ—মধুসহ লেহন করিলে সকল প্রকার বমনেরই শান্তি হইয়া থাকে। আমের আঁটি ও কুলের আঁটির শাঁস অথবা মুথা ও কাঁকড়া শৃঙ্গী—মধুর সহিত লেহনে কফজ বমি নিবারিত হয়। সমপরিমিত দুগ্ধ ও জল কিম্বা সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত একত্র পান করিলে বাতজ বমনের শান্তি হইয়া থাকে। আরসুলার বিষ্ঠা ৩৪ দানা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে সকল প্রকার বমনই শীঘ্র উপশমিত হইয়া থাকে। ২ তোলা আমলকীর রসে অর্দ্ধ তোলা শ্বেতচন্দন ঘষিয়া মধু সহ সেবনে সকল প্রকার বমনের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

উল্লিখিত যোগগুলির দ্বারা ফল না পাইলে এলাদি চূর্ণ এবং "রসেন্দ্র"—নামক ঔষধ দুইটির প্রয়োগ করিবে। নিম্নে ঐ ঔষধ দুইটির উপাদান বলা যাইতেছে।

এলাদি চূর্ণ।

এলালবঙ্গ গজকেশর কোলমজ্জ লাজপ্রিয়ঙ্গু
ঘনচন্দন পিপ্পলীনাম। চূর্ণানি মাক্ষিক সিতা
সহিতানি লীঢ়াচ্ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুত
পিত্তজাঞ্চ॥

ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের আঁটির শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিপুল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা এক আনা। চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে।

রসেন্দ্রঃ।

অজাজী ধান্য কৃষ্ণাভিঃ সক্ষৌদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ
এভিঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতঃ লেহ্যো বান্তি প্রশান্তয়ে॥

কৃষ্ণজীরা, ধনে, পিপুল, মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রসসিন্দুর সমস্ত দ্রব্য সমভাগ। মাত্রা এক আনা। বমন নিবারক যোগগুলির মধ্যে কোনও একটির সহিত সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাপথ্য।—সকল প্রকার বমন রোগেই প্রথমতঃ লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। বমন রোগের নিবৃত্তি হইলে লঘুপাচ্য ও রুচিকর আহার্য্য প্রদান করিবে। বমনবেগ থাকিতে আহার দিবার একান্ত আবশ্যক হইলে তাহা মুগের কাথের সহিত খৈ চূর্ণ, মধু ও চিনি মিশাইয়া আহার করিতে দিবে।

রৌদ্রাদি আতপ সেবন এবং যে সমস্ত কারণে মনোমধ্যে ঘৃণা জন্মিতে পারে, সেই সকল দ্রব্য বমন রোগে বর্জ্জনীয়।

তৃষ্ণাধিকার।

অম্ল, কফ এবং আমরস কর্ত্তৃক দূষিত দোষ সলিল বহ স্রোতঃ সমূহকে দূষিত করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন করে। তৃষ্ণা সাত প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ এবং অন্নজ।

বায়ুজনিত তৃষ্ণায় গুড় মিশ্রিত দধি, শীতল ও বলকারক রস এবং গুলঞ্চের রস পান উপকারী।

পিত্তজ তৃষ্ণায় যজ্ঞডুমুরের রস বা কাথ পান করিতে দিবে। সারিবাদিগণ অর্থাৎ অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারী ফল, মউল ফুল, বেণার মূল সমভাগ মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ পোয়া জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া উহা পান করিতে দিলেও পিত্তজ পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। গাম্ভারী ফল,

চিনি, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু—এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ পোয়া গরম জলে পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া পান করিলেও পিত্তজ পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বালা, ধনে, বেণার মূল ও রক্তচন্দন—প্রত্যেক দ্রব্যটীর ওজন।/১০, জল /২ সের, শেষ /১ সের। এই কাথ পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়।

বিল্বমূলের ছাল, অরহরের পাতা, ধাইফুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও কুশমূল—, মিলিত ২ তোলা, যথাবিধানে কাথ প্রস্তুত করিয়া উষ্ণাবস্থায় পান করিলে বমন হইয়া কফজ তৃষ্ণার শান্তি হইয়া থাকে।

নিমছালের কাথ, নিম্বপুষ্পের কাথ ও নিম্ব পত্রের উষ্ণ কাথও কফজ তৃষ্ণায় উপকারী।

আমজন্য তৃষ্ণায় পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী ও জেলার আটি—সমভাগে মিলিত ২ তোলা, যথাবিধানে কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত বেলশুঁঠ, বচ ও হিং চূর্ণের প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

ক্ষতজ তৃষ্ণায় দুগ্ধ ও মধু মিশ্রিত জল এবং মাংস রস উত্তম ব্যবস্থা।

অন্নজ তৃষ্ণায় বমন করাইবে।

কিসমিসের কাথ, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও যষ্টিমধুর কাথ, মধু অথবা মুঁদিফুলের রস—নাসিকা দ্বারা পান করিলে সকল প্রকার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খই ও বটের ঝুরি—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার প্রবল তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রশমিত হয়। আমপাতা ও জামপাতার কাথ কিম্বা আমছাল ও জামছালের কাথ অথবা আম্র বা জামের আঁটির শাস সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমি ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ধনের কাথ ১ দিন বাসি করিয়া সেবনেও সকল প্রকার তৃষ্ণা নিবারিত হয়। বটের ঝুরি, চিনি, লোধ, দাড়িম যষ্টিমধু ও মধু—আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত সেবনে বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। ছোলঙ্গ লেবুর পুষ্পের কেশর, মধু ও দাড়িম—এই সকল দ্রব্য সম ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া কবল করিলে, ক্ষণকাল মধ্যে প্রবল তৃষ্ণা নিবারিত হয়। বটের ঝুরি, কুড়, মধু, খই ও নীলোৎপল—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার তৃষ্ণার শান্তি হয়।

পিপাসিত ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মধু মিশ্রিত শীতল জলপান করিতে দিবে, ইহাতে বমন হইয়া তৃষ্ণা নিবারিত হইবে।

টাবা লেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম একত্র পেষণ করিয়া কবল করিলেও সকল প্রকার তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

ঔষধ দিবার প্রয়োজন হইলে রসসিন্দুর, আমছাল ও জামছালের কাথের সহ ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য।—মধুর রসবিশিষ্ট, শীতল ও রুচিজনক দ্রব্য তৃষ্ণা রোগে হিতকর। উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য মাত্রেই ইহাতে বর্জ্জনীয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস।

মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত রোগীকে মূর্চ্ছার আক্রমণ হইবা মাত্র চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শীতল জলের ছিটা দিবে। এই সময় তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন ও সুকোমল শয্যায় শয়ন করান আবশ্যক। যদি জলের ছিটা দ্বারা মূর্চ্ছার অপনয়ন না হয়, তাহা হইলে নিশাদলের টুকরা ২ ভাগ ও শুক চূর্ণ ১ ভাগ একত্র একটি শিশিতে রাখিয়া তাহার আঘ্রাণ দিবে। শিরীষ বীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, রসুন, মনঃশিলা ও বচ এই দ্রব্যগুলি সমান ভাগে লইয়া গোমূত্রে বাটিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অনেক সময় মূর্চ্ছার অপনোদন হয়। সৈন্ধব লবণ, মরিচ ও মনঃশিলারও ঐরূপ অঞ্জনে মূর্চ্ছার প্রতিকার হইতে দেখা গিয়াছে। সৈন্ধব লবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল—সমভাগে জলের সহিত বাটিয়া নস্য করাইলেও মূর্চ্ছার অপনয়ন হইয়া থাকে।

রক্ত দর্শনজনিত মূর্চ্ছা রোগে শৈত্যক্রিয়া হিতকর। অধিক মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিষজনিত মূর্চ্ছা রোগে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে।

ভ্রমরোগে—শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিসমিস—সমান ভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবার ব্যবস্থা করিবে। রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ, প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন—ভ্রম রোগীর পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। শুঁঠ, পিঁপুল, দাক্ষা ও হরীতকী—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা এবং পুরাতন গুড় ৬ তোলা, একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে ভ্রমরোগ নিবৃত্তি হয়। দুই রতি তাম্র ভস্ম, এক আনা পুরাতন ঘৃত—যথাবিধানে প্রস্তুত দুরালভার কাথ মধু সেবনে ভ্রমরোগের নিবৃত্তি হয়। বেড়েলা বীজ চূর্ণ ও চিনি একত্র দুগ্ধ সহ সেবনও ভ্রমরোগে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

সন্ন্যাসরোগে চেতনা সঞ্চারের জন্য মূর্চ্ছার প্রতিকারকল্পে যে সকল যোগের কথা বলা হইল, তাহাই করিবে। তাহাতেও চৈতন্য না হইলে গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ, উষ্ণ লৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদির দ্বারা আকর্ষণ করিবে।

শিশুদিগের সন্ন্যাসে ক্রিমি নাশক ঔষধ দিলে অনেক স্থলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ সাধারণতঃ শিশুদের সন্ন্যাসের মুখ্য কারণই ক্রিমি। এরূপ স্থলে এরণ্ড তৈল বা রসাঞ্জন চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছা রোগে কেবলমাত্র রসসিন্দুর ২ রতি মাত্রায় পিঁপুল চূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কফ জনিত মূর্চ্ছায় ঐ অনুপানে ব্যবস্থা করিবে, নতুবা ত্রিফলা ভিজান জলই উত্তম ব্যবস্থা।

"কালাগ্নি রস" নামক ঔষধটিও মূর্চ্ছা রোগে সুব্যবস্থা। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে --

রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। শতমূলী, ভূমীকুষ্মাণ্ড এবং পাথরকুচির রসের প্রত্যেকটির দ্বারা পাঁচ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান—শতমূলীর রস বা ত্রিফলা ভিজান জল।

"সুধানিধি রস" ও "অশ্বগন্ধারিষ্ট" নামক

ঔষধ ক্রটি—মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস রোগীকে প্রাতে ও বৈকালে নিয়মিতভাবে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐ ঔষধগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

সুধানিধিরস।—রসসিন্দূর ও পিপুল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধু সহ প্রযুজ্য।

অশ্বগন্ধারিষ্ট।—অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও তেউড়ী—প্রত্যেক দ্রব্য দশ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল—প্রত্যেকটি ৮ পল। এই সমস্ত দ্রব্য পাঁচমন বারসের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ধাইফুল ষোল পল, মধু সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক দুই পল, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ—প্রত্যেক দ্রব্য চারিপল, প্রিয়ঙ্গু চারিপল এবং নাগেশ্বর দুইপল, এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া একটি আবৃত পাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। তাহার পর ছাঁকিয়া ১ তোলা হইতে ৪ তোলা মাত্রায় সেব্য।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস রোগে প্রযুজ্য। এই সকল ঔষধ ও তৈলের পরিচয় বাতব্যাধি অধিকারে বলা যাইবে।

পথ্যাপথ্য।—সকল প্রকার বলকারক আহার্য্য এই সকল পীড়ায় ব্যবস্থেয়। তিল তৈল মর্দ্দন, স্রোতস্বিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে অবগাহন-স্নান, সুগন্ধিদ্রব্য মর্দ্দন, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা এই সকল পীড়ায় উপকারক। গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও অম্লদ্রব্য সকল ভোজন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি এই সকল পীড়ায় বর্জ্জনীয়।

মদাত্যয়।

অপরিমিত মাত্রায় এবং অবৈধ নিয়মে মদ্য পানের ফল মদাত্যয় রোগ। এরূপ অবস্থায় সমমাত্রায় যথা বিধানে মদ্যপান করানই মদাত্যয় রোগের চিকিৎসা-বিধি।

খৈ চূর্ণ, পিণ্ড খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল, দাড়িমের রস, পরুষ ফল ও আমলকীর রস—সমভাগে একত্র বাটিয়া সেবন করিলে মদ্যপান জনিত বিকার নষ্ট হয়।

পীতমদ্য পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মদ্যের সহিত সচল লবণ, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ চূর্ণ এবং কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। বায়ুজনিত মদাত্যয়ে ইহা উপকারী।

চিনির সহিত মুগের যূষ এবং সুস্বাদু মাংস রস পান ও শৈত্যক্রিয়া—পিত্তজনিত মদাত্যয় রোগে উপকারী।

অল্প বা অধিক পরিমাণে লঙ্ঘন এবং শর্করা কোলের চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করান শ্লেষ্মাজনিত মদাত্যয় রোগে হিতকর।

মদ্যের সহিত চালিতা, খর্জ্জুর, কিসমিস ফলসা, দাড়িমের রস ও ছাতু মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও পৈত্তিক মদাত্যয় উপশমিত হয়। প্রচুর ইক্ষু রস মিশ্রিত মদ্য পান করাইয়া ক্ষণকাল পরে সেই মদ্য বমন করাইলেও পৈত্তিক মদাত্যয়ের উপশম হয়। শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে বমনকারক দ্রব্য সংযুক্ত মদ্যপান করাইয়া বমন করাইবে। তাহার পর রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া উপবাস দিবে। শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে বালা, বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী অথবা শুঁঠের কাথ শীতল করিয়া পান করিতে দিবে।

...চ, সচল লবণ, হিং, টাবালেবুর ছাল, শুঁঠ ...যানি চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করিলে সর্ব্ববিধ ...াত্যয় উপশমিত হইয়া থাকে।

মদাত্যয় রোগে মত্ততানিবারণের জন্য ঘৃত মিশ্রিত চিনি লেহন করিতে দিবে। দাহ ...ত্তির জন্য দাহনাশক যোগ সকল প্রয়োগ করিবে।

সুপারি ভক্ষণে বমি, মূর্চ্ছা ও অতীসারের ...ত মত্ততা জন্মিলে তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত শীতল জল পান করিতে দিবে। শুষ্ক বস্ত-...গোময় আঘ্রাণে, শীতল জল পানে অথবা ...বণ ভক্ষণে সুপারি ভক্ষণজনিত মত্ততা ...শমিত হয়। চুণ খাওয়ায় জিহ্বার পীড়া হইলে চিনি দ্বারা কবল গ্রহণ করিবে।

গুড়ের সহিত কুমড়ার রস পান করিলে ...বনফল ও কোদ্রব ভক্ষণ জন্য মত্ততা আশু প্রশমিত হয়।

চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ পান করিলে ধুতুরা ভক্ষণজনিত মত্ততা নিবারিত হয়।

সিদ্ধি সেবনে মত্তত্া জন্মিলে, উষ্ণ ঘৃত, কাঁঠালের পাতার রস, তেঁতুলের জল বা ডাবের জল পান করাইবে।

ফলত্রিকাদ্য চূর্ণ, অষ্টাঙ্গ লবণ ও মহা-কল্যাণ বটী—মদাত্যয় রোগের বিখ্যাত ঔষধ। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ফলত্রিকাদ্য চূর্ণ।

ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চ লবণ, গুলঞ্চ, বচ, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও এলবালুক—প্রত্যেকটির চূর্ণ সম ভাগ। একত্র মিশাইয়া দুই আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় জল সহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

অষ্টাঙ্গ লবণ।

সচল লবণ, জীরা, মহাদা ও অম্লবেতস—প্রত্যেকের চূর্ণ এক ভাগ, দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ—প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধ ভাগ এবং চিনি এক ভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই আনা মাত্রায় জল সহ সেব্য। কফজনিত মদাত্যয় রোগে ইহা অধিক কার্য্যকরী।

মহাকল্যাণ বটী।

স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মুক্তা—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। আমলকীর রসে মর্দ্দন। ১ রতি বটী। মাখন ও চিনি অথবা তিল চূর্ণ ও মধু অনুপানে প্রযুজ্য।

শতাবরী তৈল ও বৃহৎ ধাত্রী তৈল মর্দ্দনেও মদাত্যয় রোগে উপকার পাওয়া যায়। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

শতাবরী তৈল।

তিল তৈল ⁄৪ সের। শতমূলীর রস, আমলকীর রস, ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস, প্রত্যেক ⁄৪ সের। ছাগ দুগ্ধ ⁄৪ সের। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলথ ও মাষকলাই—প্রত্যেকের কাথ ⁄৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় দশক, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, শ্যামা-লতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুলফা, পুনর্ণবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, দারুচিনি, অপক্ক কদলীফল, পদ্ম, অগুরু, হরীতকী, আমলকী—মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধানে পাক করিবে।

পথ্যাপথ্য।—বাতিক মদাত্যয়ে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন, মৎস্যের ঝোল, অম্ল ও লবণ রস সংযুক্ত দ্রব্য। পৈত্তিক মদাত্যয়ে শীতল

অম্ল, চিনি মিশ্রিত মুগের যূষ, স্বাদু মাংসের রস, শীতল স্থানে শয়ন, শীতল জলে স্নান প্রভৃতি হিতকর। কফজ মদাত্যয়ে প্রথমে উপবাস, তাহার পর রুক্ষ ও ঘৃতাদি শূন্য মাংসরস সহ অন্নভোজন হিতকর। কফজ মদাত্যয়ে গরম জলপান হিতকর।

দম্পতী-জীবন।

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

গর্ভের লক্ষণ। গর্ভাধানের সঙ্গে রমণী গর্ভধারণ করিল কিনা তাহা নিম্ন লিখিত চিহ্নগুলি দেখিয়া জানিতে পারা যায়। যথা—শুক্র ও আর্ত্তব যদি নির্গত হইয়া না যায়, সে সময়ে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনিদেশের স্ফুরণ হইয়া থাকে।

গর্ভ হওয়ার কিছুদিন পরে স্তনযুগের মুখভাগের কৃষ্ণবর্ণতা, রোমরাজির বিশেষভাবে উদ্গম, চোখের পাতা লাগিয়া যাওয়ার মত, গা বমি বমি করা, ভাল জিনিষ খাইলেও কখন কখন বমি হইয়া যাওয়া, অরুচি, ভাল গন্ধও ভাল না লাগা, শরীরের অবসাদ, মুখে দিয়া জল উঠা, সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

প্রসব হইবার পূর্ব্বে পুত্র বা কন্যা হইবে তাহা জানিবার উপায়। যদি দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে গর্ভের আকার একটী পিণ্ডের মত গোল হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পুত্র সন্তান হইবে, এবং যে নারী পুত্র-প্রসবিনী হইবে—তাহার দক্ষিণ নেত্র একটুকু বড় বড় দেখায়, দক্ষিণ স্তনে পূর্ব্বে দুগ্ধ বাহির হয়, দক্ষিণ উরু সামান্য স্থূল, মুখের প্রসন্নতা ও উজ্জ্বল বর্ণ হয়, দোহদের সময় যে সমস্ত দ্রব্যে পুরুষের নাম আছে, সেই সকল দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে, স্বপ্নে আম, নারিকেল প্রভৃতি লাল বর্ণের ফুল দর্শন করে।

গর্ভে কন্যা জন্মিলে দ্বিতীয় মাসে গর্ভ লম্বা দড়ির মত দীর্ঘাকার হয় এবং স্ত্রীলোকের বামনেত্র আয়ত, বামস্তনে প্রথমে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে, বাম অঙ্গের চেষ্টা সকল অর্থাৎ ধারণ, গ্রহণাদি ক্রিয়া অধিক হইলে, স্ত্রী গর্ভাবস্থায় অত্যধিক পুরুষ সঙ্গ কামনা করিলে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের নিদ্রা, পান, ভোজন, শয়ন, স্বভাব অতিশয় স্ত্রীজনোচিত হইলে, বামপার্শ্বে গর্ভের সঞ্চলন অধিক হইলে, কাতরভাব, ভীরুতা, লজ্জাশীলতা, চাঞ্চল্য, শরীরের শিথিলভাব ও মৃদুভাব আসিলে, নিম্ন অঙ্গের ভারবোধ হইলে, জানিতে হইবে, যে এ গর্ভে কন্যারত্ন বিরাজ করিতেছেন।

পুত্র ও কন্যার যে সকল লক্ষণ উক্ত

(খ) এই উভয়বিধ লক্ষণ বর্ত্তমান রহিলে ও গর্ভের আকৃতি আবের মত অর্থাৎ গোল কলের অর্দ্ধেকের তুল্য হইলে গর্ভে নপুংসক (ক্লিবয়া) সন্তান আছে বুঝিতে হইবে।

গর্ভবতীর কর্ত্তব্য। সন্তানের স্বাস্থ্য, জননীর আচার ব্যবহার ও আহারের উপর নির্ভর করে, মধের উৎকর্ষ অপকর্ষভাব ও মাতার মনোভাবকে অপেক্ষা করিয়া জন্মে। জননীর ভুক্তদ্রব্য হইতে পরিপাকান্তে যে রসের উৎপত্তি হয়, সেই রসের দ্বারাই গর্ভ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে থাকে। মাতা যদি সুপথ্য ভোজন ও গর্ভিণীর কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সন্তান, সবল, ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, পরিপুষ্টাঙ্গ ও বল-বর্ণ যুক্তাযুক্ত হইয়া যথাকালে ভূমিষ্ঠ হয় এবং সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করে। আর অপথ্য ভোজন বা অনিয়ম অত্যাচার করিলে সন্তান নানাবিধ রোগজীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মলাভ করে এবং অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্য গর্ভিণীর প্রথম হইতে গুরুজনোপদিষ্ট শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সকল পালন করতঃ বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী প্রথম হইতে অতিশয় পবিত্রভাবে থাকিবেন, ধৌত শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বহুবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা প্রফুল্লমনে কালযাপন করিবেন। দেবতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজন ও দ্বিজে ভক্তিমতী হইবেন, যাহাতে জীবন অধিক পরিমাণে আছে, সেই সকল দ্রব্য, ... দ্রব্য এবং দুগ্ধ প্রত্যহ গর্ভিণী যাহাতে ... করেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তৃপক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী অতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, খুব ঝাল বা অত্যন্ত গরম দ্রব্য সমূহ ভোজন করিবেন না, অতিশয় পরিশ্রমের কাজ, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, উপবাস অথবা অতি ভোজন, পচা, বাসি বা শুষ্ক দ্রব্য ভোজন, কোনরূপ বেগশালি-যানে আরোহণ, শোক দুঃখ, মল মূত্রের বেগধারণ, উঁচু হইয়া উপবেশন করিলে গর্ভস্থ সন্তান উদরের মধ্যে মৃত অথবা অকালে স্খলিত অথবা শুষ্ক হইয়া থাকে। মলিন, বিকলাঙ্গ বা বিকটাকার পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে স্পর্শ, দুর্গন্ধ বস্তুর ঘ্রাণ, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ, রাত্রিতে বা সন্ধ্যা বেলায় একাকিনী অন্যত্র গমন, একাকিনী একঘরে শয়ন, ক্রোধ করা গর্ভিণীর পক্ষে উচিত নহে। গর্ভবতী রমণী খুব জোরে কথা কহিবেন না, অতিশয় তৈলমর্দ্দন বা গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দ্দন করিবেন না, মাটীতে শয়ন, উঁচু শয্যায় শয়ন ও উচ্চ আসনে উপবেশন করিবেন না, কোনরূপ আঘাত বা পীড়া ও গর্ত্তস্থান (কূপ প্রভৃতি) অথবা খুব উচ্চস্থান দর্শনাদি দ্বারাও অসময়ে গর্ভস্রাব হইতে পারে, লাল রঙের কাপড় বা পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলে গর্ভিণীকে দেবতা, রাক্ষস অথবা তাহাদের অনুচর ভূত প্রেতগণ আক্রমণ করিয়া থাকে। এই হেতু গর্ভিণীর লাল রঙের বস্ত্রাদি পরিধান করা উচিত নহে। মাদক দ্রব্য বা মাংস ভোজন, যাহাতে মন অপ্রসন্ন হয়—এরূপ কোন কাজ করা ও গর্ভিণীর কর্ত্তব্য নহে। গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নাই; চিৎ হইয়া শুইলে গর্ভের নাভিলগ্ন-নাড়ী গর্ভের কণ্ঠে জড়াইয়া যাইতে পারে।

গর্ভিণীর শূন্যদেশে শয়ন অথবা রাত্রিতে ভ্রমণ করিলে সে রাক্ষস বা ভূতাদি দ্বারা আবিষ্টা হইয়া থাকে, এবং উন্মাদ রোগযুক্ত সন্তান প্রসব করে, গর্ভিণী কলহরতা হইলে সন্তানের অপস্মার রোগ জন্মে, গর্ভিনী নিত্য মৈথুনাসক্তা হইলে সন্তান বিকলাঙ্গ, নির্লজ্জ ও স্ত্রৈণ হয়।

গর্ভিণী অত্যন্ত শোকাকুলা হইলে সন্তান ভীত, কৃশাঙ্গ ও অল্পায়ু সম্পন্ন হয়, গর্ভিণী পর দ্রব্যাভিলাষিনী হইলে সন্তান পরের দুঃখদাতা, ঈর্ষাযুক্ত ও দুর্জ্জন হয়. চৌর্য্যপরায়ণ গর্ভিণী অপরিশ্রমী, বিবাদপ্রিয় ও কুকর্ম্মনিরত সন্তান প্রসব করে, গর্ভিণী অমর্ষপরায়ণা হইলে তাহার সন্তান উগ্রস্বভাব বঞ্চনাতৎপর ও অসূয়াশীল হয়, গর্ভিণী অতিশয় নিদ্রালু হইলে তন্দ্রাযুক্ত নির্ব্বোধ ও অল্পাগ্নিযুক্ত হইয়া থাকে, মদ্যরতা গর্ভিণী, পিপাসাযুক্ত ও চঞ্চল চিত্ত, গোধামাংস প্রিয়া গর্ভিণী শর্করা, পাথুরী, অথবা প্রমেহ যুক্ত সন্তান প্রসব করে। মৎস্য বা মাংস প্রতিদিন অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে সন্তান চিরনিমেষ বা স্তব্ধ নয়ন হয়, দুগ্ধ ভিন্ন অন্যান্য মধুর রস যুক্ত দ্রব্য প্রত্যহ অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে গর্ভিণী প্রমেহযুক্ত কালা বা অতিশয় স্থূল সন্তান প্রসব করে, গর্ভিণী অম্লপরায়ণা হইলে রক্তপিত্ত, চক্ষুপীড়া বা চর্ম্মরোগযুক্ত সন্তান জন্মে। অত্যন্ত লবণ ভোজনে সন্তানের অকালে বলী (চামড়া জড় হইয়া যাওয়া) খালিত্য (টাকপড়া) ও অকালে কেশপক্কতা রোগ জন্মে, বেশী ঝাল খাইলে সন্তান দুর্ব্বল, অল্প শুক্রযুক্ত হয়, এবং সে সন্তানের আর সন্তান হয় না, গর্ভাবস্থায় বেশী তিক্ত দ্রব্য খাইলে সন্তান শোষ রোগান্বিত, দুর্ব্বল ও কৃশ, কষায় দ্রব্য বেশী খাইলে শ্যাব-বর্ণ, আনাহ রোগযুক্ত অথবা উদাবর্ত্ত রোগ বিশিষ্ট সন্তান জন্মে। মধুর, অম্ল, লবণ, ঝাল, তিক্ত ও কষায় এই ছয় রস যুক্ত দ্রব্য ভোজন করা গর্ভিণীর ও গর্ভের পক্ষে হিতকর হইলেও অতি মাত্রায় কোনটিও খাওয়া উচিত নহে।

পুংসবন যোগ। যাহাদের কেবল কন্যা প্রসব হয়, পুত্র জন্মেনা, আয়ুর্ব্বেদের অমোঘ শক্তি ঔষধের গুণে তাহাদেরও পুত্র জন্মিতে পারে। পূর্ব্বকালে এই সকল ঔষধের বিশেষ আদর ছিল, ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ অধিকাংশ সভ্য-ধনশালী ভারতবাসী পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর আয়ুর্ব্বেদে আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা এখন দেশীয় অনুকরণে তৎপর। বিদেশীয়েরা যাহা বলিবেন, বিদেশীয় শাস্ত্র যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই তাঁহাদের এখন দেবতার বাক্য ও নত মস্তকে পালনীয়। বিদেশীয়গণ যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে বিজ্ঞানানুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করতঃ স্বদেশের চিকিৎসার প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর, ভারতবাসীও তেমনই সেই কথার সত্যতা নিশ্চয় করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই ভারতের গৌরব অভ্রান্ত, অমোঘবীর্য্য, সিদ্ধফল, আয়ু-র্ব্বেদকে পরিত্যাগ করিতে,—হতাদর করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাঁহাদের অনাদরেই আজ আয়ুর্ব্বেদের বিস্ময়কর ঔষধগুলি অস্তমিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেইজন্য পুংসবনাদি যোগ (পুত্রকারক যোগ) ও অনাদরে—অব্যবহারে অপ্রসিদ্ধ ও অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক ভারতের একজনও যদি বিশ্বাস করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধের ফল লাভ করিতে চেষ্টা করেন, সেই আশা

ক্রমে ধরিয়া কয়েকটি পুত্রকারক যোগ নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল ঔষধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই গর্ভিণীকে ব্যবহার করাইতে হয় শরীরের গঠন হইয়া গেলে আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে, তৃতীয় মাসে গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম মাসে ও দ্বিতীয় মাসে পুত্রকারক যোগ ব্যবহার করিতে হয়।

যোগ (১) গোষ্ঠে (গো সকল চরিতে গিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করে তাহাকে গোষ্ঠ বলে) অথবা পর্ব্বতে উৎপন্ন বটবৃক্ষের পূর্ব্ব দিক ও উত্তরদিকের দুইটী শাখা হইতে নির্দোষ (কীটাদির দ্বারা অভক্ষিত) দুইটী শুঙ্গ আনিতে হইবে, এই দুইটী শুঙ্গ এবং পুষ্ট, কীটাদির দ্বারা অদুষ্ট দুইটী মাষকলাই, অথবা এক জোড়া শ্বেতসর্ষপ একত্র দধি দিয়া বাটিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে গর্ভবতী রমণীকে পান করিতে দিবে।

(২) জীবক, ঋষভক, আপাং (চটপটের মূল) এবং পিঝুঁটী মূল (ঝিণ্টা) প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা একত্র বাটিয়া আধ পোয়া দুগ্ধ ও আধ সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ খাইলে কন্যা না হইয়া পুত্র জন্মে।

(৩) ঐ চারিখানি জিনিষের মধ্যে সব গুলি না পাওয়া গেলেও যাহা পাওয়া যায়, তাহাই মিলিত এক তোলা পরিমাণ লইয়া উক্ত পরিমাণ জল ও দুগ্ধসহ পাক করিয়া খাইতে হয়।

(৪) অণুপরিমিত (খুব সূক্ষ্ম যাহা গলায় না লাগিয়া খাইতে পারে এমন) সোণার, কিংবা রূপার অথবা লোহার পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে অগ্নির উপর রাখিলে যখন অগ্নির মত লালবর্ণ হইবে, সেই সময়ে এক অঞ্জলি পরিমাণ দুগ্ধে বা দধিতে অথবা জলে ফেলাইয়া দুগ্ধাদির সহিত খাইতে হইবে, এই যোগে দুগ্ধ প্রভৃতি নিঃশেষ করিয়া খাইতে হয়।

(৫) পুষ্যা নক্ষত্রে লক্ষণামূল. বা বটের শুঙ্গা অথবা পীতবেড়েলা; কিম্বা শ্বেতবেড়েলার মূল তুলিয়া এক বর্ণা সবৎসা গাভীর দুগ্ধ দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা টানিয়া টানিয়া লইতে হয়, নাক দিয়া টানিলে যাহা মুখে আসিবে, উহা না ফেলাইয়া খাইতে হয়।

(৬) পঞ্চম মাসে, রবিবারে একবর্ণা বৎসা গাভীর দুগ্ধ একগলা জলে দাঁড়াইয়া খাইলে গর্ভিণী বলশালীবিশিষ্ট পুত্র লাভ করে।

(৭) উন্মাদ রোগাধিকারে উক্ত পানীয় কল্যাণক অথবা ক্ষীর কল্যাণক ঘৃত এবং লক্ষণালোহ, পুংসবনকালে রমণীদিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

আয়ুর্ব্বেদের আশা। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে বাঙ্গালা দেশের মত মান্দ্রাজ হইতেও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সম্পতি ঐ সমিতির প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও একজন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সকল চিকিৎসকই আয়ুর্ব্বেদের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতেও সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে। মান্দ্রাজের ঐ সমিতি ভারতবর্ষীয় সকল প্রদেশে গমন পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদের সকল তথ্য সংগ্রহ করিবেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট যে এতকাল পরে আয়ুর্ব্বেদের জন্য অনুসন্ধান-কমিটী গঠিত করিয়াছেন, ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যত অবস্থা যে আশাপ্রদ—তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।—বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে আমাদের দেশের লোকের ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে সর্ব্বপ্রকারে সুফলপ্রদ, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে বিদেশীয় উগ্রবীর্য্য ঔষধে কোন কোন স্থলে আমরা আশু রোগযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইলেও সে সকল ঔষধ আমাদের ধাতু ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া তাহার ফলে ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক নূতন রোগকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া থাকি। কুইনাইনে ম্যালেরিয়া জ্বর সদ্যঃ নিবারিত হয়, কিন্তু সে ঔষধে কবিরাজী হরিতালঘটিত ঔষধের মত স্থায়ীভাবে কখনই বন্ধ হয় না। একটু অনিয়ম করিলেই কুইনাইনে-আটকান জ্বর আবার যে ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ফলে কুইনাইন সেবনে জ্বর বন্ধ করায় পুনঃ পুনঃ জ্বরে ভুগিয়া ক্রমশঃ জীবনীশক্তির অপচয় হইয়া থাকে। ইহা শুধু আমাদের কথা নহে, দেশের বড় বড় ডাক্তারেরাও একথা এখন প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকে যে এ বিষয়ে চিন্তা এতদিন করেন নাই, ইহাই তো দুঃখ।

আয়ুর্ব্বেদে ও উড্রফ। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদের অতীত অবস্থার মত আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ অবস্থা যে আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহা কল্পনা করা এখন আর আকাশকুসুম নহে। ভারতবন্ধু সারজন্ উড্রফ তাঁহার "ভারত-শক্তি" নামক পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকলের যে গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভারতবাসীমাত্রেরই তাহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সার জন্ উড্রফ আমাদের দেশে জজীয়তী করিতে আসিয়া শুধু মামলা-মোকদ্দমারই বিচার করেন নাই। তিনি আমাদের আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা আমাদের স্বস্তি অস্বস্তি সকল বিষয়েরই নিরপেক্ষ বিচারে ঐ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সুদূর মহাসমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেও, ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগকেও তিনি সাদরে আহ্বান করিতেন এবং "যোগেন্দ্র রস" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের অমূল্য ঔষধ সকল সেবন করিয়া ঐ সকল ঔষধের মন্ত্রশক্তি ন্যায় যে কার্য্য দেখিয়াছিলেন. তাঁহার আয়ুর্ব্বেদে অনুরাগ তাহারই ফলসম্ভূত। তিনি ঐ পুস্তকের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"তাঁহার এক ভারতীয় ভৃত্য পীড়িত হইলে তাহার চিকিৎসার ভার দেশীয় চিকিৎসকের উপর অর্পণ করায় ভৃত্য ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিল,—তাহার চিকিৎসার ভার এলোপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে অর্পণ করা হউক।" সার জন উড্রফ এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মন্তব্যে বলিতেছেন "যে দেশে অশিক্ষিতেরাও পর্য্যন্ত ডাক্তারী চিকিৎসার পক্ষপাতী সে দেশে সেই প্রদেশীয় চিকিৎসার অবনতি তো সুনিশ্চিত। ভারতবর্ষীয়দিগের বাড়ীর আশে পাশে যে সকল অযত্ন সম্ভূত বৃক্ষলতা বিদ্যমান, ভারতবর্ষীয়েরা অতি সহজে তাহা সেবনে নিরাময় হইতে পারে। কিন্তু তাহা তাহারা বুঝিল না। যদি কোন পাশ্চাত্যদেশীয় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ভারতজাত ঐ সকল ওষধি দ্রব্য ব্যবহারের পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তখন ভারতবাসীরা নিজেদের দ্রব্য নিজেরাই চিনিতে পারিবে।" মহামতি সার জন্ উড্রফের এ উক্তি বাস্তবিকই বর্ণে বর্ণে সত্য।

বিলাতী ফুড। বিলাতী ঔষধের মত বিলাতী ফুডেও আমাদের কম অনিষ্ট হইতেছে না। হরলিক মলটেড মিল্ক, এলবরিস ফুড, বেঞ্জার্স ফুড, মেলিন্স ফুড, মিলোফুড্, নেস্‌নেস্ ফুড, রবিন্‌সন্ পেটেণ্ট বার্লী প্রভৃতি যে সকল ফুড বাজারে চলিত আছে, সে সকল ফুড খাইয়া শিশুরা খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ইহা আমাদের দেশের বিখ্যাত ডাক্তারেরাও প্রকাশ করিতে এখন কুণ্ঠিত হয়েন না। পৌষ মাসে স্বাস্থ্যসমাচারে বাহির হইয়াছে,"ডাক্তারী পেটেণ্ট ফুডগুলি এদেশের শিশুর পক্ষে বিষতুল্য। দেশে এত প্রকার আহার্য্য দ্রব্য আছে, যদি সেই সকল হইতে চিকিৎসকগণ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া মাথা ঘামাইয়া স্থল বিশেষে উপযুক্ত আহার ও পথ্য এবং উহাদের

[illegible] প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যবস্থা করিয়া [illegible]েন, তাহা হইলে আজকালকার শৈশবীয় মৃত্যুসংখ্যা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে।" আমাদের দেশের লোকে এ বিষয়ে চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিকতা।—আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান সম্মত কিনা সম্প্রতি এ বিষয় লইয়া যে আলোচনা চলিতেছে, তাহার সপক্ষে আমরা কয়েকজন বিলাতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি।—

(১) আমেরিকা দেশের কালিফর্ণিয়া ফ্রানসিস্‌কো সহর হইতে ডাক্তার কারপেন্‌ ভারম এম, ডি, বলেন—

"অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুত ও অপরাপর ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের পবিত্র স্মৃতি আজিও তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থেও জাগরূক রাখিয়াছে। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থ আরবী, ল্যাটিন ও গ্রীক্‌ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল। এ্যালোপাথি ও হোমিওপ্যাথিমতে মূল সূত্র যাহা আমি এতকাল পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি, তদপেক্ষাও আয়ুর্ব্বেদীয় মত যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ তাহা আমি বিলক্ষণ প্রতীতি করিতেছি। আয়ুর্ব্বেদেই যথার্থ স্বভাব ও চিকিৎসার অনুসরণ করিয়াছে।"

(২) আমেরিকার ডাক্তার, জর্জ্জ পার্ক এম, এ, এম ডি লিখিয়াছেন।—

"ইংরাজী চরক পাঠ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যদি বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকেরা তাঁহাদের ঔষধের তালিকা হইতে আধুনিক যাবতীয় ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে চরকের মতে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শববাহকের কার্য্য অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীতে চিররোগীর সংখ্যাও কম হইবে।

(৩) ডাক্তার চার্লস একদিন বলিয়াছিলেন,—"প্রাচীন হিন্দুদিগের অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী বর্ত্তমান অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"

(৪) কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকলিওড্‌ ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষাদানের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন "হে হিন্দুছাত্রগণ! বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তোমাদের ঋষিগণ ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল উন্নত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, আজ আমি তাহাই তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছি।"

(৫) ডাক্তার সারজন লিকুইস্‌ঃ—"প্রাচীন কালের হিন্দুরা যে সকল অমূল্য তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজকাল আমরা জগতে প্রচার করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। জারমনদেশের দুইজন ডাক্তার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শোথ ও উদরী পীড়ায় লবণ ও জল বর্জ্জন করা বিজ্ঞান সম্মত, হিন্দুরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।" বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, গ্রীস্‌, সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংলণ্ডাদি প্রভৃতির প্রায় যাবতীয় সুসভ্যদেশের মহাপণ্ডিতগণ সেই সকল দেশের চিকিৎসা বিষয়ের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় কেহ বলিয়াছেন, "ভারতের চরক নামক চিকিৎসা গ্রন্থে ছয় শত প্রকার বিরেচক ঔষধেরই ব্যবস্থা আছে, না জানি ভারতীয় সে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান কতদূর অসীম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।" কেহ বলিয়াছেন "উন্নতশীল বর্ত্তমানের চিকিৎসা প্রণালী লইয়া আমরা যতই জাঁকজমক করি না কেন, তথাপি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর অনেক বিষয়ের নিকট এখনও লজ্জায় আমাদের মস্তক নত করিতে হয়।" কেহ লিখিয়াছেনঃ—"কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা ইদানীং যে সকল ঔষধের নূতন আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া মনে মনে বড়ই স্পর্দ্ধা করি, তাহার প্রায়ই অধিকাংশ দেখিতেছি, ভারতীয় ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"

এই সকল মন্তব্যের পরও আমাদের দেশের পাশ্চাত্যসভ্যতালোকপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে যে সন্দিহান হয়েন, ইহা শুধু লজ্জার কথা নহে, ইহা দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
[illegible] ২৯নং কবিরাজপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দোলযাত্রা।

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

তরুলতার শ্যাম-বেষ্টনের মধ্যে তন্দ্রামগ্ন প্রাসাদ। কুসুম-সুরভি-সিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল 'ঠাকুর দালানে'—দোদুল্যমান কাষ্ঠমঞ্চের উপর আবির-রাগ-রঞ্জিত রাধামাধব মূর্ত্তি। দালানের একান্তে—একখানি সতরঞ্চের ফরাসে—আমরা বসিয়াছিলাম। সেদিন দোল-পূর্ণিমা—হোলির ফুল্লা[illegible]মহা-মহোৎসবে,—গৃহকর্ত্তা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে সারেঙ্গীর সুর, আসিতেছিল। সেই সুরে—বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া কোন সুন্দরী গাহিতেছিল—

"আর তো খেলব না হোলি,
হরি! তব সঙ্গে।"

একে বসন্তকাল,—তাহাতে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, যুবতীর কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনায়—সিন্ধু খাম্বাজের সেই অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস—যামিনী বল্লভের শুভ্র কিরণের মতই, শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়-মন প্লাবিত করিয়া, যেন নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। "সর্ব্বং হস্তি বুভুক্ষয়া' মন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক অভাগা আমি—অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ফলা'রের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমার কাছে বসিয়া প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়—ঐতিহাসিক অক্ষয় দাদাকে বুঝাইতেছিলেন—'দোলযাত্রাটা আর কিছুই নহে, বৌদ্ধযুগের মদনোৎসবের অবশেষ! রত্নাবলী প্রভৃতি প্রাচীন নাটকে তোমরা যে মদন পূজার নমুনা দেখিতে পাও, এই দোললীলা সেই পূজারাই ক্ষীণ স্মৃতি।'

যুক্তিটা অবশ্য পাকা লোকের; কথাটা কিন্তু আমার ভাল লাগিল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম—সত্যই কি তাই? দোললীলা কি বিলাসিতার চরম নিদর্শন অতীতের সেই মদনোৎসব? ইহার সঙ্গে কি ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই? বিট বিদূষক কঞ্চুকী লইয়া—রাজা রাজ্ঞীর প্রেম ছলনা কি—আমাদের এই দোললীলায় আত্মগোপন করিয়াছে? হায়

অমাপতি! হায় বাঙ্গালার প্রথম কবি চণ্ডীদাস। তোমাদের সেই "লাল যমুনাজল, লাল তমাল দল" কি তবে নন্দলালের বৃথা বন্দনা গুঞ্জন? তোমাদের নামাবলী 'রসকলির রভসে' মৈথিলীর মাখন গালিয়া, ব্রজবুলির মধু ঢালিয়া, অমিয়া ছানিয়া, নিছনি নিঙ্গাড়িয়া, পিরীতি-পীযুষের প্রবলপ্রবাহে একদিন যে কৃষ্ণপ্রেমের ময়ূরপঙ্খী ছুটিয়াছিল, সেকি কেবল কামকলারই বিচিত্র বিকাশ?

হিন্দু আমি—কোন্ প্রাণে ইহা বিশ্বাস করিব? গায়িকা তখনও গাহিতেছিল। সে গানে বুঝি—বৃষ্টিক্ষোভরহিত মেঘের মত গম্ভীর, পাষাণময় নারায়ণের ধমনীতেও, শোণিতের স্পন্দনে তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন অনুমিত হইতেছিল। গৃহকর্ত্তার আহ্বানে—নামাঙ্ক "মিষ্টমুখ" করিয়া আমি বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। তথাপি আমার ঘুম আসিল না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল। কথাটা পুরাতন, আমার কিশোর স্মৃতির সঙ্কলন। এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা।

মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন তখন মর্ত্ত্যধামে বর্ত্তমান—সেই সময় দোলের ছুটি লইয়া রাজপুরুষদের মধ্যে একটা তর্ক চলিতেছিল; ন্যায়রত্ন মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া সে তর্কের মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন; তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"দোলযাত্রা হিন্দুর পর্ব্ব নহে; উহা খোট্টার পর্ব্ব।" এই অপরাধে—সাময়িক পত্রে তাঁহার মসীলাঞ্ছিত ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরলোকস্থিত ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সার্ব্বভৌম সম্রাট হইয়া যে দোলযাত্রাকে হিন্দুর পর্ব্ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই; ইহলোকস্থিত শাস্ত্রী মহাশয় সূরি-শিরোমণি হইয়া যে দোললীলাকে মদনোৎসবের ব্যভিচার বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; আজ আমি সেই দোলযাত্রাকে হিন্দুর এক মহাপর্ব্ব বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি। এই দুঃসাহসের জন্য নব্যতন্ত্রের কাছে হয়ত আমি কিছু অপরাধী হইব। কেননা, যে দোলের নাম শুনিলে ফরসা কাপড় পড়িবার ভরসা হয় না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই যে বিড়ম্বনা। কিন্তু সেজন্য অবতরণিকার মুখেই, আমি সকলের কাছে মার্জ্জনা চাহিতেছি।

যিনি যাহাই বলুন না কেন,—আমি হিন্দু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—দোলযাত্রা অতীতের উৎকট কামলীলার শেষ চিহ্ন নহে। দোলযাত্রার সমস্তটাই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। 'দোল'—আর্য্য ঋষির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কল্পনা। কিন্তু এখন আমরা রূপক রহস্য ভুলিয়া দোল যাত্রাকে যে ভাবে দাঁড় করাইয়াছি, তাহাতে দোলের কোনও উচ্চভাব সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না। 'দোল' বলিলে আগে 'ফাগের' কথাই মনে পড়িয়া যায়। আবার 'দোলের' আদর বাঙ্গালীর চেয়ে খোট্টার কাছেই বেশী। আমাদের দোল—পশ্চিমা প্রথার ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র।

মহাকবি কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ক্ষুদ্র কবিরা পর্য্যন্ত যে বসন্ত লইয়া বিব্রত, দোলযাত্রার সময় সেই বসন্ত কাল। "বসন্ত পঞ্চমী" অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন হইতে দোলযাত্রার সূচনা, রামনবমীর দিনে ইহার পরিসমাপ্তি। যিনি কখনও পশ্চিমাঞ্চলের

দোললীলা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন,—তাঁহারি কাছে একথা নূতন ঠেকিবেনা। আমাদের বাঙ্গালা দেশে—পূর্ণিমার দিন হইতে দোলের আরম্ভ। কাহারও বাটী প্রতিপদের দিন, কাহারও বাটী দ্বিতীয়ার দিন, কাহারও বাটী বা তৃতীয়ার দিন,—এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে রামনবমী পর্য্যন্ত—বাঙ্গালা দেশে দোলের উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়।

দোলের পূর্ব্বদিন "বহ্নি উৎসব" বা 'মেড়া পোড়া' এবং "চর্চ্চরী" নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই চর্চ্চরীর প্রচলিত নাম "চাঁচোড়"। শুষ্ক তৃণপুঞ্জ বিজড়িত বংশখণ্ড—মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়, ইহারই নাম 'মেড়াপোড়া'। সমর্থ পক্ষে এই সময় তুবড়ী-হাউই প্রভৃতি বাজী পোড়ান হইয়া থাকে। পরদিন অভিষিক্ত-গৃহদেবতার অর্চ্চনা, বিগ্রহ মূর্ত্তি দোলমঞ্চে সংস্থাপন, আবির লইয়া ক্রীড়া, অবশেষে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে ভোজ্য প্রদানে পরিতুষ্ট করা সংক্ষেপে—ইহাই দোল যাত্রার পরিচয়।

কিন্তু ঋষি যে বলিয়াছেন—

"দোলায়াং দোল গোবিন্দং মঞ্চস্থ মধুসূদনং।
রথস্থ বামনং দৃষ্টা—পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" *

এ কথার সার্থকতা কি? কাঠের দোলায় গোবিন্দের বিগ্রহ দেখিলে যে পুনর্জ্জন্ম হয় না—বিংশ শতাব্দীর বুকে বসিয়া এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? বাস্তবিক কথাটী অত সহজ নহে। "দোলায়াং দোল গোবিন্দং"—এই 'দোলা' অর্থে দোল চৌকী নহে, দোলা—আমাদের দোদুল্যমান চঞ্চলচিত্ত। চিত্ত-দোলায় গোবিন্দ অর্থাৎ ভগবানকে দেখিতে পারিলে আর কি জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়? তবে, মায়া-মোহক্ষুব্ধ বাসনাবিদ্ধ মনকে স্থির করা—তোমার আমার পক্ষে বড় কঠিন। এই জন্য দোলের পূর্ব্বে আমাদিগকে আরও কতকগুলি আনুসঙ্গিক ব্রত পালন করিতে হয়। ক্রমে তাহা বুঝাইতেছি।

ছয়টী ঋতুর মধ্যে-বসন্ত ঋতুতেই দোলের অনুষ্ঠান। বসন্ত কালে দুর্দ্দমনীয় কামরিপু স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং মন ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় পাছে সর্ব্বানিষ্ঠকরী 'অবিদ্যা' আসিয়া মনকে অধিকার করিয়া বসে, তাই বসন্ত পঞ্চমীতে বিদ্যা রূপা সরস্বতীর আরাধনা করিতে হয়। সরস্বতী পূজার দিন ষট পঞ্চমী ব্রতেরও ব্যবস্থা আছে। ষট্ (৬) পঞ্চমী (৫) ব্রত (সংযম)—এই তিনটি শব্দ লইয়া ষট্ পঞ্চমী ব্রত";

"ষট"—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই—ছয়টী রিপু, "পঞ্চমী"—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়; "ব্রত"—ইহাদের সংযম। সোজা-কথায় বলিতে গেলে—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয় হইতে মনকে পৃথক রাখার নাম—'ষট্ পঞ্চমী ব্রত।

সরস্বতী পূজার দিন দেবীর পাদপদ্মে আবির ও অভ্র উপহার দিতে হয়। আবির—লোহিতবর্ণ, ইহার দ্বারা রজোভাব বুঝায়; অভ্র—চাকচিক্যশালা উজ্জ্বল পদার্থ,—অর্থাৎ অভ্রের দ্বারা আমাদের পার্থিব আমোদ

---

* মঞ্চস্থ মধুসূদন ও রথস্থ বামনের কথা পৃথক্ প্রবন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ক্রমে নারায়ণের "দ্বাদশ যাত্রা"—আয়ুর্ব্বেদে প্রকাশিত হইবে। লেখক—

প্রমোদ বা ভোগ বিলাস বুঝায়। ধরণীর অকিঞ্চিৎকর বৃথা ভোগ-সুখ ছাড়িতে পারিলে রজোভাব অপসারিত হইয়া মনে সাত্ত্বিক ভাব জাগিয়া উঠে। কাম ক্রোধাদির দমন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম সাধন, সুখাভিলাষ পরিত্যাগ—এইগুলি করিতে পারিলে, চঞ্চলচিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

"ষট্‌পঞ্চমীর" পর "শীতল ষষ্ঠী"। ষড়্‌রিপুকে শীতল রাখা অর্থাৎ শান্ত করার নামই—"শীতলষষ্ঠী"। ইহার পর "ভীমএকাদশী"। ভীম-একাদশীতে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা। তাহাতে শরীরের রস শুষ্ক হয়, মনের শক্তি বাড়ে, ইন্দ্রিয়ের তেজ কমিয়া যায়। তৎপরে—"শিবচতুর্দ্দশী"। কালরূপী রুদ্রের আরাধনাই—"শিবরাত্রি"। "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিনাং"—জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী একথা যেন আমারা ভুলিয়া না যাই। মৃত্যুভয় সর্ব্বদা স্মৃতি পথে থাকিলে, মানুষের উপভোগে আর অনুরাগ থাকে না।.

শিবচতুর্দ্দশী শেষ হইলে—"বহ্নি উৎসব" অর্থাৎ "মেড়াপেড়া"। মেঢ়াসুর নামে এক দুর্দ্দান্ত অসুর ছিল। ঐ দুরাচার এক সময় বৃন্দাবন ধামকে পিশাচের লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছিল। কামাতুর দানব যে কত শত কুলকামিনীকেই কলঙ্কসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এইরূপ নিত্য নিরত নারী-নির্য্যাতন নিরীক্ষণ করিয়া, নর নারায়ণ শ্রীহরি নানা কৌশলে নারকীর নিধন সাধন করেন। পাছে পাপাত্মা পুনর্জ্জীবিত হয়, সেই ভয়ে তাহার শবদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। বসন্তকালে কামপ্রবৃত্তি রূপ মেঢ়াসুরকে নষ্ট করিতে না পারিলে—জীব ধর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেনা। এই জন্যই দোলের পূর্ব্বে "মেড়াপোড়া।" সরস্বতী পূজা হইতে মেড়াপোড়া পর্য্যন্ত—আমরা একে একে অনেকগুলি মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলাম।" এইবার "দোলযাত্রায়" অগ্রসর হইলাম।

রিপু সংযম, ইন্দ্রিয় দমন করিয়া ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চঞ্চল চিত্ত তো স্থির হইল,—আত্মদর্শনের যোগ্যও হইলাম, কিন্তু কৈ, দোল তো আসিলনা, মন তো সম্পূর্ণ স্থির হইলনা। কাজেই দোলও চলিতে লাগিল। পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতিপদ,—দ্বিতীয়া—তৃতীয়া—ক্রমে নবমী পর্য্যন্ত দোল চলিতে লাগিল। চাঞ্চল্য কি সহজে যায়? মন কি অনায়াসে বশীভূত হয়? চিত্তজয়ের জন্য আরও মহাশক্তি চাই। সেই মহাশক্তি লাভের জন্যই শক্তিরূপিণী "বাসন্তীর" পূজা। "বাসন্তী" ও "দুর্গা"—একই প্রতিমা। দেবশক্তির পদতলে পশুশক্তি। দোলের সঙ্গে দুর্গার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই লোকে বলে—অমুকের বাড়ী দোল-দুর্গোৎসব হইয়া থাকে।

বাসন্তী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আমরা সর্ব্ববিজয়ী শক্তি সঞ্চয় করিলাম। শক্তির কাছে মন পরাস্ত হইল,—চিত্ত এখন শান্ত—সুস্থির, এতক্ষণে আত্মজ্ঞানও জন্মিল। এই আত্মজ্ঞান লাভের নাম—"রামনবমী।" রাম—মহাজ্ঞানের প্রতিনিধি।

এতদিনে অর্থাৎ "রামনবমীর" পর দোল লীলা সমাপ্ত হইল। এখনও কি তোমরা বলিতে চাও—দোল হিন্দুর পর্ব্ব নহে? এখনও কি বুঝাইতে চাও—দোল—মদনপূজার পরিশিষ্ট? প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব—দোল হিন্দুর

মুক্তিপথের মর্ম্মরসোপান। দোল-অনন্ত রত্ন প্রসূ—ঋষি প্রতিভার রহস্তময়ী মহাসৃষ্টি।

এইবার 'হোলিখেলা'র কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে শটীরপালো, লোধ্র ও বকম কাষ্টের ক্বাথে রঞ্জিত করিয়া, আমাদের দেশে আবির প্রস্তুত হইত। এই আবির কফনাশক। বসন্তকালে—শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে, হাম-বসন্ত প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক বিকার মানব দেহকে পীড়িত করে। শটী চূর্ণের অনুলেপনে—সহসা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকেনা। সম্ভবতঃ এই জন্যই দোলের সময় 'ফাগ' মাখার প্রচলন হইয়াছিল। আমরা সভ্য হইয়াছি, আর ভুলিয়া গিয়াছি—

"লাল বৃন্দাবন, লাল গোপিনীগণ,
লালে লাল নন্দলালা।"

ম্রিয়মান বঙ্গপল্লী।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—•:o:•—

এই পল্লীতেই ছিল সব। আজ সে সজীবতা—সে আনন্দ কই? সেই তপোবন সদৃশ গ্রামগুলির কি মনোহর দৃশ্যই ছিল! কালের নির্ম্মম আঘাতে সব ভেঙ্গে চূরে কোথায় গিয়াছে। এখন পল্লী এক মহাশ্মশান—গহন কাননাবৃত ব্যাঘ্র-শিবা-সর্পাদি বন্য জন্তুসঙ্কুল এক অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এমন দশা ইহার কেন হইল? অনেকেই উত্তর দিবেন—যেদিন হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতে সোণার বাংলা ছারখার হইতে বসিয়াছে। তখন লোকের বাঁচিবার chanceই বেশী ছিল। তাই প্রতিগৃহে পক্ককেশ শতায়ু নরনারী বিরাজ করিত। যাহার একবার জ্বর বিকার হইত, সে হয়ত পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মত জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত। এখন বার মাস ত্রিশ দিন অতি ভয়ানক যমদূত সম রোগসকল মানবকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যেই Malaria season উত্তীর্ণ হইল, অমনি শীতে প্লেগ ও কলেরা দেখা দিল; কলেরা শেষ হইতে না হইতে বসন্ত রোগের আবির্ভাব। এত ভয়ে ভয়ে মানুষ আর কয়দিন বাঁচিতে পারে? কলেরা-প্লেগ ও বসন্ত এই তিনটী ফৌজদারী ব্যারাম হইতে না হইতে বিচার শেষ। আসামী বেকসুর খালাস, কিম্বা একেবারে দ্বীপান্তর চালান। বাকীগুলি প্রায় দেওয়ানী ব্যারাম ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়া মক্কেলের আয়ুশোষণ করিতেছে। যথা ম্যালেরিয়া-ডিস্‌পেপসিয়া বহুমূত্র ইত্যাদি। মানুষের আর সুখশান্তি কই? যেন সদাই রণক্ষেত্রে বাস, কখন কাহার মাথা উড়িয়া যাইবে! কিছুই স্থিরতা নাই।

যে সব নূতন ও সখের রোগের আমদানী হইয়াছে, ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উহাদের নামগন্ধও এদেশে কেহ জানিত না। অট্টালিকা, দাস, দাসী, সাজ পোষাক, গাড়ী, ঘোড়া, গহনা প্রভৃতি বিষয়ে যেমন বড়লোকের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হইয়াছে, তেমনি fit, hysteria, diabetes প্রভৃতি সখের ও সুখের পায়রার ব্যারামেও যেন কেমন একটা পাল্লা চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। "কে কয়টা, কত টাকা ভিজিটের ডাক্তার-কবিরাজ, দিনে কতবার আনিতে পারে, দেখা যাক।" চিকিৎসারও যত উন্নতি হইতেছে—ডাক্তার-বৈদ্যের সংখ্যাও দিন দিন যত বাড়িতেছে, দেশে রোগও তত শিকড় গাড়িতেছে। রোগের জ্বালায়—ডাক্তার ও উকীলের পয়সা দিতে লোকে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতেছে। রোগের জন্য ডাক্তার বাড়িতেছে, না ডাক্তারের জন্য রোগ বাড়িতেছে,—ইহা একটী বিষম সমস্যা।

পল্লীর শ্রীহীনতার প্রধান কারণ, ম্যালেরিয়া হইলেও আমি উহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। যেহেতু একই স্থানে বাস করিয়া যখন একজন বেশ সুখে থাকে, তাহার কদাচ জর হয়, তখন আর একজন ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে, স্থানটীর দোষ না দিয়া আমি প্রথমে সেই ব্যক্তিকে দায়ী ও দোষী করিব। ইছাপুর, নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে যে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিগণ আছেন, তাঁহাদের জন্য কি বোতলে করিয়া ওয়ালটেয়ারের হাওয়া আসে, না air light পাত্র মধ্যে condensed milk এর ন্যায় বদরিকাশ্রমের জল আসে? সেই একই হাওয়া, একই জল (একটু পরিষ্কৃত) ব্যবহার করিয়া তাঁহারা কেমন অমরাবতীর আনন্দ—কেমন স্বর্গীয় স্বাস্থ্যসুখভোগ করিতেছেন। দার্জ্জিলিং মেল যখন শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাটে আসে, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে লাল, টুকটুকে গোলাপ ফুলের মত সজীব স্ফূর্ত্তিময় কর্ম্মবীরের চেহারাগুলি দেখিলে নয়ন সত্যই সার্থক হয়। অনেকে বলিবেন—"কিসের সঙ্গে কি! সাহেব লোক দেশের রাজা—তাঁহাদিগের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। বিজেতা ও বিজিতে কি তুলনা হয়? আমাদের দেশে পনের আনা লোক গরীব—নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরিয়া দু'বেলা ভাত পায় না। সুতরাং কেমন করিয়া তাহারা রোগের সহিত লড়িবে?" স্বীকার করি, "দারিদ্র্যদোষো গুণ রাশি নাশী।" তথাপি আমার মনে হয়, আমাদের দেশে তিনটী বিশেষ গুণের অভাব—কর্ম্মপটুতা শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য। এজন্য আমরা জীবন যে কেমন করিয়া উপভোগ করিতে হয়—পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য কেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা জানি না। কোন জঙ্গলময় পাহাড় স্থানে একজন পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরকে ফেলিয়া আসুন। বিশ বৎসর পরে গিয়া দেখিবেন, তথায় জঙ্গল নাই, পাহাড় নাই, বাঘ ভালুক কোথায় পলাইয়াছে। সে সেখানকার একচ্ছত্রী সম্রাট। কি এক যাদুবিদ্যায় যেন এই বিভীষিকাময় নির্জ্জন প্রদেশ এক অতি অপূর্ব্ব রমণীয় কুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। সে এমন এক ভেল্কী জানে—যাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। এটা কি সেই আলাউদ্দীনের ম্যাজিক লণ্ঠনের বশীভূত দৈত্য? দৈত্যও নহে, দানবও

নহে। ইহার নাম—ধৈর্য্য, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কঠোর প্রতিজ্ঞা—iron will. মানবের এই ইচ্ছাশক্তির কাছে 'জীবসৃষ্টি' ও 'মৃতজীবকে পুন জীবনদান' এই দু'টী কাজ ব্যতীত আর সমস্তই অনায়াস সাধ্য। এই ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্ম্মীর আজ আমাদের অভাব। আমাদের দেশে নাই সহানুভূতি, সহযোগিতা ও একতা। পরের জন্য যখন ভাবিতে শিখিব—পরের যাতনায় যখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, তখনই আমাদের জাতীয় জীবন যথার্থ আরম্ভ হইবে। আমাদের দেশে আছে—কাকের ন্যায় চতুরতা, সঞ্চয় বুদ্ধি ও পরশ্রীকাতরতা। কিন্তু নাই কেবল ডাক্তার বৌটনের ন্যায় স্বদেশ প্রেমিকতা, স্বজাতি প্রিয়তা ও স্বার্থত্যাগ। আমরা নিজের লইয়াই ব্যস্ত—স্বীয় গণ্ডীর বাহিরে বড় বেশী ভাবি না। এই সঙ্কীর্ণতা আমাদের প্রধান দোষ। গ্রাম মরিতেছে--পল্লী দিন দিন ক্ষীয়মান, তথাপি নগরবাসী মনে ভাবেন—"আমার কি? আমার কামিনী-কাঞ্চনের কোন অনিষ্ট হয় নাই। আমার ঘরবাড়ী ঠিক যেমন ছবিটী তেমনিই আছে। কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই।"

জগতে ত্যাগই মহত্ত্ব। ত্যাগী না হইলে কি দুনিয়ার শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হওয়া যায়? যাহার যতটুকু ত্যাগ, তিনি সেই পরিমাণে মহান ও আদর্শস্থল। দেশের জন্য সমাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম অক্ষয় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়া আছে। তাঁহাদিগের হইয়াছে দৈহিক বা পাঞ্চভৌতিক মৃত্যু, কিন্তু মনোজগতে তাঁহারা চিরদিন অমর হইয়া আছেন। এই ত্যাগী মহাত্মাদিগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেকেই তাঁহাদিগের স্বোপার্জ্জিত প্রভূত অর্থ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষা অগ্রে, না জীবন অগ্রে? ইহাই প্রথম বিবেচ্য। দেশের লোক বাঁচিয়া থাকিলে ত শিক্ষা লাভ করিবে। আর যদি জাতীয় জীবন গড়িবার পূর্ব্বেই এই প্রকাণ্ড দেশটা এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়ে, তখন এই মধুর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইলে কে ইহার ফলভোগ করিবে? কেই বা বক্তা, কেইবা শ্রোতা হইবে? দেশে শিল্প বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞানের প্রচুর উৎকর্ষ হউক—ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। তবে ইহাও কি ঈপ্সিত নহে?—দেশের লোক সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু হউক, লোকে পেট ভরিয়া বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খাউক। দেশের লোকে যখন শিরঃ উন্নত করিয়া, বুক ফুলাইয়া, সজোরে পদক্ষেপ করতঃ, ধরাকে সরার মত ভাবিয়া চলিবে, তখন অবশ্য এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বোধ হয় দূর ভবিষ্যতের কথা। আজিকার কাজ—আকাশ কুসুম রচনা করা নহে, কথার বাণিজ্যে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা নহে। দেশটাকে বাঁচাও। জীবন থাকিলে ত হাড়ে মাষ লাগিবে। এই 'মোরো' জাতিটাকে যিনি আসন্ন মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত দেশবন্ধু—তিনিই যথার্থ ত্যাগী, তিনিই দেশের মুকুট মণি—তিনিই জাতির আরাধ্য দেবতা। ইহাই বর্ত্তমান সমস্যা। অতীতের কথা ডুবিয়া থাক্—ভবিষ্যতের মোহন ছবির প্রলো-

নাই। বর্ত্তমান কাজ দেশটাকে বাঁচাও, জাতটাকে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী কর। তাহার মজ্জায় জোর দাও, শরীরে সামর্থ্য দাও, পেটে বিশুদ্ধ খাদ্য দাও এবং তাহার বিশুষ্ক প্রাণে ধর্ম্ম ও নীতির পবিত্র-বারি সেচন কর। তবেই এই মোরা জাতির নব-জীবন সঞ্চার হইবে—তাহার ত্রিতাপদগ্ধ জীবন আবার সুশীতল হইবে। কূপে পতিত পণ্ডিত যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন—"আমাকে অগ্রে কূপ হইতে উদ্ধার কর। আমার প্রাণ বাঁচাও। তারপর আমাকে তিরস্কার করিও—আমাকে সতর্কতা শিক্ষা দিও" এখন আমাদের দেশেও ঠিক ওই উপদেশ প্রয়োজ্য। ছাত্রগুলিকে পর্য্যাপ্ত ও পুষ্টিকর আহার্য্য দাও—শিশুকে প্রচুর বিশুদ্ধ দুগ্ধ দাও। তার পর তাহাকে শিখাও—কোনও ক্ষতি নাই। ম্যালেরিয়া হইতে পল্লীবাসীকে রক্ষা কর। নচেৎ গ্রাম-গুলি মরিয়া যাইলে কে তোমার বড় সাধের 'প্রাথমিক শিক্ষা' লইবে? কে তোমার শিল্প-বাণিজ্য-সাহিত্য-বিজ্ঞানোন্নতি করিবে?

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কত সদাশয় লোক মুক্ত হস্তে অর্থদান করিয়াছেন। কিন্তু পল্লী সংস্কারের জন্য ম্রিয়মান গ্রামগুলিকে পুনঃ সজীব করিতে ত কেহই যত্নশীল নহেন! এই স্থলেই আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। আমরা মাথা লইয়া বড় ব্যস্ত—সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আমরা খুব আন্দোলন করিতে পারি। কিন্তু আমাদের দেহগুলি যে দিন দিন খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে—আমরা যে কতশত লোকের heart—failure শুনিতে পাইতেছি, ইহার প্রতিবিধানকল্পে ত কেহই সম্যক্ চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে কি আমরা অশরীরি জাতি কেবল আত্মারাম হইয়া জগতের স্বাধীন শক্তি সমূহের মধ্যে স্থান পাইব! পৃথিবীর কোন চিন্তাশীল মস্তিষ্ক হইতে এখনও এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হই-য়াছে কি না জানি না। তবে ইহা বেশ দেখিতেছি, আমাদের head গুলি গরম আগুন, আর heart গুলি ঠাণ্ডা বরফ। তাই আজ যখন তখন heart-failure শুনিতে পাই। আমরা কি শেষে বেঙ্গাচীর ন্যায় মাথা-সার হইব। আমাদের দেহে শক্তি নাই—হৃদয়ে বল নাই—চরিত্রে নির্ম্ম-লতা নাই—মনে বিশ্বাস নাই—প্রাণে আশা নাই—এই 'নাই, নাই' মহাদৈন্যের কারণ কি? আমাদের হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি তিরোহিত হইতে বসিয়াছে। স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি প্রভৃতি অন্তরের সদ্গুণ নিচয় আজ লুপ্ত প্রায়। বিধবা ভগিনীর করুণ ক্রন্দনে তাই আমাদের মরুময় শুষ্ক হৃদয় কিছু মাত্র বিগলিত হয় না। তাই আমরা খাতককে এক পয়সা না ছাড়িয়া সুদে আসলে চতুর্গুণ করিয়া কিসে তাহার ভদ্রাসনটী আত্মসাৎ করিব সেই দিকে আজ লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। কত মোকদ্দমা করিয়া অনাথা বিধবাকে পথে বসাইতেছি—কত শত লোকের চোখের জলে বুক ভাসাইয়া তাহার শেষ টাকাটীও ঔষধের মূল্য বা উকীলের পারিশ্রমিক স্বরূপ লইতে আমাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় না। অহো! কেন আমরা এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয় হইলাম! কে আমাদের সরল প্রাণে গরল ঢালিয়া বিমল

আনন্দের উৎস বন্ধ করিয়া দিয়াছে? কেন আজ অসীম ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও দুনিয়ায় প্রেম নাই—আনন্দ নাই—শান্তি নাই। লীলাময় প্রভো! মানবের মলিন আত্মাকে আজ

ধর্ম্মনীতি দ্বারা সুপ্রসন্ন করুন।

দেশে আজ সাহিত্যপরিষৎ, পুরাণ পরিষৎ, হরি সভা, নাট্য সমাজ, প্রভৃতি বিস্তর সভা সমিতি আছে; কিন্তু উহাদের কয়টীতে আমাদের স্বাস্থ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বিষয়ক আলোচনা হয়? কেহই ত একবার খাদ্য পরিষৎ ও স্বাস্থ্য সভার কথাটীও উত্থাপন করেন না। কি ঘোর রুচিবিকারই আমাদের হইয়াছে! যে যাহা পাইতেছে, তাহাই বেচিতেছে, যে যাহা পাইতেছে, তাহাই খাইতেছে। এটী খাদ্য, এটী অখাদ্য বা কু-খাদ্য এইরূপ বিচার করিবার আর শক্তি ও অবসর নাই। ভাল মন্দ যাহা হয় একটা নূতন কিছু পাইলেই হইল। এই সব ভেজাল দ্রব্য খাইয়া যে শরীর মধ্যে প্রত্যহ slow poison প্রেরণ করিতেছি—তাহা কয়জন লক্ষ্য করিয়া থাকেন? এই বিষ তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহা ধীরে ধীরে ভিতরে কার্য্য করিতে থাকে, পরে ক্ষেত্রটী ঠিক প্রস্তুত হইলেই সামান্য একটী নিমিত্ত কারণ উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশ করে। বাজারে এই অখাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় রহিত করিতে হইবে। মানুষের যখন আত্মসংযম লুপ্ত হয়, যখন তাহার হিতাহিতবোধ তিরোহিত হয়—যখন সে জিহ্বা ও উপস্থের ক্ষণিক সুখে আত্মহারা হইয়া যায়, তখনই বাহ্য শাসন ও বিধি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। জল তীর বেগে নামিয়া যাইতেছে—শিক্ষা, উপদেশ প্রকৃতি কোন মৃদু বাধাই মানে না। এখন চাই কড়া হুকুম—কঠোর শাসন ও শাস্তি।

এই সব ভেজাল দ্রব্য হইতে পল্লী সমাজও নিষ্কৃতি পায় নাই। গ্রামে যে দোকানখানি আছে, সেখানি সহরের বড় দোকানের miniature—একটী ছোট শাখামাত্র। সহরেও যাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এখানেও তাই—মাত্রা কেবল কম। গ্রাম্য দোকানে দেশীয় ঘানির বিশুদ্ধ সর্ষপতৈল নাই—আছে দুর্গন্ধ কলের তৈল। কলের থৈল, বালুমিশ্রিত নানা দ্রব্য একত্র পেষিত কলের ময়দা, সাদা চিনি, সাদা লবণ, সাদা ফ্যাকফেকে ঘৃত।—মধু কিনিতে যান, সেই সহরে জল দেওয়া মিছরি বা চিনির পানা। গ্রাম্য-ময়রা দোকানে যান, ছানা হীন সন্দেশ ও রসগোল্লা, দুগ্ধহীন রাবড়ী, অদ্ভুত পানতুয়া, আশ্চর্য্য লুচী-পরেটা, মনোহর সিঙ্গেরা-কচুরী প্রভৃতি নানাবিধ কলির মিষ্টান্ন থরে থরে সজ্জিত আছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, এক একটী যমদূত মিঠাই আকারে কলির জীবের অকালমৃত্যু ঘটাইতে প্রস্তুত। কল্কী অবতার কি রক্তমাংশের দেহ ধারণ করিয়া আসিবেন? আমার মনে হয়—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, অজীর্ণ, বহুমূত্র, অর্শ, রক্তামাশয়, বাত শ্বাসকাশ প্রভৃতি রোগ ভয়ঙ্কর প্রবল হইবে; সংযমহীন মানব ক্রমে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইয়া হিতাহিতজ্ঞান হারাইবে; নির্ম্মম ও স্বার্থান্ধ ব্যবসাদার ক্রমশঃ আরো অর্থগৃধ্ন হইয়া কালে এক ভীষণ নর-

ঘাতক, যমদূত হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষে মানুষ মারে—ইহা চিন্তা করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে। এই মানুষই মানুষ বাঁচাইতে কত যত্ন করিতেছে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে গভীর ধ্যান নিমগ্ন; আবার এই মানুষই মানুষ মারিতে কত ব্যাকুল! কি চিন্তা, কি উদ্বেগ, কি অর্থব্যয়, কি লোকক্ষয়, কি মহাসমর! Machine Gun এর সৃষ্টি হইয়াছে বাঘ-ভালুক শিকার করিতে নহে—মানুষ মারিতে। উঃ! কি চমৎকার সভ্যতা! মানুষকে খাওয়াইবার জন্য মানুষ কত কৌশল করিয়া ঘৃতে বসা ও চর্ব্বি মিশাইয়া রং করিয়া দিতেছে। অর্থলোভী মানুষ যখন দুধে জল দেয়, রসগোল্লায় সুজি দেয়, চাল,ডালে বালু কাঁকড় মিশায়,লবণে ধুলি সংযোগ করে, ময়দায় ছাইভস্ম মিশায়, তখন কি সে একবার মনে ভাবে—"স্বার্থের জন্য কেন মহাপাপ করিতেছি! কেন স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য এই ভীষণদুষ্কৃতানুষ্ঠানে অনন্ত নরক অর্জ্জন করিতেছি। যে জিনিষ নিজে খাইতে বা নিজের ছেলেকে খাওয়াইতে পারিনা, উহা কেমন করিয়া পরকে বা পরের ছেলেকে খাওয়াইব! আমি মানুষ, মানুষ আমার ভাই, মানুষ আমার বন্ধু—এই ভাইবন্ধুকে কেমন করিয়া স্বহস্তে বিষ তুলিয়া দিব!" অহো! মানবপ্রাণ কি কঠিন—কি পাষাণ—কি নির্ব্বেদ। তোমার ক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া যাইবে, কিন্তু ঐই অদ্ভুত ব্যবসাদার কলির শাইলকের নিষ্ঠুর প্রাণে দয়ার লেশমাত্র সঞ্চার হইবেনা। তুমি তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিলেও, তাহার চোখে এক ফোঁটা জল আসিবেনা।

এখন একটী বিষয় আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে—ম্রিয়মান পল্লীগুলিকে কেমন করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে? অনেকেই অনেক কথা বলিতেছেন—অনেক গবেষণা করিতেছেন। অন্যান্য বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও, একটা কথা তাঁহারা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন—পল্লীর প্রথম সংস্কার—বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা, দ্বিতীয় কার্য্য—বনজঙ্গল পরিষ্কার করা। বৃষ্টির জল পুকুর ডোবা প্রভৃতি স্থানে সঞ্চিত হয়। উহাতে পাতা পচিয়া মশক জন্মায়। সন্ধ্যাকালে মশকের অব্যক্ত মধুর ধ্বনি যিনি শ্রবণ করিয়াছেন এবং দংশন জ্বালা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন, পল্লীগ্রামে মশকের উপদ্রব কিরূপ। সহরে যেমন ব্যাণ্ড বাজে, পল্লীগ্রামে এই কার্য্য মশক দ্বারা সংসাধিত হয়। সন্ধ্যা হইলেই মশক-সঙ্গীত শ্রবণ করুন, বিশেষতঃ পদদ্বয়ে মশকের দংশন-জ্বালা ভোগ করুন। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র মশক আছে, ইহাদের শব্দও শ্রুত হয় না, বা আকৃতিও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহাদের কামড় বড়ই তীব্র। রাত্রিতে কিছুক্ষণ মশারির বাহিরে থাকিলে ইহাদের কামড়ে অস্থির হইতে হয়। বর্ষান্তে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর এই মশকচমূ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। মনে হয় যেন এইবার ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর অক্ষৌহিণী মহোল্লাসে তুরীভেরী বাজাইয়া দলে দলে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছে। কাহার সাধ্য, সে সৈন্যের গতি রোধ করে? এ সময় প্রতি গৃহেই রোগের সাতিশয় প্রকোপ হইয়া থাকে। ভরসা একমাত্র কুইনাইন ও পেটেণ্ট ঔষধ। (বাঁশ বনে ডোম কাণা)—সেইরূপ আজ বাজারে পেটেণ্ট

ঔষধের ছড়াছড়ি। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ বুঝিবার উপায় নাই, কারণ বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে সকলেই আপন ঔষধটীকে স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও সুফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। সরল ও অশিক্ষিত পল্লীবাসী রোগের জ্বালায় দিশেহারা হইয়া তাহাদিগের বহু ক্লেশার্জ্জিত অর্থ দ্বারা এই সব পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া দেহযন্ত্রটাকে আরও দুর্ব্বল ও রোগের আকর করিয়া ফেলিতেছে। কারণ যাঁহারা পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বেচিতেছেন, তাঁহাদিগের মূল উদ্দেশ্য জীবন রক্ষা করা নহে—অর্থোপার্জ্জন। নতুবা এত জ্বরের যম, সর্ব্বজ্বরগজসিংহ, এত ব্যাধিশার্দ্দূল থাকিতেও আজ দেশ এত ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠিতেছে কেন? পল্লীবাসী বুঝি আর বাঁচে না। সে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কত কষ্টে ধরিত্রীর নিকট হইতে লাঙ্গলের মুখে ফসল উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু বেচারার পরিশ্রমই সার। তাহার কোনদিকেই নিস্তার নাই। একে মহাজনের জুলুম, তদুপরি রোগের জ্বালা ও মোকদ্দমা খরচ। মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া যাহা কিছু থাকে, তাহা ডাক্তার-বৈদ্যের ভিজিট ও ঔষধ-পথ্য খরচেই ব্যয়িত হয়। তা'র পর অগত্যা মোকদ্দমা চালাইবার জন্য মাসে মাসে ধার ধরিয়া, সহরে ও নগরে যে সব উকীল মোক্তার মাকড়সার ন্যায় জাল পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগের পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকে। কি সুন্দর ব্যবসায়! কি চিত্তাকর্ষক কথার বাণিজ্য। দয়া নাই, মায়া নাই, প্রেম নাই। এক অদ্ভুত নরশোণিত শোষক শিক্ষিত ও সুসভ্য জলৌকা। ধিক্ বর্ত্তমান সভ্যতায়! যে শিক্ষায় অতি সুমিষ্ট মানবাত্মাকে আঁটিতে টক করিয়াছে, যে সভ্যতায় প্রেম নাই, আনন্দ নাই, শান্তি নাই—যে আলোকে মনের আঁধার শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে, ধিক সেই পশুত্ব বিকাশিনী, ভণ্ডতা বর্দ্ধিনী দেবত্বনাশিনী সভ্যতায়। সরল বুনো, কোল, সাঁওতাল, পাহাড়ী প্রভৃতি অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির মধ্যে বোধ হয় এখনও এতটা হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা - অর্থের জন্য এতটা দোপরদা, কুটিলতা, নীচতা ও মনুষ্যত্ব-হীনতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

প্রসঙ্গক্রমে পল্লীবাসীদিগের কুসংস্কার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। জ্বর আসিয়াছে, রোগী শীতে ভয়ানক কাঁপিতেছে, তথাপি লেপ গায়ে দিবে না। অনেক অনুরোধ করায় রোগী কাতর স্বরে বলিতেছে—"ওগো কার্ত্তিক মাসে লেপ গায়ে দিতে নাই—আমার পূর্ব্বপুরুষ কখনও কার্ত্তিক মাসে লেপ ব্যবহার করে নাই। আমি কেমন করিয়া সে প্রথা ভঙ্গ করিব?" 'কার্ত্তিক মাসে লেপ গায়ে দিতে নাই'—কি আশ্চর্য্য কুসংস্কার। ম্যালেরিয়া জ্বরে যখন শীত ও কম্প ধরে, তখন ৪।৫টা লেপ চাপাইয়া ধরিয়া থাকিলেও বিন্দুমাত্র গরম বোধ হয় না। ২।১ ঘণ্টা শীতের পর তবে গাত্রদাহ ও জ্বালা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক পল্লীবাসী ভীষণ শীত ও কম্পাবস্থায় লেপ গায়ে দিতে চাহে না। এ স্থলে শিক্ষা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সে যখন শিখিবে, বাড়ীর সম্মুখে নাকের কাছে পচা গোবরের গাদা রাখিতে নাই, পুকুরের পাড়ে বনঝোপ কাটিয়া

এমন পরিষ্কার করিতে হয়—যাহাতে জলে হাওয়া ও রৌদ্র লাগিতে পারে এবং পাতা পচিয়া জল দূষিত না হয়, গ্রামে অন্ততঃ একটী পুকুর থাকিবে—যেখানে স্নান, কাপড়-কাচা, বাসনমাজা, জলশৌচ, গো-মহিষাদির স্নান করান প্রভৃতি কদভ্যাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ-উহার জল কেবল পান করার জন্ত অতি সযতনে সংরক্ষিত হইবে—এক কথায় সে যখন শিখিবে—কেমন করিয়া নিত্য স্বাস্থ্যসুখভোগ করিতে হয়,কি নিয়ম পালন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়,তখন তাহার পল্লী আবার মানব-সমাগমে সজীব ও শ্রীমান্ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু ঘুড়ির আকাশে উঠিবার পূর্ব্বে যেমন তাহাকে 'ধরাই' দিতে হয়, গ্রামগুলিকেও তেমনি এখন একটু সাহায্য করা দরকার। যখন কাদায় পা পুতিয়া যায়; তখনই তাহাকে ধরিয়া টানিয়া তুলিতে হয়। তারপর আবার সে নিজের পায়ে চলিতে থাকে। ম্রিয়মান গ্রামগুলিকে সেইরূপ বনজঙ্গল, ম্যালেরিয়া কুসংস্কার প্রভৃতি বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লীবাসীকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া হউক—বনজঙ্গল সাফ করিলে, পুকুরের পাড়ে ঝোপ কাটিলে, পানা ছাঁকিয়া ফেলিলে কেমন সুস্থ থাকা যায়। তখন সে বুঝিবে—ইচ্ছা ও একতা থাকিলেই বন কাটা যায়, জল পরিষ্কৃত থাকে,সুস্থ ও নীরোগ শরীরে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'—এই মহামন্ত্রে সে তখন দীক্ষিত হইবে। সে তখন শিখিবে, কঠোর প্রতিজ্ঞা (iron will) জাগতিক সুখৈশ্বর্য্যের মূল। তাহার ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইবে। সে তখন মানুষের মত মানুষ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গ্রামগুলিকে পুনরায় তপোবন তুল্য শান্তি নিকেতন করিয়া তুলিবে।

সহৃদয় নগরবাসীমাত্রেই পল্লী সংস্কারে মনো-নিবেশ করুন। পল্লীর অনেক রত্ন সহরে যাইয়া বড়লোক হইয়া এখন তাঁহাদি-গের কাঙ্গালিনী পল্লীকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। পল্লী চিরদিনই রত্নপ্রসবা। লর্ড সিংহ, স্যার রায় প্রভৃতি দেশের কৃতী সন্তানগণ বাল্যে পল্লীবক্ষেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই অনেক কবিরত্ন—অনেক সাহিত্যসম্রাট অনেক বিজ্ঞানবীর পল্লীজাত। আমার বিশ্বাস, নগর যত বহুমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে পল্লী-জননী অধিকতর সম্মান,যশ ও গৌরব পাইবার যোগ্যা। এমন বিশ্ববিশ্রুত সন্তান থাকিতে পল্লীমাতার আজ এই দশা দেখিলে সুশিক্ষিত নগরবাসীর কৃতঘ্নতা ও স্নেহশূন্যতায় বুক ফাটিয়া যায়। হায় রে! আমাদের কি ঘোর বিকার হইয়াছে। আমরা যতদিন পল্লীমাতার চোখের জল মুছাইতে না পারিব, ততদিন আমাদের কোনও মঙ্গলাশা নাই। জননী আশীর্ব্বাদ না করিলে কি সন্তানের কল্যাণ হয়? আজ পল্লীজননী বিষণ্ণা—রোগে, শোকে, দুঃখে, দুর্ভিক্ষে কাতরা হইয়া রোরুদ্যমানা। উপযুক্ত পুত্র থাকিতে যে মাতা অনাথার ন্যায় ম্রিয়মাণা, ধিক্ শত ধিক্, সে পুত্রে। মাতার অসময়ের সম্বল—দুঃখের আশ্রয়, শোকে সান্ত্বনা, রোগে ঔষধ হইতেছে তাঁহার পুত্র। এই পুত্র যদি কালধর্ম্মে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হয়, তাহা হইলে মাতার দুঃখ আর কে মোচন করিবে? তখন বুঝিব ঘোর কলি সমাগত—ধর্ম্ম জগতে নাই। কেবল অধর্ম্মই রাজত্ব করিতেছে।

নগরবাসী এইরূপ লক্ষ লক্ষ ধনী-যশস্বী ও কৃতী পুত্র আজ পল্লীমাতার ঋণ কিঞ্চিৎ পরি-

শোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন। দেখুন দশের চেষ্টায় কি অসাধ্য সাধন হয়? একতার বলে কি না হইতে পারে? সহরে বড় লোক বৎসরে অনেকবার নগর ও সহর ছাড়িয়া প্রকৃতির খোলা মিঠা হাওয়া খাইতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। মধুপুর, শিমুলতলা, গিরিডি জামতাড়া, দেউঘর প্রভৃতি স্থানে প্রমোদগৃহ নির্ম্মাণ করিতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, সেই টাকার চতুর্থাংশে কি স্বীয় পল্লীভবন বাসোপযোগী হয় না? সেই টাকার কিয়দংশ দশজনে দিলে কি এক একটী পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হয় না? অতি সামান্য অর্থ সাহায্য দানে কি সকলে মিলিয়া নিজ গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া স্থানটীকে ফাকা ময়দানে পরিণত করিতে পারেন না? দশের লাঠি, একের বোঝা, পল্লীভবন যখন চাই-ই, তখন দূরে রেলপথে বহু অর্থ ব্যয়ে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া যাওয়ার ফল কি? যদি জল ও হাওয়া সেবনই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যে বিজ্ঞান শব্দ ও রূপ ধরিয়াছে। তাহার দ্বারা কি কৈলাশের জল ও ওয়ালটেয়ারের হাওয়া বোতলে আবদ্ধ হইতে পারে না? সহরে যেমন চেলেপটী, হুঁকো পটী, খেংরাপটী, পগেয়াপটী প্রভৃতি আছে, সেইরূপ জলপটি ও হাওয়াপটী হইলে আর আমাদিগকে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া বহু অর্থব্যয়ে শিমুলতলা, এলাহাবাদ, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে শুধু একটু অতি সূক্ষ্ম হাওয়া খাইবার জন্য বাঙ্গালা দেশ হইতে যাইতে হয় না। আশা করি, কোনও বিজ্ঞানবীর সহরের এই অভাব পূরণ করিতে শীঘ্রই মনোযোগ দিবেন।

আর এক কথা বলিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানই পশ্চিম বলিয়া গণ্য হইত। ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ পীড়িত বাবু বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা ও রাঢ়ের শুষ্ক হাওয়া খাইয়াই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতেন। কিন্তু বিস্তর হাওয়া-খোরের আমদানী হওয়ায় বর্দ্ধমান স্থানটীও ক্রমশঃ প্লীহা, যকৃত, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের আকর হইয়া উঠিল। তখন আর একটু পশ্চিমে রাণীগঞ্জ আক্রান্ত হইল। দলে দলে জল বায়ু প্রার্থী আসিয়া রাণীগঞ্জের জল হাওয়ার উত্তমাংশটুকু শোষণ করিয়া স্থানটীকে দূষিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে নাগরিক বঙ্গবাসী ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া কালে মধুপুর, গিরিডি, শিমুলতলা, কাশী, এলাহাবাদ, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে প্রমোদকুঞ্জ তৈয়ারী করিলেন। তাঁহাদের শুভাগমনে স্থানগুলি বৃহৎ অট্টালিকা ও উদ্যানে শোভিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী এমন নাছোড়বান্দা যে, এখনও তাঁহাদের সঙ্গে ছাড়ে নাই। সুদূর দিল্লী পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর গন্ধে গন্ধে ম্যালেরিয়া গিয়া উপস্থিত তাই ভয় হয়, যদি এই ভাবে পশ্চিমে যাইতে যাইতে কালক্রমে তাঁহাদিগের গতি পেশোয়ারে গিয়া ঠেকে, তাহা হইলে সহুরে বাঙ্গালী বাবুর কি পরিশেষে সুলেমান পাহাড় টপকাইতে হইবে? ধন্য হাওয়া সেবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা! এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণাভোগ করিয়া লটবহর লইয়া ছুটী হইলেই দূরদেশে বায়ুসেবন করিতে যাওয়া চাই-ই। তথাপি স্বীয় পল্লীর নিজ বাসভবনটীর সংস্কার করা হইবেনা। পাছে সহরের বড়লোকসমাজে মান হানি হয়—পাছে কেহ 'পাড়া গেঁয়ে

বলে। ধন্য আমাদের মনের বল—ধন্য আমাদের সৎসাহস। যাহা হউক, পল্লীমাতার যাহারা যথার্থ সুসন্তান, তাঁহাদিগের উচ্চহৃদয় বঙ্গপল্লীর কাতরোক্তিতে—গ্রামবাসীর মর্ম্ম-বাণীতে নিশ্চয়ই কাঁদিয়া উঠিবে। তাঁহারা অবশ্যই জননীর এই নিদারুণ দুঃখ দূর করিবেন। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পল্লীসংস্কারে মনোনিবেশ করুন। ইহাই ম্রিয়মান বঙ্গপল্লীর প্রাণের কামনা—বিনীত নিবেদন।

আয়ুর্ব্বেদ প্রতিভা।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

[পট পরিবর্ত্তন]

পূর্ব্বদৃশ্য।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। ও কি দৃশ্য দেখালে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়? কালে একদল অর্ব্বাচীন চিকিৎসকের ঐরূপ প্রাদুর্ভাব হ'বে বটে, কিন্তু মহর্ষি আত্রেয় প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা শাস্ত্রেরও মর্ত্ত্যধামে যে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ ক'রবে, সে চিত্রটা দেখালে না কেন? এই দেশহিতব্রতেব্রতী স্বার্থ বিরহিতা রমণী তোমাদের ঐ চিত্র দর্শনে যে আতঙ্কিতা হ'য়ে উঠেছেন! (সুকন্যার প্রতি) মা! তোমার গুণগাথা আমি সমস্তই অবগত আছি। তুমি ভারতের চিকিৎসক-সমাজের যে ভীষণ চিত্র দেখেছ, তাই যথেষ্ট নয়,—একদিন এই ভারতবর্ষ মহর্ষি আত্রেয় প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আলোকেও আলোকিত হ'য়ে উঠবে। রোগ-রাক্ষসগণ আমারই শরীর থেকে উদ্ভূত মা! দক্ষযজ্ঞে অপমানিত হ'য়ে আমার যে নিঃশ্বাস রাশি নির্গত হ'য়েছিল, সেই নিশ্বাসে রোগ-রাক্ষস দিগের রাজা জরাসুরের প্রথম জন্ম। আমিই এদের উৎপত্তি ক'রেছি। আবার আমিই এদের বিনাশের ব্যবস্থাও করেছি। আমার রসৌষধি সকলে সে বিনাশের ব্যবস্থা সকল প্রকটিত। ভারতের এমন একদিন আ'সবে—সনাতন আর্য্যচিকিৎসার সেই রসৌষধির মহিমা অন্য দেশের চিকিৎসক মণ্ডলী অবগত হ'য়ে রসৌষধির সর্ব্বপ্রধান মহৌষধ 'মকরধ্বজের' ব্যবহারে বিশেষ অনুরক্ত হ'য়ে উঠবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা শল্যচিকিৎসায় মহর্ষি আত্রেয় এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে অসিদ্ধ কাম মনে ক'রে ভারতের ভবিষ্যৎ চিত্র দর্শন করিয়েছ, কিন্তু মহর্ষি আত্রেয় শল্যকার্য্যে শস্ত্র প্রয়োগে অভ্যস্ত না থাকলেও দ্রব্যবিজ্ঞানে তিনি যেরূপ সিদ্ধকাম, তা'তে অনেক শস্ত্র সাধ্য ব্যাপারও ঐ দ্রব্য মাহাত্ম্যেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হ'য়ে তাঁর দ্রব্য বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ ক'রতে সমর্থ হ'বে। দে'খবে এই দ্রব্য-বিজ্ঞান ও রসৌষধির এক সময়ে ভারতে কিরূপ উন্নতি হবে।

[পট পরিবর্ত্তন]

স্থান কান্যকুব্জ —ভাবমিশ্র ।

মহা । ঐ দেখ—কান্যকুব্জ দেশে ভাবমিশ্র জন্ম গ্রহণ ক'রে আয়ুর্ব্বেদের সকলগুলির সার সংকলন পূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব পুস্তক প্রণয়ণ ক'রছেন। ঐ পুস্তকের নামকরণ হ'বে 'ভাবপ্রকাশ'। ঐ ভাবপ্রকাশের সাহায্যে কালে ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-জগতে এক বিশাল কীর্ত্তি স্থাপনে সক্ষম হ'বেন।

আরও দেখ্‌বে, ঐ দেখ—

পট পরিবর্ত্তন

(বাঙ্গালা দেশ চক্রপাণি দত্ত)

মহাদেব। উঁহার নাম চক্রপাণি দত্ত। উনি বাঙ্গালাদেশে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ ক'রে বৈদ্যবংশ অলঙ্কৃত ক'রেছেন। মহর্ষি পুনর্ব্বসু চিকিৎসা-জগতে চরক সংহিতা নামে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন, ঐ মহাত্মা তা'রই বিশেষ বিশ্লেষণের জন্য এক খানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা ক'র্‌ছেন। ঐ গ্রন্থের নামকরণ হ'বে -চক্রদত্ত। বনৌষধির অপূর্ব্ব শক্তি ঐ গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ থাকিবে। ভারতীয় এই গ্রন্থের তুলনা সমগ্র অবনীর আর কোনো গ্রন্থে পাওয়া যাবে না।

আরও দেখবে—

(পট পরিবর্ত্তন)

[বাঙ্গালা দেশ —মাধবকর]

মহাদেব। ঐ দেখ বৈদ্যবংশে মাধবকর নামে আর এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, রোগ রাক্ষসদিগের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ সংপ্রাপ্তি ও উপশয় প্রভৃতির বিশেষ তথ্য সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক ইনি একখানি অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ণ ক'রছেন। এই গ্রন্থে জ্ঞান লাভ ক'রে ভবিষ্যৎ বৈদ্যগণ চিকিৎসার সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে জয়লাভ ক'রতে সমর্থ হ'বেন।

আরও দেখ —

(পট পরিবর্ত্তন)

[বাঙ্গালা দেশে —বিজয় রক্ষিত]

মহা। মাধবকরের নিদান সম্পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। বাঙ্গালাদেশের বৈদ্যগর্ব্ব-বিজয় রক্ষিত তাঁহার সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বৈদ্য-সমাজের আদরণীয় ক'রবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকারে উহার টীকা প্রণয়ন ক'রছেন। মাধব নিদানের দুর্ব্বোধ্য শ্লোকগুলি এই টীকার সাহায্যে বৈদ্যগণের বোধগম্য হ'বে।

তারপর শেষ চিত্র দেখ—

(পট পরিবর্ত্তন)

[স্থান —বহরম পুর—গঙ্গাধর]

মহাদেব। ইঁহার নাম মহাত্মা গঙ্গাধর। শাস্ত্রচর্চ্চায় ইনি প্রাণান্ত ক'রছেন। ইনি শাস্ত্র চিন্তার তুলনায় অর্থকে অতি তুচ্ছই অনুভব করেন। ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর গৃহ চিকিৎসক। একদা স্বর্ণময়ীর অসুস্থতার জন্য ইঁহাকে আহ্বান করার বহুক্ষণ পরে ইনি সে স্থানে উপস্থিত হন, মহারাণীর প্রধান কর্ম্মচারী রাজীবলোচন তাহাতে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করায় ইনি রাজকীয় মাসিক এক শত টাকার বৃত্তির মায়া পরিত্যাগ ক'রতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। ইনিও ঐ চরকের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা ক'রছেন। ইঁহার বহসংখ্যক শিষ্য এক সময়ে এই আর্য্যাবর্ত্তে চিকিৎসার অপূর্ব্ব আলোক বিকীর্ণ ক'রে ফে'ল্‌বে।

(পট পরিবর্ত্তন)

[একজন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ দরিদ্র চিকিৎসক]

আরো দেখ ঐ একজন বঙ্গভূমির এক নিভৃত পল্লীর দরিদ্র চিকিৎসক। আর্য্য-চিকিৎসার উন্নতি কল্পে ইনি এতই বিব্রত যে, সংসারের দারিদ্র্য এঁর অনুভবের অবসরই নাই। কি বনৌষধি, কি রসৌষধি—সকল বিষয়ই ইনি যেরূপ আয়ত্ত ক'রেছেন, নাড়ী-বিজ্ঞানেও ইনি সেইরূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধ মহাপুরুষ। মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে বায়ু পিত্ত কফের গতি উপলব্ধি ক'রে নাড়ী দর্শনের ফলে ইনি ভাবী মৃত্যুর কথা ব'লে দিতে পারেন। কালে এঁর মত বহুসংখ্যক আর্য্য চিকিৎসক ভারতভূমির গর্ব্ব বৃদ্ধি ক'রবেন।

(পট পরিবর্ত্তন)

পূর্ব্বদৃশ্য।

মহাদেব। শুধু মন্দ দিকটাই দেখিও না অশ্বিনীকুমার দ্বয়! মন্দ দিকটার সঙ্গে সঙ্গে ভাল দিকটাও দর্শন করাও।

১ম অঃ কুঃ।—অন্যায় হ'য়েছে পশুপতি! ক্ষমা করুন।

মহাদেব।—না অন্যায় কিছুই হয়নি, তবে আমার বক্তব্য—যখন মন্দ দিকটা দেখা'লে, তখন ভাল মন্দ—দুই দিকটাই দেখিয়ে দাও। ভাল মন্দ দুই নিয়েইতো জগত। আলোক উপভোগ ক'রতে হ'লে অন্ধকারও ভোগ ক'রতে হবে। সুখ ও দুঃখ ও এইরূপ ভাবেই পরিবর্ত্তমান। কালে সনাতন আর্য্যচিকিৎসক সমাজেও সেই রূপ ভাল মন্দ দুই রকম দৃশ্যই প্রকাশ মান হবে।

আত্রেয়।—মহেশ্বর! আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমি এরূপ ক্ষুব্ধ হ'য়ে প'ড়েছিলাম যে, আমাদের আয়ত্ত চিকিৎসা সম্পূর্ণ নয় মনে ক'রে এ বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রবোই কল্পনা ক'রেছিলাম। আপনার কথায় মনের সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘ'টল।

মহা।—তোমাদের আয়ত্ত চিকিৎসা সম্পূর্ণ নয়—কে ব'ললো ঋষিবর! তোমাদের আর্য্যচিকিৎসায় নাই কি? তোমাদের বাসক, তোমাদের অশোক, তোমাদের গুলঞ্চ, তোমাদের কণ্টকারী, তোমাদের নিম্ব, তোমাদের পুনর্ণবা—এক সময় দে'খবে সমগ্র জগতে অন্যান্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা এক অপূর্ব্ব চিকিৎসার দান মনে ক'রে উৎফুল্ল সহ প্রয়োগ ক'রতে শি'খবে,—তোমাদের দ্রব্যবিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে সমগ্র দেশের চিকিৎসক মণ্ডলী উহার শিক্ষা লাভের জন্য তোমাদের শরণাপন্ন হবেন। তোমাদের শল্যচিকিৎসা কালক্রমে অন্য সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পিত হ'লেও তোমাদের বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার গৌরব সকল দেশের চিকিৎসকগণকে নত শিরে—অবনত বদনে স্বীকার ক'রতে হ'বে।

আত্রেয়।—পশুপতি! ধন্য হ'লাম। আসুন ঋষিবৃন্দ! আসুন;—এই অবসরে আমরা মহাযোগীর গুণ-গাথা গেয়ে মনোপ্রাণ ধন্য করি।

গীত।

জয় শিব শঙ্কর পিনাকী, দিগম্বর—
তোমারি মহিমা জ্যোতিঃ—ধরা।
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, বায়ু, ব্যোম, তুমি ক্ষিতি,
—দৃশ্য মোহন আলো করা।
ধরণীর ভার করিতে হরণ—
সংহারের মূর্ত্তি তোমারি গঠন,
আদি তুমি, অন্ত তুমি, তোমারি নিখিল ভুমি
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু—নানা নামে ভরা।

[যবনিকা পতন]

লেখকগণের প্রতি উপদেশ।

[কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

[অপ্রকাশিত কবিতা]

যে প্রবন্ধ পাঠে হয় বিদ্যা বুদ্ধি পুষ্টি,
যে প্রবন্ধ পাঠে হয় পাঠকের তুষ্টি ;
লিখ হেন প্রবন্ধ, লেখক ভ্রাতৃগণ।
পরের নিন্দায় যেন দিওনাক মন॥

যে প্রস্তাবে মানবের কল্যাণ না হয়,
সে প্রস্তাব—প্রকাশের উপযুক্ত নয়।
লেখকের প্রাণে যদি থাকে ধর্ম্ম বল।
কর্ম্মক্ষেত্রে অবশ্যই ফলে শর্ম্ম-ফল॥

গদ্যে, পদ্যে, যিনি যাহা করুন রচনা,
স্বদেশের হিত যেন থাকে আলোচনা।
অভিমানে মত্ত হৈয়া পরে দিয়া গালি,
লেখনীর মুখে দাদা! মাখিওনা কালী॥

পক্ষের লেখনী যদি পক্ষপাত করে,
তা'র চেয়ে পাপ আর নাই চরাচরে।
অতএব পক্ষপাত করি পরিহার—
মাতৃ সম মাতৃভাষা—সেবা কর তাঁর।

দেখান' উচিত বটে সমাজের দোষ,
কিন্তু তা'র মূলে যেন থাকেনাক' রোষ!
লেখার উদ্দেশ্য যা'র নরের মঙ্গল,
কখন তাহার চেষ্টা না হয় বিফল।

রচনা কঠিন হয় বিশুদ্ধ ভাষায়,
মনোগত ভাব, ভাল প্রকাশ না পায়।
চলিত কথায় লেখা অতি সুললিত।
পাঠ করি মন প্রাণ হয় পুলকিত॥

সহজ ভাষায় লেখ' সাধ্য অনুসারে,
মাতা, ভগ্নী, পত্নী, যেন বুঝিতে তা' পারে।
রচনা মধুর করে, সত্য সরলতা।
কোথা লাগে তা'র কাছে রঙ্গ-রসিকতা?

কথা হ'লে কট মট—বিকট বিরস,
রচনা নীরস তা'র—কে পায় কি রস?
কাঠেতে কামড় দিলে হয় কিহে সুখ?
কবি হ'তে হ'লে, হ'তে হ'বে পাকা 'কুক্'।

রচনায় থাকে যেন প্রচুর প্রভাব।
অক্ষরে প্রকাশ হ'বে তোমার স্বভাব॥
করিও না কথা ধার অভিধান খুজি'—
বার কর আপনার যাহা আছে পুঁজি॥

আপনি লিখিবে, আর অপরে লেখা'বে।
আপনি শিখিবে যাহা, অন্যেরে শেখা'বে।
যা লিখিবে—থাকে যেন ধর্ম্মের দোহাই
যা লিখিবে—প্রাণ দিয়া লিখ' তুমি ভাই।

---

* ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালীর শেষ কবি। মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি—তাঁহার সহজ ধর্ম্ম ছিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাটককার দীনবন্ধু প্রভৃতি গুপ্ত কবির শিষ্য ছিলেন। গুপ্ত কবির বাটী ছিল—কাঁচরাপাড়ায়। বাটীটি এখনও বর্ত্তমান আছে কিন্তু এখন সেই নবরসের আধার কবির প্রমোদকক্ষে—এক ঘর কুম্ভকার আসিয়া চাক ঘুরাইতেছে—দেশবাসী কোন ধনকুবের জাতীয় কবির স্মৃতি রক্ষার জন্য বাটীটি কিনিতে পারেন নাই। ব্র, ব, ম।

যশ যদি চাও—ছাড়' ঘৃণা হিংসা দ্বেষ,
ভুলেও কাহার প্রতি বাড়িওনা ক্লেশ।
পবিত্র বাণীর ব্রত, নহে ব্যবসায়।
লোক যত দূর যদি, লোকে দিবে সায়।

অপরের ভাব ভাষা করিওনা চুরি,
অনুকরণেতে বল কোথা' বাহাদুরী?
ভাব চুরি, ভাব চুরি,—উভয় সমান।
চিন্তার স্বাধীন ভাব—রচনার প্রাণ॥

রসনা বাসিনী দেবী বীণাপাণি যিনি,
সুধাময় শব্দ সৃষ্টি করিবেন তিনি।
অলঙ্কার উপমার হৈলে প্রয়োজন,
জোর ক'রে ক'রোনাক তা'র আয়োজন॥

বিধাতার এই সৃষ্টি অতি পুরাতন,
তোমারে করিতে হ'বে সে সৃষ্টি নূতন।
সৃষ্টি ছাড়া অনাসৃষ্টি করিওনা কিছু,
অসম্ভবে অবিশ্বাসে, অপযশ পিছু॥

পর গ্লানি, পরপীড়া, কর ভাই বন্ধ,
সবাই রচনা কর সুন্দর প্রবন্ধ।

দেশের মঙ্গল সাধ'—চলি ন্যায় পথে,
লেখনী প্রসাদে হ'বে বিখ্যাত জগতে॥

ক্ষাপানীরা—যে সময় ক্ষাপানেতে ওঠে,
'বাপে' 'খাজা' বলা তা'র লেগে থাকে ঠোঁটে।
সেই মত জানিবে, যে নিন্দুক লেখক।
সে অভাগা – অগ্নি তুল্য বিশ্বাসঘাতক।

এলোমেলো লিখনাক' যা' আসিবে মনে,
সে লেখা প্রমাণ তুমি করিবে কেমনে?
মধুকর হ'য়ে ক'র'—মধুপানে আশা।
মক্ষিকা হইলে, হ'বে আঁস্তাকুড়ে বাসা।

অঙ্গনা—লইয়া যদি নিজ অলঙ্কারে -
সাজায় মনের সাধে অগ্রনা কুমারে;
সে অলঙ্কারের দর্প চূর্ণ যথা হয়,
কুপ্রসঙ্গে সুরচনা, তদ্রূপ নিশ্চয়।

কুৎসিত প্রসঙ্গ লৈয়া থাকে সদা যেই।
কেবল দুর্ণামমাত্র কেনে ভবে সেই॥
চিরসুধা প্রসবিনী—কলমের কাঠী
তা'র হাতে হ'য়ে পড়ে—লেঠেলের লাঠী॥

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ বা
Practice of Medecine.

[অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য]

—o—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

দাহাধিকার।

পিত্ত প্রকুপিত হইয়া হস্ততল, পদতল বা সর্ব্বাঙ্গে যে জ্বালা উৎপন্ন করে তাহারই নাম দাহরোগ। এই রোগে চক্ষুর জ্বালাও হইতে পারে।

দাস্ত পরিষ্কার রাখা এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও চন্দন—ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দাহার্ত্ত ব্যক্তিকে স্নান করাইবার ব্যবস্থা করিবে।

তণ্ডুলকের রস ও ক্ষেৎপাপড়ার রস সেবন দাহার্ত্ত রোগীর পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। দুই তোলা ধনে অর্দ্ধ পোয়া জলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল চিনির সহিত সেবনে দাহরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, বেণার মূল, নাগেশ্বর, তেজপত্র ও মুথা সমভাগে বাটিয়া কালিয়া কড়ার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দাহ প্রশমিত হয়।

দাহ রোগীকে পদ্মপত্র বা কদলী পত্রে শয়ন করাইয়া চন্দনসিক্ত জল সংযুক্ত তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিবে।

চন্দনাদি কাথ সেবনে প্রবল দাহরোগের শান্তি হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

পটীর পর্পটোশীরবনীর নীরদ নীরজৈঃ।
মৃণালমিসিধাত্রী চ পদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ॥
অর্দ্ধ শিষ্টঃ সিতাশীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্র সমন্বিতঃ।
কাথো ব্যপোহয়েদ্দাহং তৃষ্ণাঞ্চ পরমোল্বণম॥

রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, বেণার মূল, বালা, মুথা, পদ্মমূল, পদ্মমৃণাল, মৌরি, ধনিয়া, পদ্ম কাষ্ঠ এবং আমলকী—এই সমস্ত দ্বারা অর্দ্ধাবশিষ্ট কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

তিল তৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎ ষোড়শগুণে শনৈঃ।
কাঞ্জিকে বিপচেত্তৎ স্যাদ্দাহজ্বরহরং পরম্॥

তিল তৈল /৪ সের। ৬৪ সের কাঞ্জিকের সহিত মৃদু অগ্নি উত্তাপে পাক করিয়া শরীরে মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

'দাহান্তক রস' ও 'সুধাকর রস', নামক ঔষধ দুইটিও দাহরোগে প্রযুজ্য। নিম্নে ইহাদের উপাদান বলা যাইতেছে।

দাহান্তক রস।

পাঁচ তোলা পারদ ও পাঁচ তোলা গন্ধক —টাবা লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে পানের রসের ভাবনা দিবে। পরে সেই কজ্জলীর দ্বারা ১ তোলা পরিমিত তাম্র পত্র লিপ্ত করিবে এবং শুষ্ক হইলে ভূধরযন্ত্রে তাহা পুটপাক করিবে। এইরূপ প্রকরণে ইহা ভস্মীভূত হইলে আদার রস ও ত্রিকটু চূর্ণের সহিত ২ রতি মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

সুধাকর রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। ত্রিফলার জলে ও শতমূলীর রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ দাহনাশক অনুপানে ব্যবস্থেয়।

পথ্যাপথ্য।—পিত্ত প্রশমক দ্রব্য সকল এই রোগে সুপথ্য। তিক্ত দ্রব্যমাত্রেই দাহ রোগে উপকারী। অন্যান্য নিয়ম মূর্চ্ছা রোগীর অনুরূপ।

উন্মাদ রোগ।

উন্মাদ—মানসিক রোগ। কোনও কারণে চিত্তের বিকৃতি ঘটিলেই তাহাকে উন্মাদ রোগ বলা যায়। ইহা সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ, বিষজ এবং গ্রহজ —এই কয় ভাগে বিভক্ত।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন ঘৃত পান— সকল প্রকার উন্মাদ রোগেই হিতকর। গরম দুগ্ধের সহিত ইহা ব্যবহার করাইলে অতি চমৎকার ফল হইয়া থাকে।

বাতিক, উন্মাদে প্রথমতঃ তৈল ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য পান, পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন এবং

শ্লৈষ্মিক উন্মাদে প্রথমতঃ বমন ও তদনন্তর বস্তিক্রিয়াদি করিবে।

ব্রাহ্মীশাকের রস, পুরাতন কুমড়ার রস, বচের রস অথবা শঙ্খপুষ্পীর রস—কুড় চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার উন্মাদেই উপকার পাওয়া যায়।

কুমড়ার বীজের শাঁস মধুর সহিত বাটিয়া কয়েক দিবস সেবন করিলে অত্যুগ্র উন্মাদ রোগের বিনাশ হয়।

তালশাঁস অর্থাৎ তাল বাশুড়ার রস ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়।

সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ এবং সর্ষপ তৈল মর্দ্দন সকল প্রকার উন্মাদ রোগেই হিতকর। উন্মাদ রোগীকে সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া হস্ত পদাদি বন্ধনপূর্ব্বক কিছুক্ষণ রৌদ্রে উত্তান ভাবে রাখিয়া অজ্ঞান হওয়া মাত্রেই হস্ত-পদাদির বন্ধন খুলিয়া ছায়ায় রাখিয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে স্রোতো বিশুদ্ধ হইয়া উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়।

অতিশয় প্রবল উন্মাদ রোগীকে প্রথমতঃ বমন করাইয়া তৎপরে তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। তাড়ন, তর্জ্জন, ভয় প্রদর্শন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষোৎপাদন, ও বিস্ময় জনক ক্রিয়া দ্বারা উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু দেবগ্রহ, গন্ধর্ব্বগ্রহ বা পিতৃগ্রহ দ্বারা আবিষ্ট হইলে কঠোর তাড়না করা কোনো ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

ব্রাহ্মী শাকের রস ৪ তোলা, কুড় চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা একত্র মিশাইয়া রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া উন্মাদ রোগীকে লেহন করাইবার ব্যবস্থা করিবে। কুষ্মাণ্ড বীজ চূর্ণ ৭ মাষা ও কুড় চূর্ণ ২ মাষা এবং মধু ৮ মাষা একত্র মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থাতেও উন্মাদ রোগে উপকার হইয়া থাকে। শ্বেত বচ ৮ মাষা কুড় চূর্ণ ২ মাষা, মধু ৮ মাষা—ইহা সেবনেও উন্মাদ রোগে উপকার পাওয়া যায়।

শ্বেত সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, কড়াই বৃক্ষের ছাল, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ বৃক্ষের ছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন, নস্য গ্রহণ এবং শরীরে লেপন করিলে সকল প্রকার উন্মাদ রোগে সুফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দ্রব্যগুলি এবং গোমূত্র দ্বারা যথাবিধানে ঘৃতপাক করিয়াও উপযুক্ত মাত্রায় উন্মাদ রোগীকে সেবন করান যায়।

উন্মাদ রোগীর শরীরে আলকুশীর বীজ ঘর্ষণ, তপ্ত লৌহ, তপ্ত তৈল ও উষ্ণ জল স্পর্শ, ঘোটকাদির তাড়নী রজ্জু দ্বারা প্রহার, নিভৃত গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রভৃতি প্রক্রিয়াতেও তাহার রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব, বচ, কটকী, শিরীষ বীজ, শ্বেত সরিষা, ডহরকরঞ্জার বীজ—এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া এবং বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদানপূর্ব্বক উন্মাদ রোগীর আরোগ্য লাভের চেষ্টা করিবে।

যে চটক শাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই—সেইরূপ চড়াই শাবকের মাংস—দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করাইলে উন্মাদরোগে সুফল পাওয়া যায়। পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ ও গোরোচনা—এই সকল দ্রব্য সমভাগে মাড়িয়া

অঞ্জন দিলেও উন্মাদে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

কোনো অভিলষিত দ্রব্য বিনষ্ট প্রযুক্ত যদি উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎসদৃশ কোনো পদার্থ তাহাকে প্রদান এবং আশ্বাস বাক্য দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিবে।

কাম শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা ও লোভ—এই সকল কারণে উন্মাদ রোগ জন্মিলে কারণের বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কামজ উন্মাদ রোগে রোগীকে অভিলষিত স্ত্রীপ্রদান, শোকজ উন্মাদ রোগীকে শোকনাশক ক্রিয়া, এবং ভয়জ উন্মাদে ভয়নাশক ক্রিয়া ইত্যাদি করিবে।

বাতজ উন্মাদ ও বাতপিত্তপ্রধান উন্মাদে ক্ষীর কল্যাণ ঘৃত ও পানীয় ঘৃত কল্যাণ ঘৃত উপকারী। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

পানীয় কল্যাণ ঘৃতম্।

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকম্।
স্থিরানন্তং হরিদ্রে দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকম্॥
নীলোৎপলৈলা মঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িম কেশরম্।
তালীশ পত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণীচ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ।
অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈরক্ষ সমন্বিতৈঃ॥
চতুর্গুণং জলং দত্বা ঘৃতে প্রস্থং বিপাচয়েৎ।

গব্য ঘৃত /৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—রাখালশসার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুক, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোট এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম বীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ—এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটী ২ তোলা। যথাবিধানে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

ক্ষীর কল্যাণ ঘৃতম্।

দ্বিজলং স চতুঃক্ষীরং ক্ষীর কল্যাণকন্ত্বিদম্।

পানীয় কল্যাণ ঘৃত প্রস্তুতের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ক্ষীরকল্যাণক ঘৃতে আট সের জল ও ১৬ সের দুগ্ধ দিয়া ইহা পাক করিতে হয়। অন্যান্য দ্রব্য ঘৃতের পরিমাণ সমস্তই এক।

চৈতস ঘৃত মনোবিকার নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উহা প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ :—

স্বল্প চৈতস ঘৃতম্।

পঞ্চ মূল্যা বকাশ্মর্য্যৌ রাস্নৈরণ্ড ত্রিবৃদ বলাঃ।
মূর্ব্বা শতাবরী চেতি ক্বাথ্যৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ॥
কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তদ্ঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্।

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি—ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ১৬ তোলা এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, তেউড়ীমূল, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী—ইহাদের প্রত্যেকটির ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পূর্ব্বোল্লিখিত পানীয় কল্যাণক ঘৃতের ২৮ খানি কল্ক দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের ও জল /১৬ সের। যথাবিধানে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা, অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

"স্বল্পচৈতস ঘৃত" ভিন্ন অপকারাধিকারের

মহাচৈতস ঘৃত"ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার পরিচয় যথাস্থানে প্রদান করা যাইবে।

বাতশ্লৈষ্মিক উন্মাদে "মহাপৈশাচিক ঘৃত" উত্তম ব্যবস্থা। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

মহা পৈশাচিক ঘৃতম্।

জটিলা পূতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা।
ত্রায়মাণা জয়াবীরা চোরকঃ কটুরোহিণী।
কায়স্থা শূকরী ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা।
মহাপুরুষ দন্তা চ বয়স্থা নাকুলীদ্বয়ম্॥
কটম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরাচৈব শৃতং ঘৃতম্।

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ জটামাংসী, হরীতকী ভূতকেশী, স্থলপদ্ম আলকুশীর বীজ, বচ, ত্রায়মাণ, জয়ন্তী, কাকোলী, চোরপুষ্পী, কটুকী, ব্রাহ্মীশাক, বারাহীকন্দ, গৌরী, [illegible], গুলঞ্চ, শতমূলী, রাস্না গন্ধভাদুলে, বিছাটি ও শালপানি—সমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ দুগ্ধ।

বাতোন্মাদে শিবাঘৃত অতি উত্তম ব্যবস্থা। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

শিবাঘৃতম্।

শিবায়াস্তু সুপুষ্টায়াঃ পঞ্চাশৎ পলনাং পলম্।
দশ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্॥
চতুর্গুণে চতুঃষষ্টি শরাবৈরম্ভসঃ পচেৎ।
তস্য পাদাবশেষেণ তেন কাথোদকেন চ॥
ছাগস্যাতিবিরাজস্য শরাবাণাং চতুষ্টয়ম্।
যষ্ঠ্যাহ্ব মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠচন্দন পদ্মকৈঃ॥
হরীতকী শিবাধাত্রী বৃহতী তগর পাদিকৈঃ।
বিড়ঙ্গ দাড়িমী দেবদারু দন্তী হরেণুভিঃ॥
তালীশ কেশর শ্যামা বিশালা শালপর্ণিভিঃ।
প্রিয়ঙ্গু মালতীপুষ্প কাকোলী যুগলোৎপলৈঃ॥
হরিদ্রাযুগলানন্তা মেদৈলা হরিবালুকৈঃ।
সপৃশ্নিপর্ণি কৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষ সমন্বিতৈঃ॥

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—পুরুষ শৃগালের মাংস /৬০ সের এবং দশমূল সমভাগে মিলিত /৬০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড় রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী আমলকী, বহেড়া বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িম বীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসার মূল, শালপানি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, পদ্ম, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ ছোটএলাইচ, এলবালুকা ও চাকুলে—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা। যথাবিধানে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ।

কফপ্রধান উন্মাদে সারস্বত ঘৃত বা ব্রাহ্মীঘৃত—যাহা স্বতন্ত্র অধিকারে বলা হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

বাতোন্মাদ বা বাত পিত্তোন্মাদে বিষ্ণুতৈল, বৃহৎ বিষ্ণুতৈল, মধ্যম বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐগুলির পরিচয় দেওয়া যাইয়াছে :—

বিষ্ণুতৈলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলাচ বহুপুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্যচ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ তৈল প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যংক্ষীরং দত্বাচ্চতুর্গুণম্।
অস্য তৈলস্য পক্কস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥

তিলতৈল /৪ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল ও ঝাঁটিমূল—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ বিষ্ণু তৈলম্।

জলধরমশ্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শঠী।
কাকোলী ক্ষীরককোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী চৈলাত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দন কুঙ্কুমম্॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দন রেণুকম্॥
পর্ণিনী কুন্দুবোটীশ্চ গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা॥
এতেষাং পাককৈর্ভাগৈ স্তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্।
শতাবরীরস সমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ॥

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—মুথা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাসানি, কুন্দরুখোটী, গেঁঠেলা ও নখী—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, জল ৬৪ সের। যথাবিধানে তৈল করিবে।

মধ্যম বিষ্ণু তৈলম্।

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জল দ্রোণে বিপাচয়েৎ॥

পুনর্ণবা বচাদারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু।
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠ মেলা মাংসী স্থিরা বলা॥
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ পেষয়েৎ।
গব্যাজ পয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দত্ত্বা প্রদাপয়েৎ॥
শতাবরী রস প্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥

তিল তৈল /৪ সের। কাথার্থ—শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, কণ্টকারী মূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটিমূল—ইহাদের প্রত্যেকটির ১৬ তোলা। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও রাস্না—ইহাদের প্রত্যেকটী ৪ তোলা। গব্য দুগ্ধ /৮ সের। ছাগ দুগ্ধ /৮ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। যথাবিধানে পাক করিবে।

নারায়ণ তৈলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থ শ্যোনাক পাটলা পারিভদ্রকম্।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
বলাচাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা স পুনর্ণবা।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতু র্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণী চতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্ণবম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরী রসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যক্ষীরং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে।

তিল তৈল ১৬ সের। কাথার্থ—বিল্বছাল, গণিয়ারি ছাল, শোনাছাল, পারুল ছাল. পালিধা মাদারের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী. বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্ণবা—ইহাদের প্রত্যেকটী ৮০ তোলা। জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের এবং গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু. জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, ছোটএলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি. রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্ণবা মূল—ইহাদের প্রত্যেকটী ১৬ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে।

মধ্যমনারায়ণ তৈলম্।

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা শ্যোনাক বাট্যালক পারিভদ্রকম্। ক্ষুদ্রা কঠিল্লাতিবলাগ্নি মন্থং মূলানি চৈষাং সবণী যুতানাম্॥ মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং প্রস্থং স পাদং বিধিনোদ্ধৃতানাম্। দ্রোণৈরপামষ্টাভিরেব পক্ত্বা পাদাবশেষেণ রসেন তেন॥ তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেব দুগ্ধ মাজং নিদধ্যাদথবাপি গব্যম্। একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দত্বাদ্রসঞ্চৈব শতাবরীণাম্॥ তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধা মিষিদারুকুষ্ঠম্। পর্ণী চতুষ্কা গুরু কেশরাণি সিন্ধূত্থ মাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ॥ শৈলেয়কং চন্দন পুষ্করাণি এলাত্র যষ্টি তগরাব্দ পত্রম্। ভূষ্টাঽবর্গাম্বু বচা পলাশং স্থৌণের বৃশ্চীরক চোরকাখ্যম্॥ এতৈঃ সমস্তৈ র্বিপল প্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং বিবিনা বিপক্বম্। কর্পূর কাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপল প্রমাণম্॥ এতেন দৌর্গন্ধ নিবারণায় দত্ত্বাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ। নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং সর্ব্বপ্রকারে র্বিধিবৎ প্রয়োজ্যম্॥

তিল তৈল ৩২ সের। কাথার্থ—বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোনা,বেড়েলা. পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলে ও পারুল—ইহাদের প্রত্যেকটী ২৷৷০ সের। পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীর রস ৩২ সের। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগাণি, মাষাণি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগর পাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেতপুনর্ণবা ও চোরপুষ্পী—ইহাদের প্রত্যেকটি ১৬ তোলা। গন্ধ দ্রব্য—কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি প্রত্যেক ৮ তোলা।

হিমসাগর তৈলম্।

শতাবরী রস প্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা।
কুষ্মাণ্ডক রস প্রস্থে ধাত্র্যাশ্চ স্বরসে তথা॥
শাল্মল্যাঃ স্বরস প্রস্থে তথা গোক্ষুরকস্য চ।
নারিকেল রসপ্রস্থে ক্ষীরপ্রস্থ চতুষ্টয়ে॥
অস্তোবধস্ত কল্কস্ত প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরুঃ॥
মাংসী মুরাচ শৈলেয়ং যষ্টি দারু নখী শিবা।
পূতিকা পীতিকা পত্রং কুন্দুরুর্নলিকা তথা॥
বরী লোধ্রং তথা মুস্তং ত্বগেলা পত্র কেশরম্।
লবঙ্গং জাতী কোষক তথা মধুরিকা শটী॥

চন্দনং গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কর্পূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ।
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥

তিলতৈল /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, কুষ্মাণ্ড জল /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, শিমুলমূলের রস /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ অগুরু, জটামাংসী মুরামাংসী শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খাটাশী, পিড়িংশাক পত্র, কুন্দুরুখোটী, লালুকা, শতমূলী, লোধ কাষ্ঠ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জৈত্রী, শঠী, মৌরী, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা ও কর্পূর—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা।

রসৌষধির মধ্যে—বায়ু ও পিত্ত প্রধান উন্মাদে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি ত্রিফলার জল ও মধুসহ এবং কফ প্রধান উন্মাদে ত্রৈলোক্য চিন্তামণি ব্রাহ্মী শাকের রস সহ সেবন অতি উত্তম ব্যবস্থা। কফ প্রধান উন্মাদে কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ও সারস্বতচূর্ণ ব্যবস্থা করিলেও শুভ ফল পাওয়া যায়। নিম্নে এই ঔষধগুলির উপাদান বলা যাইতেছে :-

চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ—রস সিন্দুর ২ ভাগ; লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকটি ১ ভাগ এবং স্বর্ণ।০ আনা। সমস্ত দ্রব্য ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক তিনদিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া ২ রতি পরিমিত বটী।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি—স্বর্ণ তিন ভাগ, রৌপ্য দুই ভাগ, অভ্র দুই ভাগ, লৌহ পাঁচ ভাগ, প্রবাল তিন ভাগ, মুক্তা তিন ভাগ এবং রসসিন্দুর সাত ভাগ। একত্র ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটি।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি।—হীরক, স্বর্ণ ও মুক্তা ভস্ম—প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, লৌহ তিন ভাগ এবং অভ্র ও রস সিন্দুর প্রত্যেক দ্রব্য চারি ভাগ। ঘৃত কুমারীর রস সহ মর্দ্দনান্তর ১ রতি বটি।

কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ—সমস্ত দ্রব্যই চিন্তামণি চতুর্ম্মুখের তুল্য, কেবল ইহাতে রসসিন্দুরের পরিবর্ত্তে পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ প্রযুজ্য।

সারস্বতচূর্ণ।—

কুষ্ঠাশ্বগন্ধে লবণাজমোদে দ্বে জীরকে
ত্রীণি কটুণি পাঠা।
মাঙ্গল্যপুষ্টি চ সমান্যমুনী সর্ব্বৈঃ সমানাঞ্চ
বচাং বিচূর্ণ্য॥
ব্রাহ্মী রসে নাখিলমেব ভাব্যং বারত্রয়ং
শুষ্কমিদং হি চূর্ণম্।
অক্ষ প্রমাণং মধুনা ঘৃতেন লিহ্যান্নরঃ
সপ্তদিনানি চূর্ণম্॥

কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীরা কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি এবং শতপুষ্পী সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত ঔষধ যত—তত পরিমাণে বচ চূর্ণ একত্র করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রস দ্বারা তিনবার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণ চূর্ণ—মধু ও ঘৃতের সহিত সাত দিন লেহন করিবে।

ভূতোন্মাদে—শ্বেত অপরাজিতার মূল, তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া ঘৃত সহ নস্য প্রদানের ব্যবস্থা করিবে। "মহা পৈশাচিক ঘৃত", "মহা চৈতস ঘৃত" ভূতোন্মাদে সুব্যবস্থা।

পথ্যাপথ্য।—বায়ু প্রশমক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক দ্রব্য মাত্রেই উন্মাদ রোগে হিতকর।

[illegible] অগ্নি হইতে উন্মাদ রোগীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। অন্যান্য নিয়ম মূর্চ্ছা রোগীর অনুরূপ।

অপস্মার।

অপস্মারের চলিত নাম "মৃগী রোগ।" জ্ঞানশূন্যতা, নেত্রদ্বয়ের বিকৃতি, মুখ হইতে ফেন বমন ও হস্তপদাদির বিক্ষেপ অপস্মারের সাধারণ লক্ষণ। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ ইহা চারিভাগে বিভক্ত।

সন্নিপাতজ অপস্মার, ক্ষীণ ব্যক্তির অপস্মার ও বহুকালজাত অপস্মার অসাধ্য ব্যাধি।

রোগ প্রকাশ পাওয়া মাত্রেই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

এই রোগে চেতনা সম্পাদনের জন্য মূর্চ্ছা রোগের ন্যায় মুখে ও চোখে জলের ছিটা দিবে। মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠা —একত্র মধুর সহিত মিশাইয়া অঞ্জন দিবে। যষ্টি মধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষ, বীজ, রসোন ও কুড়—একত্র গোমুত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন এবং নস্য প্রয়োগ করিবে। এই সকল প্রক্রিয়াতেও চেতনা সঞ্চার না হইলে জটামাংসীর ধূম নাসিকার নিকট প্রদান করিবে।

বায়ুজনিত অপস্মারে বস্তিকর্ম্ম, পিত্তজ অপস্মারে বিরেচক দ্রব্য এবং শ্লৈষ্মিক অপস্মারে বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ অপস্মারের সাধারণ চিকিৎসা।

পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত গ্রহণ করিয়া অঞ্জন দিলে অথবা কুকুরের পিত্ত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়।

শ্বেত তুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরপুষ্পী—এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে মালিশ করিলে অথবা ছাগমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে অপস্মার প্রশমিত হয়।

গোমূত্রের সহিত চামচিকার বিষ্ঠা গাত্রে লেপন করিলে অথবা গোমূত্রদ্বারা শ্বেত সরিষা ও সজিনাবীজ বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে অপস্মার রোগ নষ্ট হয়।

তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী এবং মধুর সহিত ব্রাহ্মী শাকের রস অপস্মারে হিতকর।

অপস্মার রোগে হৃদ্‌কম্প, চক্ষুবেদনা, ঘর্ম্ম ও হস্তাদির শৈত্যভাব থাকিলে উন্মাদ অধিকারে যে "মহা কল্যাণক ঘৃতে"র কথা বলিয়াছি, তাহা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। দশমূলের কষায়ও এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকারী। "পঞ্চগব্য ঘৃত" ও "মহা চৈতস ঘৃত"—এই রোগের সকল অবস্থায় কার্য্যকারী। নিম্নে এ দুইটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

পঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

গোশকৃদ্রস দধ্যম্ল ক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈ ঘৃতম্।
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ গ্রহাপস্মার নাশনম্॥

ঘৃত /৪ সের। গোময় রস /৪ সের। অম্ল দধি /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। গোমূত্র /৪ সের। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

মহাচৈতসং ঘৃতম্।

শণ ত্রিবৃৎ তথৈরণ্ডো দশমূলী শতাবরী।
রাস্না মাগধিকা শিগ্রু ক্বাথ্যং দ্বিপলিকং ভবেৎ॥

বিদারী মধুকং মেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা
এভিঃ খর্জ্জূর মৃদ্বিকা ভীরু মুঞ্জাত গোক্ষুরৈঃ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ-শণ বীজ, তেউড়ী মূল, এরণ্ড মূল, দশমূলী, শতমূলী, রাস্না, পিপুল ও সজিনা ছাল—ইহাদের প্রত্যেকটি ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর, কাকোলী, চিনি, পিণ্ডখর্জ্জূর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুর, রাখালশসা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ॥• তোলা।

পিত্ত প্রধান অপস্মারে "বিদার্য্যাদি ঘৃত" বিশেষ উপকারী। ইহা প্রস্তুতের নিয়ম ;—।

বিদর্য্যাদি ঘৃত।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের। ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস ১ মণ ৩২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু /১ সের।

কফপ্রধান অপস্মারে পলঙ্কষাদ্য তৈলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহা প্রস্তুতের নিয়ম,—

পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্।

পলঙ্কষা বচা পথ্যা বৃশ্চিকাল্যর্ক সর্ষপৈঃ।
জটিলা পূতনা কেশী লাঙ্গলী হিঙ্গু চৌরকৈঃ॥
লশুনাতি রসা চিত্রা কুষ্ঠৈর্বিড়ভিশ্চ পক্ষিণাম্।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্ত মূত্রে চতুর্গুণে॥
সিদ্ধমভ্যঞ্জনা তৈলম্ অপস্মার বিনাশনম্।

তিল তৈল /৪ সের। ছাগমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—গুগগুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটি মূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, ভূতকেশী, ইষলাঙ্গলিয়া, হিং, চোরপুষ্পী, রসুন, বালা, যষ্টিমধু, দন্তী, কুড় ও গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করাইতে হয়।

রসৌষধির মধ্যে বাতপ্রধান অপস্মারে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ—যাহা উন্মাদাধিকারে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। পিত্তপ্রধান অপস্মারে বৃহৎ বাত চিন্তামণি ব্যবস্থা করিবে (ইহাও উন্মাদাধিকারে বলা হইয়াছে)। পিত্তপ্রধার অপস্মারে যোগেন্দ্র রস অতি উত্তম ঔষধ। ইহার উপাদান :—

যোগেন্দ্র রস—রস সিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনান্তর এরণ্ড পত্রে জড়াইয়া তিনদিবস ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া ২ রতি বটি। অনুপান ত্রিফলা ভিজান জল।

কফ প্রধান অপস্মারে "চণ্ডভৈরব" সুব্যবস্থা। ইহা প্রস্তুতের নিয়ম :—

চণ্ড ভৈরবঃ।

মৃত সূতার্ক লৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা।
রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং গোমূত্রেণাপি মর্দ্দয়েৎ॥
তং গোলং দ্বিগুণং গন্ধং লৌহ পাত্রে ক্ষণং পচেৎ।
পঞ্চগুঞ্জামিতং ভক্ষ্যমপস্মার হরং পরম্॥
হিঙ্গুং সৌবর্চ্চলং কুষ্ঠং গবাং মূত্রেণ সর্পিষা।
কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসেহস্মিংশ্চণ্ডভৈরবে॥

পারদ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন, সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি। অনুপান—হিং, সচল লবণ, কুড় চূর্ণ, গোমূত্র ও ঘৃত।

অপস্মার রোগ প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে। এজন্য রজোলোপ হইলে বা অনিয়মিত রজঃ হইতে থাকিলে উহা নিবারণের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য। মূর্চ্ছা রোগীর অনুরূপ।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণ।

[ডাঃ শ্রীশরৎকুমার দত্ত, এল, এম, এস ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আলোচনাকালে দেখা যায় যে, জ্বর নাশক ঔষধের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ঔষধেই পারদ (রস) ও গন্ধকের ব্যবহার আছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের মেটিরিয়া মেডিকায় পারদ ও গন্ধকের কোন জ্বরনাশক গুণের উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ স্থূল দৃষ্টিতে ঔষধের গুণাবলী দেখিয়াছেন, ঔষধ সমূহের যথার্থ দৃষ্টি তাঁহাদের আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিবলে ঔষধ সমূহের যথার্থ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র অগ্নিবেশমুণি তন্ত্র প্রণয় করেন। তন্ত্রে পারদ শিব বীর্য্য ও গন্ধককে গৌরীবীর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে বিষের দ্বারা জ্বর উৎপত্তি হউকনা কেন, ঐ বিষনাশ করিতে আমাদের শরীরে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা সর্ব্বস্থানেই এক। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বর একটী পৃথক্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। আমি Pitutary body তে রুদ্রের অবস্থান এবং নাভিমণ্ডলে Pitutary body যে নাভি মণ্ডলে অবস্থিত গৌরীর অবস্থান—পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং জঠরানলকে জ্বরে উৎক্ষিপ্ত করে তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। এই নাভি প্রদেশে অবস্থিত সূর্য্যমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত আছেন—তাহাও আয়ুর্ব্বেদে উল্লেখ আছে।

"বাম পার্শ্বাশ্রিতং নাভেঃ কিঞ্চিৎ সোমস্য-মণ্ডলম।
তন্মধ্যে মণ্ডলং সৌর্য্যং তন্মধ্যেঽগ্নিব্যবস্থিতঃ॥
জরায়ু মাত্র প্রচ্ছন্নকাচকোশস্থদীপবৎ।"

ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড

"নাভ্যো মধ্যে শরীরস্য বিশেষাৎ সোমমণ্ডলং।

সোমমণ্ডলামধ্যস্থং বিস্তাৎ সূর্য্যস্তমণ্ডলং।
প্রদীপবত্তন্ন নৃণাং স্থিতোমধ্যে হুতাশনঃ॥
সূর্য্যোদিবি যথা তিষ্ঠং তেজো যুক্তৈ গর্ভস্থিভিঃ
বিশোষয়তি সর্ব্বাণি পল্বলানি সরাংসিচ।
তদ্বচ্ছরীণাং ভুক্তং জলনো নাভিমাশ্রিতঃ।
ময়ুখৈঃ পচতে ক্ষিপ্রন্নানা ব্যঞ্জনসংস্কৃতম্॥
হ্রস্বকায়েষু সর্ব্বেষু তিলমাত্র প্রমাণতঃ
স্থূলকায়েষু সর্ব্বেষু যবমাত্রঃ প্রমাণতঃ॥
কৃমিকীট পতঙ্গেষু বালুমাত্রোবতিষ্ঠত।

রসপ্রদীপ।

এই চন্দ্রমণ্ডল শুক্র হইতে প্রস্তুত এবং এই শুক্র শরীরের সর্ব্বস্থানে দক্ষপ্রজাপতি রূপে বিস্তমান আছে। যেরূপ ইক্ষুব সর্ব্বস্থানেই চিনি বিস্তমান থাকে, তদ্রূপ এই শুক্র শরীবের সর্ব্বত্রই আছে। শরীরের চর্ম্মে যে sympathetie nerve সমূহ আছে, তাহাতেও এই শুক্র বর্ত্তমান থাকে। শুক্র ক্ষরণ কালে শরীরের সমস্ত চর্ম্মের sympathetic এর ক্রিয়া আমরা বুঝিতে পারি। এই sympatheticএর কেন্দ্রসমূহ cerrical region হইতে মেরু দণ্ডের সম্মুখভাগে গুহ্যদ্বার (মূলাধার) পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাই যোগীগণের যোগ সাধনের পথ বলিয়া মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধাম পর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে pitutary body তে এই sympatheticপ্রধান কেন্দ্র অবস্থান করিতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং pitutary body তে যে চন্দ্রের প্রধান স্থান অবস্থান করিতেছে তাহা সহজেই অনুমান হয়। এই জন্যই রুদ্রের অপর নাম চন্দ্রশেখর। যোগীগণ যোগসিদ্ধ হইলে এই pitutary bodyর চন্দ্রমণ্ডল হইতে নাভিপ্রদেশের উপরিভাগে বিন্দু (অমৃত) ক্ষরণ করাইয়া থাকেন। ইহাই আত্মার রমণ।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে Pitutary body বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। ইহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর যেরূপ কোষ বিদ্যমান আছে, মস্তিষ্কের অন্য কোন স্থানের স্নায়ুমণ্ডলীতে ঐরূপ কোষ বিদ্যমান নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ইহাতে নিদ্রার কেন্দ্র বেদনা অনুভবের কেন্দ্র, জ্বরের কেন্দ্র sympathetic এর কেন্দ্র এবং ইহা যে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর জীবনস্বরূপ তাহা জানিতে পারিয়াছেন। এই pitutary body যে শরীরের সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে— তাহাও তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহা শরীরের সকলের উপরে প্রভুত্ব করে বলিয়া যোগশাস্ত্রে ইহা আজ্ঞাচক্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পারদ ও গন্ধক যথাক্রমে pituitary body ও জঠরানলের ক্রিয়াকে প্রকৃতিস্থ করে বলিয়া জ্বরে এই দুইটী ঔষধের অত্যধিক ব্যবহার বিহিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র— চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করিয়াছিল। কারণ জ্বর উৎপত্তি হইলে শরীরের যে দুইটী প্রধান জিনিসের বিকৃতি ঘটে, তাহাদের ক্রিয়াকে ঠিক করিবার ঔষধ প্রয়োগই বিজ্ঞান সম্মত এবং পারদ যে গন্ধক ব্যতীত জীর্ণ হয় না ইহাও আয়ুর্ব্বেদ-রসায়নের একটি বহুমূল্য সত্য। যেরূপ চন্দ্রমণ্ডলের কেন্দ্র pitutary body হইতে অমৃতক্ষরণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পারদও

শোধিত হইলে অমৃততুল্য হয় এবং তদ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারা যায়।

জীবক ও ঋষভক দাহ, রক্ত দুষ্টি, বাত কৃশতা ইত্যাদি নাশ করে। Adrenal secretion শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থও পোড়াইয়া ফেলে এবং pitutary body তেও দহন শক্তি সম্পন্ন পদার্থ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ইহাদের বিকৃতি ঘটলে শরীরের দূষিত পদার্থ ভালরূপে দাহ হইতে না পারায় রক্তদুষ্টি, দাহ, বাত ইত্যাদি ব্যারাম উৎপন্ন করে। আয়ুর্ব্বেদের বাতরক্ত, বাতপিত্ত প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ইহার প্রমাণ এবং এই বাতরক্ত রোগে জীবনীয়গণের অত্যধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি।

"ঋদ্ধিবৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বে ভবতঃ কোশযামলে।
শ্বেত লোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ॥
স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োব্রুবে।
তুলগ্রন্থি সমাঋদ্ধি র্বামাবর্ত্ত ফলা চ সা॥
বৃদ্ধি স্তু দক্ষিণাবর্ত্তফলা প্রোক্তামহর্ষিভিঃ॥
ঋদ্ধির্যোগং সিদ্ধি লক্ষ্মৌ বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়ামে॥
ঋদ্ধির্বলা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ।
প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছা রক্তপিত্ত বিনাশিনী॥
বৃদ্ধি গর্ভপ্রদা শীতা বৃংহণী মধুরাস্মৃতা।
মূর্চ্ছা পিত্তাস্রপ্রশমনী ক্ষতকাশ ক্ষয়াপহা।"

দ্রব্যগুণ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। ঋদ্ধি—বলকারক, ত্রিদোষ নাশক, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু, আয়ুবর্দ্ধক। ঐশ্বর্য্যপ্রদ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত বিনাশক।

বৃদ্ধি গর্ভপ্রদ শীতবীর্য্য, বৃংহণ, মধুর রস ও শুক্রকারক। ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষত, কাস ও ক্ষয় প্রশমক।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে Thyroid gland এর ক্রিয়া বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং Testicle ও ovaryর Internal Secretion আলোচিত হইতেছে। বিখ্যাত ডাক্তার ব্রাউন সেকার্ড ৭০ বৎসর বয়সের সময়ে এই Testiecle Secretion ব্যবহার করিয়া ৫০ বৎসর বয়সের চেহারা পাইয়াছিলেন। এই Theyroid Glandই ঋদ্ধি এবং Testicle ovaryই বৃদ্ধি। Theyroid Gland কার্য্যের গোলযোগ হইলে Epilepsy (মূর্চ্ছা) হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থগুলি নষ্ট হইয়া শরীরের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে আয়ুবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি—শুক্র বৃদ্ধি করে এবং ইহাতে গর্ভের সঞ্চার করে। ইহাদের কার্য্যের অভাব হইলে Eczema প্রভৃতি চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয় এবং শরীর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের এই জিনিষগুলির ক্ষয় নিবারক গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দম্পতি-জীবন।

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ তর্কতীর্থ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

গর্ভরক্ষার উপায়।

ক্রোধ, শোক, ঈর্ষা, অসূয়া, ভয়, অতিশয় মৈথুন, অতিশয় পরিশ্রম, মানসিক উদ্বেগ, মল মূত্রাদির বেগধারণ, সময়ে না থাওয়া, শুইবার দোষ, উঁচু হইয়া উপবেশন, ক্ষুধা ও পিপাসা হইলে উপযুক্ত ভোজন ও জলপান না করা দুর্গন্ধ পচা প্রভৃতি কুৎসিৎ দ্রব্য আহারাদির দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, এইজন্য গর্ভিণী এই সমস্ত সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিবেন। অপচার বশতঃ যদি গর্ভের প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় মাসে রজোদর্শন হয়, তাহা হইলে সে গর্ভের রক্ষা হয় না। যেহেতু তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত গর্ভে বিশেষ কোন রূপ সারভাগ উৎপন্ন হয় না। চতুর্থ মাসে রক্তদর্শন হইলেও গর্ভরক্ষা হইতে পারে।

চতুর্থ মাসে অল্প অল্প রক্ত দেখা মাত্র গর্ভিণীকে কোমল সুশীতল শয্যায় শয়ন করাইবে। এরূপ ভাবে শয়ন করাইবে—যেন মাথার দিক কিছু নীচু ও পায়ের দিক কিছু উঁচু হয়। তাহার পর যষ্টিমধু চূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা কিছুক্ষণ অতিশয় শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা তুলাতে উত্তমরূপে লাগাইয়া যোনির মধ্যে ও উপরে ধারণ করিতে দিবে। তুলা, না পাইলে পরিষ্কার ন্যাকরা দিয়াও ঐরূপ করা যাইতে পারে। এবং সহস্র ধৌত বা শতধৌত ঘৃত দিয়া নাভির নিম্নভাগে (সমস্ত তলপেট) আস্তে আস্তে মালিস করিবে। কিছুক্ষণ ঘৃত মালিস করার পর শীতল গোদুগ্ধ অথবা যষ্টিমধু সিদ্ধ সুশীতল জল দ্বারা তলপেট সিক্ত করিতে হইবে।

রজোদর্শন মাত্র ঠাণ্ডা জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলে অথবা তলপেটে বরফ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রক্তস্রাব হইলে বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও ডুমুর গাছের ছালের রসে, ঐ সকল ছাল একত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইয়া যোনির মধ্যে ধারণ করিতে হয়।

উক্ত বৃক্ষ সমূহের ছাল বা কচি পাতা বাটিয়া দুগ্ধ সহ খাইলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

ঐ অবস্থায় রমণীকে দুধে কিছু ভাল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

পদ্ম উৎপল (সুঁদিপুষ্প) ও কুমুদ পুষ্পের পাঁপড়ি সমান ভাগে একত্র বাটিয়া তাহাতে চিনি ও মধু মিশ্রত করিয়া খাইলে উপকার হইয়া থাকে।

ঐরূপ অবস্থায় পানিফল, পদ্মবীজ ও কেশর খাইলে অনেক উপকার হয়।

রক্তস্রাব অবস্থায় প্রিয়ঙ্গু, শুষ্ক শালুক, শুষ্ক ডুমুর এবং বটের শুঙ্গ, মিলিত আধতোলা,

একত্র বাটিয়া আধপোয়া ছাগলের দুগ্ধ সহ গুলিয়া, তাহাতে একসিকি মিছরী মিশাইয়া খাইতে হয়।

কুমুরে পোকার বাসা ঘরের মাটী, বরাহ ক্রান্তা, ধাইফুল, নবমালিকা, গিরিমাটী, ধুনা ও শোধিত রসাঞ্জন, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া চারি আনা মাত্রায়, মধু সহ খাইলে অতিশয় রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

বেড়েলা মূল, গোরক্ষ চাকুলে, শালিধান্তের মূল, বেটে ধান্তের মূল, ইক্ষুমূল, ও কাকোলী, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধ দ্বারা শালিধান্তের চাউলের পায়স করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয়।

সে সময়ে গর্ভিণীর চিত্ত যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এই সকল সাধারণ চিকিৎসা বলা হইল, সম্প্রতি প্রতি মাসের রক্তস্রাবে পৃথক্ পৃথক্ কয়েকটী যোগ লিখিত হইতেছে।

প্রথম মাসে—যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীর কাকোলী, ও দেবদারু মিলিত ছয় আনা বা আধতোলা বাটিয়া দুধে গুলিয়া খাইতে দিবে।

দ্বিতীয় মাসে- কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী, ও আমরুল, একত্র দুধ সহ বাটিয়া সেব্য।

তৃতীয় মাসে—পরগাছা, ক্ষীর কাকোলী, দুর্ব্বা ও অনন্ত মূল।

চতুর্থ মাসে—অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটীর মূল ও যষ্টিমধু।

পঞ্চম মাসে—বৃহতী, কণ্টকারী, গামারের ফল, বুট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ডুমুরের শুঙ্গা ও ছাল ঘৃত।

ষষ্ঠ মাসে—চাকুলে, বেড়েলামূল, সজিনা-বীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু।

সপ্তম মাসে—পাণিফল, মৃণাল, কিস্‌মিস্, কেশর, যষ্টিমধু ও চিনি, একত্র বাটিয়া দুধে গুলিয়া অথবা ঐ সকল দ্রব্য দুগ্ধ সহ পাক করিয়া খাইতে দিবে।

অষ্টম মাসে—কয়েত বেলের মূল, বেলের মূল, বৃহতীমূল, পল্‌তা, ইক্ষুমূল ও কণ্টকারী।

নবম মাসে—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীর-কাকোলী ও শ্যামালতা।

দশম মাসে—যষ্টিমধু, দেবদারু ও শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্য দুধে পাক করিয়া সেই দুধ খাইতে দিবে।

"দুগ্ধ পাকের 'নিয়ম"

প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে মিলিত এক তোলা, আধপোয়া দুগ্ধ ও আধসের জল একত্র সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। রোগিণীর পরিপাক শক্তি অধিক থাকিলে দ্রব্য সমূহ মিলিত ২ দুইতোলা, একপোয়া দুধ ও একসের জল, একত্র সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে খাইতে ব্যবস্থা দেওয়াও চলে।

"রক্তস্রাব সহিত পেটবেদনা"

(১) গর্ভাবস্থায় পেটের বেদনা হইলে কুশের মূল, কাশ ঘাসের মূল, লাল এরণ্ডমূল ও গোক্ষুরী একত্র দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে আধতোলা চিনি মিশাইয়া খাইতে দিবে। (২) কেশর, পানিফল, পদ্মফুল, সুঁদি পুষ্প, লাল এরণ্ড মূল, শতমূলী, জীবক (অভাবে গুলঞ্চ) ঋষভক (অভাবে ভুমি কুষ্মাণ্ড) মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা) মহামেদা (অভাবে অনন্তমূল) কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি মাষাণি, ও জীবন্তীমূল, এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে আধতোলা চিনি

প্রক্ষেপ দিয়া খাইলে গর্ভিণীর পেটবেদনার উপশম হইয়া গর্ভ স্থির হয়। (৩) কেশর, পানিফল, পদ্মেরকেশর, শুঁদীপুষ্প, যষ্টিমধু, মুণালি এই সমুদায় দ্রব্য সহ দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে সবেদনা স্রাবপীড়িতা-রমণীর রোগ শান্তি হয়। রোগিণী দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য করিবে। (৪) মুণালি, মাষাণি, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্য দুধে পাক করিয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তাহাতে চিনি চারি আনা ও মধু চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া খাওয়াইলে গর্ভিণীর উদর বেদনার উপশম হয়। (৫) যষ্টিমধু, দেবদারু, ক্ষীরকাকোলী। (৬) আনন্তমূল, শতমূলী ও ক্ষীরকাকোলী। (৭) বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁদীপুষ্প, শতমূলী, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও যষ্টিমধু।

উপরি লিখিত কয়েকটী যোগদ্বারা দুধ পাক করিয়া, ঐ দুধ পান করাইলেও শীঘ্র পেটের ব্যথা দূর হয়, এবং গর্ভস্থ সন্তান যথাস্থানে থাকিয়া পরিপুষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

নিদ্রায় হিত ও অহিত।

[কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন]

—:•:—

মহর্ষি চরক নিদ্রাজনক হেতু সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

তমোভবা শ্লেষ্মা সম্ভবা চ।
মনঃ শরীর শ্রম সম্ভবা চ॥
আগুন্তকী বাধ্যানুবর্ত্তিনী চ।
রাত্রি স্বভাব প্রভবা চ নিদ্রা॥

নিদ্রা তমো-গুণ, শ্লেষ্মা, মন ও শরীরের শ্রান্তি ও রাত্রি-স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহা আগন্তুক রূপেও উৎপন্ন হয়।

নিদ্রা এই পঞ্চবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলেও, শাস্ত্রকার নিদ্রাকে সাধারণতঃ ৩ প্রকারে ভেদ করিয়াছেন; স্বাভাবিক, তামসী ও বৈকারিক।

রাত্রি-স্বভাব-প্রভবা-নিদ্রাই স্বাভাবিক নিদ্রা, ইহা প্রাণীগণকে স্বভাবতঃ আশ্রয় করে। এই নিদ্রা আমাদের শরীর পোষণ, তর্পণ, ধারণ ও যাপন করিয়া জীবিত রাখে। ইহা ভূতধাত্রী নিদ্রা, ইহার অভাবে আমাদের শরীর ক্ষয় হয় এবং নানা প্রকার ব্যাধির হেতু হয়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। স্বাভাবিক নিদ্রা সত্ত্বগুণ-ভূয়িষ্ঠ ব্যক্তির অর্দ্ধ রাত্রিতে, তমো ভূয়িষ্ঠ ব্যক্তির দিবা বা রাত্রি সর্ব্ব সময়েই হয়। রজোভূয়িষ্ঠের নিদ্রা অনিমিত্ত এবং অনিয়মিত কালে উৎপন্ন হয়,—কদাচিৎ দিবা কদাচিৎ রাত্রি, অনিমিত্ত অর্থাৎ হয়ত কোন কার্য্য করিতেছে, ইতি মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইল। তমোভূয়িষ্ট লোকের নিদ্রাকে কেহ কেহ পাপের কারণ বলিয়া থাকেন। এই নিদ্রা

[illegible] সমূহের বাধাকারক, অতএব [illegible]।

তামসী নিদ্রা :—এই নিদ্রা মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, ইহার আর জাগরণ নাই। ইহাকে [illegible] নিদ্রা বলে, ইহা অরিষ্টসূচক মৃত্যু, [illegible] প্রকার নিদ্রাভেদ মাত্র। সাধারণ নিদ্রায় ইন্দ্রিয়গণের মনের সহিত বিয়োগ হয়, পরে জাগরণ কালে সংযোগ হয়, তামসী নিদ্রায় পুনরায় সংযোগ হয়না, ইহাই প্রভেদ।

জীবনে আমরা যে সময় নিদ্রায় অতি-বাহিত করিব, তাহা এক প্রকার মৃত্যু, কারণ নিদ্রিত অবস্থায় আমরা ইহলোকের কোন সম্পর্ক রাখি না এবং নিদ্রিতাবস্থায় আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তাহাও জন্মান্তরের ন্যায় আমাদের ইচ্ছানুরূপ হয় না; যদৃচ্ছা বা দৈবাধীনে হয়।

একটি ফকির বলিয়াছিলেন. "আমি প্রতিদিনই স্বপ্নে দেখি যে, রোমের বাদসাহ হইয়াছি; প্রাতে জাগরিত হইয়া দেখি, আমি ফকির! বলিতে পার বাদসাহ? আমার কোনটি জাগরণ? কোনটি নিদ্রা?" প্রকৃতপক্ষে জাগরণে বা স্বপ্নে আমরা আমাদের যে অবস্থা দেখি, তাহাই সত্য বলিয়া অনুভব করি। আমাদের জাগরণ অবস্থা জীবন এবং নিদ্রিতা-বস্থা মৃত্যু বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বৈকারিক নিদ্রা :—যে নিদ্রা ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী; যেমন সান্নিপাত জ্বরাদিসম্ভূত, [illegible]শরীর শ্রমসম্ভবা নিদ্রা (যদিও শ্রান্তি বা উপবাস হেতু শ্লেষ্মক্ষয় এবং বায়ুবৃদ্ধি হেতু নিদ্রানাশ সম্ভব, কিন্তু দৃষ্টফল যে নিদ্রা হয়), শ্লেষ্মসমুদ্ভবা নিদ্রা এবং দিবানিদ্রাকে বৈকারিক বা অস্বাভাবিক নিদ্রা কহে। ইহারা দোষের প্রকোপক এবং এই নিদ্রার কারণও দোষ।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

রাত্রৌ জাগরণং রূক্ষং স্নিগ্ধঞ্চ স্বপনং দিবা।
অরূক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাসীনপ্রচলায়িতং॥

রাত্রি জাগরণ, রুক্ষ, দিবনিদ্রা, স্নিগ্ধ, বসিয়া বসিয়া ঢোলা, অস্নিগ্ধ ও অরুক্ষ জাগরণ ও রাত্রে নিদ্রা আমাদের স্বাভাবিক স্বস্থবৃত্তি। শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

দেহবৃত্তৌ যথাহার স্তথা স্বপ্নঃ সুখো মতঃ।
স্বপ্নাহার সমুত্থে চ স্থৌল কার্শ্যে বিশেষতঃ॥

দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থে আহার যে রূপ উপযোগী, নিদ্রাও সেইরূপ। আর দেহের স্থূলতা ও কৃশতা—আহার ও নিদ্রা হইতেই উৎপন্ন হয়।

কার্য্যাদির চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা সন্তর্পণ, চিন্তা, রুক্ষ ও লঘু আহার, এবং নিদ্রাহীনতা কৃশতার কারণ।

অসময়ে এবং অতিশয় নিদ্রা সেবনে গৌরব, অঙ্গমর্দ্দ, অগ্নিনাশ, হৃদয়ের উপলেপ, শোথ, অরুচি, হৃল্লাস, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, কাস, গলরোগ, স্মৃতি নাশ, বুদ্ধিলোপ, স্রোতোরোধ, জ্বর, ইন্দ্রিয়-গণের সামর্থ্যহীনতা, বিষের বেগবৃদ্ধি এবং অন্যান্য কফ রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হয়।

অতএব নিদ্রা কোন্ স্থলে হিত বা অহিত, তাহা বিবেচনা করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যাইবেন।

দিবানিদ্রা ত্রিদোষ প্রকোপক এবং ইহা সেবনে অধর্ম্ম হয় দিবা কর্ম্মময়-মানব জীবনের প্রকৃষ্ট কাল, কর্ত্তব্য অবহেলা পূর্ব্বক নিদ্রা ভোগ করিয়া সময় বৃথা নষ্ট করিলে, কর্ত্তব্য

অবহেলা জনিত পাপ হয়। দিবানিদ্রা স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্মের অনিষ্টকর, অতএব হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দিবানিদ্রা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন।

গ্রীষ্মকালে লোকের শরীর কালধর্ম্মে শুষ্ক হয়, তখন বায়ু সঞ্চিত হইতে থাকে, রাত্রি অত্যন্ত ছোট হয়, এইজন্য, তৎকালে দিবাস্বপ্ন প্রশস্ত। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে দিবানিদ্রা যাইলে, বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধির প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কারণ উপস্থিত করে। আয়ুর্ব্বেদ তজ্জন্য লোকহিতার্থে উপদেশ দিয়াছেন ;—

তস্মার জাগ্রাত্রাত্রৌ দিবা স্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
জ্ঞাত্বাদোষ করারেতৌ বুধঃ স্বপ্নমিতং চরেৎ।

জ্ঞানী ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা উভয়কে দোষকর জানিয়া নিদ্রা যুক্তিযুক্ত মত আচরণ করিবে। ইহাতে মানব সুস্থ, সুমনা, এবং শ্রীযুক্ত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে।

দিবানিদ্রা প্রভৃতি যাহাদের সাত্ম্য হইয়াছে, তাহাদের দিবানিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ বাধাকর হয় না। সাত্ম অর্থে যে আহার-বিহার অভ্যাস বশে অবাধাকর হয়। যাহা বাধাকর-তাহাই দুঃখ, জীব-শরীর বা জীবের মনে দুঃখ-সংযোগই ব্যাধি।

রাত্রি জাগরিতের জাগরণের অর্দ্ধকাল দিবা স্বপ্ন হিত। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীকর্ষিত, ক্ষতক্ষীণ, মদানিত্য, যান-বাহন-পথ-কর্ম্ম শ্রান্ত, অভুক্ত, ক্ষীণ-মেদ-স্বেদ কফ, রস, রক্ত, অজীর্ণ, তৃষ্ণা, অতিসার, শূলরোগাক্রান্ত, শ্বাস, হিক্কা, পতিত, আহত, উন্মত্ত, শীত, অধ্যয়ন-ক্রোধ-ভয় শোকাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বকালে দিবানিদ্রা সেবন করিবে। দিবানিদ্রা এই সকল ব্যক্তির ধাতু সাম্য করিয়া বলবৃদ্ধি করে, দিবানিদ্রা জনিত শ্লেষ্মা ইহাদের অঙ্গ সমূহ পুষ্ট এবং আয়ু দৃঢ় করে। যেমন বিষ অবস্থাভেদে অমৃত তুল্য হয়—তদ্রূপ দোষাত্মক দিবানিদ্রা ইহাদের অমৃত তুল্য। যেমন শ্রমাদি হেতু শ্লেষ্মা ক্ষয় হয়, সেইরূপ এবম্বিধ অবস্থায় দিবানিদ্রা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করিয়া ধাতু সাম্য করে। অজীর্ণ রোগীর দিবানিদ্রা দ্বারা স্রোতঃ সমূহের অবরোধ হেতু অগ্নিবৃদ্ধি করে, তজ্জন্য আহারকে শীঘ্র পরিপাক করে। অন্যথা দিবানিদ্রা দোষকারক। এই সকল রোগী এই সকল রোগের উপদ্রবকালে দিবানিদ্রা যাইবে, নতুবা দিবানিদ্রা যাইবে না। দিবানিদ্রা অভুক্ত অবস্থায় যাওয়াই উচিত, হারীতে উক্ত আছে

"ভুক্তা স্বপ্ন ন সেবেত
সুখোঽপ্যসুখিত ভবেৎ।"

ভোজন করিয়া দিবানিদ্রা যাইবে না। শ্রম-ব্যায়ামাদিতে দিবাস্বপ্ন বিধানে অন্যত্র উক্ত আছে

"নরান্ নিরশনান্ কামং
দিবাং স্বাপয়েৎ বুধঃ।

পণ্ডিতগণ অভুক্ত মানবকে দিবানিদ্রা বিধান করিবেন।

সুশ্রুত দিবানিদ্রার কাল দুইদণ্ড হইতে দুই ঘণ্টা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত দিবা স্বপ্ন অহিত।

স্থূল ব্যক্তি, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু ও শ্লেষ্মা রোগগ্রস্থ, দুষী বিষার্থ ব্যক্তিগণ কদাপি দিবা নিদ্রা যাইবে না, গ্রীষ্মকালেও নয়।

অসময়ে বা অতিশয় অথবা দিবাকালে, নিদ্রা যাওয়া যেমন মানবের অহিত, সেইরূপ

রাত্রি জাগরণও বাতিক ও পৈত্তিক নানা ব্যাধি উৎপাদন করে। অযথা নিদ্রা বা জাগরণ অসুস্থতার হেতু। অহিত নিদ্রাবেগ নষ্টের জন্য মহর্ষি চরক বলেন—

"কায়স্য শিরসশ্চৈব বিরেকশ্চর্দ্দনং ভয়ং।
চিন্তা ক্রোধস্তথ ধূমো ব্যায়ামো রক্ত মোক্ষণং
উপবাসোঽসুখা শয্যা সত্ত্বোদার্য্যং তমোজয়ঃ।
নিদ্রা প্রসঙ্গং অহিতং ধারয়ন্তি সমুত্থিতং॥

কায়বিরেচণ (জোলাপ), শিরোবিরেচন (নস্য প্রভৃতি) বমন, ভয়, চিন্তা, ক্রোধ, ধূমপান, পরিশ্রম, রক্তমোক্ষণ, উপবাস, অসুখকর শয্যা—সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের ক্ষয় এই সকল উপস্থিত নিদ্রাবেগ নিবারণ করে। অহিত বা বৈকালিক নিদ্রাবেগ নষ্টের জন্য এই বিধান উক্ত হইয়াছে। রাত্রিকালে স্বভাবপ্রভবা নিদ্রা স্বাভাবিক নিদ্রা, ইহা যত্নের সহিত পরিপাল্য।

আমাদের স্বাভাবিক নিদ্রাও নানা কারণ বশতঃ নষ্ট হয় ও কার্য্যবার্দ্ধক্য, রোগ, স্বকীয় স্বভাব ও বাতপ্রবলতা নিদ্রানাশের হেতু।

সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

নিদ্রা নাশোঽনিলাৎ পিত্তাৎ মনস্তাপাৎ ক্ষয়াদপি।
সম্ভবত্যভিঘাতাচ্চ প্রত্যানীকে প্রশাম্যতি॥"

বায়ুপ্রকোপ, পিত্তপ্রকোপ, মনস্তাপ (শোকাদি), ক্ষয়রোগ ও আঘাতহেতু নিদ্রানাশ হয়। যে কারণে নিদ্রানাশ হয়, তাহার বিপরীত কার্য্য আচরণ করিলে নিদ্রা হইতে পারে।

কোন কারণে নিদ্রানাশ হইলে, গৃহসুখ, সুখাস্তীর্ণ শয্যা, মনোসুখ, মনোহর গন্ধ গ্রহণ ও সংবাহন (গা টেপান) অভ্যঙ্গ, মস্তকে তৈল নিষেচন ও স্নান হিতকর। যাহা কিছু শ্লেষ্মকর দ্রব্য, তৎসমুদয়ই নিদ্রাজনক। নিদ্রা শ্লেষ্মোদ্ভবা, বায়ু নিদ্রানাশ এবং পিত্ত নিদ্রাল্পতা করে। তজ্জন্য বাত ও পিত্ত বর্দ্ধক সমস্ত দ্রব্য নিদ্রানাশে বর্জ্জনার্থ বিধেয়। গ্রাম্য (ছাগাদি), উদক, মৎস্যাদি জল বহুল দেশজ মাংস, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি, স্নেহ, গম, শালি অন্ন, গুড়, চিনি প্রভৃতি দ্বারা মধুর ও স্নিগ্ধ পিষ্টান্ন সকল; এবং নিশাকালে কিসমিস, চিনি গুড়াদি ইক্ষু বিকৃতি, প্রভৃতি প্রধানতঃ দ্রব্য সকল সেবন এবং চন্দনাদি সুগন্ধানুলেপন করিলে নিদ্রানাশ প্রশমন হয়। সুষনিক (সুষনী শাক) অত্যন্ত নিদ্রাজনক। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিদ্রানাশ জন্য, এইরূপ অন্যান্য উপায় সকল ও অবলম্বন করিতেন। নিদ্রাকালে শয্যা বাধাহীন, সুপ্রশস্ত ও মনোজ্ঞ হওয়া উচিত। সুখাবহ অবতীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে—যাহাতে সুখে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি করা যায়।

"শ্রমানিলহরং বৃষ্যং পুষ্টি নিদ্রাধৃতি প্রদং।
সুখং শয্যাসনং দুঃখং বিপরীত গুণং মতঃ॥"

সুখশয্যা ও আসন, শ্রম ও বায়ুসাম্য দ্রব্য, বৃষ্য, পুষ্টিকারক দ্রব্য, নিদ্রা ও ধৃতিপ্রদ। কষ্ট শয্যাসন ইহার বিপরীত ফলপ্রদ। কষ্টকর শয্যায় নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। প্রিয়ভাষী প্রিয়জন সর্ব্বদা শয্যা পার্শ্বে থাকিয়া মনোরঞ্জন করিবে।"

বাসগৃহ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন,—

প্রশস্ত বাস্তুনি গৃহে শুচা—
রাতপ বর্জ্জিতে।
নির্ব্বাতে ন চ রোগাঃ স্যুঃ শারীরাগন্তু
মানসাঃ॥"

গৃহের বাস্তু (পাস্তর জমি) ও গৃহ প্রশস্ত হওয়া উচিত। উহা শুচি, ও রৌদ্র বর্জ্জিত ও নির্ব্বাত হওয়া উচিত। (নির্ব্বাত বায়ু প্রবাহ গৃহের একদেশে থাকিবে, অথচ বাহিরের বায়ু প্রবাহ শরীরে অবাধে না লাগে) এইরূপ গৃহে শারীরিক মানসিক ও আগন্তুক রোগের কারণ ঘটিতে পারে না।

আদ্রপদে নিদ্রা যাইবে না। উত্তর পশ্চিম বা অধঃশিরঃ ও উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইবেনা। আদ্র বংশোপরি, আকাশ (স্বল্পাবলম্বন স্থান) উচ্চস্থান, বিদ্যুৎদগ্ধ বৃক্ষ নির্ম্মিত বা গজভঙ্গ বৃক্ষের কাষ্ঠ নির্ম্মিত ভঙ্গ, ছিন্ন ও অগ্নিদগ্ধ পর্য্যাঙ্কে নিদ্রা যাইবেনা।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এবং ধান্য, গাভী, গুরুজন, জল, অগ্নি ও দেবমূর্ত্তির ঊর্দ্ধে নিদ্রা যাইবেনা।

দিবসে, উভয় সন্ধ্যাতে, ভস্মের উপরে, আদ্রস্থানে, অপবিত্র স্থানে, শ্মশানে, শূন্যালয়ে দেবগৃহে ও উচ্ছিষ্ট মুখ হইয়া নিদ্রা যাইবেনা।

তমোগুণ হইতে নিদ্রার উৎপত্তি হয়। সমস্ত মাদক দ্রব্য সমূহ তমোগুণ ভূয়িষ্ট। মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যগুলি তমোগুণের বৃদ্ধি করিয়া জীবকে নিদ্রাভিভূত করে।

ইন্দ্রিয়দমন, আহার ও নিদ্রা এই তিনটী জীবকে ধারণ করে। যাহারা ইহার মিথ্যাচরণ জানে, তাহারা সবল ও সুস্থ হইয়া মনঃসুখে জীবন যাপন করে। মিথ্যাচারীরা নানা প্রকার কষ্টে জীবন ক্ষেপণ করে এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মানবজীবন নিদ্রা ও জাগরণময়। যে ব্যক্তি নিদ্রা ও জাগরণের সদ্ব্যবহার জানে সেই ধনী, সেই সুখী সেই পবিত্র এবং সেই জ্ঞানী। নিদ্রাকে ভূতধাত্রী বলে, নিদ্রা আমাদের শান্তি দান করে, শ্রমহরণ করে, শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় পাইলে—সমস্ত দুঃখের অবসান বোধ করে সংসারক্লিষ্ট মানবেরও তদ্রূপ নিদ্রাক্রোড়ে স্থান পাইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়।

নিম্ব।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি]

"সেকালের বুড়ো বুড়ী জান্‌তো এত লতা-পাতা
ষোল টাকার ভিজিট-খেগো ডাক্তারসাহেব
লাগেন কোথা" ?

পূর্ব্বে বুড়োবুড়ীরা এত ভাল ভাল মুষ্টিযোগ জানিতেন যে, কঠিন কঠিন পীড়া সামান্য সামান্য টোট্‌কায় ভাল করিতে পারিতেন। আমাদের গৃহের আশে পাশে যে সমস্ত গাছ পালা রহিয়াছে, তাহার গুণ না জানায় আমরা কথায় কথায় ডাক্তার ডাকি। ইহাতে অর্থ ক্ষয়, মনস্তাপ—দুই-ই হয়। ধাতুস্থ পীড়ায় কোন রোগীর অষ্ট প্রহর জ্বর,—কিছুতেই যাইতেছে না,—ডাক্তারী ঔষধে কোন উপকার হইল না,—সামান্য একটা "ঘোলমৌরী" গাছের শিকড়,—ছাঁচি চিনি সহ তিন দিন খাওয়ান হইল, অমনি সে জ্বর বিনাপয়সায় সারিয়া যাইল,—ইহাই ছিল সেকালের চিকিৎসা।

আর এখনকার অবস্থা,—আমাদের বাড়ীর পাশে যে নিম গাছ আছে, তাহাকে

ক'টা লোকে চিনে? চেনে না বলিয়াই ত আমাদের এত দুর্গতি। কেবল লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছি :—

"নিম নিসিন্দা আছে যথা,
রোগ কি যাইতে পারে তথা?"

এমন রোগ নাই যাহা "নিম,, দ্বারা সারে না। অনেকে বলেন যে, বেশী দিন "নিম,, ব্যবহার করিলে শুক্র ক্ষয় হয় সুতরাং পুরুষত্ব হানি হইতে পারে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। নিম গাছের পাতা, ছাল, ফল, মূল, মূলের ছাল ফুল ও আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি, বাড়ীর দক্ষিণদিকস্থিত নিম নিসিন্দার বাতাসও ভেষজগুণ সম্পন্ন।

নিম্ন লিখিত রোগে নিম ব্যবহৃত হয় :—

১। জ্বর রোগে—নিমছাল, গুলঞ্চ (নিম-গাছের হইলে ভাল হয়) ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন এই সমস্ত গুলি মিলিত দুই তোলা, এক পোয়া জল দিয়া একছটাক কাথ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়।

বিষম জ্বরে অষ্টাঙ্গ ধূপ, অপরাজিত ধূপ প্রভৃতির প্রধান উপাদান নিমপাতা।

পিত্ত জ্বরে গাত্র দাহ থাকিলে বিছানায় নিমপাতা বিছাইয়া তাহার উপর শোয়াইলে দাহ নিবারণ হয়।

২। সর্ব্বরোগহর—নিমের পাতার ঝোল রাঁধিয়া সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন খাইলে শরীরে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। ম্যালেরিয়ারোগী নিমের পাতার ঝোল ও কাগজী বা পাতি লেবুর কাথ খাইলে তাহার ম্যালেরিয়া রোগ সারিয়া যায়।

৩। গ্রহণী রোগে নিমপাতা, নিসিন্দা [illegible] সিদ্ধি ও বেল পাতা চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে জল সহ সেবনে গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়।

৪। অর্শরোগে—কচি নিম পাতা উত্তম রূপে বাটিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অর্শে লেপন করিলে অর্শের জ্বালা-যন্ত্রণা সারিয়া যায়।

৫। রক্তার্শে—নিমছাল, দারুচিনি, দারু হরিদ্রা, বেণারমূল ইহাদের কাথ পান করিলে রক্তার্শঃ সারিয়া যায়।

৬। ক্রিমি রোগে—নিমছাল, চিরতা, বিডঙ্গ, ইন্দ্রযব ও পলাশ বীজ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় তিন দিন খাইলে ক্রিমি মরিয়া যায়।

৭। কামলা রোগে—নিমছাল, পুনর্ণবা, হরীতকী, দারুহরিদ্রা, কটকী, পটোল পত্র, গুলঞ্চ এবং শুঁঠ ইহাদের কাথ দুই তোলা গো-মূত্র সহ পান করিলে কামলা, উদরী, সর্ব্বাঙ্গ শোথ সারিয়া যায়।

৮। যক্ষ্মার জ্বরে—নিম পাতা, গুলঞ্চ ও ক্ষেৎপাপড়া ইহাদের কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে যক্ষ্মার জ্বর ভাল হয়।

৯। কফজ তৃষ্ণায়—নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল গরম থাকিতে পান করিলে কফজ তৃষ্ণা ভাল হয়।

১০। অরুচি রোগে—নিমছালের কাথ খাওয়াইয়া বমি হইলে তৎপরে সোঁদালের কাথ, মধু ও যোয়ান চূর্ণ দিয়া পান করিলে অরুচি সারে।

১১। অম্লপিত্ত জনিত বমি রোগে—নিম ছাল, পটোল পত্র, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে অম্লপিত্তের বমি সারে।

১২। উন্মাদ রোগে—নিমপাতা, বচ, হিং, সাপের খোলস ও সরিষা এই সকলের ধূপ প্রদানে উন্মাদ রোগের অনেক উপকার হয়।

১৩। শূল রোগে—নিমছাল, আমলকী হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, কটকী ও সোঁদালের মজ্জা—ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে শূলের ব্যথার উপশম হয়।

১৪। মৃগী রোগে—রবিবারে নিমের শিকড় তুলিয়া তাহা লাল সূতার দ্বারা হস্তে ধারণ করিলে মৃগী রোগ সারিয়া যায়।

১৫। বাতরক্তে—নিমের পাতা ও পলতা

ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে বাতরক্ত দোষের পরিপাক হয়।

১৬। মেহ রোগে—নিমছাল, পালিতা মাদার, জয়ন্তী, চিতামূল, খাদরকাষ্ঠ, আকনাদি, অগুরু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং ছাতিম ইহাদের পৃথক কাথ—মধু সহ সেবন করিলে সকল প্রকার মেহ ভাল হয়।

১৭। প্রমেহ রোগ জন্য ফোড়া হইলে, নিমপাতা বাটিয়া ঘৃতের সহিত গরম করিয়া ফোড়ায় দিলে ক্ষত শুকাইয়া যায়।

১৮। শোথ রোগে—নিমপাতা, শিম পাতা, পুনর্ণবা ও পালিতা মাদারের পাতা ইহাদের পুঁটুলি বাধিয়া গরম করিয়া স্বেদ দিলে শোথে উপকার হয়।

১৯। গোদ রোগে—নিমের মূলের ছাল। চারি আনা ও খদির চারি আনা একত্র বাটিয়া গোমুত্র সহ পান করিলে গোদ ভাল হয়।

২০। নালী ঘায়ে—নিমপাতা চুর্ণ অর্দ্ধ তোলা, আধ পোয়া গাওয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া সেই ঘৃত—ন্যাকড়ায় মাখাইয়া, নালীর মধ্যে দিয়া রাখিলে ঘা শুকাইয়া যায়।

২১। ভগন্দরে—নিমের পাতা, তিল ও যষ্টিমধু—দুগ্ধ সহ বাটিয়া ভগন্দরে প্রলেপ দিলে ভগন্দর ভাল হয়।

২২। গরমী পীড়ায়—নিমছাল, পলতা, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথে গুগ্‌গুল ও ত্রিফলা চুর্ণ দিয়া পান করিলে গরমী ভাল হয়।

২৩। কুষ্ঠ রোগে—নিমের শিকড়, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল এই ৫টী দ্রব্যের কাথ পান করিলে কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়।

নিমের তেল কুষ্ঠে, খোসে বা যে কোন ঘায়ে দিলে ভাল হয়।

২৪। নিমের শিকড় হইতে এক প্রকার আটা বাহির হয়, সেই আটা ১ রতি পরিমাণে খাইলে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জরা ব্যাধি আসিতে পারে না।

২৫। অম্ল পিত্তে—নিমছাল, গুলঞ্চ ও পলতা—ইহাদের কাথে মধু দিয়া পান করিলে দারুণ অম্লপিত্ত সারে।

২৬। বসন্তরোগে—নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, দুরালভা, চিরতা, কটকী, ক্ষেৎপাঁপড়া ইহাদের কাথ পান করিলে ও নিম পাতার বাতাস দিলে অপক্ক ও পক্ক বসন্ত শীঘ্রই শুষ্ক হয়। বসন্ত জনিত জ্বরেও ইহা মহৌষধ।

২৭। নিমের ডালের দাঁতন করিলে বাক্যের জড়তা সারে।

উপরি উক্ত রোগ সমূহ এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগ নিমের দ্বারা আরোগ্য হয়। এমন সমস্ত ঔষধ আমাদের বাড়ীর পাশে থাকিতে কথায় কথায় আমরা ডাক্তার ডাকি। তাই কবি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন

"দিনে দিনে হ'ল দেশের,
হায় রে এ কি নূতন হাল,
বসন ভূষণ আচারাদি সব দিকে—
ইংরাজী চাল।
বসন ভূষণ যাউক তাতে,
নাইক তত মনের জ্বালা,
ডাল ভাতের শরীরে এত
বিলাতী-বিষ কেন ঢালা?
ঘরের কারো অসুখ হ'লে
এমনি টোট্‌কা দিতেন বুড়ী,
কোথাকার রোগ কোথায় যে'ত
লাগতো নাক বৈদ্যের কড়ী।"

এখন থানকুনি, বাসক, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাঁপড়া, কণ্টকারী, আদা, পুনর্ণবা প্রভৃতি অযত্নসম্ভূত গাছ সকলের গুণ ক'টা লোক জানে?

বিবিধ প্রসঙ্গ

বৈদ্যবেদ-বিদ্যালয়।—চন্দননগরে বৈদ্য বেদ বিদ্যালয় নামে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অনুকরণে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্বোধনের দিনে

নগরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বৈদ্যকুলগৌরব কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সেই সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভারতবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি, মহাশয় এবং আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেনডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্য চরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন প্রভৃতি অনেকে সে সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

রায়সাহেব কমলা প্রসন্ন রায়।—আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বৈদ্যজাতির অন্যতর গৌরব রায়সাহেব কমলা প্রসন্ন রায় মহাশয় গত পৌষ সংক্রান্তির শেষ রাত্রে অকালে উদরী পীড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বীরভূম রামপুরহাটের ম্যাজিষ্টেটের আদালতে প্রধান ব্যবহারজীবী ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, বহুকষ্টে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া কমলা প্রসন্ন সত্বরেই অবস্থার উন্নতি পূর্ব্বক নিজ বংশের গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। পুণ্য-শ্লোকের বংশে কমলা প্রসন্নের জন্ম; নিজ বংশের গৌরবরক্ষার জন্য কমলাপ্রসন্ন তাঁহার উপার্জ্জিত সমুদায় অর্থ অকাতরে পরহিতব্রতে দান করিতেছেন। তাঁহার দুইটি পুত্র, একমাত্র কন্যা ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। কমলাপ্রসন্ন বাগ্মী, সুলেখক ও আয়ুর্ব্বেদানুরাগী ছিলেন। দরিদ্র প্রজার ঋণভার শীঘ্রই কমাইবার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ জন হিতৈষণায় মুগ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহাকে রায়-সাহেব উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার অভাবে রামপুরহাটের যেরূপ বিশেষ ক্ষতি হইল, সেইরূপ বৈদ্যজাতীর বিখ্যাত কুলীন দুর্জ্জয়ের বংশায় একটী রত্নেরও অভাব হইল। আমরা এই শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি। আমরা এইস্থলে আর একটী সংবাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—কমলাপ্রসন্ন আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সুযোগ্য জামাতা আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় এই বিদ্যালয়ের এবং "বৈদ্যশাস্ত্রের পীঠে"র শারীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ১ম ছাত্রকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণপদক ও কমলাপদক নামে ২টী রৌপ্য পদক প্রদান করিবেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন সেসন অন্যান্য বর্ষের মত এবারও আষাঢ়েই আরম্ভ হইবে। গত বৎসরই যেরূপ ছাত্রের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে এবার স্থানাভাবের বিশেষ সম্ভাবনা। বৈশাখ হইতেই ছাত্র ভর্ত্তি করিয়া রাখা হইবে, অতএব এই বিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছুক ছাত্রগণ এখন হইতে আবেদন করুন।

নৈশ অধ্যাপনা।—আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ প্রচারোদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কেবল মাত্র অফিসারদিগের জন্য একটি নৈশ ক্লাস খোলা হইবে। সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের সারসঙ্কলন পূর্ব্বক এই বিভাগে দুই বৎসরে চিকিৎসার সকল বিষয় অধ্যাপনা করা হইবে। মাসিক বেতন হইবে তিন টাকা। প্রবেশ ফিঃ তিন টাকা। যাঁহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করুন।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
৩২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ
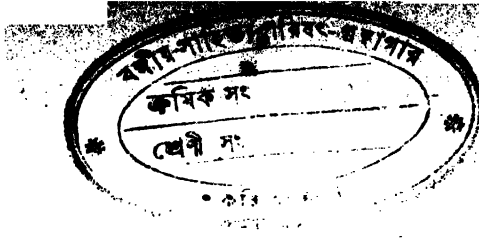
৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব। *

—:০:—

যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা জাগতিক সর্ব্ববিধ চিকিৎসার মূল, যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার স্নিগ্ধ-শান্ত-কারুণ্যরসে একদা বিশ্ববাসীর অধিবাসী মণ্ডলী নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ-চতুর্ব্বিধ সম্পদ লাভে সক্ষম হইয়াছিল, আর্য্য ঋষির আবিষ্কৃত যে আয়ুর্ব্বেদের অপূর্ব্ব প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া একদা এই চিকিৎসা গ্রহণের জন্য সমগ্র মহীখণ্ডে বিস্ময় বিহ্বলা-বশে কি যেন এক জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলে আধুনিক উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সভ্য জগতে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব আলোক রশ্মিরও সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, —সে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ এখন কিরূপ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। দৈবতার প্রসাদ ভিক্ষা যেরূপ বিপদ সঙ্কুল অবস্থা ভিন্ন এখন-কার দিনে বড় একটা কেহ করিতে চাহেন না, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শরণ গ্রহণ সম্বন্ধেও প্রায় অনেকের অবস্থাই তদ্রূপ হইয়াছে। তরুণ জ্বরে তীক্ষ্ণ বীর্য্য ঔষধ সেবনে জ্বর আটকানর পর যখন

"দোষোঽল্প হিতসংভূতো জ্বরোৎ সৃষ্টস্য বা পুনঃ
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষম জ্বরং।"

এইরূপ অবস্থায় পরিণত হয় এবং

নিত্যং মন্দজ্বরো রুক্ষ শূনকস্তেন সীদতি।
স্তব্ধাঙ্গ শ্লেষ্ম ভূয়িষ্ঠো নরো বাত বলাসকী"॥

অথবা—

"প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেন চ।
মন্দজ্বর বিলেপী চ স শীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ।

এইরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, তখনই দেবতার উদ্দেশে মানস করার মত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরও শরণ গ্রহণ করা হয়। পেট

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

জোড়া প্লীহা, বক্ষজোড়া অগ্রমাস, পার্শ্ব জোড়া যকৃত খণ্ড, দুইবার করিয়া জ্বরের হ্রাস ও বৃদ্ধি, সর্ব্ব দেহ পাণ্ডুতা ও শোথ সঙ্কুল—এইরূপ বীভৎস অবস্থা প্রাপ্তি ভিন্ন এখনকার দিনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ কয়জন করিয়া থাকেন, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ভিন্ন শোথ, উদরী, গ্রহণী প্রমেহ, বহুমূত্র, শূল,অম্লপিত্ত,উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি যে সমস্ত রোগের সহিত পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী একেবারেই যুদ্ধ করিতে অক্ষম, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের সহিত সেই সকল রোগীরই সন্দর্শন লাভ ঘটিয়া থাকে। দেশের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সাধারণের মনে এমনই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, নূতন জ্বরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করান কোনোক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, কারণ উগ্রবীর্য্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় উহাতে যত শীঘ্র উপকারের সম্ভব, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে তাহা কখনই হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস যে, নিতান্ত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ—তাহা সত্য করিয়া,—উর্দ্ধ পানে চাহিয়া বুকে হাত দিয়া বলিতে হইলে, পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকমণ্ডলীরও অস্বীকার করিবার যো নাই। যাঁহারা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সমুদ্ভাসিত তীক্ষ্ণোজ্জ্বল আলোকে ঝলসিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবগত থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু যাঁহারা সেই আলোক-সংস্থানের বিধাতৃপুরুষ, সত্য কথা বলিলে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঝঞ্ঝাবৃষ্টি পরিপূরিতা ঘোরা তিমিরা যামিনীতে দামিনীর আলোকে যে মধুরোজ্জ্বল ভাব নিহিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক আলোকমালা অপেক্ষা তাহা বাস্তবিকই তৃপ্তিপ্রদ, কারণ ব্যোমমার্গে দামিনীর বিকাশ আকস্মিক ও নিমেষ কালের জন্য পরিদৃষ্ট হইলেও তাহা মৌলিক এবং বিজ্ঞানবলে এই সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে রাজবর্ত্মগুলিতে অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোকের সহিত নগরবাসীর সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা কৃত্রিমতার প্রকটমূর্ত্তি।

চিকিৎসা-জগতেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা মৌলিক চিকিৎসা,—সেই মৌলিক সনাতন চিকিৎসা হইতেই বিজ্ঞানবলে অন্য দেশের চিকিৎসা উন্নতির উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় হইয়া মৌলিক চিকিৎসার পরিপন্থী হইয়াছে, কিন্তু মৌলিক চিকিৎসার প্রকৃত প্রভাব যে বিলুপ্ত হইবার নহে—তাহা মুখ ফুটিয়া সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন, মনে মনে সকলেই যে তাহা অবগত আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। মনের কথাও এখন অনেকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, নমুনা-স্বরূপ দু'চারিটী উদ্ধৃত করিতেছি ;—

আমেরিকাপ্রদেশের কালিফর্ণিয়া-সানফ্রান্সিস্কো সহর হইতে জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্ডারস এম ডি :—"অগ্নিবেশ, চরক-সুশ্রুত এবং অপরাপর ভারতীয় ঋষিগণের পবিত্র স্মৃতি আজিও তাঁহাদিগের গ্রন্থগুলিতে জাগরূক রহিয়াছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থ আরবী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল। অ্যালোপ্যাথি ও

হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র যাহা আমি এতকাল পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি, তদপেক্ষাও আয়ুর্ব্বেদীয় মত যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি বিলক্ষণ প্রতীতি করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদই যথার্থ স্বভাব ও জ্ঞানসঙ্গত চিকিৎসার অনুসরণ করিয়াছে।

আমেরিকায় বহুদর্শী ডাক্তার জর্জ্জ ক্লার্ক এম-এ; এম ডি—

ইংরাজী চরক পাঠে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই. সে সিদ্ধান্ত এই, যদি বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগের ঔষধের তালিকা হইতে আধুনিক যাবতীয় ঔষধ ও রাসায়নিক পাক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে চরকের মতানুযায়ী চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শববাহকের কার্য্য অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে এবং পৃথিবীতে চির রোগীর সংখ্যাও কম হইবে।”

ভাগলপুরের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর শ্রীযুক্ত স্কাইন—“ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশবাসী ও সভ্যতাভিমানী আমরা, সেই সকল বিষয়ের আবিষ্কারক বলিয়া এখন গর্ব্ব করিয়া থাকি।”

কলিকাতার বিখ্যাতনামা ডাক্তার চার্লস সাহেব মহোদয় মেডিকেল কলেজে ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন, “হে হিন্দু ছাত্রগণ। তোমাদের ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, আজ সেই বিদ্যাই আমি অসম্পূর্ণ ভাবে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।”

প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাঃ মেক্লাউড একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—“আমাদের বর্ত্তমান অস্ত্র-চিকিৎসাপ্রণালী অপেক্ষা সুশ্রুতের কোনো কোনো প্রণালী অনেক উন্নত।”

ভারতের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সারজন লিকুইস মহোদয় একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে চিকিৎসাপ্রণালী এবং ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বড়ই গৌরব অনুভব করি, এখন দেখিতেছি যে, ভারতের ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণির দুইজন ডাক্তার শোথ পীড়ায় লবণ ও জল পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহাতে জগতের চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহাদিগকে ধন্য ধন্য করিতেছেন, ভারতের ঋষিগণ কিন্তু কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই তত্ত্ব বিশদরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! ভারতের একজন সামান্য পল্লী-চিকিৎসকও শোথ রোগে লবণ জল বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকে।”

ডাঃ গার্ব্বি, ডাঃ জেকবি, বার্থ, সেণ্ট-হেলিয়ার, ওয়েন, এডগ্রিণ, সবন্‌সেন, জ্যাকসন, পল, বার্থলম প্রভৃতি আমেরিকা, জর্ম্মাণ, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেন্‌মার্ক ও ইংলণ্ডাদি দেশের মহাপণ্ডিতগণ ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় কেহ লিখিয়াছেন,—“ভারতের চরক নামক চিকিৎসা গ্রন্থে ছয় শত প্রকার বিরেচক ঔষধেরই ব্যবস্থা আছে। না জানি, সে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান কত দূর অসীম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।”

কেহ লিখিয়াছেন,—“উন্নতশীল পাশ্চাত্য

চিকিৎসা লইয়া আমরা যতই জাঁকজমক করি না কেন, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ভারতীয় চিকিৎসাপ্রণালীর অনেক বিষয়ের নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতে হয়।”

কেহ লিখিয়াছেন,—“কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা অধুনা যে সকল ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া মনে মনে বড়ই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, তাহার প্রায় অধিকাংশই দেখিতেছি, ভারতীয় ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।”

এ অবস্থায় তরুণ জ্বরে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোক প্রাপ্ত বাঙ্গালী বাবু যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতে পারেন না,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের উপর জ্বর বিকারের চিকিৎসার ভার প্রদান করিলে রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে করেন—ইহা আয়ুর্ব্বেদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে নবজ্বরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যেরূপ কার্য্যকরী হইয়া থাকে—কোনো চিকিৎসাই সেরূপ হইতে পাবে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা নবজ্বরের চিকিৎসা যে প্রণালীতে করিয়া থাকেন, তাহা রোগের মূলকারণ—বায়ু-পিত্ত-কফের বিকৃতি বৈষম্য অবলম্বন করিয়া নহে, তাপমান যন্ত্রে জ্বর-বেগের গতি নিরীক্ষণ করিয়া সেই বেগের হ্রাসতা সম্পাদনের পর জ্বরের গতি নিরোধ করাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চিকিৎসা-প্রণালী। আর্য্যঋষিগণ কিন্তু এরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই। আর্য্যঋষি চিকিৎসার ক্রমোপদেশে বায়ু-পিত্ত-কফের বিচার-বিশ্লেষণে বলিয়াছেন—

বাতঃ পচতি সপ্তাহাৎ পিত্তঞ্চ, দশভির্দ্দিনৈঃ।
শ্লেষ্মাদ্বাদশভির্ঘ স্রৈঃ পচ্যতে বদতাং বরঃ॥
ভাব প্রঃ, মধ্যখণ্ড জ্বরাধিকার।

অর্থাৎ সপ্তাহে বায়ু, দশম দিবসে পিত্ত এবং দ্বাদশ দিবসে শ্লেষ্মার পরিপাক হয়। এজন্য জ্বরের সহিত অকালে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হইয়া

জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং প্রোক্তং জ্বরমধ্যে তু পাচনম্।
জ্বরান্তে ভেষজং দদ্যাজ্জ্বর মুক্তে বিরেচনম্॥

জ্বরের আদিতে লঙ্ঘণ, জ্বরের মধ্যে পাচন এবং জ্বরের অন্তে জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং জ্বর মুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্যের অন্যথা চরণে—

দুর্হৃতেষ চ দোষেষু যস্য বা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পেনাপ্য চারেণ তস্য ব্যাবর্ত্তনে পুনঃ॥
চিরকাল পরিক্লিষ্টং দুর্ব্বলং দীন চেতসম্।
অচিরেণৈব কালেন স হন্তি পুনরাগতঃ॥
অথবাপি পরিপাকং ধাতুষেব ক্রমান্মলাঃ।
যাতি জ্বরম কুর্ব্বন্তেস্তে তথাপ্যপ কুর্ব্বতে॥
দীনতাং শ্বয়থুং গ্লানিং পাণ্ডুতাং নান্নকামতান্।
কণ্ডূরুৎ কোঠ পীড়কাঃ কুর্ব্বন্ত্যগ্নিঞ্চ তে মৃদুম্॥
চরক—চিকিৎসা—৩য় অঃ ২৩১, ২৩২ ২৩৩।

অর্থাৎ দোষসকল অনুচিতরূপে ও অসময়ে নিঃসারিত হওয়ার পরেও জ্বর নিবৃত্ত হয়, তাহা স্বল্পমাত্র অপচারেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এইরূপে প্রত্যাগত জ্বররোগীকে বহুদিবস পর্য্যন্ত পরিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও দীনচিত্ত করিয়া পরে বধ করে। অথবা দোষ সকল জ্বর না উৎপন্ন করিয়াও ক্রমে ধাতুক্ষয় করিয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়; তাহাতে দীনতা, শোথ, গ্লানি, পাণ্ডুতা

ও অন্নে অনভিলাষ; কণ্ডু, উৎকোঠ, পীড়কা ও অগ্নিমান্দ্য হয়।

শুধু জ্বরের সম্বন্ধে এই বিচারই আয়ুর্ব্বেদ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন নাই এইরূপে মানবের অন্যান্য রোগও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না হইয়া সারিলে অল্প অপচারেই পুনর্ব্বার আসিতে পারে—এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

এবমন্যেঽপি চ গদা ব্যাবর্ত্তন্তে পুনর্গতাঃ
অনির্যাতেন দোষাণামল্পৈরপ্য হিতৈ নৃণাম্॥

চরক—চিকিঃ—৩য় অঃ ২৩৩

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা চাহেন,—রোগ হইয়াছে, রোগঘ্ন ঔষধ প্রয়োগে যেমন করিয়া হউক উহা বন্ধ কর, কিন্তু আর্য্য ঋষি চাহেন তাহা নহে, রোগ হইয়াছে রোগের যন্ত্রণার হস্ত হইতে মানবকে রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্য ভুলিওনা—চিকিৎসার উদ্দেশ্য মনে রাখিও—স্বাস্থ্যলাভ, মন. বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের তুষ্টিই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, স্বাস্থ্যের অনুবন্ধ দীর্ঘায়ু, দেহের সহিত প্রাণের সংযোগ আয়ুর লক্ষণ।—এজন্য রোগ হইলে আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিবার সময় রোগী কোন্ দেশে জন্মিয়াছে, বর্দ্ধিত হইয়াছে বা কিরূপভাবে রোগগ্রস্ত হইয়াছে,—যে দেশে রোগীর জন্ম—সে দেশের লোকেরা সাধারণতঃ কিরূপ আহার-বিহার করে, তাহাদের বল, সত্ত্ব, সাত্ম্য দোষ, ব্যাধি, হিত ও অহিতই বা কিরূপ—এগুলি বিবেচনা করিয়া তবে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে। ব্যাধি-প্রশমনে আর্য্য ঋষির অমূল্য উপদেশ,—চিকিৎসা—বল ও দোষের প্রমাণ অপেক্ষা করে, যদি চিকিৎসক দুর্ব্বল রোগীকে পরীক্ষা না করিয়া অতি বল ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে রোগীর প্রাণবিনাশ হয়। অল্প বল রোগী অতি বল, অত্যন্ত আগ্নেয়, অতিশয় সৌম্য বা অতিশয় বায়বীয় ঔষধ এবং অগ্নি, ক্ষার ও শস্ত্রকর্ম্ম সহ্য করিতে পারে না, কারণ দুর্ব্বল শরীরে এই সকল ঔষধ অসহ্য ও তীক্ষ্ণ হয় বলিয়া সদ্যঃ সদ্যঃ রোগীর প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

অন্য দেশীয় চিকিৎসার সহিত আয়ু-র্ব্বেদের বিশেষত্ব এই স্থানেই,—পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসকেরা দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের ধার আদৌ ধারেন না, তাঁহাদের শাস্ত্র অনুসারে তাহা জানিবারও আবশ্যক হয় না, এজন্য তাঁহারা যে প্রণালীতে চিকিৎসা করেন, তাহা মূল ব্যাধির আরোগ্যের সাহায্য না করিয়া প্রকাশমান ব্যাধিরই উপশম করিয়া থাকে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ সকল রোগেই দোষের অবস্থা বুঝিয়া অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত,কফের বিকৃতি-বৈষম্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়া তবে চিকিৎ-সার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। রোগের প্রকারভেদ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্ব্বেদের মতে দোষ লইয়াই চিকিৎসা, অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া যিনি চিকিৎসা করিতে পারেন—আর্য্য ঋষির কারুণ্য বলে তিনিই যশস্বী চিকিৎসক বলিয়া নির্ণীত হইতে পারিবেন।

আয়ুর্ব্বেদের মতে জ্বরোৎপত্তির কারণে—

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামোমার্গান পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

সামদোষ অর্থাৎ অপক্ক রস সংযুক্ত দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিদোষ আমাশয়ে

অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নিমান্দ্য জন্মাইয়া দেহস্থিত রসবহ এবং ঘর্ম্ম বহ স্রোত (পথ) সমূহকে রুদ্ধ করতঃ জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। এই জন্যই নবজ্বরে লঙ্ঘন (অনশন) ব্যবস্থেয়। কিন্তু বিদেশীয় চিকিৎসকের এই দোষের প্রকোপ লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হয় না, Temparature এর Hatt ই তাঁহাদের জ্বর-চিকিৎসার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তবে আয়ুর্ব্বেদের মত তাঁহাদের জ্বরের শ্রেণী বিভাগ বায়ু পিত্ত কফ লইয়া না থাকিলেও সবিরাম, স্বল্পবিরাম, অবিরাম প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ যাহা আছে, তাহাও তাঁহাদের চিকিৎসার পন্থা নির্দ্দেশের উপায়স্থল হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা কি ঠিক নহে যে, দোষক্ষয়ের সময়কালের প্রতীক্ষা না করিয়াই তাঁহার জ্বর রোধের চেষ্টা করিয়া থাকেন? যদি আর্য্যঋষির অমূল্য উপদেশ মানিতে হয়, তাহা হইলে একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দোষ সকল অনুচিতরূপে ও অসময়ে নিঃসারিত করিয়া জ্বর বন্ধ করার ফলেই ধরিত্রীর জীবগণ—বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় নরনারী নানারূপ ব্যাধিপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে। চিকিৎসা—চিকিৎসা, চিকিৎসা মন্ত্রশক্তি নহে। চিকিৎসায় ভেল্কী বা ভোজবাজীর মত দেখাইতে যাইলে প্রকৃত চিকিৎসা করা হয় না, তদ্দারা সাময়িক রোগের উপশম হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফলে ভবিষ্যতের জন্য যে নূতন রোগকে আহ্বান করিয়া আনা হয়, যাঁহারা হিন্দু তাঁহাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতেই হইবে।

মহর্ষিসুশ্রুতও জ্বরচিকিৎসায় যদি অকালে জ্বর বন্ধের ব্যবস্থা করা হয় তাহার ফলে বলিয়াছেন,—

ভেষজং হ্যাম দোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরং।
শোধনং শমনীয়ন্তু করোতি বিষম জ্বরম্।

সুশ্রুত-উত্তরতন্ত্র, একোন চত্বারিংশ অঃ—৩২

অর্থাৎ অপক্ক দোষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পায়. এ অবস্থায় শোধন ও সংশমন ঔষধে বিষম জ্বর উৎপাদন করে।

কে বলিবেনা যে, বর্ত্তমান যুগে ম্যালেরিয়াই বলুন আর কালাজ্বরই বলুন, বিষম জ্বর রোগীর সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার মূল কারণ অপক্ক দোষে ঔষধ প্রয়োগের ফলসম্ভূত নহে। প্রকৃতি-বিপর্য্যয়, দেশের ভাগ্য বিপর্য্যয়—এ সকলও থাকিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসার দোষে অর্থাৎ অপক্ক দোষে নবজ্বরে তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকল সেবন করিয়াই যে এখন বহু সংখ্যক নরনারী নানারূপ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া পরিশেষে অকাল মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য কথা, আর্য্য ঋষির অমূল্য উপদেশাবলী যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে এ কথা বিশ্বাস করিতেই হইবে।

নবজ্বরে পাশ্চাত্যচিকিৎসকেরা বায়ু-পিত্ত-কফের বিচার করেন না, কোন্ জ্বরে কতদিন ভোগকাল তাহার নির্ণয় করেন না, রোগীর প্রকৃতি ও সাত্ম্যের অনুসন্ধানও করেন না, যেরূপ জ্বর বা যে দেশের লোকেরই জ্বর হউক না কেন, জ্বর-বিচ্ছেদকারক ঔষধ প্রয়োগ করেন এবং জ্বরের বিরাম পাইলেই কুইনাইন দিয়া তাহা রোধ করিতে চেষ্টা করেন,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাই জ্বরের সাধারণ চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাও যদি সেই পন্থা অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহা-

দের চিকিৎসাতেও রোগীর জ্বর-যন্ত্রণা পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসার মত অল্প দিনেই মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যঋষি মাথার দিব্য দিয়া তো বলিয়া দিয়াছেন, সেরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করিওনা, তাহাতে এক রোগ আরোগ্য করিতে গিয়া অন্য রোগকে আনয়ন করা হইবে। এই জন্যই —

জ্বরিতং ষড়হেংতীতে লঘ্বন্ন প্রতিভোজিতম্।
পাচনং কষায়ং বা শমনং পায়য়েদ্ধিমান্॥

কিন্তু দেশের লোকে যে এ কথা বুঝেনা, ইহাই তো দুঃখের কথা।

আয়ুর্ব্বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিদ্ দিগের মত শুধু রোগের চিকিৎসা নহে, আয়ুর্ব্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য,—রোগ আরোগ্যের মত ধরিত্রীর জীবগণকে যাহাতে আদৌ রোগের আক্রমণে পতিত হইতে না হয় তাহারই উপায় বিধান করা। আয়ুই হিত এবং আয়ুই অহিত, আয়ুই সুখ, এবং আয়ুই দুঃখ, অতএব হিতাহিতই আয়ুর মান, আয়ু যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে। রোগ শব্দের সংক্ষেপতঃ অর্থ শরীর ও মনের বিকৃতি। এক কথায় শরীর ও মন এই দুইটি লইয়াই রোগের সৃষ্টি। কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় বিষয় ইহাদের মিথ্যা যোগ, অযোগ ও অতিযোগ—এই তিনটি ব্যাপার শারিরীক ও মানসিক উভয় প্রকার ব্যাধিরই হেতু। অযোগ শব্দের অর্থ হীন যোগ, কালের হীন যোগ যথা শীতকালে সম্যক শীত না হওয়া, কালের অতি যোগ যথা শীতকালে অত্যন্ত শীত হওয়া, কালের মিথ্যাযোগ যথা, শীতকালে একেবারে শীত না হওয়া। বায়ুপিত্ত ও কফের বিকৃতি-বৈষম্য শারীরিক ব্যাধি উৎপত্তির কারণ। মনের দোষ সত্ত্ব রজঃ ও তম। শারীরিক দোষ—দৈব ও যুক্তির আশ্রয় দ্বারা শান্ত হয়, আর মনের দোষ—জ্ঞান, বিজ্ঞান ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি দ্বারা শান্ত হয়। দৈব শব্দের অর্থ স্বস্ত্যয়নাদি। যুক্তি শব্দের অর্থ ঔষধ প্রয়োগ। আয়ুর্ব্বেদের সূত্র এইরূপ ভাবে গ্রথিত। আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন আর কোন দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ সূত্রের গ্রন্থন আছে কিনা, তাহা আমি তো জানি না।

বায়ু পিত্ত ও কফ—এই তিনটী বিষয়ের মীমাংসা সাধন আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় তাহার নাম বায়ু। ডাক্তারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া 'নর্ভ' নামক শিরাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু এই নার্ভ সকল কিরূপে ক্রিয়া করে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই, আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিশদ বিবরণ বিবৃত আছে। পিত্ত শব্দে জীব-শরীরের উষ্মাকে বুঝাইয়া থাকে। ডাক্তারেরা ইহাকে 'অ্যানিমেল-হিট' বলেন। সাধারণতঃ শরীরের জলীয়াংশের নাম শ্লেষ্মা। বস্তি, পক্বাশয় কটি, নিতম্বদ্বয়, পদদ্বয় ও অস্থি সমূহ—ইহারা বায়ুর স্থান, তন্মধ্যে পক্বাশয় বা বিষ্ঠাশয় বায়ুর প্রধান স্থান। স্বেদ, রস, লসীকা, রুধির ও আমাশয় পিত্তের স্থান। শারীরিক উষ্মা পিত্তের ধর্ম্ম। বক্ষঃস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ, আমাশয় ও মেদ—শ্লেষ্মার স্থান। বায়ু পিত্ত ও কফ সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে ও

শরীরে কুপিত ও অকুপিত হইয়া শুভাশুভ করিয়া থাকে। এই অশুভ ফল হইতেই রোগের সৃষ্টি হইয়া অশীতি প্রকার বাতজ ব্যাধি, চল্লিশ প্রকার পিত্তজ ব্যাধি এবং বিংশতি প্রকার কফজ রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্য ও বৈষম্য বিচার করিয়া দ্রব্য সমূহের গুণ ও তাহাদের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই মনুষ্য দীর্ঘায়ুলাভে সক্ষম হইয়া থাকে। চিকিৎসার সাফল্যও এই স্থানেই। আর্য্য ঋষির উপদিষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ গুলিতে এই উপদেশই বর্ণিত হইয়াছে। অন্য দেশের চিকিৎসার সহিত ইহাই আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব। রোগ যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, যাহাতে নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারা যায়,—তাহার যে উপায় বিধান করিবেই, তদ্ভিন্ন রোগ হইলে রস-প্রভাব, দ্রব্য-প্রভাব, দোষ-প্রভাব ও রোগ-প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবে,—ইহাই আর্য্য ঋষির অমূল্য উপদেশ। এরূপ উপদেশ আর কোন শাস্ত্রে আছে কি?

(আগামী বারে সমাপ্য)

বিষ-বিজ্ঞান।

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

বাস্তু সাপ।

"বাস্তু সাপ" কাহাকে বলে?

যে বিষধর বহুকাল ধরিয়া গৃহস্থের গৃহে বাস করে, তাহারই নাম 'বাস্তু সাপ"। সেকালের লোক বাস্তু সাপকে বড় ভক্তি করিতেন; তাহাদের বিশ্বাস ছিল—বাস্তু সাপ প্রত্যক্ষ দেবতা। যে ভিটায় বাস্তুর অধিষ্ঠান —সে ভিটায় মা লক্ষ্মীর "রত্ন ঝাঁপি" বর্ত্তমান। বাস্তুর কল্যাণে—গৃহস্থের কোন আপদ বিপদ ঘটেনা। বিশেষ কোন অপরাধ না পাইলে বাস্তু কাহাকেও দংশন করেনা।

পক্ষান্তরে বাস্তু যদি মরিয়া যায়, কিম্বা অত্যাচারের তাড়নায় বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেই গৃহস্থের সর্ব্বনাশ! লক্ষ্মী সে সংসারে আর থাকেন না,—সে গৃহস্থ ভাগ্য বঞ্চনায় অভিসপ্ত, তাহার গোয়াল ভরা গরু মরে, ক্ষেত ভরা ধান শুকায়, পুকুর ভরা মাছ পচে, বাগান ভরা গাছ জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। শেষে রুদ্ধদ্বার কক্ষে—অন্ধকার ও বিজনতা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাস্তু গৃহস্থের শুভকামী সুহৃদ, অতএব বাস্তুকে মারিতে নাই।

জনশ্রুতি—যে দেশের ইতিহাসের সম্বল,

—সে দেশের লোক-রসনা যে বাস্তু সম্বন্ধীয় অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রসব করিবে, তাহাতে আর বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ কোথায়? সুতরাং কল্পনাপ্রিয় বঙ্গদেশে—বাস্তুর বহু গল্প বহুকাল ধরিয়া নর নারীর মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল গল্পের আখ্যান বস্তু কাব্য-মায়ায় আচ্ছন্ন, বাস্তু মহিমার অরুণাভায় সুরঞ্জিত। আমি তাহার সত্য মিথ্যা লইয়া বিচার করিতে চাহিনা, কেবল দুই চারিটি গল্পের উল্লেখ করিব। তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, হিন্দু ভিন্ন দেবতার দেবনিদ্রা অন্য কেহ ভাঙ্গাইতে পারিবে না। হিন্দুর দেশের ধূলিকণা—শ্রীভগবানের চরণ-তাড়নায় দশ দশ বার পবিত্র হইয়াছিল। জ্ঞানের কঠোর বিতর্ক, কর্ম্মের তীব্র তাড়না,—সমস্ত ভুলিয়া কেবল ভক্তির বলেই হিন্দু একদিন মাধবের মুরলী ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল।

"সাপের মাথায় মাণিক থাকে"—এ প্রবাদ পাঠক মহাশয়েরও অজ্ঞাত নহে। এই মাণিকের মূল্য নাকি সাত রাজার ধন!! গৃহস্থের ঘরের লক্ষ্মী বাস্তু সাপই—এই মাণিকের অধিকারী। বাস্তু সাপের মাথায় মাণিক থাকে। রাত্রিকালে চরিবার সময়, সাপ এই মাণিকখণ্ড মাথা হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিয়া দেয়। মাণিকের বিদ্যুৎবিকাশী-বিমল প্রভায় মুগ্ধ হইয়া, সেখানে অসংখ্য কীট পতঙ্গ একত্র হয়। তাহাদিগকে ধরিয়া খাইবার জন্য ভেককুল মহানন্দে ছুটিয়া আসে। বলা বাহুল্য মাণিকের মালিক সর্প মহাশয়—তখন বাহাল তবিয়তে থাকিয়া সেই ভেকগুলিকে উদরস্থ করেন। কিন্তু এই প্রকার উপায়ে মণ্ডুক ভক্ষণ করা, সর্পের পক্ষেও নিরাপদ নহে। যদি কোন লোক সেই মাণিকের উপর গোবর চাপা দেয়,—মাণিকের শোকে মণিহারা ফণীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!! তাই কবি বলিয়াছেন ——"

"মণিহারা ফণী বাঁচে কি সজনি?
কখন ধরণী-তলে লো!"

যে সে সাপ আবার এই মাণিকের অধিকারী হয় না। যে শালিক পাখী—এক লক্ষ কেঁচো খায়, সেই শালিক পাখীকে যে ভেক ধরিয়া খায়, সেই ভেককে যে সাপ আহার করে, তাহারই মাথায় মাণিকের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সাপের পক্ষে ইহা অতি বড় ভাগ্যের কথা।

এইবার মাণিকের একটা গল্প বলি। নতুবা প্রবন্ধ অঙ্গহীন হইতে পারে! এত বড় প্রবাদটারও মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়! অতএব পাঠক মহাশয়! অবহিত হউন—আমি আরম্ভ করি;—

সাপের মাথায় মাণিক।

এক সময়ে, এক দেশে, এক গৃহস্থ বাস করিতেন। দোহাই আপনাদের, আমি তাঁহার নাম ধাম, আবির্ভাবকালের সন-তারিখ—কিছুই প্রকাশ করিতে পারিব না। আপনারা কেবল জানিয়া রাখুন—সে গৃহস্থ বড় ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। নগরের কেন্দ্র স্থলে—তাঁহার কর্পূর-ধবল প্রাসাদতুল্য শোভাময়ী অট্টালিকা। তাহার সিংহদ্বার অতিথির জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। গৃহস্থের গৃহিণীর স্বহস্তে প্রস্তুত স্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন—নিত্য নিয়ত শত শত অনাথ আতুরের শীর্ণোদর স্ফীত করিয়া তুলিত!

গৃহস্থের "সাত বেটী" ও "সাত বেটা।" পুত্র কন্যা সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এক বৎসর হইল কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। পদার্পিতমাত্র-যৌবনা নববধূ শুভ-ক্ষণে "ঘর" করিতে আসিয়াছেন! সেবায়, সোহাগে, আদরে, স্বামি-গৃহের সকলকেই তিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন।

বধূ অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাহার ক্ষুদ্র দেহে—উজ্জ্বল মধুর লাবণ্য তরঙ্গায়িত। সে স্মিত-সুন্দর মুখখানি যেন শরতের শুভ্র শেফালী! নয়ন দু'টী—যেন নীলপদ্ম, তদুপরি নিবিড় কৃষ্ণ যুগ্ম ভ্রূ; মাথায় ঘন কুঞ্চিত কেশ রাশি, ললাট—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; ওষ্ঠাধরে—মূর্চ্ছিত তাম্বূল রেখা, সর্ব্বাঙ্গে মোহের প্রাণস্পন্দন! এই পুষ্পমঞ্জরীর মত সুন্দরী বালিকাকে—সকলেই ভালবাসিত।

বধূর গুণও অনেক ছিল। কর্ম্মের মধ্যেই সুখ—অল্প বয়সেই বালিকা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সংসারের কার্য্য করিয়া, আপনার মধ্যে আপনি, সে বিপুল আনন্দ অনুভব করিত। তাহার শ্রান্তি ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, বিরক্তিও ছিল না। শ্বশুর-বাটীর অন্তঃপুর তাহার প্রাণপাত পরিশ্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই কর্ম্মনিরতা বালিকাটীকে দেখিলে মনে হইত, শরতের অভ্র-শুভ্র-মেঘ—সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মাখিয়া, সমীরণ হিল্লোলে যেন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সেবা-পরায়ণ হাত দু'খানি—সংসারের পুণ্যানুষ্ঠানে সর্ব্বদাই অনলস থাকিত। সে স্বহস্তে রন্ধন করিত, গুরুজনগণকে আহার করাইয়া, দাস দাসীদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া নিজে স্বামি-দেবতার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিত। বিকাশোন্মুখ ঊষার অরুণ রাগ, যেমন অস্তমান রবির সান্ধ্য কিরণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এই নবীনাটীকে দেখিলে তেমনি প্রবীণা গৃহিণীর মতই বোধ হইত।

প্রত্যহ শ্বশুর-শাশুড়ীর নৈশভোজন সমাপ্ত হইলে, বধূ তাঁহাদের পদসেবা করিত। গৃহ লক্ষ্মীর মায়া পেলব স্পর্শে বিশাল বিশ্বের মোহময় নিদ্রা, সুষুপ্তির কুহক জালে বেষ্টিত হইয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নয়ন অচিরে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিত। গভীর রাত্রিকালে বালিকা শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিত।

এই সময় সে দেখিতে পাইত—তাহাদের অন্দরের উঠানে যেন কিসের আলো জ্বলিতেছে। এ বুঝি নিশান্তের শুকতারা, এ বুঝি শচী-কক্ষের রত্ন-প্রদীপ, এ বুঝি চন্দ্রালোকের অমর রশ্মি! এই উজ্জ্বল আলোক বধূ প্রত্যহই দেখিত, কিন্তু কিসের আলো বুঝিতে পারিত না। আলো দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিত, আবার নিমেষ ফেলিতে নিভিত;—ক্ষণকাল পরেই আবার দ্বিগুণ দ্যুতি বিকীর্ণ করিত। বধূর কৌতূহলী নেত্রে—মোহের ধাঁধা লাগিত, অবাক হইয়া সে চাহিয়া থাকিত, কাহাকেও কিছু বলিত না, আপনার মনেই আপনি ভাবিত।

এই ভাবে কিছু দিন কাটিল। একদিন গভীর নিশীথে—বধূ গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। গ্রীষ্মের গুমটে—তাহার ঘুম হয় নাই। শব্দ হীন স্তব্ধ রজনীতে—মুক্ত গগন-তলে দাঁড়াইয়া বালিকা কিছু স্বস্তি পাইল। ধীরে ধীরে তখন বাতাস বহিতেছিল। তাহার সঙ্গে মায়া মাধুরীর সঞ্চার করিয়া, নিকটের

উদ্যান হইতে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। সহসা বধূ দেখিতে পাইল—উঠানের কোণে সেই আলোক আবার জ্বলিতেছে! কি দীপ্তি! কি উজ্জ্বল! কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়!

আলোক কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য হইতেছিল।

মাথার ঊর্দ্ধে—আকাশের মাঝে ছায়াপথ—নীল সমুদ্রে সেতুবন্ধের মত শোভা পাইতেছে, নিম্নে ধরণীর মুখে আঁধারের অবগুণ্ঠন। সকলেই নিদ্রিত—কোথা'ও সাড়া শব্দ নাই। বধূর কৃষ্ণতার স্থির নেত্রে—রহস্যোদ্ঘাটনের আবেশ, মুখে উদ্রিক্ত কৌতূহল, বুকে দুর্জ্জয় সাহস,—সে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গনে নামিয়া আসিল। বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া উন্মাদিনীর মত আলোকের পানে ছুটিল।

এই সময় কি একটা সন্‌সন্ শব্দ হইল, প্রাঙ্গনের লতাগুল্ম ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। বধূ দেখিল—উপলখণ্ডের মত কি এক জ্যোতিষ্মান পদার্থ উদ্গীরণ করিয়া, তটিনীর মত বক্র গতিতে এক ভীমকায় মহাসর্প চলিয়া যাইতেছে। ঐ উপলখণ্ডই—দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

বধূ বুঝিতে পারিল—ইহাই সেই অমূল্য রত্ন—মাণিক। মাণিকের রহস্য বধূর অজ্ঞাত ছিল না। গো-শালা হইতে একতাল গোময় আনিয়া বধূ তৎক্ষণাৎ সেই মাণিকখণ্ডের উপর চাপা দিল। শেষে গোময় পুটিত মাণিক—গৃহের মধ্যে ধামা ঢাকা দিয়া রাখিয়া হাত মুখ ধুইয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল।

এদিকে—মাণিক হারাইয়া, শোকে গৃহস্থের বাস্তু সাপটী অল্পক্ষণের মধ্যেই মরিয়া গেল।

বাস্তু বিয়োগে বাড়ীর বিপদ।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। তরুশিরে বসিয়া দধিয়াল দিবসের স্বাগত-গীতি গাহিতে আরম্ভ করিল। বন ভূমির নবীন শ্যামলতা সূর্য্য কিরণে সমজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিশার নিদ্রাবেশ ছাড়িয়া সকলেই জাগিয়া বসিল। জাগিলনা কেবল—গৃহস্থের সেই কণিষ্ঠা বধূ, সারারাত্রি জাগিয়া সে এখনও অকাতরে ঘুমাইতেছে।

বাটীর সকলেই আজ বিস্মিত, প্রাঙ্গণে বাস্তুসাপ মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এই অতর্কিত দুর্ঘটনায় সকলেই শোকাকুল। শ্বাশুড়ীর ভীতি-পাণ্ডুর মুখে ভাবী অমঙ্গলের ছায়া। প্রতিবেশিনী রমণীতে বাটী ভরিয়া গিয়াছে। বধূর ঘুম ভাঙ্গিল না! এত বেলা হইল, তবু বধূ উঠিল না।

গৃহিণী বধূকে জাগাইতে আসিলেন। পুত্রের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল! তিনি চাহিয়া দেখিলেন—গৃহ অপার্থিব আলোকাকীর্ণ! এ তো সূর্য্যের আলো নয়! তবে এ কিসের আলো? সহসা ধামার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। আলোক ধামার রন্ধ্র পথেই বাহির হইতেছিল। গৃহিণী ধামা খুলিয়া ফেলিলেন,—দেখিলেন, ধামার ভিতরে গোময় মণ্ডিত মাণিক—আলেয়ার মত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিতেছে!

এতক্ষণে গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন—'বাস্তু সাপের' মৃত্যুর কারণ কি? অভাগিনী পুত্র বধূই—সকল প্রমাদের মূল! কিন্তু তখন

আর দুঃখ করিয়া ফল কি? ক্রোধে ক্ষোভে গৃহিণী—সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন কোলাহল শুনিয়া বধূরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সেই দিন হইতে গৃহস্থের লক্ষ্মী ছাড়িল। গোলাভরা ধান—কীট মূষিকে কাটিল, স্বচ্ছ সলিলা সরসী—শৈবালে মজিল, ফুলফুলের সাজান বাগান—আবর্জ্জনায় ভরিয়া গেল, ভরা যৌবনে "সাতবেটী" বিধবা হইল, ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাধিল,—কর্ত্তা গৃহিণী একে একে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। বিগতশ্রী সংসারে যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা অলস হস্তে ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া লইল।

'বাস্তু সাপের' মহিমার এইরূপ অনেক গল্প আছে, আমি কেবল একটীর নমুনা দিলাম। শুনিয়াছি—হিন্দুর "উপকথাতে"ও নাকি বিজ্ঞান রহস্য পরিস্ফুট। আমার সময় অল্প, শক্তি সামান্য, যিনি সেই সব উপকথার যুগব্যাপী মৌনব্রত ভাঙ্গিতে পারিবেন, গৌড়ের অনির্দ্দিষ্ট অতীত ইতিহাস, তাঁহারই হস্তে একদিন শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

বাস্তুর আদর।

এ কালেও—পল্লীগ্রামের প্রবীন প্রবীনাদের সমাজে বাস্তু সাপের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এখনও অনেকে বাস্তুকে 'পয়মন্ত' ভাবিয়া থাকেন। বাস্তু দর্শন তাঁহাদের পক্ষে মহাপুণ্য জনক। কোন কোন বৃদ্ধার মুখে শুনিয়াছি, একাদশী তিথিতে বাস্তু সাপকে দুগ্ধ-কদলী দানে পরিপুষ্ট করিয়া, তাহার কপালে যে রমণী সিন্দুর বিন্দু পরাইতে পারে, তাহাকে কখনও বৈধব্য-যন্ত্রণায় ভুগিতে হয় না। কথাটা ঠিক ইন্দুরের পরামর্শের মত। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার সাহস কোন্ ইন্দুরের আছে? তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি, এই সীতা-সাবিত্রীর পবিত্র জন্মভূমিতে সীমন্তের চির অরুনিমা বজায় রাখিবার জন্য হয় তো কোন সাধ্বী একদিন বাস্তুর মস্তক সিন্দুরাঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেরূপ দুঃসাহসিকা সতী—এযুগে আর দেখিব কি?

মুসলমানের মধ্যেও আমি বাস্তু সাপের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছি।

নৈহাটী ষ্টেসনের চারিক্রোশ পূর্ব্বে—'দারিয়াপুর" গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসী বৃন্দ সকলেই মুসলমান। বকাউল্লা মণ্ডল—দারিয়াপুরের এক সম্পন্ন কৃষক। তাহার এক পুত্রের চিকিৎসার জন্য—তিন বৎসর পূর্ব্বে দারিয়াপুরে গিয়াছিলাম। বাহিরের দলিজে—আমার বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই দলিজ হইতে অন্দর মহল দেখিতে পাওয়া যায়।

বকাউল্লার ধৌতধূলি প্রাঙ্গণে একটী বাতাবী লেবুর গাছ আছে। আমার দৃষ্টি সেই বৃক্ষের পানে আকৃষ্ট হইল। অকস্মাৎ—আমি এক লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। বৃক্ষের তলদেশে—কৃষকের এক দিগম্বর শিশুপুত্র বসিয়া খেলা করিতেছিল, বালকের দক্ষিণ পার্শ্বে—কতকগুলি কুক্কুটশাবক কদন্ন ভোজনে ব্যস্ত, অদূরে এক উন্নত ফণ ভীমকায় কাল সর্প বিরাজমান—তাহার দৃষ্টি বালকের দিকে নিবদ্ধ! ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। বকাউল্লাকে ডাকিয়া আমি সেই দৃশ্য দেখাইলাম, সাক্ষাৎ শমনের মুখ হইতে বালকটীকে সরাইয়া আনিতে বলিলাম। বকাউল্লা একটু হাসিল, বলিল—'ওদিকে বাবু! আপনি নজর

দিবেন না। আমার খোকা রোজ ঐ সাপের সঙ্গে খেলা করে। ও সাপ কামড়াইতে জানেনা—ও আমাদের বাস্তুসাপ, ওকে আমরা ভয় করিনা।”

আমি তো অবাক! এ পাগল বলে কি! সাপটা পোষা নাকি?—সাপের সঙ্গে শিশুর খেলা—নরলোকে কাহারও নেত্রগোচর হইয়াছে কিনা জানিনা;—আমি কিন্তু সে খেলা দেখিতে লাগিলাম। শিশু ক্ষুদ্র হাত দু'খানি উর্দ্ধে তুলিয়া—সাপকে ভয় দেখাইতেছিল;—বৈষ্ণব-কাব্যের “মানবক ক্রীড়” ছন্দে—সাপটাও ঘন ঘন দুলিতেছিল।—অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! এমন ভয়ঙ্কর ঘটনাতেও গৃহস্থ বিচলিত হইলনা। সাপও নড়িলনা, শিশুও সরিলনা। পরে শুনিয়াছিলাম—নিদ্রিত শিশুকে আঙ্গিনায় রাখিয়া, মাতা জল আনিতে গিয়াছিলেন, লোহিত রবিকিরণ শিশুর মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, ফণা বিস্তার করিয়া—এক বিষধরী রৌদ্রতাপ হইতে শিশুকে রক্ষা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কুম্ভকক্ষে লইয়া অলস মন্থর গমনে জননী ফিরিয়া আসিলেন, সর্পিণীটীও প্রস্থান করিল। অদূর ভবিষ্যতে—এই শিশু নাকি রাজসম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। আমি এই নিরক্ষর চাষার ঘরে—কল্পনাকে আজ শরীরিণী দেখিলাম।

রোগীকে দেখিবার জন্য আমি যেমন বকাউল্লার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, নূতন লোকের পদ শব্দে ভীত হইয়া সর্পটাও অমনি পলায়ন করিল।

অপরাহ্নে আমি দরিয়াপুর পরিত্যাগ করিলাম। পথে আসিতে আসিতে বকাউল্লা—বাস্তু সাপটীর অনেক গুণের পরিচয় দিল। প্রায় দশ বার বৎসর ধরিয়া সে ঐ বাস্তু সাপকে দেখিতেছে। প্রথম প্রথম তাহার ভয় হইত, কিন্তু এখন তাহার ধারণা—ঐ সাপই তাহার সংসারের রক্ষা কর্ত্তা। প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে—সর্পটী বাতাবী বৃক্ষের চরণপ্রান্তে বিশ্রাম করে। বকাউল্লা সাপকে দুগ্ধ খাইতে দেয়। সাপ অদ্যাবধি কাহারও ক্ষতি করে নাই। এই পরমমন্ত বাস্তু সাপটীর মেহেরবাণীতে—তাহার বাটীতে কোন অভাব অনাটন ঘটেনা। তাহার ক্ষেতের ইক্ষু হইতে উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়, সে গুড় “আমডাঙ্গার” হাটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিকায়। প্রায় একমাস পূর্ব্বে সে বাস্তর জন্য যে দুগ্ধটুকু রাখিয়াছিল, জ্যেষ্ঠপুত্রের পা' ঠেকিয়া দুগ্ধটুকু পড়িয়া যায়। বোধ হয়—সেই পাপেই ছেলেটার কঠিন রোগ হইয়াছে। নহিলে তাহার বাটীতে—ডাক্তার-কবিরাজ প্রবেশ করিতে পায়না—ইত্যাদি।

আমি বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহাদের বাস্তু সাপের মাথায় সে মাণিক দেখিয়াছে কিনা? সে স্বীকার করিল—মাণিক দেখে নাই। রাত্রিকালে সে সাপকে চরিতে দেখিয়াছে, কিন্তু কোনও উজ্জ্বল আলোক অদ্যাবধি তাহার নেত্রপথে পতিত হয় নাই। তবে সাপের মাথায় মাণিক থাকে—এ প্রবাদের অর্থ কি? কথাটা কি নিতান্তই অলীক? অথচ পুরাণে, কাব্যে, চাণক্যের নীতিগ্রন্থে রত্নপরীক্ষার বহু পুস্তকে সাপের মণির পরিচয় পাওয়া যায়। এটা কি শুধু কল্পনা? কে একথার উত্তর দিবে? সাপ লইয়া যাহারা আশৈশব নাড়াচাড়া করিতেছে—তাহাদের অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি

কেহই মানিক দেখে নাই। হউক মিথ্যা, হউক আজগুবি গল্প, সে যে "সাতরাজার-ধন।" অতএব

"তারে পায়না কোনজন
ওঝা ! নয় তা' সাধারণ।"

সুতুলী সাপ।

"সুতুলীসাপ"—একপ্রকার বিষধর কিন্তু দুর্ল্লভ দর্শন। জীবনে একবার মাত্র আমি এই সাপ দেখিয়াছিলাম।

আমরা তখন কাঁচরাপাড়ার বাটীতে থাকি। আমাদের বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে—সাহিত্যিকের মজলিস্ বসে। সে মজলিসে—হুগলী কলেজের বর্ত্তমান ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম এ,—প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ,—প্রভৃতি মনীষি ও মনস্বীগণ—উপস্থিত থাকেন। মদগ্রজ ৺রাধাজীবন রায়—তখন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা—'সাধারণীতে' প্রকাশিত হইতেছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে—কবি বলিয়া তাঁহার একটু পশার জমিয়াছে গুপ্তকবির স্মৃতিরক্ষার জন্য—"প্রভাকর লাইব্রেরী' স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

এই উপলক্ষে—পরলোকস্থিত লেখক অক্ষয়কুমার সেন,—৩২নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট নিবাসী কালিদাস মিত্র,—'ছাইভস্মের' সুরসিক কবি রসময় লাহা, এমারেল্ড থিয়েটারের নাটককার অতুলকৃষ্ণ মিত্র,—বেঙ্গলের "বাক্যবাগীশ" প্রণেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষদের স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার নিত্যকৃষ্ণ বসু এমএ—প্রভৃতি অধুনা বিখ্যাত সাহিত্যিকগণকে—দাস মহাশয় কাঁচরা পাড়ায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ইহারা—তাঁহার অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ ছিলেন। পুত্রের বন্ধুগণকে আমার মা পুত্রের মত স্নেহ ও যত্নের সহিত খাওয়াইলেন।

কাঁচরাপাড়ার কাঁটাল বড় বিখ্যাত। সেটা জ্যৈষ্ঠমাস,—পক্ক পনসের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত। মা—অন্নপূর্ণার মত একখানা কাঁটাল আনিয়া সন্তানদের সম্মুখে হাজির করিলেন।

আমাদের বাটীর ভিতরের উঠানে একটী প্রকাণ্ড কাঁটাল গাছ আছে। গাছটী যে কত কালের বলা যায়না। তাহার স্থাবর জীবন, যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের দুঃখে নৈশ-শিশির ঢালিয়াছে, হর্ষে—শাখা পল্লব কাঁপাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

গাছটীর নাম—"পদ্মরাজ"—তাহার কাঁটাল খুব বড়, অতি সুস্বাদু, দুই চারিটি কোয়া খাইলে পেট ভরিয়া যায়। কলিকাতার ছেলেরা খাইবে বলিয়া মা এই গাছের কাঁটালই আনিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—কাঁটাল কেহ মুখে করিতেও পারিলেন না। সকলের জিহ্বায় উহা বিকট তিক্ত লাগিল, কেহই খাইলেন না। মা বিস্মিতা, দাদা দুঃখিত, আমরা সকলেই অবাক্। কেন এমন হইল? যে গাছের কাঁটাল—আমাদের গর্ব্বতৃপ্তির উপাদান, আত্মীয়-স্বজন কুটুম্বের গৃহে—বহুদিন ধরিয়া যে কাঁটাল সমাদৃত হইয়া আসিতেছে,কোন্ দুর্ব্বিপাকে আজ তাহার আস্বাদ—নিম্ব পত্রের ন্যায় তিক্ত হইয়া গেল ?

একে একে সকলেই কাঁটালের স্বাদ পরীক্ষা

করিলেন—বাস্তবিক অতি সাংঘাতিক তিক্ত। কোন নির্ঘণ্টকার উপস্থিত থাকিলে—এই পাকা কাঁটালকেই তিক্তরসের উপমা স্বরূপ গ্রহণ করিতেন।

আশ্চর্য্যকথা—সে বৎসর সে গাছের সকল কাঁটালই তিক্তাস্বাদ। একটী মানুষও খাইতে পারিল না।

সেই সময় আমাদের তৃণাচ্ছাদিত "পাক-শালার" সংস্কার হইতেছিল; একজন বৃদ্ধ ঘরামী বলিল "বাবু—কাঁটাল গাছের গোড়ায় সাপ আছে,—তাই কাঁটাল তিক্ত হইয়াছে। আমার একটা আমগাছের ফল—একবার ঐরূপ তিক্ত হইয়াছিল, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আমার ভাই একটা সুতুলী সাপ বাহির করে। পর বৎসর হইতে আবার তাহার ফল পূর্ব্ববৎ মিষ্ট হইয়াছে।" কথায় কথায় প্রকাশ পাইল—ঘরামীর ভাই একজন সাপের ওঝা। তাহাদের বাটী সিঙে-ভবানী পুরে, তাহারা জাতিতে পোদ।

পরদিন—প্রভাতকালে দাদা সেই ঘরা-মীর ভাইকে ডাকিয়া আনিলেন। সে লোকটা অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—"গাছের গোড়ায় নিশ্চয়ই সাপ আছে। আপনারা সাবল ও কোদাল দিন, আমি সাপ বাহির করিতেছি।"

লোকটা বৃক্ষের তলদেশ খনন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া প্রায়—৪ হস্ত গভীর গহ্বর হইয়া পড়িল। বৃক্ষের মূল বাহির হইল, অনেক শিকড় কাটিয়া গেল। পাড়ার নরনারী ছুটিয়া আসিল। বাটী—লোকে লোকারণ্য। সহসা খনন কারী—হর্ষ-বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সাপ পাওয়া গিয়াছে!"

পল্লীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, একটী গৃহস্থ প্রাঙ্গণের মঙ্গল শান্তির মধ্যে—অনেক গুলি নেত্র এক সঙ্গে সর্পের অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কোথায় সে শয়তানের প্রতিনিধি? স্বেদসিক্ত দেহ-পোদ সন্তান সকলের সম্মুখে একটী শুভ্রবর্ণ গোলক রাখিয়া বলিল—"দেখুন বাবু! আপনারা সাপ দেখুন, সাবধান, বেশী কাছে যাইবেন না।"

সকলেই স্তম্ভিত! সাপ কৈ? এ যে—সূত্রের ক্ষুদ্র পিণ্ড! পিণ্ডের আকার একটী সুপারীর মত, যেন একত্র কতকগুলি ছিন্ন সূতাকে গোলাকারে পাকাইয়া রাখিয়াছে! এই কি সাপ? যা'র বিষদগ্ধ নিশ্বাস স্পর্শে—চির দিন ক্ষুধার্ত্তের পক্ষে সুধাময় স্বাদু কাঁটাল ফল—নিম্বের মত তিক্ততম হইয়াছে—এই কি সেই সাপ? এই ভীষণ সরীসৃপই কি এত দিন ভূগর্ভের নেপথ্যে আত্ম গোপন করিয়া-ছিল? এ কথা তো বিশ্বাসই হয় না। তা না হউক, কিন্তু মুক্ত বাতাসের স্নিগ্ধস্পর্শে দেখিতে দেখিতে—সেই পিণ্ডাকার পদার্থ—জীবনের হিল্লোলে ও কল্লোলে হঠাৎ স্পন্দমান হইয়া উঠিল। সূতার পোট্‌লী—শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা নড়িতে লাগিল মুখ বাহির করিল, কেশাগ্র সূক্ষ্ম-স্বকনী দ্বারা অধরোষ্ঠ লেহন করিতে লাগিল। হাঁ, সাপই বটে, গতি বক্র বিসর্পিত, বর্ণ পীতাভ শ্বেত, দৈর্ঘ্যে—৪।৫ হাত হইবে,—'প্যাকিং' কার্য্যে ব্যবহৃত সূত্রের মত কৃশকায়। এ কি রকম সাপ? বোধ হয় সূতার মত দেখিতে বলিয়াই নাম হইয়াছে "সুতুলী সাপ"।

চতুর্দ্দিকে অসম্ভব জনতা দেখিয়া সাপ কিছু ভীত ও চঞ্চল হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল,—এমন সময় পোদ সন্তান তাহার উপর—একখণ্ড ইষ্টক নিক্ষেপ করিল। সর্পের সরীসৃপ লীলা শেষ হইল। শেষে বাঁশীকৃত শুষ্ক পত্রের উপর-মৃত সর্পকে রাখিয়া,—'ধরামীর' দ্বারা তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দিল।

বেলা অনেক হইয়াছে, ওঝা বিদায় চাহিল, দাদা মহাশয় তাহাকে পুরস্কার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সে হাসিয়া বলিল—"লোকের উপকার করিয়া কি বাবু! মূল্য লইতে আছে?" যাত্রাকালে 'ছোট লোকের' মুখে—কি আধ্যাত্মিক কথা! হায়! পল্লীবাসি-অসভ্য! এখন হয় তো ইহজগতে তোমার আর চিহ্ন মাত্র নাই, তোমার কথা কিন্তু আমার অন্তরে অহরহঃ জাগ্রত রহিয়াছে। বাল্যকালে তোমার উপদেশ শুনিয়াছি, জীবনের প্রৌঢ়ত্বে পঁহছিয়া—আজিও তো তাহা পালন করিতে পারিলাম না।

সভ্যতার গর্ব্বদৃপ্ত অভ্যুদয় কালে—সহর বাসী পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন—এই সাপ বাহির করা পোদপুত্রের একটা চাতুরী। সাপ পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল, নিজের বিদ্যা জাহির করিবার জন্য—গাছের গোড়া খুঁড়িয়া খননকারী তাহা লোকের সম্মুখে বাহির করিয়াছিল। হইতে পারে এ অনুমান সমূলক, হইতে পারে পোদপুত্র সাপটাকে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল; কিন্তু সেই দিন হইতে, সেই পনস বৃক্ষের মহাতিক্ত ফল আবার কেন মধুময় হইল,—কে এ রহস্য ভেদ করিবে? মনের এ ধাঁধা তো একদিনের জন্যও গেল না। তাই এবার "বিষবিজ্ঞান" লিখিতে বসিয়া, "সঙ্" দিয়াই পালা শেষ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শিশুর যকৃত রোগ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, প্রসূতির স্তন্যের উপর শিশুর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। স্তন্যদানের ব্যবস্থার পূর্ব্বে প্রসূতির স্বাস্থ্য ও আহার বিহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। অনেকেই বোধহয় জানেন, মাতার ক্রোধের সময় স্তন্যপান করিয়া অনেক শিশুর তড়কা উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই সময়ে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ মাতার অন্য কোন রিপুর উত্তেজনার সময়েও তাহার দুগ্ধ শিশুর পানের অযোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ত্তব্যের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হয় রোগগ্রস্থ—বিশেষতঃ

এই দুর্জ্জয় ব্যাধি পীড়িত শিশুর মাতার স্বামী সহবাস কোনক্রমেই উচিত নহে এবং কোনরূপ রিপুর উত্তেজনা যাহাতে যাহাতে হয় না, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। উত্তম স্বাস্থ্য যুক্ত মাতার স্তন্যদান কালে ঋতু বন্ধ থাকে। সুতরাং এই সময়ে যাহাদের ঋতু প্রকাশ পায়, তাহাদের দুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর মনে করিয়া ত্যাগ করাই সদ্বিবেচকের কার্য্য।

দন্তোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত সাগু, বার্লি, ময়দা, আটা ইত্যাদি ষ্টার্চ্চযুক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে এই সমস্ত খাদ্য তাহারা সহজে পরিপাক করিতে পারে না, ইহাই সাধারণ বিধি, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, দরিদ্রদের ঘরে যাহারা মাতৃদুগ্ধ পায় না, অথচ অর্থাভাবে গোদুগ্ধের সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা বার্লি ও আটার উপরেই অনেক স্থলে নির্ভর করে। ইহাতে সকল স্থলেই যে কুফল দেখা যায় তাহা নহে, দরিদ্রদের শিশুরা যে আটা-বার্লি সহজে পরিপাক করিতে পারে, ধনীদের শিশুরা তাহা পারে না, যাহা হউক যাহাদের যকৃতের দোষ আছে, তাহাদের শুধু গোদুগ্ধ সেবন করানও উচিত নহে, এইস্থলে মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ যতদিন দন্তোদ্গম না হয়, ততদিন দুগ্ধ-বার্লি সেবন করানই কর্ত্তব্য, কিন্তু দাঁত উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে শিশুর খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা উচিত। এই সময়ে ষ্টার্চ্চ যুক্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন খাদ্য—যথা সুজি সাগু, ভাত প্রভৃতি খাওয়ান অভ্যাস করান যাইতে পারে। শিশুর ষষ্ঠ মাসের পর সাধারণতঃ অষ্টম মাস হইতে দাঁত উঠিতে থাকে, দাঁত উঠিলে শিশুকে অল্প অল্প ভাত খাওয়ান যাইতে পারে, এবং সেরূপ ব্যবস্থাও উচিত। ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে হিন্দুর শাস্ত্র মতে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা। এই কারণও বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অনেকে বলেন, গর্দ্দভীর দুগ্ধ নারীদুগ্ধের অনুরূপ, বাস্তবিক তাহা নহে, বিশ্লেষণ করিলে অনেকটা মিল দেখা যায়, কিন্তু নারী দুগ্ধ অপেক্ষা গর্দ্দভীর দুগ্ধের পুষ্টি অপেক্ষাকৃত কম। নারীদুগ্ধ অপেক্ষা গর্দ্দভীদুগ্ধে জল এবং লবণের ভাগ একটু বেশী, কিন্তু প্রটিড, ফ্যাট (চর্ব্বি) ও কার্ব্বহাইড্রো (চিনি) এর ভাগ কম, যাহা হউক তাহা হইলেও গর্দ্দভীর দুগ্ধ ব্যবহার করান যাইতে পারে, গর্দ্দভীর দুগ্ধ পানে শিশুর জীবন ধারণ করিতে হইলে অন্ততঃ দ্বিগুণ পরিমাণের প্রয়োজন, কিন্তু গর্দ্দভীর দুগ্ধে চিনি ও লবণ অধিক থাকায় অপকার অবশ্যম্ভাবী। গোদুগ্ধে প্রটিড ফ্যাট ও চিনির ভাগ পূর্ব্বোক্ত দুইটী দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী, সুতরাং গোদুগ্ধ শিশুর পক্ষে প্রথম প্রথম হজম করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। যাহারা গোদুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে গর্দ্দভীর দুগ্ধই প্রশস্ত। মহিষীর দুগ্ধ অত্যন্ত দুষ্পাচ্য, তাহাতে চর্ব্বির ভাগ অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী। ছাগীর দুগ্ধ সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর বলিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু আমার কাহারও কাহারও মতে উহাও দুষ্পাচ্য। বাস্তবিক ছাগীদুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা লবণ বেশী, অন্যান্য উপকরণও কম নহে, সুতরাং শিশুর পক্ষে দুষ্পাচ্য, উপযুক্ত পরিমাণে জল মিশাইলেই শিশুর উপযোগী হয়। এখানে

	জল	প্রোটেড্	চর্ব্বি	চিনি	লবণ
নারীদুগ্ধ	৮৮·০০	২·৯৭	২·৯০	৫·৮৭	০০·১৬
গাভীর	৮৬·৮৭	৩·৯৭	৪·২৮	৪·৮২	০০·০৮
মহিষীর	৮১·০০	৪·০৪	৯·০০	৪·০৮	০০·০৮
ছাগীর	৮৭·৬২	৩·৬২	৪·২০	৪·০০	০০·৫৬
গর্দ্দভীর	৯১·৯৭	১·৭৯	১·০২	৫·৫০	০০·৪২

সকল প্রকার দুগ্ধের উপাদানের (শত করা হিসাবে) একটা তালিকা দেওয়া গেল। দুগ্ধ সকলের গুণাগুণ ইহা হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে, আশা করি।

উন্মুক্ত আলোক ও বায়ু যাহাতে শিশুরা প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যকৃতগ্রস্ত শিশুর জ্বর না থাকিলে তাহাকে সহমত স্নান করান যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে ঈষদুষ্ণ অথবা সূর্য্য তাপ পক্ক গরম জল বিশেষ হিতকর।

আহার-রহস্য।

[শ্রীরাম সহায় বেদান্ত শাস্ত্রী]

—— :০: ——

শরীর রক্ষা জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম। শরীর রক্ষা ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না। শরীররক্ষা আহার দ্বারাই বটে। শরীররক্ষা সম্পাদক আহার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যাপার। শরীরই ধর্ম্মের সাধন। সেই শরীর আহারের অধীন, এজন্য আহারও ধর্ম্মের সাধন। জীবরক্ষার হেতু অন্নই নারায়ণ, জল নারায়ণ ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্নকেই প্রাণ বলা হইয়াছে, সেই অন্নরূপী প্রাণের উপাসনাও ব্যবস্থিত হইয়াছে। যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার। এই আহারের সহিত শুধু যে শরীরেরই সম্বন্ধ, তাহা নহে। আহারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, মনের, প্রাণেরও সম্বন্ধ নহে।

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু স্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠা তন্মনঃ"—(ছান্দোগ্য)

ভক্ষিত অন্ন তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলভাগ পুরীষ, মধ্যম ভাগ মাংস, সূক্ষ্মভাগ মনরূপে পরিণত হয়। অন্নেরই অতি সূক্ষ্মাবস্থা মন। তাহা হইলে আহার অনুযায়ী যেমন মাংস, মনও তদ্রূপ। যেমন আহার হইবে, মনও সেইরূপ গড়িয়া উঠিবে। মস্ত-মাংসের দেহ ও তৃণভোজীর দেহ যেমন পৃথক্, ইন্দ্রিয়-মনও তাহাদের তদ্রূপই পৃথক হইবে।

আপঃ পীতা ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু তন্মূত্রং যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽনিষ্ঠঃ স প্রাণঃ। ছান্দোগ্য।

পীত জলের স্থূলতমভাগ মূত্র, মধ্যভাগ রক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়।

অনুভবাত্মক মন, আধ্যাত্মিক বায়ুই প্রাণ —ইহাও উপনিষদের মত। এক্ষেত্রে বুঝিতে হইলে মনের উপাদানে অন্ন, প্রাণের উপাদানে জল বিদ্যমান। অনুভবাত্মক মন, আধ্যাত্মিক বায়ুরূপী প্রাণ যখন ভৌতিক, তখন অবশ্যই উহা অন্নজলাদি দ্বারাই নির্ম্মিত হইবে। তবে মনোপ্রাণের মধ্যে যদি অভৌতিক কিছু থাকে, তবে তাহা চৈতন্যাংশ মাত্র।

"তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবর্ত্তে যো মধ্যমঃ স মজ্জা, যোঽনিষ্ঠঃ সা বাক্" (ছান্দোগ্য)

তেজ (অশিত) ভুক্ত হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়। স্থূলভাগ অস্থিরূপে, মধ্যমভাগ মজ্জারূপে, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাগ বাক্যরূপে পরিণত হয়।

অন্নময় মন, জলময় প্রাণ, তেজোময়ী বাক্। মাংস, অস্থি, মজ্জা, রক্ত—সকলই আহার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে, আহার দ্বারাই ঐ সকলের রক্ষা, আহার অভাবে ঐ সকলের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অন্নের সূক্ষ্ম পরিণাম মন, জলের সূক্ষ্ম পরিমাণ প্রাণ, তেজের সূক্ষ্ম পরিণাম বাক্—এ সকল আমরা যুক্তিদ্বারা ঠিক বুঝাইতে পারিব কিনা জানি না। কিন্তু আহারের সহিত মনঃপ্রাণের সাক্ষাত ভাবে যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। অন্ন জল আহারে প্রাণ বাঁচে, মন শক্তিমান্ থাকে। গর্ভস্থ জ্রূণ জননীর ভুক্ত ও পীত অন্ন জল খাইয়াই ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া থাকে, পরিশেষে মানবাকার ধারণ করে। ইন্দ্রিয় ঐ আহার দ্বারাই ক্রমে ফুটিয়া উঠে, মন ও প্রাণ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। একদিনের জ্রূণে মাংস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু অস্থি, ত্বকের কি পরিচয় পাওয়া যায়? হইতে পারে মনঃপ্রাণ সূক্ষ্মভাবে ছিল, ইন্দ্রিয়ও সূক্ষ্মভাবে ছিল, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আহার দ্বারাই সেইগুলির বিকাশ লাভ ঘটিল, বর্দ্ধিতায়ন হইল, কার্য্যক্ষমতা লাভ করিল। আহার না করিলে সেগুলি থাকিয়াও তো না থাকার মধ্যে ছিল। দেহও ত সূক্ষ্মভাবে ছিল, আহারের দ্বারা পরিপুষ্ট হইল মাত্র।

আহারের সহিত মনোপ্রাণের যে নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান, তদ্বিষয়ে উপনিষদে একটি আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। অন্নই ব্রহ্ম—এই উপদেশ পাইয়াও সনৎকার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

কয়দিন উপবাসী থাকিলে মনঃশক্তি সম্পন্ন অসামান্য মেধাবী ছাত্রও আপনার সুষ্ঠু অধীত বিষয়ও স্মরণ করিতে পারে না, অতি সহজ বিষয়ও পরিষ্কাররূপে বোধগম্য করিতে পারে না।

যে যেমনভাবে আপনার দেহ-ইন্দ্রিয় গঠন করিতে চাহিবে, মনোপ্রাণকে যে ভাবাপন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহাকেই সেই মতই আহার করিতে হইবে। এমন কি, যে যেরূপ সন্তান চাহিবে, তাহাকে সেইমত আহার-বিহারাদি করিতে হইবে। বৃহদারণ্যকে —যে যেমন পুত্র চাহে, তাহার পক্ষে সেই অনুযায়ী চরু প্রস্তুত করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ।"

স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদমনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ।

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ।

অথ য ইচ্ছেৎ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ। ইত্যাদি বৃহাদারণ্যক।

পুত্রের বেলায় বেদজ্ঞ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু দুহিতার বেলায় বেদজ্ঞা হউক—, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না, তবে বিদুষী হউক এই প্রার্থনা করা হইয়াছে। যে বৃহদারণ্যকে গার্গী মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণীদের ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ আছে, তাহাতেই সাধারণ নারী গণের পক্ষে বেদজ্ঞা হউক এরূপ প্রার্থনা নাই।

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ॥

আহারের শুদ্ধিতেই মনঃশুদ্ধি। আহারের ফলেই সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি ও রজঃ এবং তমো গুণের ক্ষয়।

মনোপ্রাণের সহিত আহারের নিবিড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আহারের দ্বারাই চিত্তের শুদ্ধি হয়, প্রাণের শক্তি বাড়ে, আবার আহারের দোষেই মনের মালিন্য ও প্রাণের দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণবিশিষ্টা। মানব প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজ, তম এইরূপে ত্রিগুণান্বিতা। বাত, শ্লেষ্মা ও কফ এই তিনটী ধাতুতে ঐ ত্রিগুণের প্রভাব দৃষ্ট হয়। কোন আহারে বাত বৃদ্ধি, কোন আহারে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, কোন আহারে বা কফের বৃদ্ধি হয়। ইহা সত্য যে দেহের সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের যতটা নিকট সম্বন্ধ, মনঃ প্রাণের সঙ্গে ঠিক ততটা নিকট সম্বন্ধ নহে।

প্রকৃতি ভেদে, রুচি ভেদে ও অবস্থা ভেদে সকলের পক্ষে এক আহার ব্যবস্থিত হয় না, সকলেই এক খাদ্য পছন্দও করে না। ইতর জন্তুর কথা ছাড়িয়া দাও, এক মানব জাতির মধ্যে আহারের কত বিভিন্নতা।

স্ব স্ব উপভোগোপযোগী উৎকৃষ্ট আহারে শরীর ত ভাল থাকেই, এমন কি, ইন্দ্রিয় সতেজ, মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও প্রাণ শক্তিযুক্ত থাকে। আহার গুণে, আহার সংযমে আয়ুর বৃদ্ধি করে, আয়ুর বৃদ্ধি হইলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়, একথা অদৃষ্ট বাদী শাস্ত্রকারগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আহারের দোষে মানব নানা রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, অত্যাচারে, অনিয়মে, কুকর্ম্মদোষে, পাপের ফলে, আয়ু থাকিতেও মানব মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হয়। যথেষ্ট তৈল সত্ত্বেও দীপবর্ত্তিকা ঝটকা-বাতাসে নিবিয়া যাইতে পারে।

বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদযথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংশয়ঃ॥

কুপথ্য ভোজনাদি কারণে পরমায়ু থাকিতেও মানব—মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়, ইহা শাস্ত্রকারেরই কথা। এমন কি, আচার্য্য শঙ্কর, প্রারব্ধ ব্যতীত সঞ্চিত নামে একটি পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। প্রারব্ধের ভোগ অপরিহার্য্য, তাহার ইতর বিশেষ করা মানবের সাধ্যাতীত, কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কুকর্ম্মকে মানব সাধনার দ্বারা ক্ষয় করিতে পারে, অত্যাচারের দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারে। সঞ্চিত কর্ম্মফলের উপর মানবের হাত আছে। আহারাদির শুদ্ধি এবং আহারাদির সংযমের দ্বারা রোগাদির আক্রমণ হইতে যেমন অব্যাহতি লাভ করা যায়, তদ্রূপ পরমায়ু বৃদ্ধিও করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান জন্মে যে নূতন কর্ম্ম মানবেরা করিয়া থাকে, তাহারই নাম ক্রিয়মাণ কর্ম্ম,—সেই ক্রিয়মান কর্ম্মের উপর মানবের স্বাধীনতা আছে। ক্রিয়মান কর্ম্মের দ্বারা যখন মানবেরা বর্ত্তমান জন্মেই পুণ্যপাপ উৎপন্ন করতঃ সুখ দুঃখ লাভ করিতে পারে, তখন সুখ দুঃখ ভোগ মাত্রেই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল নহে। বর্ত্তমান জন্মের অনেক ভোগই আমাদের ইহকৃত কর্ম্মের ফল। তাহা হইলে বর্ত্তমান জন্মের সাধনা ও অত্যাচারের দ্বারা কেন না আয়ুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইবে? আহার সংযমে সুফল এবং আহারের অনিয়মে কুফল কেন না ঘটিবে? ভগবান্ গীতাতেই বলিয়াছেন—

আয়ুসত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যা স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ

আহার আয়ুবৃদ্ধির হেতু, যে আহার সত্ত্ব শুদ্ধির কারণ, যে আহার বল ও আরোগ্যের নিদান, যাহা সুখ এবং প্রীতির বর্দ্ধক, সেই সুরসক, স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্য আহারই সাত্ত্বিক আহার। সত্ত্ব প্রধান ব্যক্তিরা সাত্ত্বিক আহারেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। জীব রক্ষার একমাত্র উপায় আয়ু ও সত্ত্ব বৃদ্ধির হেতু, সেই আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিদ্যমান।

খাদ্যাখাদ্য শুধুই যে শরীরের রক্ষার জন্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত তাহার যে কোন সম্বন্ধ নাই, এমন—কথা আমরা বলিতে পারি না। শরীর রক্ষা যেমন উদ্দেশ্য সত্ত্ব শুদ্ধি, মনঃ শুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয় শক্তির বৃদ্ধি ও সেইরূপ উদ্দেশ্য। দেহ রক্ষাও যেমন চাই,—ইন্দ্রিয়ের, মনের ও প্রাণের উন্নতিও তেমন চাই। শুধু দেহটী স্থূল হইল, বর্ণ মসৃণ হইল, কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হইল না, তবে আর কি ভাল হইল? উপরন্তু যে আহারের ফলে ইন্দ্রিয়ের, মনের ও প্রাণের অবনতি সাধিত হইল, সে আহার সাত্ত্বিক নহে। সেরূপ আহার করা জীব মাত্রেরই অধর্ম্ম। যাহা জীবন রক্ষার ক্ষতিকর, তাহা যেমন অখাদ্য, তেমনই যাহা ইন্দ্রিয় ও মন-প্রাণের ক্ষতিকর, এমন কি, আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নকর, সে আহারও—অখাদ্য এবং সেরূপ আহার করা জীব মাত্রেরই অধর্ম্ম। সাধারণ দৃষ্টিতে যে আহার অখাদ্য, পশুপক্ষীর নিকটও তাহা অখাদ্য, কিন্তু সূক্ষ্ম মানবের দৃষ্টিতে এমন কিছু আহার অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে অখাদ্য বিবেচিত হয় না। আহার যেমন মানবের প্রকৃতিকে অবস্থান্তরিত করে, আহার

তেমনি সেই অবস্থান্তরিত প্রকৃতিকে তদনুরূপ চালিতও করে। আহার সাধারণতঃ উপাদানের উপযোগী হয় বটে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বেশ আপনার মত উপাদান গঠন করিয়াও লইয়া লইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রেও—যে আহার সত্ত্বগুণের বিরোধী, কাম ক্রোধাদির উত্তেজক, এবং কোমল বৃত্তির ক্ষতিকারক, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আহারের সহিত মানবের প্রকৃতির এবং মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের যে একটী সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, কি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

আহার সম্বন্ধে কোন কোন দার্শনিক বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন সত্য, বিশেষ দুই একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক আহারকে অভ্যাসমাত্র বলিয়া গিয়াছেন। কথাটী যে একেবারেই ভিত্তিহীন অবশ্য তাহা নহে, কিন্তু অভ্যাস ব্যতীত আহারেরও এমন একটী বিশেষত্ব আছে; যাহা অভ্যাস অপেক্ষা অল্প শক্তি ধরে না। বাস্তবিক অভ্যাসের শক্তি অসীম, কিন্তু তাহারও একটী সীমা আছে। অভ্যাসের প্রভাব সকল জীবের উপর অল্পবিস্তর আধিপত্য করে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া দেশ, কাল, প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও উড়াইয়া দেওয়া চলেনা। মানবের আত্মা যে জাতীয় সংস্কার সম্পন্ন মন লইয়া, যে প্রকার বিষয় গ্রাহী ইন্দ্রিয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সেই আত্মাকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে পৃথক ভাবে টানিয়া লইয়া যাইবার শক্তি অভ্যাসের নাই। উক্ত সংস্কারের প্রভাব হইতে একেবারে অব্যাহতি দেওয়াও অভ্যাসের অধিকারের মধ্যে নাই। একই পিতা মাতার সন্তান, একই প্রকার আহার পাইয়া, একই রূপ শিক্ষা লাভ করিয়া, একই ভাবে লালিত পালিত হইয়াও পৃথক রুচিযুক্ত, বিভিন্ন প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কর্ম্মের বৈচিত্র্য গুণে নানাবিধ ইন্দ্রিয় মনঃসমন্বিত, বিভিন্ন সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিরা পৃথক্ পৃথক্ আহারে অনুরাগী হইতে পারে, তাহা হইলেও আহারের একটী নিজস্ব শক্তি আছে। ইন্দ্রিয় মনকে উৎকৃষ্টতর করিবার ক্ষমতা আছে। প্রকৃতি এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার একটী কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকারের, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাধনার, রোগের বিরুদ্ধে চিকিৎসার যেমন একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে, প্রকৃতি এবং সংস্কারের বিরুদ্ধেও আহারেরও তদ্রূপ একটী স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদে ত দৃষ্ট হয়ই; অদৃষ্টবাদ-প্রধান প্রধান দর্শনশাস্ত্রেও তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত আছে। আমাদের সূত্রকার সত্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।"

বায়ু, পিত্ত ও কফ।

[ডাঃ শ্রীশরৎকুমার দত্ত এল, এম, এস,]

—— •):০:(• ——

আমি এই প্রবন্ধে বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে কয়েকটী কথার আলোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে শরীরের সর্ব্বস্থানেই বায়ু, পিত্ত ও কফ বিদ্যমান আছে এবং এই তিনটী সাম্যাবস্থায় থাকিলে জীবগণের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাদের কোন একটীর অভাব বা তাহাদের কার্য্যের অসমাঞ্জস্য হইলে শরীরে পীড়ার উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসকগণ হস্তস্থিত নাড়ীতে (Radial artery) এই বায়ু পিত্ত কফের ক্রিয়া বুঝিতে পারেন এবং তাহাদের মধ্যে কোনটী সাম্যাবস্থায় আছে এবং কোন্ কোনটীই বা বিকৃত হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারেন। এই হস্তস্থিত নাড়ী হৃৎপিণ্ডের (Heart) ক্রিয়াজ্ঞাপক মাত্র।

পাশ্চাত্য এলোপ্যাথিক শাস্ত্রের এনাটমি এবং ফিজিওলজি পাঠে জানা যায় যে, হৃৎপিণ্ড Vagus (Prennagastric) নামে একটী স্নায়ু আছে। ইহা দুই দিকে ২টী আছে। ঐ স্নায়ুদ্বয় মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া ফুসফুস (Lungs) আমাশয় (Stomach) এবং ইহাদের শেষ অংশ নাভিমণ্ডলের Caetiac axis (solarplexus) গিয়াছে এই vagus nerveটী হৃৎপিণ্ডে গিয়াছে। শরীরের যন্ত্র সমূহের আলোচনাকালে দেখা যায় যে, হৃৎপিণ্ডের (Heart) ক্রিয়ার জন্য vagus nerve এর কোনই প্রয়োজন নাই। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চালাইবার জন্য যে শক্তির দরকার, তাহা তাহার মাংসপেশীস্থিত স্নায়ু সমূহেই বর্ত্তমান আছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চালাইতে বাহিরের কোন স্নায়ুর আবশ্যক নাই। তবে Vagus nerveটী তথায় কি জন্য গিয়াছে? এলোপ্যাথিক শাস্ত্র মাত্র vagus এর পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া (accalator এবং Inhibiter) উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বায়ু, পিত্ত ও কফের ঠিক এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়ার উল্লেখ আছে।

এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বায়ু, পিত্ত, কফের সহিত vagus nerveএর তুলনামূলক আলোচনা করা যাউক।

আয়ুর্ব্বেদ পাঠে জানা যায় যে, যদিও বায়ু পিত্ত ও কফ শরীরের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত আছে, তথাপি তাহাদের প্রত্যেকের প্রধান আশ্রয় ভূত স্থানের উল্লেখ আছে।

চরক সংহিতায়—

"তস্মাদিত্যা এব পক্কাশয়মনুপ্রবিশ্য
কেবলং বৈকারিকং বাতমূলং ছিনত্তি।
তত্রাবজিতে বাতেহপি শরীরান্তর্গতা
বাতবিকারাঃ
প্রশান্তিমাপদ্যন্তে। যথা বনস্পতের্মূলে ছিন্নে
স্কন্দশাখাবরোহ কুসুম ফল পলাশাদীনাং
নিয়তো বিনাশস্তদ্বৎ।

চরক, সূত্রস্থান ; ২০ অঃ—১৬ শ্লোঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পক্বাশয়েই (Intestines) বায়ুর প্রধান মূল আছে। সেই মূল ছিন্ন করিলে শরীরে সমস্ত বায়ু বিকার প্রশান্ত হয়। vagus nerveটীর শেষ অংশ caetiac axis হইতে সমস্ত পাকাশয়ে Intestines গিয়াছে। সুতরাং বায়ু বিকার ঘটলে ঐ স্নায়ু দ্বারা তাহা হৃৎপিণ্ডে বহন করে এবং তদ্বারা আমরা হস্তস্থিত নাড়ীতে বায়ু বিকার অনুভব করি।

পুনশ্চ

"তদ্ধ্যাদিত এবমামাশয়ম অনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং পিত্ত মূলঞ্চাপকর্ষতি। তত্রাবজিতে পিত্তেঽপি শরীরান্তর্গতাঃ পিত্ত বিকারাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে। যথাগ্নৌব্যপোঢ়ে কেবলমগ্নিগৃহঞ্চ শীতং ভবতি তদ্বৎ।

চরক, সূত্রস্থানম্ ২০ অঃ।২১

পিত্তের প্রধানস্থান আমাশয় (stomach) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পিত্ত বিকার ঘটলে আমাশয় (stomach) চিকিৎসায় ইহার মূলোৎপাটন হয়। vagua nerveএর একটী অংশ Gastineb anch এই আমাশয়ে গিয়াছে। ইহা দ্বারা আমরা হৃৎপিণ্ডে ও তথা হইতে হস্তস্থিত নাড়ীতে পিত্তবিকার বুঝিতে পারি। এই আমাশয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে বলিয়া ইহাকে গ্রহণী নাড়ী বলে।

অপিচ —

"তদ্ধ্যাদিত এববামামাশয়ম্ অনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং শ্লেষ্ম মূলমপকর্ষতি। তত্রাবজিতে শ্লেষ্মণ্যপি শরীরান্তর্গতাঃ শ্লেষ্মবিকারাঃ প্রশান্তমাপদ্যন্তে। তথা ভিন্নে কেদারসেতৌ শালিযবযষ্টিকাদিন্যভিষ্যন্দ্যমানানি অম্ভসা প্রশোষমাপদ্যন্তে তদ্বৎ ইতি।

চরক, সূত্রস্থানম্ ২০ অঃ, ২৭।

এই কফের স্থানও আমাশয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আমাশয় স্থানটী দুইটী ফুসফুসের মূলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে (Middle Mediastinum) এবং ইহা হৃৎপিণ্ডের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত। এই স্থানে বহু Lymphatic glands আছে। ইহাই কফের কেন্দ্রস্বরূপ। এই স্থানে vagus nerveএর ফুসফুসের অংশটী গিয়াছে। শরীরে কফের আধিক্য হইলে এই স্নায়ু দ্বারা হৃৎপিণ্ডে ও তথা হইতে হস্তস্থিত নাড়ীতে তাহা জ্ঞাপন করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, vagus nerveটী বায়ু, পিত্ত ও কফের তিনটী প্রধান স্থানে গিয়াছে এবং যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফের পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া সমূহ দেখা যায়, তদ্রূপ এই vagus nerveএর accelaler ও Inhibiter প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া সকল ডাক্তার মহোদয়গণই জ্ঞাত আছেন। অথচ এই vagus nerve হৃৎপিণ্ডকে চালাইবার কোনই সাহায্য করে না। সুতরাং এই স্নায়ুটী যে বায়ু, পিত্ত ও কফ জ্ঞাপক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই vagus neave এর solar plexus হইতে (জঠরানল) বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে মস্তিষ্কে একটী Afferent sensation যায়, তাহাই উদান বায়ু এবং এই vagus nerve এর ২টী Recurrent Laryngeal nerve আছে, তদ্বারা বাক্যোচ্চারণ হয়। সুতরাং বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে জঠরানল সঙ্কুচিত হয়

বলিয়া বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাহা জানিতেন, তজ্জন্যই আহারের সময় তাঁহারা কোন বাক্যই উচ্চারণ করিতেন না, কারণ তাহাতে হজম শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। আমার জঠরানল প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমি আশা করি ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণের প্রত্যক্ষীভূত বায়ু, পিত্ত ও কফকে বৃথা শিক্ষিতাভিমানী চিকিৎসকগণ প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। চর্চ্চা অভাবে আমাদের অনেক জিনিস লোপ পাইয়াছে, তথাপি এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা অমূল্য।

দম্পতি-জীবন।

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তী)

—•)(:০:)(০—

সাধ ভক্ষণ

গর্ভ হইলে এখনও প্রায় সকল দেশে আত্মীয়েরা স্ত্রীলোকগণকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ ও বস্ত্রাদি দান করিয়া তাহাদের সমাদর প্রদর্শন করেন। গর্ভাবস্থায় রমণীর চিত্ত অপ্রসন্ন হইলে সন্তান বিকৃত ও রোগগ্রস্ত হয় বলিয়া পূর্ব্বে গর্ভিণীর সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত তাহার অভিপ্রায় মত সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। গর্ভ সময়ে রমণী যদি উদর পূরিয়া আহার করিতে না পায়, তাহা হইলে গর্ভ অকালে স্খলিত হইয়া যায়, অথবা শুষ্ক হইতে থাকে, এমন কি রসাভাবে পুষ্ট হইতে না পারায় যথা সময়ে প্রসব না হইয়া দীর্ঘদিন পেটের মধ্যে থাকিয়া যায়। প্রসূতি যে সকল বস্তু আহার করেন, তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে যে রস জন্মে, সেই রসের দ্বারাই গর্ভের উৎপত্তি, বৃদ্ধি তেজঃ, উৎসাহ, বল, বিক্রম ও লাবণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। এমন কি, সন্তানের শারীরিক পুষ্টি ও সুস্থকায়ে দীর্ঘজীবন লাভের প্রতি ঐ উৎকৃষ্ট রসই কারণ। উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে উত্তম বীজ রোপণ করিয়া যদি প্রথমে ভাল করিয়া জলাদি সেচন করা না যায়, তাহা হইলে সে বীজ হইতে যে বৃক্ষ জন্মে, তাহা যেমন দীর্ঘকালেও ফল-পুষ্পাদির দ্বারা শোভিত হয় না, সেইরূপ উৎকৃষ্ট গর্ভাশয়ে উত্তম বীজের দ্বারা গর্ভের উৎপত্তি হইলেও তাহা যদি প্রথম মাতার সারবান্ আহার্য্য রস দ্বারা বর্দ্ধিত না হয়, তবে সে গর্ভের সন্তান ও চিরদিনের মত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া সকল কাজেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পরে এবং অল্পায়ু হয়। গর্ভস্থ সন্তানের নাভিতে যে অমরা নামে নাড়ী আবদ্ধ আছে, উহা মাতার হৃদয় ও কতকগুলি নাড়ীর সহিত

মিলিত থাকে, মাতার হৃদয়স্থিত রস ঐ সকল নাড়ীপথে গর্ভস্থ সন্তানের অমরা-নাড়ীতে ক্ষরিত হইয়া সন্তানের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তানকে পরিপোষণ ও বর্দ্ধিত করে; মাতার হৃদয়ের সহিত ঐ অমরা নাড়ী সংযুক্ত থাকিয়া মাতৃহৃদয় ও গর্ভস্থ সন্তানের হৃদয়ের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ ঘটাইয়া রাখে। এই জন্য কোন কারণে মাতা হৃদয়ে আঘাত পাইলে সন্তানও আঘাত পাইয়া থাকে এবং মাতার সুখে সন্তানও সুখ অনুভব করে। গর্ভস্থ সন্তান যাহা প্রার্থনা করে—তাহা ঐ সমস্ত নাড়ী পথে মাতৃহৃদয়ে সঞ্চারিত হয় বলিয়া, মাতাও প্রার্থনা করিয়া থাকে। এইরূপ মাতার প্রার্থনা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের হৃদয়ও প্রার্থনা বিশিষ্ট হয়, সন্তানও মাতার দুইটী হৃদয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়াই সন্তান ও মাতা উভয়ের ইচ্ছা ও সমান হয়। গর্ভের ইন্দ্রিয় সমূহ ও হৃদয় পরিস্ফুট হইবার পর গর্ভিণী নানাবিধ প্রার্থনা করে। যে সকল বিষয় ভোগের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে সমুৎসুকা দেখা যায়, যে সমস্ত বিষয় লাভ করিবার জন্য গর্ভস্থ সন্তানই অভিলাষী হইয়া থাকে।

জননীর ও গর্ভস্থ সন্তানের দুইটী হৃদয়ের ভাব মিলিত হইয়া প্রার্থনা উপস্থিত করে বলিয়া গর্ভিণীর এই প্রার্থনাকে শাস্ত্রকারগণ দৌহৃদয্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। গর্ভাবস্থায় যে সকল বিষয় ভোগের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে সমুৎসুক দেখা যায়, সে সমস্ত বিষয় লাভ করিবার জন্য গর্ভস্থ সন্তানই অভিলাষী হইয়া থাকে, মাতার ইচ্ছা গর্ভস্থসন্তানের ইচ্ছার অনুরূপ হয় বলিয়া সে ইচ্ছার বিরুদ্ধতাচরণ করিলে অথবা তদিচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন না করিলে মাতা ও সন্তানের মনে ভীষণ ক্ষোভ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষোভবশতঃ শরীরের রক্ষক বায়ু দুষ্ট হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে কুব্জ, বামন, পঙ্গু, বধির, বিকৃত চক্ষু ও কুণিরোগগ্রস্ত করিতে পারে, এমন কি অভিলাষ পূরণ না করার জন্য মাতা অতিশয় ক্ষুব্ধা হইলে গর্ভের নাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় কোন অহিতকর বস্তুর জন্য ও স্ত্রীলোকের প্রার্থনা অনিবার্য্য হইলে, একবারে প্রার্থনা ভঙ্গ না করিয়া হিতকর অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সে অহিতকর বস্তুও প্রদান করা উচিত। গর্ভিণী যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্য যে যে বিষয় প্রার্থনা করে, সেই সেই বিষয় না পাইলে, সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া যায়, মোটের উপর গর্ভিণীর মঙ্গলেই গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল, গর্ভিণীর অমঙ্গলেই তাহার অমঙ্গল, এইজন্য গর্ভিণীকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত হিতকর নানাবিধ ভোজ্য, বস্ত্র-পরিচ্ছদ প্রভৃতির দ্বারা আপ্যায়িত করা এবং তাহার ইচ্ছার অনুকূল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মনের সন্তোষোৎপাদন করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। গর্ভিণীর প্রার্থনা পূরণ করিলে সন্তান সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন ও বলবীর্য্যশালী হইয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করে।

গর্ভিণীর প্রার্থনা-বিশেষে সন্তানের প্রকৃতি লাভ।

গর্ভকালে যে স্ত্রীলোকের রাজাকে দর্শন করিবার জন্য অভিলাষ জন্মে, তিনি ধনশালী ভাগ্যবান সন্তান প্রসব করেন।

নানারূপ পরিচ্ছদ অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহার সন্তান সর্ব্বদা

পরিষ্কার বেশে সজ্জিত ও অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

তপস্বীগণের আশ্রম দর্শনে যে গর্ভিণীর স্পৃহা জন্মে, তাহার সন্তান সংযতেন্দ্রিয় ও নিত্য ধর্ম্ম কার্য্যে নিরত হয়।

দেবতা প্রতিমাদি দর্শনে ইচ্ছাবতী গর্ভিণী প্রমথগণের মত দেবতাভক্ত সন্তান প্রসব করে।

সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দর্শনে গর্ভিণীর স্পৃহা জন্মিলে সন্তানের প্রকৃতি হিংসাশীল হয়।

মহিষের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য গর্ভিণীর ইচ্ছা হইলে সন্তানের নেত্র লালবর্ণ হয় ও গাত্রে বহু লোম জন্মে।

হরিণের মাংস ভোজন করিবার জন্য অভিলাষ হইলে গর্ভিণীর সন্তান বলশালী হয়, এবং সে সন্তানের জঙ্ঘা বিশেষতঃ প্রশস্ত হইয়া থাকে, যে সন্তান বনে বনে বিচরণ করিতে বড় ভালবাসে।

(ক্রমশঃ)

ম্যালেরিয়া জ্বর।

[শ্রী—পাইকর-বীরভূম]

'জুজু' শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র যেমন অবোধ শিশু সন্তানগণ একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ভয়ে বিচলিত হইয়া পড়ে, আজকাল ম্যালেরিয়া কথাটী শুনিয়াও তেমনই দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতার বদনমণ্ডল বিবর্ণ ও হৃদয় কম্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত জুজুর আশঙ্কা তিরোহিত হইলেও আলোচ্য ম্যালেরিয়া-ভীতি কিন্তু অপনোদিত হয় না। অধিকন্তু তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই দেখা যায়। এমন কি, একদিন যাঁহারা ম্যালেরিয়া বিভীষিকায় পড়িয়া সৎসাহসিকতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহারাও এখন ক্রমে সেই সৎসাহস হারাইয়া ম্যালেরিয়ার ভয়ে জড়সড় হইতেছেন। এরূপ সঙ্কটকালে ম্যালেরিয়ার-প্রকৃত তত্ত্ব যাহাতে সাধারণ্যে সম্যক প্রকাশিত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই সাধ্যতম চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মনে হয় যে, লোকে যদি একবার জানিতে পারেন যে, আলোচ্য ম্যালেরিয়া জ্বরই আমাদের চিরপরিচিত জ্বর ভিন্ন আর কিছু নহে, তাঁহারা যদি আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রসম্মত যুক্তি তর্ক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান দ্বারা একবার বুঝিতে পারেন যে, এদেশের সেই সর্ব্বজন বিদিত জ্বরই চিকিৎসার দোষে ও অত্যাচারের ফলে ম্যালেরিয়া এই নূতন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে সকলেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও সতর্ক হইয়া সহজেই ম্যালেরিয়ার হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিতে পারেন। বলা বাহুল্য,

আমাদের সেই স্বদেশী জ্বর, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর যে মুখোস পরিধান করিয়া আজ জন সমাজে বিভীষিকা দেখাইতেছে, তাহা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠকগণকে একটী কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। আমরা ম্যালেরিয়ার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে গিয়া যে সকল যুক্তি-তর্ক-বচন প্রভৃতির অবতারণা করিব, তাহার কোনটিই আমাদের স্বকপোল কল্পিত নহে। অপিচ ইহার কোন অংশই যে আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস অথবা তাদৃশ অন্য কোনরূপ অসার ও অযৌক্তিক গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত তাহাও নহে। পরন্তু এতদর্থে লিখিত যাবৎ কথাই ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং দেশবিখ্যাত চিকিৎসক ও সুপণ্ডিত গণের উক্তির দ্বারা সম্যকরূপ সমর্থিত হইবে। তবে কথা এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে সকল কথার বচন প্রমাণ উদ্ধৃত না হইলেও আমরা আমাদের স্থূল স্থূল উক্তির সমর্থন জন্য সর্ব্বজন সমাদৃত বচনাদি উদ্ধৃত করিতে কদাচ বিরত হইব না।

জ্বর জিনিসটী যে কি—তাহা অনেকে অবগত না হইলেও জ্বর হইলে যে শরীরের একটা ভাবান্তর ঘটে—তাহা সকলেই অবগত আছেন। শরীর বিজ্বর অবস্থায় থাকিলে আমরা স্বতঃই এক প্রকার সুখ ও শান্তি উপভোগ করিয়া থাকি, কিন্তু জ্বর হইলেই সে সুখ-শান্তির পরিবর্ত্তে কেমন একটা অসুখ ও অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব এই অসুখ ও অশান্তি জনক জ্বরের পরিচয় জানিতে হইলে প্রথমতঃ শরীরের স্বাভাবিক (বিজ্বর) অবস্থার এবং পরে তাহার জ্বরাবস্থার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

চিকিৎসা শাস্ত্রে বিবিধ জ্বরের নামোল্লেখ আছে। এদেশে বিবিধ রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেও ঐ সকল জ্বরের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে যখন ম্যালেরিয়া জ্বরই আলোচ্য, তখন আমরা অন্য জ্বর সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া যে জ্বর কালে ম্যালেরিয়া নামে পরিচিত হয়, কেবল তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

কি জন সাধারণ, কি পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালে ম্যালেরিয়া জিনিসটাই এদেশে ছিলনা। কিন্তু এদেশের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই মতের আদৌ সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, বিশুদ্ধ গব্যঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রিত করিলে তাহা যেমন ভেজাল নাম ধারণ করে, আমাদের দেশের সর্ব্বজনপরিচিত সাম দোষজ জ্বরও তেমনই দোষান্তরের সহায়তায় ম্যালেরিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অতএব ম্যালেরিয়া জ্বর—মূলতঃ আমাদের দেশী জ্বর ভিন্ন আর কিছু নহে। তবে ইহাকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করিতে হইলে ইহার ম্যালেরিয়া বা ভেজাল জ্বর এইরূপ একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে। আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলে এবং বহুদর্শী সুচিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতার প্রামাণ্যে আয়ুর্ব্বেদের এই মতই সমর্থন যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে এক দৃঢ় ধারণা জন্মে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই আমরা আজ ম্যালেরিয়ার ঠিকুজী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সকলেই অবগত আছেন—যে, জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা হইতে বিশেষতঃ জ্বরা-

বস্থার কাল হইতেই আমাদের দেহাভ্যন্তরে যেন একটা তোলপাড় উপস্থিত হয়। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, সুস্থ শরীরে যে একটা মিলজুল থাকে, জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা ও জ্বরাবস্থায় তাহার গরমিল অর্থাৎ ভাবান্তর ঘটে। অতএব জ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই মিলজুল পদার্থটী যে কিরূপ এবং পরবর্ত্তী কি প্রকার কারণ দ্বারাই বা তাহার সেই মিলজুল (Order নষ্ট হইয়া গরমিল (Disorder) উপস্থিত হয় তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। প্রকাশ থাকে যে, শরীরের ঐ মিলজুল তত্ত্ব আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের, আর ঐ মিলজুল নাশকারী কারণের তত্ত্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যেমন তানপুরা নামক বাদ্যযন্ত্রে খেথব, কোমল, গান্ধার অথবা পঞ্চমে সুর বাঁধা হয় এবং অন্যান্য যন্ত্র গুলিকে পরে তাহারই সুরে বাঁধিয়া সঙ্গীতারম্ভ করা হইয়া থাকে, জীবাত্মাও তদ্রূপ জীবন ক্রিয়ারম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোন এক সুরে সুর (জীবনীশক্তি) বাঁধিয়া লয় এবং তাহার ফলে শারীরযন্ত্রের সুখকরী ও শান্তিদায়িকা ক্রিয়া চলিতে থাকে। আবার বাদ্যযন্ত্র বদসুরা হইলে সঙ্গীতধ্বনি যেমন সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় মধ্যে একরূপ উৎকট যাতনা প্রদান করে, জীবন ক্রিয়ার বদসুরা অর্থাৎ ব্যতিক্রম হইলেও শরীরী মানব তেমনই একপ্রকার অশান্তি উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

আমরা ক্রমে জীবন ক্রিয়ার বদসুর হওয়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ ইহা স্থূল চিকিৎসা শাস্ত্রেরই অন্তর্গত। এই স্থূল আলোচনার পূর্ব্বে জীবন ক্রিয়ার স্বরূপের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহায়তায় কতকটা উদ্ঘাটিত করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। জগদম্বা জানেন সে চেষ্টা সফলবতী হইবে কিনা।

শরীর তত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের দেহ কতকগুলি যন্ত্রের সমষ্টি মাত্র এবং চক্ষু কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইহার এক একটি ব্যষ্টি যন্ত্র। এই সমস্ত ব্যষ্টি যন্ত্র জড় পদার্থ অর্থাৎ ইহারা স্বয়ং কোনরূপ চেতনার পরিচয় দিতে সমর্থ নহে। যখনই ইহারা সচেতন দৃষ্ট হয়, তখনই দেখা যায় ইহারা অন্য এক শক্তির দ্বারা পরিচালিত সেই শক্তির কারণ ক্রিয়াশীল হইয়া দেহের যন্ত্র গুলি চালিত করে, কখন বা বিলীন অবস্থায় কোন একস্থানে অবস্থিতি করে। শক্তির এই বিলীন অবস্থায় মানুষ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। যখন মানুষ নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে তখনই তাহার এতাদৃশ অবস্থা ঘটে। এই শক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ এই শক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামক তিনটী বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে গঠিত। শাস্ত্র বলেন যে, চৈতন্যোপেত এই ত্রিশক্তিই কর্ম্মপুরুষ বা জীবাত্মা। এই ত্রিশক্তির একটা মিলজুল (Hormony) থাকে। যতদিন এই মিলজুল অব্যাহত থাকে, ততদিন শরীরের কোন গ্লানি অনুভূত হয় না, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম হইলেই যত গোল উপস্থিত হয়।

চৈতন্যোপেত এই ত্রিশক্তি বা কর্ম্মপুরুষ এক এক সময় এক এক শক্তির অধীন হয় অর্থাৎ কখন তিনি সত্ত্ব প্রধান, কখন রজঃ প্রধান এবং কখনও বা তমঃ প্রধান হইয়া পড়েন। সত্ত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞান। অতএব

এই কর্ম্মপুরুষ যখন সত্বপ্রধান হইয়া কার্য্য করেন, তখন দেহের কোন অবস্থান্তর ঘটেনা। কিন্তু যখন তিনি দুরদৃষ্টক্রমে রজঃ প্রধান বা তমঃ প্রধান হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার যাবৎ কষ্টের সূত্রপাত হয়। রজঃ শব্দের অর্থ রাগ অর্থাৎ অনুরাগ। সুতরাং রজঃ প্রবল হইলে প্রত্যেক বস্তুতেই অনুরাগ বা তৃষ্ণা বাড়িতে থাকে। অন্য পক্ষে তম শব্দের অর্থ আন্ধ্য, মান্দ্য, জড়তা প্রভৃতি। সুতরাং কর্ম্ম পুরুষ তম প্রধান হইলে তাহার জ্ঞানের লোপ হয় ও জড়তাদি বৃদ্ধি পায়। কাজেই কর্ম্মপুরুষ রজঃ বা তম প্রধান হইলে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। কারণ কর্ম্মপুরুষ জ্ঞানপ্রধান হইলে তিনি জ্ঞানালোক দ্বারা ভাল মন্দ চিনিতে পারেন এবং তাহার ফলে মন্দ ত্যাগ করিয়া যাহা ভাল—তাহাই গ্রহণ করিয়া সুখী হন। কিন্তু তাঁহার রজঃ বা তম বৃদ্ধি হইলে তিনি জ্ঞানহারা হইয়া পদে পদে বিপন্ন হইতে বাধ্য।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ কর্ম্মপুরুষই নানা কারণে জ্ঞান হারাইয়া হয় রজঃ প্রধান, নয় ত তম প্রধান হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের দুঃখেরও সীমা নাই। তাঁহারা যে দেহের অধীশ্বর, সেই দেহও আর ঠিক থাকিতেছেনা। সৃষ্টিতত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, এই দেহ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী ভূত দ্বারা নির্ম্মিত। স্বয়ং কর্ম্মপুরুষ এই পাঁচটী ভূত দ্বারা নরদেহ নির্ম্মাণ করেন এবং পরে এই দেহের দৈনন্দিন ক্ষয় ও ঐ সকল ভূত পদার্থ সংগ্রহ করিয়া পূরণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মপুরুষ যতদিন সত্ব প্রধান অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান থাকেন, ততদিন তাঁহার এই সংগ্রহ কার্য্যের কোন ত্রুটি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ কর্ম্মপুরুষ জ্ঞান হারাইয়া রজঃ প্রধান বা তম প্রধান হইলেই আর দেহের যথাবশ্যক উপাদান সংগৃহীত হয় না। কাজেই উপাদান-বিভ্রাটের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের যন্ত্রাবলীর মধ্যেও অনুরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে সেই কর্ম্মপুরুষও অর্থাৎ দেহ যন্ত্রের যন্ত্রীও আর যথাযোগ্য ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারেন না। এই উপাদান বিভ্রাট জনিত দেহ যন্ত্রের বিভ্রাটের নামই বাধা বা শারীরিক ব্যাধি।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ক্ষিত্যাদি যে পঞ্চভূত দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহার মধ্যে অপ, তেজঃ ও মরুৎ নামক নামক তিনটী উপাদান দেহরক্ষার প্রধান সাধন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহাদের নাম কফ, পিত্ত ও বায়ু নামক ত্রিদোষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দেহ মধ্যে ইহাদের মাত্রা ঠিক থাকিলে আর কোন গোলই উপস্থিত হয় না, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন একটীর বা দুইটীর অথবা তিনটীরই প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইলে কর্ম্মপুরুষ অস্থির হইয়া পড়েন। কারণ এই পরিবর্ত্তন-বৈষম্যের নামই ব্যাধি। তাই আয়ুর্ব্বেদকার বলেন,—

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং
ব্যাধিরুচ্যতে।

ইহাই হইল যাবৎ রোগের আধ্যাত্মিক ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত ব্যাখ্যা। বলা বাহুল্য আলোচ্য ম্যালেরিয়া জ্বর ও এই সকল ব্যাধির অন্যতম।

তবে এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ম্যালেরিয়া জ্বরের পরিচয় পাওয়ার পূর্ব্বে

সাধারণ জ্বর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এজন্য আমরা প্রথমে সাধারণ জ্বর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া ক্রমে ম্যালেরিয়া জ্বরের তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

যে কোন প্রাণীদেহ পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায় যে, তন্মধ্যে অল্লাধিক তাপ বিদ্যমান থাকে। ইহার মধ্যে যে তাপ স্বাভাবিক, তাহাই দেহের সুস্থতাজ্ঞাপক। মানবের সুস্থদেহেই এই তাপ বিদ্যমান থাকে। যদি কেহ এই তাপের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে তাপমান যন্ত্রের (Thermometr) সাহায্যে যে কোন সুস্থ মানব-দেহ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। এরূপ পরীক্ষার ফলেই তিনি দেখিবেন যে, ঈদৃশ প্রত্যেক দেহেই প্রায় ৯৮॥০ রেখা (degree) তাপ বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুল্য, কোন শবদেহে এই তাপ দৃষ্ট হয় না। ইহা পরীক্ষার জন্য কোন যন্ত্রেরও আবশ্যক হয় না, কারণ শব দেহের শৈত্য এবং প্রাণীদেহের উষ্ণতা করস্পর্শ মাত্রেই অনুভূত হইয়া থাকে।

আবার দেখা যায় যে, জ্বর হইলেও আমরা এক প্রকার তাপ অনুভব করি। তবে এ তাপ শরীরের স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা জ্বরের মাত্রানুসারে ক্রমশঃ বেশী। শরীরের উল্লিখিত স্বাভাবিক তাপই বর্দ্ধিত হইয়া পরে জ্বর নামে পরিচিত হয় কিনা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা আবশ্যক। তবে ঈদৃশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ তাপ ও জ্বর উভয়েরই কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ বলেন যে, শরীরের স্বাভাবিক তাপই বর্দ্ধিত হইয়া জ্বর নামে অভিহিত হয়। তাঁহাদের কার্য্য দ্বারাও ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। জ্বর হইয়াছে কিনা তাহা তাঁহারা রোগীর দেহে থার্মোমিটার লাগাইয়া পরীক্ষা করেন। রোগীর দেহে কিয়ৎক্ষণ ঐ যন্ত্র লাগাইয়া রাখিলে যদি তাহার পারদ ৯৮॥০ রেখার অধিক না উঠে, তাহা হইলে রোগীর জ্বর নাই বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করেন। আবার সেই তাপ ৯৮॥০ রেখার বেশী হইলেই রোগী জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করা হয়। অতএব দেহের তাপই যে বর্দ্ধিত হইয়া জ্বর নামে পরিচিত হয়—তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ স্বীকার করেন।

উল্লিখিত সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ জ্বরের কোন সাধারণ সূত্র দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। তাঁহারা মাত্র বলেন,- Fever in the symptom of some disorder in the physical system অর্থাৎ জ্বর শারীর যন্ত্রের একপ্রকার বিশৃঙ্খলতার জ্ঞাপক। বলাবাহুল্য, এরূপ সাধারণ সূত্র দ্বারা তত্ত্বদর্শী হিন্দু চিকিৎসকগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা জানেন শুধু জ্বর কেন, যে কোন ব্যাধিই শারীর যন্ত্রের বিশৃঙ্খলতার জ্ঞাপক। বিশেষতঃ তাঁহারা অবগত আছেন যে, আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষি প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্রে এই জ্বরের তত্ত্ব সূক্ষ্মতর ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। জ্বর যে মাত্র শরীরের বৈষম্য মূলক তাপ—শুধু একথা বলিয়া এই শাস্ত্র নীরব নহেন। শরীরের কোন্‌স্থান এই তাপের মূলাধার এবং কি কারণেই বা এই

তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাহার সন্তোষ জনক মীমাংসা আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়।

হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, আমাদের এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক অর্থাৎ, মাটি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ভূত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। জীবাত্মা অর্থাৎ দেহের কারিকর এই পঞ্চভূত দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করেন। এই পঞ্চ উপাদানের মধ্যে তেজ বা তাপ মানব দেহ-নির্ম্মাণের ও তাহার রক্ষার একটী প্রধান সাধন। এই তাপ শরীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহারই একস্থানে অবস্থান করে এবং পরে শরীরের, পুষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। এক্ষণে এই বিশাল মানব দেহের কোন্ অংশটী এই তেজ বা তাপের মূল স্থান তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

রোগ-বিজ্ঞান।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্যব্যাকরণ তীর্থ, এইচ, এম, বি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

আবার রোগ সকল ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। জীব দেহের জীবনী শক্তি যখন জীবাণু শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন তাহাকে ধ্বংস করিতে হইলে কোন সজীব পদার্থের দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে: জড় শক্তির দ্বারা জড় দেহের বিকৃতি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু জীবনী শক্তির উপর তাহার কোন প্রভুত্ব বা অধিকার থাকিতে পারে না। চৈতন্যের অংশভূত জীবনী শক্তিকে চৈতন্যের অংশ সম্ভূত জীবাণু শক্তি আক্রমণ করিলে এক মাত্র সে স্থলে চৈতন্য বিশিষ্ট ঔষধ শক্তিই জীবাণু শক্তিকে দূর করিতে সমর্থ। জগৎ চৈতন্যময় প্রত্যেক পদার্থে চৈতন্যের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অনুপরমাণু হইতে বৃক্ষ লতাদি পর্য্যন্ত সমস্ত পার্থিব পদার্থেরই প্রাণ আছে, চৈতন্যের অংশ আশিকরূপে নিহিত আছে। তাই চৈতন্যের উদ্বোধক সাধক বৃন্দ সারা জগৎকেই চৈতন্যময় দেখিতে পান। তবে চৈতন্য দ্বিবিধ; একটী শুদ্ধ চৈতন্য আর একটী জড় চৈতন্য। সাধক যখন সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সত্ত্বা লাভ করেন, তখন তিনি সারা জড় প্রকৃতিকেই চৈতন্যময় দেখেন, আর জড় চৈতন্যে মিশ্রিত আমরা জীব ভিন্ন সকলকেই জড় আখ্যায় অভিহিত করি, কিন্তু ভাবিনা যে একদিন অনু পরমাণু সকলেই ক্রম বিকাশ ক্রমে শুদ্ধ চৈতন্যে পরিণত হইবে। সাধক দেখিবেন—“সর্ব্বেদং ব্রহ্মময়ং জগৎ”

সারা সংসারটাই ব্রহ্মময়, চৈতন্যময়, সচেতন; আর দেখিবেন—ফুল ফলের অভ্যন্তর হইতে শত শত সজীব কোমল মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে; যেন ফাটিয়া সৌন্দর্য্যের সহিত সৌগন্ধ্য মাখিয়া সারি সারি বাহির হইয়া আসিতেছে, বিশ্ব প্রকৃতির বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই প্রকৃতির সাধক, ভারত গৌরব, জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রাদির সাহায্যে দেখাইতেছেন যে, তরু গুল্মাদিরও জীবন আছে মানবের মত তাহাদেরও কতকাংশে অনুভব্যাদি শক্তি ও দেহে স্নায়ু প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, ইহা অবিসম্বাদে সপ্রমাণ করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহা পরিবর্ত্তন ও নূতন আলোক দান করিয়াছেন। অবশ্য ইহা তিনি যে নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, বহু প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষিগণ প্রথম তাহার সত্বা উপলব্ধি করেন তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমাহিতাঃ।"

সেই তরুলতাদিরও অন্তরে সংজ্ঞা আছে, তাহাদের সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে, ঋষিরা চৈতন্যময়, তাই বৃক্ষাদিতেও চৈতন্যের ব্যক্ততা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর একালের ঋষি জগদীশ চন্দ্র তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন। কেবল কোমল তরুলতাদিরই যে প্রাণ আছে, তাহা নহে, অতি কঠিন লৌহ ইস্পাৎ প্রভৃতিরও যে অন্তর নিহিত চেতনা আছে, প্রাণ আছে, তাহা অধুনা পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলী প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। মানুষের দেহে যেমন ক্লান্তি আসে—পরিশ্রমের পর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তেমনি ধাতব পদার্থেরও শ্রান্তি আছে দেখিতে পাওয়া যায়, লৌহ ও ইস্পাতে এই লক্ষ্যটী বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। লৌহ নির্ম্মিত কলকব্জা বহুদিন ব্যাপিয়া কার্য্য করিতে করিতে তাহাদের দেহ এমন অবসন্ন হইয়া পড়ে যে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম না পাইলে তাহারা আর কার্য্য করিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহাদের দ্বারা কার্য্য করাইতে গেলে তাহারা অনেক সময়ে আর সুচারু কার্য্য করে না বা অকর্ম্মণ্য অথবা একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। বহিদৃষ্টিতে মনে হয়, কলখানি হঠাৎ বিকল হইয়া গেল। কিন্তু বস্তুতঃ কল খানি হঠাৎ বা অকারণে বিগড়াইয়া যায় নাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অবসন্ন ধাতব পদার্থকে অল্পকাল বিশ্রাম দিলে তাহার কার্য্যকারিতা শক্তিতে নবোদ্যম আসে।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও গণিতজ্ঞ লর্ড কেল্‌ভিন্ ধাতুর এই অন্তর্নিহিত চৈতন্য শক্তি সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন এবং বহু প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করেন। তিনি কয়েক গাছি লোহার তারকে ছয়দিন ধরিয়া অবিরাম পরিদোলনের অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি দেখিলেন যে, তার গুলির আকুঞ্চন-প্রসারণ শক্তি (elasticity) বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে একদিন বিশ্রাম দেওয়া হইল। এই বিশ্রামের পর দেখা গেল যে তার গুলি তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে এই সত্যটী বহুবার পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, তাহাদিগেরও প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। যাবতীয় জড় প্রকৃতির কত যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য

আছে তাহার ইয়ত্তা নাই, সভ্য-মানব বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে বহু রহস্য ভেদ করিয়াছে ও করিতেছে।

লৌহাদি ধাতুর চৈতনার কথা লর্ড কেল্‌ভিন্‌ সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেও তাহার পূর্ব্বে ব্রিটনের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী জন্‌ টিণ্ড্যাল্‌ (Tyndel) লৌহাদির এই চৈতন্য প্রকৃতির আভাস পাইয়াছিলেন ও ইহার জীবন লক্ষণ আছে বলিয়া তাঁহার মনে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জড়বিজ্ঞান মতের তাৎকালিক অবস্থায় তিনি লৌহের জৈব লক্ষণের কথা সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। অধ্যাপক টিণ্ড্যালের এই প্রত্যাখ্যাত সুযোগ ও সত্যের কথা উপলক্ষ্য করিয়া "থিয়সফি" সম্প্রদায়ের আদি অধিষ্ঠাত্রী বিদুষী ম্যাডেম্‌ ব্লাভাটস্কি তাঁহার রচিত বিখ্যাত "Isis Unviled" নামক গ্রন্থে লৌহের চেতনা-শক্তির কয়েকটী উদাহরণ দিয়া একটু কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন—"Tyndel has narrouslly escaped a truth. Iran has Life."

সে যাহা হউক, ধাতুর চেতনা-শক্তি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আমাদের জগদীশ-চন্দ্র তাঁহার অভিনব যন্ত্রাদি ও পরীক্ষা-সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল নূতন পরীক্ষায় লৌহাদি ধাতুর অবসাদ উত্তেজনা প্রভৃতি বহু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জীবৎ লক্ষণ প্রকাশিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ Royal Institute নামক বৈজ্ঞানিক ভবনে তত্রত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহার এই সকল পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষা-প্রদর্শনকালে পূর্ব্বোক্ত লর্ড কেল্‌ভিন্‌ মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষায় ও তল্লব্ধ সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ধাতুর জীবনী শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদেরও জীবনী-শক্তির আবিষ্কার করিয়া তিনি আর্য্য ঋষিগণের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য বস্তু বিজ্ঞানের অচ্ছেদ্য যুক্তিময় সত্যের উপর প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষের মত অবসাদ, সুখ, দুঃখ ও উত্তেজনা-ধাতু ও উদ্ভিদ পদার্থেও আছে, শুধু এই জ্ঞানটুকু লাভ করিলেও মানবজীবন সার্থক বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞান ও পরম জ্ঞানের পথে মানুষ যতই অগ্রসর হইবে, ততই সে সেই অনাদি বিধাতা পুরুষের নিকটতর হইতে পারিবে। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই প্রাণ আছে, সেই জীবন বিশিষ্ট ঔষধের উপাদান পদার্থ জীবের জীবনী শক্তির উপর আধিপত্য করিয়া রোগ উৎপন্ন করিতে পারে, আবার বিনাশ করিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন—"ঔষধী গন্ধজে মূর্চ্ছা" অনেক সময় গোলাপ ফুলের গন্ধেও মানব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, কারণ তাহার চৈতন্য শক্তির দ্বারা জীবনীশক্তি আক্রান্ত হয়। ডাঃ হিউজ হে-ফিভার বা ওষধিগন্ধজ জ্বর ইপিকাক আঘ্রাণে প্রকাশ পায় বলেন, কিন্তু এই রোগ যে পুষ্পরেণু হইতে জন্মে, তাহা নহে। ডাক্তার ব্লাক্লি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহাতে জীবাণু থাকে। অতএব যে ঔষধের এই জীবিত

পদার্থ বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, কেবল তদ্দ্বারাই হে-ফিবার সম্যক আরোগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রত্যেক ঔষধিরই রোগোৎপাদন করিবার উপযোগী একটী অসাধারণ শক্তি আছে, প্রাণ আছে। যদি তাহা না থাকিত, তবে তাহার আরোগ্যকারী শক্তিও থাকিত না। চৈতন্যের সৃষ্ট চৈতন্যময় যাবতীয় তরুলতাদিরই যেমন রোগোৎপাদনকারী শক্তি আছে, তেমনই আরোগ্যকারী অন্য একটী শক্তি তাহার অন্তরে নিহিত আছে। সচেতন প্রাকৃতিক পদার্থ শক্তি, জীবনী শক্তিকে আক্রমণ করিয়া একটী রোগ উৎপন্ন করে, পরে আর একটী সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ—শক্তি কর্ত্তৃক অপসৃত হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের রোগোৎপাদনকারী প্রাকৃতিক শক্তি যখন জীবনী-শক্তিকে আক্রমণ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে, তখন মাত্রাদির দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী সচেতন ঔষধ-শক্তি ও প্রাকৃতিক রোগাক্রান্ত জীবনীশক্তির উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়। জীবনীশক্তি যখন প্রবলতর সজীব ঔষধজনিত রোগশক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন আর প্রাকৃতিক জীবাণুযুক্ত রোগশক্তিকে গ্রাহ্য করে না। কারণ সেই সময় তাহার অধিক শক্তিকে সহ্য করিয়া নিজের অর্থাৎ জীবনী-শক্তির শক্তি, প্রাকৃতিক রোগশক্তি অপেক্ষা অধিকতর হয়, সেইজন্য প্রাকৃতিক রোগশক্তিকে আর মানিতে চায় না। যেমন কোন লোককে একটী দশ সের ওজনের দ্রব্য বহিবার জন্য দেওয়া হইলে তাহার যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছিল ও তাহার সেই দশ সের দ্রব্য বহিতে যে কষ্ট হইতেছিল, পরে তাহাকে একটী অর্দ্ধ মোন ভারপদার্থ বহিতে দিলে ক্রমশঃ তাহার অন্তরের শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, পূর্ব্বের দশ সের ভার এখন আর তাহার তত দূর অনুভূতিতেই আসে না। সেইরূপ জীবনীশক্তি অল্প বলবিশিষ্ট প্রাকৃতিক রোগশক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও যখন অধিক বলসম্পন্ন ঔষধজনিত রোগশক্তিকে বহন করিতে সক্ষম হয়, তখন আর প্রাকৃতিক রোগ শক্তিকে না মানিয়া দূরীভূত করে কারণ দুইটী সমধর্ম্মী পদার্থ এক স্থলে আশ্রয় পাইতে পারে না, তাই প্রাকৃতিক রোগশক্তিও ঔষধজনিত রোগশক্তি যদি সমধর্ম্মী বা সমজাতিবিশিষ্ট হয়, তবে ঔষধজনিত রোগশক্তি মাত্রাদির দ্বারা প্রবল হওয়ায়, প্রাকৃতিক রোগশক্তি দূর হয় বা জীবনীশক্তি তাহাকে গ্রাহ্য আর করে না। যেমন প্রাতঃকালীন বৃহস্পতিনক্ষত্র সূর্য্যের প্রখর আলোকবশতঃ দৃষ্ট হয় না, নিস্তেজ হইয়া যায়। নস্য লইলে Nerveএর উগ্রতা বশতঃ অন্য কোন গন্ধের ঘ্রাণ অনুভব করা যায় না, একটি বাতিতে পড়িবার সময় যদি শত বাতিবিশিষ্ট একটী আলোক দেখা যায় তবে পূর্ব্ব বাতিটী নিস্তেজ হইয়া যায়, সেইরূপ জীবনীশক্তি ক্ষীণশক্তি প্রাকৃতিক রোগশক্তিকে দূর করিয়া দেয়, পরে ঔষধজনিত রোগশক্তির স্থিতিকাল অতীত হইলে তাহা আপনা হইতে অন্তর্হিত হয়। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হওয়ার পর ও কুইনাইনের রোগোৎপাদক শক্তির দ্বারা জীবনীশক্তি আক্রান্ত ও অভিভূত থাকে, তাই রোগীর হস্তপদের অবসন্নতা যায় না, কর্ণে শুনিতে পায় না, মুখে স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, জল তিক্ত মনে হয়, ক্ষুধা হয় না,

প্রভৃতি লক্ষণ কয়েকদিন যাবৎ থাকিবার পর যখন কুইনাইনের রোগশক্তি অন্তহিত হয়, তখন রোগী আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। ইহাই আরোগ্য।

ক্রমশঃ।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

[শ্রীঅবনীভূষণ গুপ্ত]

দাহে—ধনে, নালতে ও মৌরী মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধ পোয়া ঈষৎ গরম জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া সেবন করিলে পিত্তজ হাত—পা জ্বালা নিবারিত হয়।

বৃশ্চিক দংশনে।—বৃশ্চিক দষ্টস্থানে তেঁতুলের বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

শীতপিত্তে।—আমলকী চূর্ণ ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিলে শীতপিত্তরোগ নষ্ট হয়।

আমাশয়ে।—সোঁদালের পাতা সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে আমাশয় ভাল হয়।

রক্ত আমাশয়ে। (১) থুলকুড়ীর রস ২ তোলা লইয়া দিবসে ৩ বার সেবন করিলে রক্ত আমাশয় ভাল। (২) দাড়িম্বত্বক ২ তোলা, পিঁয়াজ ১ তোলা, জল ⁄৪ সের, শেষ ⁄২ সের পানার্থ সেব্য। ইহাতে পিপাসা ও আমাশয় ভাল হয়।

দাঁতনড়ায়—বকুল ফুল চিবাইলে দাঁতনড়া ভাল হয়।

ছেলেদের কাসে পানের বোটা থেঁতো করিয়া পুরাতন ঘৃতের সহিত ফুটাইয়া সেই ঘৃত বুকে মালিস করিলে ঘড়ঘড়ানি, কাসি, বক্ষের বেদনা আরোগ্য হয়।

ফোড়ায় যবের ছাতু ঘৃতে ফুটাইয়া ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া পাকে।

চুলকণায়—হলুদ, নিমপাতা, সৈন্ধবলবণ, সমভাগ, একত্রে গাত্রে মর্দ্দন করিলে চুলকণা ভাল হয়।

পোড়া ঘায়ে—কতগুলি কাঁচা পলতা থেঁতো করিয়া তাহার সহিত কিছু সর্ষপ তৈল পাক করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাও। ইহা পোড়া ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দাহে আর একটী—কাঁচা হলুদ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে হাত, পা জ্বালার উপশম হয়।

কাসে—বৃহতীর ফল ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে কাস ভাল হয়।

ক্রিমিতে—(১) বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ চূর্ণ ও ইন্দ্রযব চূর্ণ—মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নিশ্চয় ভাল হয়।

(২) আমারুলের কচিপাতার শ্বেতাংশ ছেঁচিয়া তাহার রসের সমপরিমাণ চুণের জলের সহিত খালি পেটে খাইলে ভাল হয়।

স্বরভঙ্গে—(১) ব্রাহ্মীশাক ভাজিয়া খাইলে গলা ভাঙ্গা সারে।

(২) একটী পাতি লেবু বা কাগজী লেবু গোবরের মধ্যে রাখিয়া তাহা পোড়াও, তাহার ভিতর লেবুটী অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে তাহার রস গরম গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে গলা ধরার তখনি কিছু উপশম হয়। এক টুকরা সোহাগা গালে রাখিলে স্বরভঙ্গ ভাল হয়।

ব্রণ মেচেতায়—মুখ ব্রণ বা মেচেতা হইলে একটী পাতি বা কাগজী লেবু লইয়া একটী গোবরের ঠুলী প্রস্তুত করিয়া তাহা পোড়াইয়া তাহার রসে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দিলে, উহা ভাল হয়।

বাতের বেদনায়—এরণ্ড তৈল, কিছু সৈন্ধব লবণ দিয়া ঈষৎ গরম করিয়া বেদনা স্থানে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হয়।

২১। রক্তপিত্তে।—কুক্‌সিমের পাতার রস ও চিনি সেবন করিলে রক্তপিত্তের বিশেষ উপকার হয়।

২২। উকুনে।—ধুতুরা পাতার রস ও ও কর্পূর বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন নষ্ট করা যায়।

বসন্তের প্রতিষেধক কতকগুলি মুষ্টিযোগ।

১। প্রত্যহ প্রাতে কণ্টকারির মূল এক আনা, নিমপাতা এক আনা ও গোলমরিচ দশটী একত্রে বাটিয়া প্রত্যহ খাইলে বসন্ত হইবার ভয় থাকে না।

২। বাসক পাতার রস ১ তোলা কণ্টকারীর মূলের রস ।০ আনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্ত হয় না।

৩। কাঁটানটের মূল চারি আনা ও গোল মরিচ ১০টী বাটিয়া সেবন করিলে শরীরের বসন্তের বিষ নষ্ট হয়।

৪। কাঁচাহলুদ এক তোলা ও ইক্ষুগুড় এক তোলা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে বসন্তাক্রমণের ভয় তাহা থাকে না।

৫। প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা হলুদের রস ॥০ তোলা, ব্রাহ্মীশাকের রস ॥০ তোলা ও মধু কুড়ি ফোঁটা একত্রে খাইলে বসন্ত-হামাদির আক্রমণ হয় না।

৬। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে অর্দ্ধ তোলা হেলেঞ্চার রসের সহিত রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া তাহা আধ আনা পরিমাণে লইয়া একত্রে সেবন করিলে বসন্তের বিষ নষ্ট হয়।

বসন্তের দাহ নিবারণ।

বসন্ত রোগনিবন্ধন শরীরে দাহ উপস্থিত হইলে বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দাহের শান্তি হইবে। অধিকন্তু এই মধু মিশ্রিত জল পান দ্বারা বসন্ত রোগের উপশমও হয়।

• উপরোক্ত মুষ্টিযোগগুলি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পরীক্ষিত। লেখক—

সমালোচনা।

চণ্ডীদাসকাব্য—শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম এ প্রণীত। শ্রীতারাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক ১২৪।২।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।৹ টাকা। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের আসন কত উচ্চে—তাহা যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব ভিন্ন প্রকৃত কাব্যানুরাগীর নিকটও চণ্ডীদাসের আদর কম নহে। চণ্ডীদাসের—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

এ কবিতা, কাব্য-প্রিয়-পাঠকের প্রাণে চিরদিনই ধ্বনিত হইয়া কবি চণ্ডীদাসকে অমর করিয়া রাখিবে। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ সেই মহাকবির জীবনী অবলম্বনে গ্রথিত। রজকিনী-রামমণি, দেবী বাশুলীর আদেশে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা প্রকাশের আলোকদাত্রী। এ গ্রন্থে শ্রেণীবদ্ধভাবে কবির জীবনী লিখিতে বসিয়া গ্রন্থকার সে সকল কথা ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন। এ কাব্যের যে স্থানই পাঠ করা যায়, তাহাতেই যেন অমৃতধারা বর্ষিত হইয়া থাকে। ভাবের আবেশে আত্মহারা হইয়া চণ্ডীদাসের এই জীবনী লিখিত হইয়াছে। এ যুগে এরূপ ধরণের কাব্য পুস্তক একেবারেই বিরল। কাব্যামোদী-সুধীসম্প্রদায় এ গ্রন্থ পড়িলে পরিতৃপ্তই হইবেন। ছাপা অতি সুন্দর, কাগজ পরিপাটী। আমরা এ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।—বিহার অঞ্চলে আজকাল ডাক্তারি অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বেশী প্রচলন হইয়াছে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপরে সে সকল অঞ্চলের অধিবাসীবর্গের অনুরাগ অত্যধিক। কেবল বাঙ্গালী-সমাজেই এখনো কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর অবাধে চলিতেছে। বাঙ্গালী, বচনে সকল দেশকে বিজয় করিতে সমর্থ, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যে বাঙ্গালী অপেক্ষা ভারতবর্ষের তাবৎ দেশের অধিবাসীবর্গই যে সমুন্নত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

চিকিৎসায় কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষির অমূল্য উপদেশে জানিতে পারা যায়, যিনি যে প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তদ্দেশ জাত ঔষধি দ্রব্য যেরূপ গুণ সম্পন্ন, অন্য দেশজাত ঔষধ তাহা কখনই হইতে পারে না। বাঙ্গালী এইটুকু বুঝে না বলিয়াই সকল দেশ অপেক্ষা বাঙ্গালী-সমাজে আধিব্যাধির সংখ্যা অত্যধিক। বাঙ্গালীর বাড়ীর আসে পাশে এত ঔষধিদ্রব্য বর্ত্তমান যে, বাঙ্গালী সামান্য পরিশ্রমে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া যদি অবস্থা ভেদে সেবন করে, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে একদিকে যেমন ব্যয়বাহুল্যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না, সেইরূপ তাহার ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে ঔষধ ব্যবহারে তাহার নীরোগ ও দীর্ঘায়ু লাভের উপায়ও ব্যবস্থিত হয়। বিদেশীয় চিকিৎসকগণ বাঙ্গালীর কালমেঘ, বাঙ্গালীর বাসক, বাঙ্গালীর অশোক, বাঙ্গালীর গুলঞ্চ, বাঙ্গালীর কণ্টকারী—কত ভেষজেরই গুণ উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালার দেশ হইতে ঐ সকল লইয়া গিয়া, টিংচার আকারে পরিণত করিয়া বাঙ্গালীর সেবনের জন্য বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করিতেছেন। বাঙ্গালী বাড়ীর আসেপাশের ঐ টাটকা ভেষজ বিনা ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া সেবন করিবে না, অথচ ঐ সকল রূপান্তরিত ভেষজ লাভের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। বাঙ্গালীর চৈতন্য আর কবে হইবে?

টিঞ্চার ও স্বরূপ ভেষজ।—টিংচার ও স্বরূপ ভেষজে বাস্তবিকই অনেক তফাৎ। কালমেঘের একষ্ট্রাক্ট অপেক্ষা টাটকা কালমেঘের রসে কতটা বেশী ফল হইয়া থাকে, তাহা যাহারা ব্যবহার না করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না। অশোকের একষ্ট্রাক্ট অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের মতে অশোকত্বক্ অনেক কার্য্যকরী। এরূপ ব্যবস্থা বাঙ্গালী সমাজে পুনঃ প্রচলিত হইলে ইহার ফলে বাঙ্গালীর চিকিৎসার খরচও যেরূপ কমিয়া যায়, বাঙ্গালী-সমাজে রোগবাহুল্যও যে সেইরূপ হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা অবিসংবাদিত সত্য কথা। সভ্যতা-গর্ব্বাভিমানী বাঙ্গালী জাতি এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি?

নূতন দাতব্য চিকিৎসালয়—হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অধীনে "অনিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে একটী নূতন দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনিয়ার জমিদার মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহারা ঐ স্থানে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করুন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে,—

পদক প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনাথ আচার্য্য চৌধুরী স্বুবর্ণ-পদক—জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বুবর্ণ পদক—(ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বুবর্ণ পদক—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। হেমচন্দ্র রৌপ্য পদক – বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। শশিপদ-রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৬। রামগোপাল-রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য-সমালোচনা।

৭। অক্ষয়কুমার বড়াল-রৌপ্য পদক—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়-কুমার বড়ালের স্থান।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল-রৌপ্য পদক—(খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৯। নবীনচন্দ্র সেন-রৌপ্য পদক—নবীন চন্দ্রের কাব্যে "জরুৎকারু"-চরিত্র।

১০। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-রৌপ্যপদক বাঙ্গলা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুরস্কার (২০৲)—ঐতরেয়, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (২৫৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ২য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৩য় বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভাগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৮ম ও ৯ম বিষয় মহিলা-গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধা-রণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ৩০এ বৈশাখ ১৩২৯ মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রবন্ধগুলি পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
৩২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২ —বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

রসের কথা।

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

৩৫ বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গসাহিত্যের অধিনায়ক —আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র—"নবজীবন" পত্রে কবির সহিত পাচকের তুলনা করিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন,—

"রস লইয়াই কাব্য—আর রস লইয়াই ভোজন। প্রকৃতি একদিকে আমাদের রসনা সৃষ্টি করিলেন, আর সেই সঙ্গে তাহার ভোগের জন্য—তাহার তৃপ্তির জন্য—সৃষ্টি হইল রস তন্মাত্র। সুতরাং রসনার সহিত রসের বড় নিকট সম্বন্ধ। অর্থাৎ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। সেইরূপ মনের রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি হইল—কাব্য। আমি কবিদিগকে খাদ্যাকার ব্রাহ্মণ মনে করি। যখন তাঁহাদের কাব্য পড়ি, তখন আমার ভোজন-পাত্রের কথা মনে পড়ে।"

এ অধমের অদ্যকার এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ—মহর্ষি অক্ষয়চন্দ্রের সেই অপূর্ব্ব বৈদিক সূক্তের—তুচ্ছ কার্ত্তিক মাত্র। পাছে পাঠকগণ "রসের কথাকে" রসিকতার বিজৃম্ভণ মনে করেন, তাই সূচনায় কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

রসই আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বস্ব। রস—শরীরের প্রথম ধাতু। চিকিৎসার প্রথম ও প্রধান সূত্র—রসের পরিপাক। রস দ্রব্যের আশ্রয়। তবে তোমরা রসের কথা শুনিবে না কেন?

রস তন্মাত্র হইতে মূল ছয়টী রসের উৎপত্তি। সেই ছয়টী রস কি কি? আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—"রসঃ স্বাদ্বম্ল লবণতিক্তোষণ কষাত্মকাঃ।" অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় রস এই ছয় প্রকার। ইহারা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

আদি যুগে ভারতের সাহিত্যেও প্রথমে

ছয়টী রস ছিল। সেই ছয়টী মূল রসের নাম —করুণ রস, আদিরস, হাস্যরস, বীররস, রৌদ্ররস ও বীভৎস রস। অনেকে বলিবেন; কাব্যের রস তো নয় প্রকার, তুমি আবার ছয়টী রসের নাম করিয়া নূতন কথা বল কেন? আমার উত্তর মূল রস ছয়টাই বটে,. সেই ছয়টী রস হইতে নয়টী রস, ক্রমে নানারূপ সংমিশ্রণে নয় রস হইতে অনন্ত রসের উদ্ভব হইয়াছে। শেষে রস গড়াইয়া "রসো বৈ সঃ" হইয়াছে। এ রসের তত্ত্ব অল্প পরিসরে বুঝান যায় না। আমরা কেবল বুঝিবার চেষ্টা করিব—কাব্য রসের সহিত আহার্য্য রসের সাদৃশ্য কিরূপ?

১ম রসের নাম মধুর রস।

সাহিত্যে যাহার নাম "করুণ রস" —ভোজন ব্যাপারে তাহাই "মধুর রস"। মধুর রস সকল রসের সেরা। তাই শাস্ত্রের উপদেশ— "মধুরেণ সমাপয়েৎ", অর্থাৎ ভোজনের শেষে মধুর রস সেবন করিবে। এই উক্তির দুইটী উদ্দেশ্য। (ক) অন্যান্য রসের আস্বাদনে মুখের বিকৃতি ঘটিলে—মধুর রসের মাধুর্য্যে সে বিকৃতি বিদূরিত করা। (খ) কফস্রাবের সাহায্য করিয়া, মুখ বিবরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি নিঃসৃত লালা প্রসেক দ্বারা ভুক্ত পদার্থকে জীর্ণ হইবার সুযোগ দেওয়া। মধুর রসের এই দুইটী কার্য্য। সাহিত্যের করুণ রস ও ঠিক মধুর রসের মত। যে রস দিয়াই কাব্য কাহিনী আরম্ভ হউক না কেন, করুণ রস দিয়া উহা শেষ করিতে হয়। মধুর রস শরীরকে পোষণ করে, করুণ রসও মনকে মুগ্ধ করিয়া হৃদবৃত্তির বিকাশ ঘটায়। অতএব ভোজনের মধুর রস, আর অধ্যয়নের করুণ রস—দুই এক। মধুর রস বিহীন ভোজন বিফল, করুণ রস শূন্য কাব্যও বৃথা! তবে যাহার বহুমূত্ররোগ আছে—তাহার পক্ষে মধুর রস নিষিদ্ধ। পাঠকের মধ্যেও এমন এক শ্রেণীর পাঠক আছেন-- করুণ রস তাঁহাদের ধাতে সহে না, ভালও লাগে না।

২য় রসের নাম অম্লরস।

অম্লরস ও আদিরস উভয়ই সমান। অম্ল-রস- পাচক, রুচিজনক, রোমহর্ষ ও দন্তহর্ষ উৎপাদক, পিত্ত রক্ত এবং ক্লেদবর্দ্ধক। আদি রসেও পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি বর্ত্তমান। আদিরস বেশ মুখরোচক, পড়িতে পড়িতে লোমহর্ষ উপস্থিত হয়; রক্ত স্রোতের উত্তেজনা বাড়ে, মানসিক ক্লেদের বৃদ্ধি ঘটে। অতিরিক্ত অম্ল রস সেবনে যেমন ভ্রান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, চক্ষুরোগ কণ্ডু, পাণ্ডু প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, অতি-রিক্ত আদিরস পাঠেও তেমনি - দাঁত টকে, আঁত টকে. মন গোলমাল হইয়া যায়, গা জ্বালা করে। যাঁহারা অম্লরোগ ও রুচিবায়ুগ্রস্ত - অম্লরস ও আদিরস তাঁহাদের বড় অনিষ্টকারী। মুখের আস্বাদ পরিবর্ত্তনের জন্য. জিহ্বার রস বহা স্নায়ু উত্তেজিত করিবার জন্য ভোজনের মধ্যভাগে অম্লরস ভক্ষণের ব্যবস্থা। জীবনের মধ্যভাগেও আদিরস ঘটিত কাব্য পাঠ্যের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

৩য় রসের নাম মধুর রস।

লবণ রস ও হাস্য রস সমধর্ম্মী। উভয়ই শুধু ব্যবহার করা চলেনা। কিন্তু সকল রসের সঙ্গেই ইহাদের বেশ মিলন হয়। তবে উভয়েরই একটা দোষ এই, মধুর রসের সহিত লবণ রস, এবং করুণ রসের সহিত হাস্য রস - কখনই

মিশ খায় না। লবণ রস সংশোধক, রুচিজনক, পাচক, পুরুষত্ব নাশক এবং সর্ব্বশরীর শিথিল কারক। হাস্য রসেও এই সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত হাস্য রসে পুরুষের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়,—প্রকারান্তরে ইহাই পুরুষত্ব হানির লক্ষণ!

৪র্থ রসের নাম তিক্ত রস।

আহারের তিক্তরস ও সাহিত্যের বীর রস—এক প্রকৃতির। শীতের জড়তা-অবসাদ নষ্ট করিয়া শরীরে একটু উষ্ণতা ও উন্মাদনা জাগাইবার জন্য—বসন্ত কালে তিক্তভক্ষণ করিতে হয়। জীবনের বসন্ত কাল যৌবনেও তেমনি যৎকিঞ্চিৎ বীর রস আস্বাদন করা কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া জরগ্রস্ত—অবসন্ন—দুর্ব্বল রক্তহীন-বাঙ্গালীর পক্ষে নিমপল্তা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরাতা, গুলঞ্চ, শেফালী-পত্র, কুইনাইন প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য—মহৌষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; ভীরু কাপুরুষ স্বার্থ মোক্ষ জড় বাঙ্গালীর পক্ষে বীর রসও তেমনি উপকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয়—হাতুড়ে ডাক্তার ও অশিক্ষিত বৈদ্যগণ' প্রয়োগানভিজ্ঞতা দোষে—তিক্তরসের গুণ দেখাইতে পারে না। অল্প বুদ্ধি নাট্যকারও বেতালা যাত্রাওয়ালারা বীররসটাকেও মাটী করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা সমাজ হিতৈষীগণকে এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিতে বলি।

৫ম রসের নাম কটু রস।

কটুরস ও রৌদ্ররস একই জিনিষ। উভয়েরইগুণ—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বায়ু পিত্ত বর্দ্ধক, এবং অত্যন্ত রুক্ষ। যাঁহাদের শরীর মেদোময় অর্থাৎ মোটা, যাঁহারা দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ কুড়ে, যাঁহাদের মুখে কথা ফুটে না, কিছুতেই মন উঠেনা, হিতোপদেশ মনে রয় না, কষাঘাতেও চৈতন্য হয়না, তাঁহারা কটুরস ও রৌদ্ররসে আসক্ত হউন; তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু সাবধান, মাত্রাধিকা হইলে মূর্চ্ছা, গা জ্বালা ও বলক্ষয়ের ভয় আছে। এমন কি মাথা গরম হইয়া পাগল হওয়ারও সম্ভাবনা।

৬ষ্ঠ রসের নাম কষায় রস।

ভোজনের কষায় রস, কাব্যের বীভৎস রস উভয়েরই মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান। দুই ই শরীর স্তম্ভনকারী, হৃৎপীড়া জনক, বায়ু প্রকোপক, শীতবীর্য্য, জড়তাকারক এবং স্রোতারোধক। যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি শিথিল, মস্তিষ্ক চঞ্চল, বায়ুর ধাত, একটুতে বুক ধড়ফড় করে, সর্ব্বদাই মন হুহু করে,—যাঁহাদের দেহে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের নার্ভাস ডেবিলিটির আধিপত্য তাঁহাদের পক্ষে কষায় রস ভোজন আর বীভৎস রসাত্মক কাব্য পাঠ, একেবারেই নিষিদ্ধ।

সাহিত্যে আরও ৩টী রসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা শান্ত, অদ্ভুত ও ভয়ানক। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ ৩টী মূল রস নহে,—মিশ্র রস। শান্ত রস—অম্ল মধুর রস; অদ্ভুত রস—লবণাম্ল রস, আর ভয়ানক রস—কটু কষায় রস। রসজ্ঞ পাঠক, মিলাইয়া দেখিলেই আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

রসের কথা তো বলিলাম, এইবার রন্ধনের কথাটা বলি। আমার সাহিত্যাচার্য্য কবি বা গ্রন্থকারকে পাচক বা সূপকার শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সংশয় প্রশ্নের অতীত।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা—চিঁড়ার ফলার। ইহাতে পাচকের নৈপুণ্য নাই—বেশ সহজ সরল রসনাতৃপ্তিকর। আমাদের বড় ভাল লাগে। জানি না—এই ভেজালের দেশে কবে আবার আদিযুগের সেই চিঁড়া দধির ফলার ফিরিয়া আসিবে! যাঁহারা আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব, তাঁহাদের কাছে ইহার বড় আদর। তবে সভ্যতার খাতিরে, অনেকে ইহার নামে শিহরিয়া উঠিবেন; আমরা কিন্তু জোর করিয়া বলিতে পারি,—এ ফলার—মাথার গুণে বড় সুতার, বড় স্নিগ্ধ, হজম করিতে পারিলে শরীরের বলও বাড়ে।

"চৈতন্য চরিতামৃত" "চৈতন্য মঙ্গল" প্রভৃতি কাব্যগুলি মধুর রসে রসময়ী "মালপুয়া।" প্রেমঘৃতে ভাজিয়া, ভক্তিরসে মজাইয়া—এগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া—এই মালপুয়ার আস্বাদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন—ইহা যেমন উপাদেয়, তেমনি পুষ্টিকর খাদ্য।

কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" সাদা ডাল ভাত। এ না হইলে—বাঙ্গালীর চলে না। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই এই ডাল ভাত—আমাদের চাই। ইহাতে চরিত্র গঠিত হয়, শরীর পুষ্ট হয়, মনেরও বল বাড়ে।

কাশীদাসের "মহাভারত"—"যজ্ঞি বাড়ীর" ছ্যাচড়া। নানা দ্রব্যের নানা রসের মিশ্রণে প্রস্তুত, বড় উপাদেয়, তবে অনেক তৈল মস্লায় পাক কথা বলিয়া—কিছু গুরুপাক।

কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" আমাদের শুক্তানি। অরুচির রুচি, ত্রিদোষনাশক। আমরা ইহার বড় পক্ষপাতী।

কেতকীদাসের "মনসার ভাসান" অরন্ধনের পান্তাভাত ও কচুর শাক। ইহাতে শরীর ঠাণ্ডা হয়, বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ কমে। তবে যাঁহাদের কফের ধাত, দিন রাত গায়ে ফ্লানেল আঁটা, তাঁহারা ইহার উপর বেজায় চটা।

রামেশ্বরের "শিবায়ন"—মোচার ঘণ্ট, ইহার মূল তরকারী—শিবচরিত্রের মোচা, কিন্তু ইহাতে রামমাহাত্ম্যের "ছোলা ভিজা," বাণোপাখ্যানের বড়ী ভাজা, রুক্মিণী ব্রতের জীরা ফোড়ন, হরেক রকম গল্পের মসলা,—সব আছে। অতি অদ্ভুত সুস্বাদু ব্যঞ্জন। মিষ্ট রস, কটু রস, লবণ রস—সকল মিশিয়া ইহা বেশ মুখরোচক ও পুষ্টিকর হইয়াছে।

ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল" ডুমুরের ডাল্না। ডুমুরগুলি জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করা। ধর্ম্মমঙ্গলের চরিত্রগুলিও নীচশ্রেণী হইতে গৃহীত। এই ডাল্নায় রৌদ্র ও বীভৎস রস ছাড়া আর সব রস আছে, তবে করুণ রসের কিছু বাড়াবাড়ি।

রামপ্রসাদের "পদাবলী"—ছানার পায়স। বড় সুস্বাদু, বড় পুষ্টিকর, বুঝি ইহার তুলনা নাই। পাচক স্বয়ং পাকবিদ-বৈদ্য কিনা? তাই বুঝি পদাবলী ও কালীকীর্ত্তন—এত উপাদেয়। এ পায়স জরাজনিত রোগের অপূর্ব্ব রসায়ন।

ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" "ভুনি খিচুড়ী"। রান্না—মোগলাই ধরণের। পাচকের পারিপাট্যও যথেষ্ট। ইহাতে নবাবী আমলের মসলা—অনেক পারসী কথা মিশ্রিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের পলাণ্ডুরসের গন্ধও আছে। শেষে রসমঞ্জরীর চাট্‌নী। আমরা পেটরোগা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগী, রুচিবায়ুগ্রস্ত

বাবুগণকে—এরূপ গুরুপাক খাদ্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

ঈশ্বর গুপ্তের "কবিতাবলী"—বাঙ্গালীর মাছের ঝোল। সহজ পাচ্য, লঘু, রোগীর পথ্য; এমন জিনিষ কি হয়। পাচক নিজে বৈদ্য, তাই লোকের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের লেখকদের আর পরিচয় দিব না। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—"ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর শেষ কবি।" আমরাও ঈশ্বরচন্দ্রের মাছের ঝোলের পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। বর্ত্তমান যুগের যাঁহারা লেখক, তাঁহাদের অনেকেরই রচনা সখের খাতিরে, রন্ধন অনেকেরই ভাল—কিন্তু তাহা কেবল স্বামী পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের জন্য। সাধারণের তাহাতে অধিকার নাই। অনেক লেখক আবার "উড়ে বামুণ"—তাঁহাদের রচনায় না আছে রস, না আছে আস্বাদন। কেবল পেটের দায়েই তাহা খাইতে হয়। অতএব এই খানেই ভোজরাজ তুষ্ণীম্ভুব।

আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব।

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী।)

আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্বের কথা তুলিলে অনেক কথাই বলিতে হয়, সে সকল কথা এত বিস্তৃত যে, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে একটি প্রকাণ্ডায়তন প্রবন্ধ কেন, একখানি অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সেইজন্য অন্য সকল কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে পারিব না। তবে পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসার ফলে অধুনা যেমন বহু সংখ্যক নরনারী নানারূপ আধিব্যাধির করাল আক্রমণে অকাল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে, সেইরূপ আর্য্য ঋষির উপদিষ্ট পথ্য সকলও পরিত্যাগ করিয়া অস্বাস্থ্যকে বরণ করিয়া আনিতেছে। সেই কথারই অল্লাধিক আলোচনা করিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

চিকিৎসিতং ব্যাধিহরং পথ্যং সাধনমৌষধম্।
প্রায়শ্চিত্তং প্রশমনং প্রকৃতিস্থাপনং হিতম্॥
বিদ্যাদ্ভেষজনামানি তচ্চাপি বিবিধ স্মৃতম্।
স্বস্থস্যোর্জস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্তস্য রোগনুৎ॥

চিকিৎসিত, ব্যাধিহর, পথ্য, সাধন, ঔষধ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রশমন প্রকৃতি স্থাপন ও হিত—এই কয়েকটি ঔষধের নাম। এই ঔষধ বিবিধ—কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক, কতকগুলি পীড়িতের রোগনাশক। সুতরাং পথ্য—চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ, এজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে পথ্যের বিষয় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য রোগের প্রতীকার অপেক্ষা—মানবশরীরে রোগ উৎপন্ন হইলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা মনুষ্যগণ যাহাতে রোগাক্রান্ত না হইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা। পথ্য, আরোগ্যের অনুসঙ্গী। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদে সর্ব্বাগ্রেই পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা প্রচলিত।

"হিতাহারোপযোগ এক এব পুরুষস্যাভিবৃদ্ধি করোভবতি। অহিতাহারোপযোগঃ পুনর্ব্যাধি নিমিত্তমিতি।" চরক সূত্রস্থান ২৫ অঃ ১৫ শ্লোঃ।

অর্থাৎ হিতাহার সেবনই পুরুষের একমাত্র সুখবৃদ্ধির কারণ এবং অহিতাহার সেবনই রোগের কারণ। এই হিতাহাব অহিতাহারের বিচার নির্ণয়ের জন্য আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যবিজ্ঞান লিখিত।

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেবচ।
পদার্থাঃ পঞ্চতিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্মচ॥

দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি—এই পাঁচটী পদার্থ অবস্থিতি করে, ইহারা দ্রব্যে থাকিয়াস্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহাদিগের মধ্যে বসবিশ্লেষণে মূল রসের সংখ্যা মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় ভেদে ৬টি এবং ঐ ছয়টির সহিত দুইটী করিয়া মিলিত হইলে একটি সংখ্যা কম হইয়া পাঁচটি সংখ্যা হয়—যথা, মধুরাম্ল, মধুর লবণ, মধুর তিক্ত, মধুর কটু ও মধুর কষায়। এইরূপ অম্ল রসও পাঁচটী হয় যথা, অম্ল মধুব, অম্ল লবণ, অম্ল তিক্ত, অম্ল কটু, অম্ল কষায়। কিন্তু মধুর অম্ল দুইবার হইতেছে বলিয়া একটি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতপক্ষে অম্ল রস চারিটী। এই নিয়মে লবণ রস তিনটি, তিক্ত রস দুইটী ও কটু রস একটি। অতএব দুই দুইটির সংযোগে সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটী রসের সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহাদের আবার তিন তিনটির সংযোগে মধুর রস ১০, অম্ল রস ছয়টি, লবণ রস তিনটী ও তিক্ত রস একটি নির্ণয় করিতে পারা যায়। এইরূপ মধুরাদির চারিটি চারিটি করিয়া সংযোগে মধুর রস ১০টি, অম্ল রস চারিটী ও লবণ রস একটি অর্থাৎ পনেরটী পাওয়া যায়। ঐ হিসাবে পাঁচটী করিয়া সংযোগ করিলে মধুর রস পাঁচটি ও অম্ল রস একটি অর্থাৎ মোট ৬টি হয়। আর ছয়টির একত্র যোগে একটি রস হয়। অতএব যৌগিক রস সর্ব্বশুদ্ধ ১৫+২০+১৫+৬+১=মোট ৫৭টি এবং মূল রস ৬টি, অতএব রস-বিশ্লেষণে ৫৭+৬=৬৩টী রসের বিষয় আর্য্য ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন। এই ৬৩টি রস ও অনুরস ভেদে এবং রস ও অনুরসের তারতম্য ভেধে অসংখ্য হইয়া থাকে। সিদ্ধিলাভেচ্ছু চিকিৎসক দোষ ও ঔষধাদির বিচার করিয়া কোথাও এক রস, কোথাও বা বহু রসযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিবেন—ইহাই আর্য্য ঋষির চিকিৎসার সূত্র।

তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্।
কষায়তিক্ত মধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে॥

উল্লিখিত রসগুলির মধ্যে আদ্য তিনটী অর্থাৎ মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ুনাশক, তিক্ত, কটু ও কষায় রস কফনাশক, কষায়, তিক্ত ও মধুর রস পিত্তনাশক এবং তিক্ত, কটু ও কষায় রস বায়ুবর্দ্ধক, মধুর, অম্ল ও লবণ রস কফকারক এবং অম্ল, লবণ ও কটু রস পিত্তবর্দ্ধক।

রস-বিচারে শুধু উপরের কথাগুলি বলিয়াই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ নিবৃত্ত হন নাই, উঁহাদের যে রস বায়ুর প্রশমক। সেই রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা থাকিলে তদ্দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয় না, যে রস পিত্ত প্রশমক, সেই রসে তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লঘু গুণ থাকিলে পিত্ত প্রশমন হয় না, যে রস কফনাশক, সেই রসে স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শীতলতা থাকিলে ঐ রস শ্লেষ্মা নষ্ট করিতে পারে না—এ সকল

বিষয়েরও বিচার এরূপ সুন্দর ভাবে করিয়াছেন যে তাহা আয়ত্ত করিলে চিকিৎসা কার্য্যে আর কিছুরই অভাব থাকে না। দ্রব্যের গুণশব্দের অর্থও ইহাই।

বীর্য্যশব্দের অর্থ এক কথায় শক্তি।

বিপাক—

জাঠরেনাগ্নিনা যোগাদ যদ যদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥

ভুক্ত বস্তুর সহিত জাঠরাগ্নির যোগে পরিপাক অন্তে ভুক্ত বস্তু যে রসান্বিত, সেই রস হইতে পৃথক যে রস-বিশেষের উৎপত্তি তাহার নাম বিপাক।

"প্রভাব প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে।" রস, বীর্য্য, বিপাকের অতীত দ্রব্যগতশক্তিকে প্রভাব বলে।

এইরূপ ভাবে দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব বুঝাইয়া তাহার পরে আরো বিশ্লেষণে বুঝাইয়াছেন যে, দেহ ধাতুর প্রতিকূল দ্রব্য সকল দেহধাতুর বিরোধ উপস্থিত করে এবং কতকগুলি দ্রব্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া সংযোগ ও সংস্কার বশতঃ বিরোধ সাধন করে। ইহা ভিন্ন কতকগুলি দেশকাল মাত্রাদি দ্বারা বিরুদ্ধ হয় এবং কতকগুলি স্বভাবতঃই বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত যে মৎস্য খাইতে নাই—তাহার কারণ মৎস্য ও দুগ্ধ উভয়ই মধুর এবং উভয় মধুরতার বিপাক বশতঃ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী হইয়া থাকে, আবার দুগ্ধ শীতল ও মৎস্য উষ্ণ বলিয়া বিরুদ্ধবীর্য্য হয়। এই বিরুদ্ধ বীর্য্যের জন্য রক্ত দূষিত করে এবং সাতিশয় অভিষ্যন্দী বলিয়া স্রোতঃ সমূহের অবরোধ করে। জলে আলোড়িত ঘৃত শক্তু পান করিয়া পায়স ভোজন করিলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় এবং শ্লেষ্মা অতিশয় কুপিত হয়। পুঁইশাকে তিলের বাটনা দিয়া ভক্ষণ করিলে অতীসার হয়। এই সংযোগ বিরুদ্ধ ভোজনে দেহীদিগের নানাপ্রকার রোগ হইতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ বিবেচনা করিয়া তৎপ্রশমনের জন্য বমন, বিরেচন ও বিরুদ্ধ আহার দিগকে পরিপাক করাইবার জন্য সংশমন যোগ সকলের যে ব্যবস্থা সকল বলিয়া গিয়াছেন সংক্ষেপতঃ তাহাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ক্রম নির্দ্দেশ শুধু বায়ু, পিত্ত, কফের বিচারে ঔষধ লইয়াই নহে, সুপথ্যই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলভিত্তি। দ্রব্যগুণের বিচারবিশ্লেষণে সেই সুপথ্য ও সদাচার সকল পালনে মানুষ যাহাতে নীরোগী হইতে পারে—আর্য্যঋষি তাহাই স্ব স্ব সংহিতায় বিবৃত করিয়াছেন। উহার ব্যতিক্রমে যখন রোগের আক্রমণ ঘটিবে—তখনি চিকিৎসার প্রয়োজন। এরূপ ব্যবস্থা আর কোনো শাস্ত্রে আছে কি?

আয়ুর্ব্বেদের মতে নবজ্বরে রোগীর পথ্য—

লাজ পেয়াং সুখ জরাং পিপ্পলানাগরৈঃ শৃতম্।
পিবেজ্জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুধানল্পাগ্নিরাদিতঃ॥

জ্বর রোগীর অগ্নির তেজ অল্প অথচ ক্ষুধা উপস্থিত হইলে প্রথমে পিঁপুল ও শুঁঠ সহযোগে প্রস্তুত লাজপেয়া অর্থাৎ খইয়ের মণ্ড ভোজন করিতে দিবে, কারণ উহা সহজে জীর্ণ হয় এবং জ্বর বিনাশ করিয়া থাকে।

যবাগূ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান পথ্য। এই যবাগূ দুই প্রকার, কল্কসাধ্য যবাগূ ও কাথ সাধ্য যবাগূ। যে সকল ঔষধ দ্বারা যবাগূ পাক করিতে হইবে, সেই দ্রব্য গুলির কল্ক প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা যবাগূ পাক করিলে কল্ক সাধ্য যবাগূ প্রস্তুত হয় এবং

পাকসাধ্য ঔষধ গুলির কাথ বাহির করিয়া তদ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিলে তাহাকে কাথ সাধ্য যবাগূ বলা যায়।

এই যবাগূ ভিন্ন মণ্ড, পেয়া বিলেপী এবং দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর পিয়াল ও পরুষ প্রভৃতি অম্ল ফলের রসের সহিত খৈচূর্ণ এবং ইক্ষু চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক তর্পণ প্রস্তুত করিয়া নব জ্বরের রোগীকে আহার করিতে দিবার ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিদেশীয় নানাপ্রকার ফুড্ অপেক্ষা যে কত গুণে উৎকৃষ্ট, আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

ডাক্তারদিগের নিকট আমরা দুর্ব্বলতা নিবৃত্তির জন্য যে সকল পথ্যের ব্যবস্থা পাই—তাহা আমাদের দেশকাল, বল, সাত্ম্য—এই সকল বিবেচনা করিলে কোনো ক্রমেই সুসঙ্গত নহে, তাঁহারা আমাদের দুর্ব্বলতা নিবারণের জন্য জুস, সুপ, রুটী ইত্যাদি সেবনের ব্যবস্থা প্রদান করেন কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সুস্থাবস্থাতেও ঐ সকল দ্রব্য আহার করেনা, সে অবস্থায় সেই সকল আহার্য্য—দ্রব্যগুণ বিচারে তাহাদিগের পক্ষে সুপথ্য কি কুপথ্য তাহার বিচার করিবার জন্য বড় বেশী ভাবিতে হইবেনা। রুগ্নাবস্থায় ঐ সকল দ্রব্য সেবনের ফলে তাহার পক্কাশয়ে ঐ সকল দ্রব্য পরিপাকের সাহায্য না করিয়া বরং বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে মুগ, মসুর, ছোলা, কুলথ কলাই ও বনমুগের যূষ—জ্বর রোগীকে দিবার যে ব্যবস্থা, আছে আমাদের দেশের ধনকুবেরদিগের তাহা ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু জর্ম্মাণ দেশের চিকিৎসকগণ অধুনা তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকার চিকিৎসক মহলে এখন "খইয়ের মণ্ড" খুব চলিতেছে। আর আমরা ভারতবাসী হিন্দু,—ডাক্তারি ব্যবস্থায় স্মিথ-বাথগেটের বাড়ী হইতে হিন্দুর মাতৃস্বরূপিণী গাভীর অবিকৃত টাট্কা রক্ত সুদৃশ্য কাচের শিশিতে কিনিয়া আনিয়া ইহ-পরকার উভয়ই নষ্ট করিতে অভ্যস্ত হইতেছি! বিজাতীয় ডাক্তারখানা হইতে জুস আনিয়া, বিজাতির হস্তে প্রস্তুত সুপ কিনিয়া, অস্পৃশ্য হোটেল হইতে রুটি কিনিয়া রুগ্নাবস্থায় ভক্ষণে ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিকৃত দেহ হইতেছি! যাহা বলিলাম—তাহার এক বর্ণও অতি রঞ্জিত নহে, ডাল-ভাত-খেগো বাঙ্গালীর—যাহাদিগের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ কখনো জগস্থপ, মিটস্থপ, ব্রথ—মাংসের সার এবং বি-ফটি বা মাংস ভিজান জলের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই—তাহাদের ধাতুতে উহা পরিপাক হইবে কিরূপে? হইতে পারে ঐগুলি সুপথ্য কিন্তু তাহা আমাদের ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য নহে—যে দেশের লোকেরা প্রত্যহ মাংস খায়, রুটী ডিম যাহাদিগের প্রাত্যহিক আহার, তাহাদের শরীরে রুগ্নাবস্থায় ইহা সহ্য হইতে পারে। দুগ্ধ-ঘৃত মৎস্যই যাহারা প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায়না বা খায়না, দাল-ভাত-তরকারিই যাহাদিগের প্রত্যহ দুইবেলা উপযুক্ত পরিমাণে জোটেনা, অনশনে, অর্দ্ধাশনে, একাসনে যাহাদিগকে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়—তাহাদিগের পক্ষে পাশ্চাত্যদেশের পথ্যের ব্যবস্থার পোষকতা শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন চিকিৎসকমাত্রেরই যে করা উচিত নহে তাহা অবিসংবাদিত সত্য, ইহার প্রতিকূলে কিছুই বলিবার নাই।

আমার তো মনে হয়—যেমন অসময়ে, ও অসঙ্গতরূপে দোষের নিবৃত্তি করিয়া জ্বর রোধ করার ফলে অধুনা নানারূপ জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে—সেইরূপ বিদেশীয় পথ্যের প্রচলনও তাহার অন্যতম কারণ। আজ কাল শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, এই শশু মৃত্যুর যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে তাহাদিগকে নানাপ্রকার বিলাতী ফুডের আস্বাদ প্রদান তাহার অন্যতম কারণ।

এই বিলাতী ফুডের অপকারিতা সম্বন্ধে আমরা নিজেরা কিছু না বলিয়া কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি :—

সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর ডাক্তার ৺রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় তাঁহার "শিশু ও বাল চিকিৎসা" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"দুঃখের বিষয় আজ কাল এদেশে অনেক বাড়ীতে শিশুর আহারে নিমিত্ত কৃত্রিম 'ফুড' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল ফুড অযথা ও দীর্ঘকাল ব্যবহারে অনেক স্থলে রিকেটস্ রোগ হয়। বাজারের টিনের কৌটায় যে সকল গাঢ় দুগ্ধ বিক্রীত হয়, সে সকলে জল মিশ্রিত করিয়া লইলে চর্ব্বির অংশ বিলক্ষণ কম থাকে। * এই সকল ফুড ব্যবহারে শিশুকে মোটা, চর্ব্বিভরা ও থলথলে হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের দেহে যে চর্ব্বি জন্মে, তাহা সুস্থ চর্ব্বি নহে, দুগ্ধ, মাংস, যুষ আহারে যে চর্ব্বি হয়, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেশে এত প্রকার আহারীয় দ্রব্য আছে, যদি সেই সকল হইতে চিকিৎসকগণ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া মাথা ঘামাইয়া স্থল বিশেষে উপযুক্ত আহার ও পথ্য এবং উহাদের প্রস্তুত, প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে আজি কালিকার বিষম শৈশবীয় মৃত্যু সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে।"

ডাক্তার টমাস ডটন বলেন,—বিলাতী ফুড ব্যবহারে শিশুর অজীর্ণ, উদরাময়, রিকেটস্ ইত্যাদি পীড়া জন্মে।

ডাক্তার কিলস্ এম, ডি বলেন—শিশুর খাদ্যে ১ ভাগ পটাশ কি সোডা মিশ্রিত থাকিলেও সেই খাদ্য অপকারী।

ডাক্তার ফিসার এম, ডি বলেন,—শিশুর খাদ্যে সোডা ও পটাশ মিশ্রিত থাকা অন্যায়। কারণ সোডা ও পটাশ পাচক রস হ্রাস করিয়া অনেক বিলম্বে পরিপাক-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু :—বিলাতী পেটেণ্ট ফুড ব্যবহারে কত শিশুর স্বাস্থ্য যে, চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়, তাহা বলা যায় না। পেটেণ্ট ফুড মুখরোচক ও সহজে হজম হয় একথা সত্য, কিন্তু পরিপাক শক্তির ক্রম বিকাশের পক্ষে ইহা একেবারেই অনুপযোগী। এইরূপ খাদ্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্য আপাততঃ ভাল হইলেও পরিণামে তাহা বিফল হইয়া যায়। অনেক পেটেণ্ট ফুডের বেশ অর্থপূর্ণ নাম আছে, কিন্তু কদাচ তাহা শিশুদিগকে ব্যবহার করাইবেন না। শিশুদিগের আহারের জন্য খাদ্য দ্রব্যে যে যে উপাদান থাকা আবশ্যক, তাহা হইতে ইহাদের পার্থক্য দেখা যায়। পেটেণ্ট ফুড খাইয়া শিশু খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া থাকে।

উপরে কয়েকজন ডাক্তারের অভিমতগুলি প্রকাশ না করিলেও চলিতে পারিত, কারণ

আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ অপেক্ষা ডাক্তারদিগের উপদেশ যে বেশী প্রামাণ্য —তাহা অন্ততঃ আমি তো স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু কাল ধর্ম্মে সাধারণের নিকট ঋষিবাক্য অপেক্ষাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদদিগের কথা বেশী আদরণীয়, সেইজন্যই ঐগুলি উদ্ধৃত করিলাম। ফল-কথা ডাক্তারি ঔষধের মত ডাক্তারি ফুডেও যে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে—এবং সেই স্বাস্থ্যহানির ফলে আমরা নানারূপ উৎকট ও জটিল রোগকে ডাকিয়া আনিয়া অকাল মৃত্যুর-পন্থা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতেছি—ইহা নির্ভাজ সত্য কথা।

সুস্থ শিশুর পথ্যের পক্ষে দুগ্ধের মত আর কিছুই নাই। দুগ্ধের গুণ অমৃত তুল্য, এইজন্য ইহার অপর নাম পয়ঃ, শিশু-শরীরে ইহার মত সুপথ্য আর কিছুই নাই—এইজন্য ইহার একটি নাম "বালজীবন।"

দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্তন্যং বালজীবনমিত্যপি।
দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্॥
সদ্যঃ শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্ব শরীরিণাম্।
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজিকরং পরম্॥
বয়ঃ স্থাপক মায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়ণম্।
বিরেকবান্তি বস্তিনাং তুল্যমোজো বিবর্দ্ধনম্।

দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়স, স্তন্য ও বালজীবন এই গুলি দুগ্ধের পর্য্যায়। দুগ্ধ মধুর রস, স্নিগ্ধ, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক, সদ্যঃ শুক্রকারক, শীতবীর্য্য,সকল প্রাণীরই সাত্ম্য ও জীবনস্বরূপ শরীরের উপচয়কারক, বলকারক, মেধাজনক শুক্রবর্দ্ধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বয়ঃস্থাপক, আয়ুষ্কর, সন্ধানকারক, রসায়ন, বমন,* বিরেচন ও বস্তি ক্রিয়ার তুল্য গুণকর ও ওজোবর্দ্ধক।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত এ হেন দেশের গাভীজাত দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দেশের শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী মহাপুরুষগণ বিলাতী জমাট দুগ্ধ অকুণ্ঠিতচিত্তে শিশুদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই বিলাতী দুগ্ধ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের নির্ভিক পণ্ডিতেরা কিরূপ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন—শুনুন—

গত ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে ডাক্তারি লেনসেট পত্রিকায় ডাক্তার 'জেলি' লিখিয়াছেন,—"বিলাতী দুগ্ধে শর্করার ভাগ অধিক থাকায় মেদ বৃদ্ধি হয়, শরীরের বলক্ষয় হয়, সামান্য কারণেই অনেক প্রকার পীড়া জন্মে! এই দুগ্ধে ছেলেরা প্রথম প্রথম খুব মোটা হয় বটে, কিন্তু শেষে তাহাদের মাংসপেশী নিস্তেজ হয়, ছেলে শীঘ্র চলিতে পারে না, তাহাদের পেটটি বড় হয়, ব্রহ্মতালু শীঘ্র যোড়া লাগে না,সর্ব্বদাই তাহাদের পেটের পীড়া হয়, অধিক মিষ্ট না দিলে অন্য কোন পথ্যও খায় না।"

ডাক্তার লালা বলেন—"বিলাতী দুগ্ধ পানের ফলে ছেলেরা মোটা হয় সত্য, কিন্তু ইহার ফলে তাহাদের রিকেটস পীড়া প্রকাশ পায়।"

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ফিসার এম, ডি, বলেন, "বিলাতী দুগ্ধ পানে শিশুরা রিকেটস পীড়ায় আক্রান্ত হয়, এবং সংক্রামক রোগপ্রবণ হইয়া থাকে। নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, হার্ণিয়া প্রভৃতি পীড়া -এগুলি বিলাতী দুগ্ধ পানেরই ফলসম্ভূত। এই দুগ্ধ পানে ছেলেদের অতিশয় বিলম্বে দাঁত উঠে, এবং তাহারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

সুবিখ্যাত ডাক্তার সাদার ল্যাণ্ড এম, ডি, তাঁহার শিশু চিকিৎসা গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"বিলাতী দুগ্ধে মেদের অংশ খুব কম দৃষ্ট হয়, ইহা শিশুদিগকে খাওয়ান কর্ত্তব্য নহে।

প্রসিদ্ধ সিবিল সার্জ্জন, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু এম, ডি তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষা গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"বিলাতী টিনের ঘনীভূত দুগ্ধে যবক্ষার জানময় পদার্থ থাকে না বটে, কিন্তু উহা খাওরায় শিশুদের যেরূপ গঠন তদনুরূপ তেজ হয় না।"

পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতাগর্ব্বিত ডাক্তারেরা যে বিলাতী দুগ্ধের অজস্র নিন্দা করিয়াছেন, ভারতবাসী আমরা তাহাই কোটি কোটি টাকার ক্রয় করিয়া শিশুমৃত্যুর বাহুল্যের পথ পরিষ্কার করিতেছি!—দেশের দুর্ভাগ্য কিরূপ, তাহা আর বলিতে হইবে কি?

আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষি দ্রব্যগুণের বিচার করিয়া সুস্থ ও রোগীর জন্য যে সকল পথ্যের গুণ-পরিচয় আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, এখন বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ চিকিৎসক গণ অনেক গবেষণার ফলে সেই সকল তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন! আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য তো এইখানেই প্রমাণিত হয়। ডাক্তারদিগের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, বরং যে সকল ডাক্তার আয়ুর্ব্বেদের তথ্যাবলী অবগত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি যে সকল ডাক্তার আয়ুর্ব্বেদের সহিত সংস্পৃষ্ট নহেন, তাঁহারা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন, সেজন্যও তাঁহাদের কোনও অপরাধ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতিও আমি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি—কিন্তু ভারতের অধিবাসীবর্গের কার্য্যকলাপের অন্যথাচরণের জন্য তাঁহাদিগকে একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা শিক্ষা পাইয়া, সভ্য হইয়া জাগতিক অনেক বিষয়েরই ভালমন্দের নিরাকরণে সক্ষম হইলেও আরোগ্য সম্পাদনে, আয়ুরক্ষার উপায় বিধানে যে পন্থায় ধাবমান হইয়াছেন, সে পন্থা নানারূপ অভিনব ব্যাধি উৎপন্নের অতি ভয়ঙ্কর সরণী, সে সরণীর অনুসরণে তাঁহাদের আয়ুকাল যে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে,সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সত্য কথা বলিলে,ঋষিবাক্য মান্য করিয়া কথা কহিলে, ডাক্তারীর সহিত আয়ুর্ব্বেদের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিয়া বলিতে হইলে—এ কথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, বিদেশীয় শিক্ষা পাইয়া, বিজাতীয় সভ্যতার অনুকরণ করিয়া, বিদেশীয় চাকচিক্যে মুহ্যমান হইয়া, বিদেশীয় চিকিৎসায় তথা বিদেশীয় ঔষধ ও পথ্যে আমরা যে অনুপ্রাণিত হইতেছি—বর্ত্তমান যুগের ম্যালেরিয়া, বর্ত্তমান যুগের কলেরা, বর্ত্তমান যুগের ইনফ্লুয়েঞ্জা সর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান যুগের যক্ষ্মা ও ডিস্‌পেপসিয়া তাহারই ফলসম্ভূত। আমি তো সকল রোগেই ডাক্তারির সহিত আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে,—আমাদের দেশে এত যে আধিব্যাধি বাড়িয়াছে—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে প্রতি বৎসর যে অসংখ্য অসংখ্য লোক শমন-সদনে প্রেরিত হইতেছে—যক্ষ্মায় যে সর্ব্বাপেক্ষা সহর গুলির ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—ইহার প্রধান কারণ ডাক্তারী উগ্রবীর্য্য চিকিৎসায় জ্বর রোধ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ডাক্তারেরা আমাদের দেশে চিকিৎসা করেন বটে কিন্তু তাঁহারা

আপাততঃ মধুর সুখের পন্থা দেখাইয়া দিলেও তাহা আমাদের পক্ষে পরিণাম বিরস অতিশয় অশুভ। দেশের লোকে এ কথা চিন্তা করুন —ইহাই আমার প্রার্থনা।

আয়ুর্ব্বেদের আর একটি বিশেষত্ব—আয়ুর্ব্বেদের স্ত্রী চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সকল চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদের এ উপদেশ পালন করেন কিনা জানি না, কিন্তু আর্য্যঋষি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের প্রতি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—"চিকিৎসা বল ও দোষের প্রমাণ অপেক্ষা করে। যদি চিকিৎসক দুর্ব্বল রোগীকে পরীক্ষা না করিয়া অতিবল ঔষধ প্রয়োগ করেন, তবে তাহার প্রাণ বিনাশ হয়। অল্পবল রোগী—অতিবল, অত্যন্ত আগ্নেয়, অতিশয় সৌম্য বা অতিশয় বায়বীয় ঔষধ এবং অগ্নি, ক্ষার ও শস্ত্র কর্ম্ম সহ্য করিতে পারেনা। এই সকল ঔষধ অসহ্য ও তীক্ষ্ণ হয় বলিয়া সদ্যঃ সদ্যঃ রোগীর প্রাণনাশ করে। চিকিৎসকেরা এই কারণেই দুর্ব্বল রোগীকে প্রায়ই অদুঃখকর, মৃদু ও সুকুমার ঔষধ প্রয়োগ করেন, আর বিশেষ আবশ্যক হইলেই গুরুতর ঔষধ ক্রমে ক্রমে এবং যাহাতে বিভ্রম উৎপাদন না করে—এইরূপ করিয়া প্রয়োগ করেন,

বিশেষতশ্চ নারীস্ত্বাহ্যনবস্থিত মৃদু বিকৃতি বিক্লব হৃদয়াঃ প্রায়ঃ সুকুমারা নার্য্যোঽবলাঃ পর সংস্তভ্যাশ্চ। চরক বিমানস্থান ৮ম অঃ ১০৮ শ্লোক।

বিশেষতঃ নারীদিগকে কোমল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কারণ নারীদিগের হৃদয় অস্থির, মৃদু, বিকৃত অর্থাৎ খোলা ও কাতর। উহারা প্রায়ই সুকুমার, অবলা ও পরের নিকট সান্ত্বনা অপেক্ষা করে। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত সাধক চিকিৎসককে পুরুষ ও মহিলার চিকিৎসা পৃথক করিয়া করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য কোনো চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে কিনা আমি জানি না, তবে ইদানীন্তনকালে হিষ্টিরিয়ায় বহু সংখ্যক মহিলা ভুগিতেছেন, যক্ষায় সহস্র সহস্র রমণী অকালে কাল কবলিত হইতেছেন, ইহার কারণগুলির মধ্যে কুসুম সুকুমার প্রাণে তীব্র বীর্য্য ঔষধের দহন শক্তির প্রভাব ও যে একটুকুও নাই—তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিজ্ঞজনে সে কথার মীমাংসা করুন, আমি সে সম্বন্ধে বেশী আর বলিতে চাহি না। প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে মহিলাগণের মৃত্যুর একটু পরিচয় প্রদান করিলাম—এই মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব—আয়ুর্ব্বেদের নাড়ী বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন চিকিৎসা। ডাক্তারেরা নাড়ী দেখার ধার ধারেন না, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের কিন্তু রোগনির্ণয়ে নাড়ী পরীক্ষাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এই নাড়ী বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বেও ভাবী মৃত্যুর কথা বলিয়া দিতে পারেন। আর রসায়ন চিকিৎসা। সেই কথাটা বলিয়াই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

যথা নিবৃত্ত সন্তাপা মোদন্তে দিবি দেবতাঃ।
তথৌষধীরিমাঃ প্রাপ্য মোদন্তে ভুবি মানবাঃ॥

সুশ্রুত—চিকিৎসা স্থান-ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

যেমন দেবতাগণ সন্তাপ শূন্য হইয়া স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করেন, সেই প্রকার মানবগণ সর্ব্ব প্রকার রসায়ন ঔষধ প্রাপ্ত হইলে

পৃথিবীতে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। এই রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যাং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয় বলং পরম্॥
বাক্ সিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ।
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্॥

অর্থাৎ রসায়ন হইতে দীর্ঘ আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণতা, প্রভা, বল ও স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, বাক্‌সিদ্ধি, প্রণতি ও কান্তি লাভ হইয়া থাকে। রসাদি ধাতু সমূহ লাভ করিবার উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহার নাম রসায়ন।

পূর্ব্বেকার লোকে যে কলির নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু একশত কুড়িবৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন, নীরোগ ও সুস্থ দেহে আশী বৎসরের বুড়াও যে অপত্য মুখ নিরীক্ষণে অপার আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন,—তাহা এই রসায়ন ঔষধেরই ফল সম্ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখনকার দিনে রোগ হইল বিশেষ বিবেচনা সহ তবে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রসায়ন ঔষধ তখন সকলেই ব্যবহার করিতেন, মহর্ষিরাই সে শিক্ষা চিকিৎসকদিগকে প্রদান করিতেন, যথা—

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা মনুষ্যস্য রসায়নং।
প্রযুঞ্জীত ভিষক প্রাজ্ঞঃ স্নিগ্ধ শুদ্ধতনোঃ সদা॥
সুশ্রুত—চিকিৎসাস্থান—২৭ অঃ

প্রাজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম বয়সে অর্থাৎ যৌবন কালে ও মধ্যম বয়সে অর্থাৎ প্রৌঢ় কালে স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

এ হেন রসায়ন চিকিৎসা—মানুষকে অজর-অমর না হউক—চির স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়া থাকে। এই চিরস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবী করিবার উপায় বিধির ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন আর কোনো চিকিৎসা-পুস্তকে আছে কি? পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ জরা ও মৃত্যু বিনাশার্থ সোমনাশক অমৃত অর্থাৎ সোমলতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্য ঋষি আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন;—

ন তান্ পশ্যন্ত্য ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ।
ভেষজ্য দ্বেষিণশ্চাপি ব্রাহ্মণ দ্বেষিণ স্তথা।
সুশ্রুত—চিকিঃ স্থান—২৯ অঃ।

যে সকল লোক অধর্ম্মিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, ঔষধদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষী,—সেই সকল লোক কদাচ সোমলতার গাছ দেখিতে পায় না জানিবে।

ঋষি বাক্য ফলিয়াছে—অধর্ম্মপ্রাণ ও আয়ুর্ব্বেদদ্বেষী ভারতবাসীর নিকটও সেইজন্য সোমলতার গাছ আজি অদৃশ্য থাকিয়া তাহা জরাবার্দ্ধক্যের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু সে সোমলতা দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হউক, আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য রসায়ন ঔষধ এখনো এত সহজ সুলভ যে, সেরূপ সহজ সুলভ রসায়ন ঔষধ আর কোনো দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের সমগ্র পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ—যদি আর কোনো ঔষধও না পাওয়া যায়—তাহা হইলেও কেবলমাত্র এই কয়টির দ্বারা মানুষের সকল প্রকার রোগ হরণ এবং মানুষকে অক্ষত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করান যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকমাত্রেই এই নয়খানি দ্রব্যের পরিচয়

অবগত আছেন, এ নয়খানি দ্রব্যের তুলনাও বুঝি আর কোনো চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই।

শেষ কথা,—শল্য চিকিৎসা। শল্য চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অনভিজ্ঞ—এই কথা এখন সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন একদিন ছিল—যেদিন এই শল্য চিকিৎসার দুন্দুভিনিনাদে সমগ্র বিশ্ব মাতোয়ারা হইয়া দেবতার অমোঘ আশীর্ব্বাদ ভারতীয় শল্য চিকিৎসা শিক্ষার জন্য ভারত-বর্ষীয়দিগের শরণ-গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিক শল্য বিজ্ঞানের মূলভিত্তিই আয়ুর্ব্বেদীয় শল্য চিকিৎসা। মহর্ষি সুশ্রুত সেই আয়ুর্ব্বেদীয় শল্য চিকিৎসার সার্জ্জন ছিলেন। অধ্যাপক ওয়েবার তাঁহার সুবিখ্যাত **History of India and Literature** গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"গ্রীকগণই সুশ্রুত হইতে বহু তত্ত্ব শিক্ষালাভ করিয়াছেন।"

সুবিখ্যাত ডাক্তার হার্মবার্গ বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের কঠিন কঠিন অস্ত্র চিকিৎসা গ্রীকগণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এবং ইউরোপীয়গণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ সকল অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক ডায়াজও অনেক গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীক-চিকিৎসা-প্রণালী হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

যাঁহারা গ্রীকগণের পন্থাবলম্বী—তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, গ্রীকগণ তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য মিশরবাসীগণের নিকট ঋণী এবং মিশরবাসীরা হিন্দুগণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, হিন্দু চিকিৎসার মধ্যে শল্য চিকিৎসা যে একটি সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, হিন্দু চিকিৎসক এখন সে চিকিৎসা ভুলিয়াছে, ইহাও সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মধ্যে এখনো যে সকল প্রকরণ রহিয়াছে—কেবলমাত্র তদ্বারাই মানবকে চির স্বাস্থ্য প্রদান করা যাইতে পারে—সেই চিকিৎসার প্রতি ঔদাসিন্যই আজি দেশের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ, একথা সহস্রবার বলিব।

সংযমের কথা।

"হিতং মনোহারী চ দুর্ল্লভং বচঃ"

(শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দোপাধ্যায় বি-এ)

আর কতকাল আত্মগোপন করিয়া চলিবে। যাহা সত্য, তাহা কখনও লুকাইয়া থাকেনা—বাহির হইবেই হইবে। উহা তেজস্বী ভাস্করের ন্যায় সদা প্রোজ্জ্বল। সত্য স্বরূপ ভগবানের বিজয় জ্যোতিঃ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতেছে—কেহ তাঁহার গতিরোধ

করিতে পারেনা। মহান্ বিশ্ব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। যাহা অসত্য, তাহাকে বুনিয়াদ করিয়া কথনও সৎবস্তুর প্রতিষ্ঠা হইতে পারেনা। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে আহার বিহারে যে অনিয়ম অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, উহা সত্যের অনুরোধে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করা উচিত। সত্য সর্ব্বদা সকলের প্রীতিকর হয় না। তাই বলিয়া প্রিয় অসত্য কহিয়া আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করা ও শিক্ষাও সভ্যতার কার্য্য নহে। সত্যসন্ধ ভারতকবি ভারবি নির্ভীকচিত্তে গাহিয়াছেন—"হিত' মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।"

ভারতের মন্ত্র—ভোগ নহে, ত্যাগ ও সংযম; প্রবৃত্তি নহে, নিবৃত্তি।

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় একাভিবর্দ্ধতে।

বাল্যকাল হইতে এই কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ত্যাগ ও সংযম শিক্ষা করিতেন। সংযমী ও মিতাচারী সাত্ত্বিক হিন্দু বহুবিধি নিয়মের বশীভূত হইয়া দেহযন্ত্রকে ক্লেশসহিষ্ণু ও শক্ত করিতেন। কলির বিলাসী জীবের ন্যায় সুখের পারাবত হইতেন না। কঠোরতা দ্বারা দেহ ও চরিত্র গঠন করিয়া ব্রহ্মচারী গৃহস্থ জীবন আরম্ভ করিতেন; এজন্য কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবল রিপুগণ তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিত না। রিপু তাঁহাদিগের দাস ছিল—কলির অসংযত জীবের ন্যায় তাঁহারা কামদাস ছিলেন না। রিপুকে নষ্ট না করিয়া তাহাকে দমন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা কর্ম্মজীবনে অনেক উপকার পাইতেন। কাম ক্রোধাদি রিপু না থাকিলে সংসার চলেনা—ভগবানের সৃষ্টি থাকে না। শত্রুর সহিত সংগ্রাম না করিলে কি জগতে বীর হওয়া যায়? গহন কাননে—নিভৃত গুহায় বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু সকলেই যদি শুকদেবের ন্যায় সংসার ত্যাগ করতঃ প্রলোভনের বাহিরে গিয়া তপশ্চরণ করে, তাহা হইলে দুনিয়ায় কর্ম্ম করিবে কে? গৃহস্থ কর্ম্মীর গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ তপোবন। ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধুর সমন্বয় হইলেই জগতে আবার কি দেখিব? যথার্থ জ্ঞানী ধার্ম্মিক কর্ম্মী গৃহী,—যাঁহাদিগের মন্ত্র হইবে—"শত্রুকে বশীভূত কর,—রিপু জয় কর, নাশ করিও না," শত্রুকে নিপাত না করিয়া স্ববশে আনিয়া তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করাই প্রকৃত বিজ্ঞের কর্ম্ম। এই সুনীতি অবলম্বন করিয়াই মহাত্মা সুচতুর আকবর দিল্লীর সমীপবর্ত্তী রাজপুতদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন নাই—মিত্রতা স্থাপন করতঃ তাহাদিগের দ্বারা পরম উপকৃত হইয়াছিলেন।

'ভোগে রোগভয়ং'—যেখানে অনিয়মিত ভোগ, সেইখানেই রোগ ও অকাল মৃত্যু। মানবজীবন ত চীনে মাটীর বাসনের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ বটেই, কলির বিলাসী জীব যেন জল বুদ্বুদ অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়ী হইয়াছে। এই আছে, এই নাই। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী'। জড়বাদীর সিদ্ধিলাভ হইতেছে বটে, কিন্তু প্রাণে তাহার আনন্দ কই? অসীম পার্থিব ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও তাহার দৈন্য ঘুচিলনা কেন? ভোগী জড় সর্ব্বস্ব কলির জীব তমো ও নাশের পথে তীরবেগে ধাবিত হইতেছে কেন? কেবল রাজসিক

আহার বিহারে শরীর আপাত সুন্দর ও কার্য্যক্ষম হয় বটে, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাব ব্যতীত কখনও স্থায়িত্বলাভ করা যায় না। দেহের বাহ্য চাকচিক্য—বেশভূষা প্রভৃতি এই রজোগুণ—কলিযুগে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায়, পবিত্র সত্ত্বগুণ চাপা পড়িয়াছে। পরমজ্ঞানী প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যমনীষিগণ এই পাঞ্চভৌতিক ক্ষণভঙ্গুর দেহপিঞ্জরকে অতি সযতনে রক্ষা করিতেন। অবিরত খাটাইয়া যন্ত্রকে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করিয়া ফেলিতেন না। তাঁহারা বুঝিতেন—"আধার ব্যতীত আধেয় থাকে না; পাখীকে রাখিতে হইলেই পিঞ্জরখানির যত্ন করিতে হইবে; আত্মার উৎকর্ষ করিতে হইলেই দৈহিক উৎকর্ষ একান্ত আবশ্যক; নচেৎ অশরীরী মানব কেবল আত্মারাম হইয়া জগতে উন্নতি লাভ করিতে পারে কি?" সেই জন্য আহার বিহারের এত কঠোর নিয়ম করিয়াছিলেন, খাদ্যাখাদ্যের এত সূক্ষ্ম বিচার ছিল, পরপাক-স্বপাক প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা এত অধিক গুরুত্ব স্থাপন করিতেন। প্রকৃতির সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ সাতিশয় ঘনিষ্ঠ। তাই আহার্য্য বিষয়ে তাঁহারা এত মনোযোগী ছিলেন। ছাইভস্ম খাইলেই চলে কি? বিচার পূর্ব্বক আহার না করিলে পৃথিবীতে কখনও স্বাস্থ্যসুখ ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় না।

আর এক কথা, আহার্য্যই অনেক পরিমাণে প্রকৃতি গঠন করে। মাংসাশী ব্যাঘ্র যদি বহুকাল অস্থিশোণিতের আস্বাদ না পায়, তাহা হইলে তাহার হিংস্র প্রকৃতি অবশ্যই কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। শৈশবে মাতৃহীন ব্যাঘ্র শাবক মেষপালের সহিত গৃহে পালিত হইলে তাহার মারাত্মক স্বভাব বোধ হয় অন্তঃপ্রোথিত হইয়া যায়। বাঘের হিংস্র প্রকৃতি একেবারে অন্তর্হিত না হইলেও তাহার মধ্যে, কেবলই প্রাণী হিংসা আর জাগে না। লোকসমাজেও দেখা যায়, যাঁহারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন—নিরামিষ ভোজী, ফলমূলাহারী, সংযত ও মিতাচারী, তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতুল্য—প্রশান্ত ও প্রফুল্ল; আকৃতিও কেমন মধুর, সৌম্য ও চিত্তাকর্ষক। তাঁহাদিগের দর্শনেও পুণ্যলাভ হয়। কিন্তু যাহারা দুরাচার, রাজসিক ও তামসিক আহার বিহারাভ্যস্ত, তাহাদিগের দেহ কেমন রুক্ষ, কর্কশ ও লাবণ্যহীন, দেখিলে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, বরং প্রাণে ভীতি সঞ্চার হয়। শৃগাল বানর সর্পভোজী যাযাবর বেদে দিগের আচার ব্যবহার যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তাহাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ। শৃগাল ধরিবার জন্য বনজঙ্গলে বসিয়া যখন জম্বুক রব করিতে থাকে, তখন দেখিলেই মনে হয়, উহারা মানুষ নহে—মনুষ্যাকারে পশু। কি ভীষণ মূর্ত্তি! একাকী তাহাদিগের বাসস্থানের নিকট দিয়া যাইতেও আতঙ্ক হয়। তাহারাও ত মানুষ, তবে মানুষ দেখিলে এত ভয় হয় কেন? মানুষের চামড়া গায়ে থাকিলেই মানুষ হয় না। যথার্থ মানুষ হইতে হইলে মনুষ্যত্ব চাই,—চাই ধর্ম্ম—প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস—নামে রুচি ও জীবে দয়া। মানুষে পশুত্ব ও পৈশাচিকতা দেখিলে, পশু ও পিশাচ বোধে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। আবার মহাত্মা সাধু সন্ন্যাসীদিগের পবিত্র দেহ—জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করুন, দেখিবেন এই মানুষেই দেবত্ব আছে। মিতাচার ও সংযমে তাহার শরীরে কি এক

অপূর্ব্ব কান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—অন্তঃপ্রকৃতির কি এক অনৈসর্গিক মাধুরী বাহ্য আকৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেখিলে নয়ন মন যথার্থ মোহিত হয়। অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় মানুষ পশুর অধম হইয়া জগৎকে ঘোর নরকে পরিণত করে। আবার সুশিক্ষার ফলে এই মানবই দেবত্বলাভ করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গীয় সুখ, আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করে। সুশিক্ষায় জীব শিব হয়; কুশিক্ষায় নর—বানর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

ন্যায় ও সত্য, ধর্ম্ম ও সুনীতি ভারতের জীবন। কেবল আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন লিপ্ত ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান হইয়া ঘোর অশান্তিতে কালক্ষেপ করিবে। নিবৃত্তি মার্গ-চারী ধার্ম্মিক আর্য্যগণ সুস্থ ও নীরোগ দেহে দীর্ঘায়ু হইয়া জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেন। আজ আমরা গ্রীষ্মপ্রধান ভারত বর্ষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া, রজোগুণী বৈদেশিক আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া মহোল্লাসে দেহটাকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছি। প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণ—ভগবানের বিধি লঙ্ঘন করিলেই সমুচিত দণ্ড-ভোগ করিতে হইবে। Nature's laws can never be violated with inpunity, দেহ ভগবানের পবিত্র মন্দির। কোনপ্রকারে কলুষিত হইলে সে মন্দিরে আর দেবতা থাকেন না। কলির নাস্তিক জীব নিরন্তর এই পবিত্র দেবপীঠকে নানাবিধ পাপাচরণ দ্বারা দূষিত করিতেছে বলিয়া ভগবান ঘন ঘন দেহান্তর পরিগ্রহ করিতেছেন। সত্ত্বগুণে স্থিতি, তমোগুণে নাশ। রাজসিক পান ভোজনে ক্রমশঃ তমো আধিক্যবশতঃ আমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারি না। তাই আজ এত শিক্ষা—এত বিদ্যালয় সত্ত্বেও এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এত ব্যভিচার সমাজে প্রবেশ করতঃ আমাদিগকে অন্তঃসারশূন্য-অবিবেকী-ঘোর নারকী করিয়া ফেলিয়াছে; তাই আজ এত শিল্পবিজ্ঞানের মধ্যেও এত দুঃখ—এত দৈন্য এত ক্লেশ—এত অশান্তি এত অকালমৃত্যু। দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার প্রয়াস আমাদের কই? মরিবার ঔষধ গলায় বাঁধিয়া কি বাঁচিতে পারা যায়। পবিত্র ও সংযমী হও, সুস্থ নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইবে। প্রেমের প্রতিষ্ঠা কর, আবার আনন্দময় ধর্ম্ম-রাজ্য ফিরিয়া আসিবে। হিংসা, দ্বেষ ও ব্যভিচারে সর্ব্বরক্ষক বিশ্বপ্রেমিক সৃষ্টি করে না,—সৃজন করে কেবল ভীষণ নিষ্ঠুর ঘাতক কসাই—সর্ব্বনাশক কালাপাহাড়। এক কথায়, সতত একটী প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হয় 'বিজ্ঞানবীর কেন শান্তিহীন হয়? জড়-বাদী দীর্ঘায়ু হইয়া জগতে কেন বিমল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেনা?' জড়বিজ্ঞান যদি ত্রিভুবনে আপনার বীরত্ব ঘোষণা করিয়া বলে—"দেখ, ফটোগ্রাফে রূপ ধরিয়াছি; গ্রামোফোনে শব্দ ধরিয়া ফেলিয়াছি; বিশাল সাগরে বাষ্পীয় পোত চালাইয়া সগর্ব্বে আজ যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে যাইতেছি; অন্তরীক্ষেও জাহাজ উড়াইয়া মেঘের পশ্চাতে থাকিয়া মেঘনাদের ন্যায় ভীমনাদে গোলাবর্ষণ করতঃ নরশোণিতে মেদিনী প্লাবিত করিতেছি".—তাহাহইলে আমার একটীমাত্র জিজ্ঞাস্য আছে—"ওহে বিজ্ঞানবীর; তোমার অসাধ্যসাধন করিবার যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে ভূমিতায় আবার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতেছ না কেন?

তোমার এত জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যেও এত অজ্ঞান ও অবিদ্যাজনিত পাপতাপ ও কলহের উৎপত্তি কেন? অসংখ্য যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছ, কিন্তু আজিও ত পৃথিবীতে প্রেম, আনন্দ ও শান্তি ধরিবার কোন কলই আবিষ্কার করিলে না। তোমার এত কল কারখানায় তোমার শান্তি কই? তুমি পূর্ব্বে অসভ্য অবস্থায় যেমন মারামারি কাটাকাটি করিতে, এখনও তাই। বরং সুসভ্য জগতে অসুখ অশান্তি আরও বাড়িয়াছে। যদি একথা সত্য হয়, তবে বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানবীরকে অজ্ঞানবীর বলিবনা আরকি—এই সুশিক্ষিত ও সুসভ্য মানুষকে বনমানুষ বলিতে আর বাধা কি।"

জীবনসংগ্রাম দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে; মানবেরও আর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিবার অবসর নাই। যাহা কিছু খাদ্যাখাদ্য সম্মুখে আছে, তাহাই নাকেমুখে চোখে গুঁজিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে। আর যেমন আবর্ত্তে ঝম্পপ্রদান, অমনি অবিরাম ঘূর্ণন। এই ভয়ঙ্কর বেগ ও গতির মধ্যে পড়িয়া মানব শমদম সংযম ও স্ববশবর্ত্তিতা হারাইয়াছে। বর্ত্তমানের তীব্র কশাঘাতে তাহার ভবিষ্যৎ ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে। আজ কি খাইবে, কেমন করিয়া পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবে ও কন্যার বিবাহ দিবে, কি উপায়ে বিলাসিনী পত্নীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিবে ও সমাজে আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে পাঁচ জনের মত হালফ্যাসনে ঠাট বজায় রাখিবে—এই সব দুশ্চিন্তায় তাহাকে এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে যে, তাহার বর্ত্তমান কর্ম্মের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে সে আদৌ ভাবিতে পারিতেছে না। 'এখন ত ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়া পড়, তার পর ভবিষ্যতে একখানা হাড় পাইত বিলাতে আপিল করিব'—এই ভাবে বর্ত্তমান কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই প্রতিদিন অম্লানবদনে বিষবৎ ভেজাল দ্রব্য উদরসাৎ করিতেছে। মৃতবিষ তৎক্ষণাৎ ফলপ্রসূ হয়না। কিন্তু ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী। গরল ধীরে ধীরে দেহাভ্যন্তরে কার্য্য করিতে থাকে; সময়ে ক্ষেত্রটী ঠিক প্রস্তুত হইলেই এই অন্তর্নিহিত বিষ সামান্য একটী ক্ষত বা দুষ্টব্রণরূপে প্রকটিত হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশ করে। বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব যে অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ—ইহাতে বোধ হয় মতভেদ নাই। আহার সম্বন্ধে সংযমী ও মিতাচারী না হইলে মানব কখনও সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না।

আত্মসংযম মানবকে কঠোরতা শিক্ষা দেয়; বিলাসিতা দুর্ব্বল ও কুসুম কোমল করিয়া ফেলে। সুখের পায়রা এত সুকোমল যে, একটা 'কাকে' আক্রমণ করিলেও আত্মরক্ষা করিতে পারেনা। তাহার নখ ও চঞ্চু শোভার জন্য—আত্মরক্ষার অস্ত্র নহে। সুখের ঘরে রূপের বাসা। তবে শুধু রূপ লইয়াই না জগৎ চলে কই? গুণ না থাকিলে রূপের আদর হয় কি? সুন্দর সুন্দর কাচের পুতুল প্রায় বারমাসই আলমারীর ভিতরে বা তাকের উপরে তোলা থাকে—মৃত্তিকা বড় একটা স্পর্শ করে না। বাহারে পাতায় উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে—অধিকারীকে কোনও সুফল প্রদান করে না। সেইরূপ সমাজে বাহারে ও পোষাকী নরনারী দ্বারা দেশের কোনও উপকার সাধিত হয় না। নারী নরের নিত্যসহচরী। নরের যে

পরিমাণে উন্নতি ও অবনতি হইবে, নারীও সেইমত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। পুরুষ তাহার সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মের সহায় না করিয়া ক্রমশঃ পাপও বিলাসিতার সহকারিণী করিয়া ফেলিতেছে। পুরুষ ও প্রকৃতি শান্ত, দান্ত ও সংযমী না হইলে তাহাদের ফল কখনও বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হয় না। গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস পড়িলেই জানা যায়, তদানীন্তন গ্রীস ও রোমবাসী কিরূপ বলবান্, দীর্ঘকায় ও সাহসী ছিল। ক্রমে বিলাসিতা ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বল, দুর্বিনীত ও ভীরু কাপুরুষ করিয়া ফেলিল। এখনও ছবিতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়দিগের সুদৃঢ় মাংসপেশী দেখিলে মনে হয়, তাহারাই যথার্থ মরদ ছিল। গায়ের জোর যুবকের একটা প্রধান গৌরব। সেই দৈহিক বলবীর্য্য হইতে আজ আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ একেবারে বঞ্চিত। 'নিজহস্তে শ্রমসাপেক্ষ কার্য্য করিলে মানমর্য্যাদার হানি হয়'—এই মিথ্যাগৌরব কেবল চিত্তদৌর্ব্বল্য-পরিচায়ক এবং ইহার বিষময় অপরিহার্য্য ফল—পরমুখাপেক্ষিতা। পাছে লোকে কি বলে এই ভয়ে আমরা বাজার হইতে পাঁচসের দ্রব্য স্বহস্তে গৃহে আনিতে পারিনা, নিজে তৈল মর্দ্দন করিনা, চাকরে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সভ্যতা! লোকলজ্জার খাতিরে ত মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, জালজুয়াচুরী প্রভৃতি হইতে বিরত হই না। বরং পাপে অর্থাগম হয় বলিয়া আরও আনন্দ অনুভব করি। যাহা হউক, শারীরিক ব্যায়ামের অভাবেই আমরা অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইয়া থাকি। একছটাক চাউলের ভাত খাইয়া পরিপাক করিতে পারি না; এক মাইল পথ চলিতে হইলে আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাবুও ক্ষীণরোগী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার নিজহাতে গড়া বিলাসিনী ভার্য্যাও তাঁহার যোগ্য সহচরী হইয়াছে। না হইলে মিলিবে কেন? মনে হয় যেন আধুনিক সভ্যতার একটা নিয়ম হইয়াছে—বাবু বড়লোক হইলেই তাঁহার অজীর্ণ বহুমূত্রাদি বাঁধা কয়েকটী রোগ থাকিবেই এবং তাঁহার স্ত্রীরও কথায় কথায় মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, পেটব্যথা প্রভৃতি হওয়া চাই। কি অদ্ভুত কায়দা! আমার দেহ আমার নিজের নহে—বাবা গোপেশ্বরের বা অমুক খ্যাতনামা ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়ের কৃপায় নানা ঔষধ খাইয়া, অনেক তাগা মাদুলী ধারণ করিয়া বহুকষ্টে কোন গতিকে বাঁচিয়া আছি মাত্র। ডাক্তার-বৈদ্যমহাশয় আমার জীবন মরণের কর্ত্তা। তিনি বাঁচাইলে বাঁচিব, না বাঁচাইলে মরিয়া যাইব। দেশের প্রাকৃতিক ও নৈতিক আবহাওয়া দূষিত হইলে চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার কঠিন সংক্রামক ব্যাধির প্রাবল্য হয়। লোকের দেহ ও চরিত্র যতই পচিয়া যায়, দেশে চিকিৎসক ও ব্যবহারাজীবের সংখ্যা ততই বাড়িতে থাকে। নৈসর্গিক ও নৈতিক বিধি মানুষ যতই উল্লঙ্ঘন করিতেছে, ডাক্তার উকীল মহাশয়দিগের ততই সুবিধা হইতেছে। কেহ মরে, কেহ 'হরি হরি' বলে। কামক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় অস্থির হইয়া জীব যখন পাপে লিপ্ত হয়, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। পরে রোগের জ্বালায় দিশাহারা হইয়া অগত্যা ডাক্তার-উকীলের পাদপদ্মে বহুক্লেশার্জ্জিত রজতমুদ্রা ঢালিয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। 'বাঘে ছুঁইলে আঠার

যা'। এই বা সারাইতে অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান আদালতের অর্থশোষক ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পড়িলে সুবিচার প্রার্থী সরল ব্যক্তিকে প্রায়ই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

স্বামী যেমন গড়িবেন স্ত্রীও তেমনি হইবে। অশুচি অবস্থায় চা, পাঁউরুটী, বিস্কুট, হালুয়া, হাঁসের ডিম, আলুর চপ প্রভৃতি বিলাতী প্রাতরাশ খাইলে, বাজারে দশের সমক্ষে মুখের ঘোমটা খুলিলে, স্বামীর হাত ধরিয়া মাঠে হাওয়া সেবন করিলে পতি যদি সন্তুষ্ট হন, পতিব্রতা ভারতমহিলার তাহাই করণীয়। কারণ ভারতের শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ—

"বাল্যেপিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং"॥

স্বামীকে সুখী করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। সুতরাং স্বেচ্ছায় না হইলেও, নিষ্ঠুর ও অবিবেকী স্বামীর অসঙ্গত অনুরোধে স্ত্রীকে অনেক সময় অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ আয়ু নাশক কর্ম্মও করিতে হয়। স্ত্রী স্বামীর ছায়া স্বরূপ। পতি তাহাকে যাহা শিখাইবেন, সে তাহাই শিখিবে। সে কাদার ডেলা, যেমন ছাঁচে ঢালিবেন, তেমনি আকার ধারণ করিবে, কাজেই আজকাল স্বামীর দেখাদেখি কামিনীগণ যে অনেকটা বিদেশী আহার বিহার অনুকরণ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি। তবে আর্য্য রমণীর পক্ষে ঈদৃশ আচার ব্যবহার সর্ব্বথা হিতকর ও প্রশংসনীয় নহে। কিছুদিন পূর্ব্বেও বধূগণ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তি জাগিবার পূর্ব্বেই দরজা, দালান, প্রাঙ্গন, রন্ধন শালা প্রভৃতি স্থানে গোবর জল ছড়াইতেন, সম্মার্জ্জনী দ্বারা গৃহাদি পরিষ্কার ও গোময় লেপন করিতেন। দৈহিক পরিশ্রম জন্য তাঁহাদের শরীর ও মন সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকিত। লক্ষ্মীরূপিণী সদাহাস্যময়ী—মধুর ভাষিণী সাধ্বী গৃহিণী ঘরে ঘরে বিরাজ করিত। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, শারীরিক শ্রমসাধ্য গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, শীতল জলে স্নান, দেবপূজা, স্বহস্তে রন্ধন—এবম্বিধ সংযত ধর্ম্মজীবন যাপন করায় তাঁহারা অনেক সুসন্তান প্রসব ও লালনপালন করিয়াও নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি গুরুজন-সেবা অতিথি সৎকার, পূজার্চ্চনা, স্বহস্তে গৃহকর্ম্মানুষ্ঠান, রন্ধন প্রভৃতি অতি আদরের সামগ্রী ছিল। লজ্জাশীলতা ও নম্রতা ললনাকুলের বহুমূল্য ভূষণ ছিল। আজ আমাদের অন্তঃপুরে বর্ত্তমান সভ্যতার তরঙ্গ আসিয়া কেমন একটা ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। আজ পুরুষও যেমন ধূর্ত্ত ভণ্ডচূড়ামণি বিশ্বাস ঘাতক, তাঁহার চতুরা প্রণয়িনীও বকধার্ম্মিকা-বিড়াল তপস্বিনী। মুখে মধু, হৃদে বিষ। পুরুষও একএকটী শিকারী বাজপক্ষী, স্ত্রীও নেকড়ে বাঘিনী। এখন সৎ নরও অতি বিরল, সতী নারীও প্রায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নরই নারীর চালক ও পথপ্রদর্শক। তিনি তাহাকে অসৎপথে চালিত করিলে—তাহার কুকর্ম্মের সঙ্গিনী করিলে, সে কেমন করিয়া আর 'সহধর্ম্মিণী' নামের যোগ্যা থাকে। নর মনে করেন—"আমি পুরুষ; আমার পাপ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; আমি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে বা কুলটাগৃহে আমোদ প্রমোদ উপ-

ভোগ করিয়া বাড়ী আসিলেও আমার সতী স্ত্রী নিশ্চয়ই ততক্ষণ জাগিয়া বসিয়া উদ্গ্রীব হইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিবে এবং আমাকে গরম গরম লুচী-পরেটা ও আলুর চপ খাওয়াইবে; আমি নরাধম হইলেও, আমার স্ত্রী নারী শিরোমণি দেবতুল্যা পতিব্রতা হইবে"। কলির অসাধু পুরুষের পক্ষে প্রিয়ার নিকট হইতে এতটা সত্যযুগের সতীত্ব ও পাতিব্রত্য আশা করা সম্পূর্ণ ভ্রম বলিয়া মনে হয়। তুমি নিজে রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, নল ও সত্যবানের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ হও, দেখিবে তোমার সহধর্ম্মিণীও সীতা, শৈব্যা, দময়ন্তী ও সাবিত্রীর তুল্য সতী সাধ্বী পতি প্রাণা রমণীরত্ন হইবে। তুমি তাহার আদর্শ। আদর্শ লঘু ও নীচ হইয়া পড়িলে সেই আদর্শে শিক্ষিতা রমণীও লঘুচিত্তা ও নীচমনা হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? নর সভ্য হইলে, নারী কি আর অসভ্য বর্ব্বর থাকে। তুমি যথার্থ সুশিক্ষা ও সভ্যতা লাভ কর, দেখিবে তোমার নিত্যসহচরী নারীও সুশিক্ষিতা ও সুসভ্যা হইয়াছে। সত্যবান্ না হইলে কি সাবিত্রী পাওয়া যায়?

[ক্রমশঃ]

রোগবিজ্ঞান।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এইচ, এম, বি]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

ঔষধের প্রয়োগ বিধি বহুপ্রকারে বিভাজিত হইয়াছে। সংহিতার সময় অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ ঔষধ ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তী সংগ্রহকার দিগের সময় হইতে ধাতু ভস্ম ও পারদাদির বহুল পরিমাণ ব্যবহার হইতে থাকে এবং ধাত্বাদির অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতাশক্তি ও অচিন্তনীয় প্রভাব দর্শনে বহুল প্রচার হয়। সজীব ধাতুকে সূক্ষ্মরূপে বিভাজিত করিয়া ঔষধার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ জীবনীশক্তির বা শারীরিক বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত মিলিত হইয়া জীবানুযুক্ত রোগ শক্তিকে ধ্বংস করিতে হইলে, ঔষধ শক্তিও সূক্ষ্ম ও বৈদ্যুতিকশক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কার্য্যকারী হইতে পারে না। কারণ উত্তপ্ত লৌহের সহিতই উত্তপ্ত লৌহের সম্মিলন হইতে পারে। সেই জন্য লৌহ, অভ্র প্রভৃতিকে শত সহস্রবার ভস্ম করিয়া তাহাদের জড়ত্বের অংশ ও মালিন্য বিমুক্ত করতঃ নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম তাড়িৎ সম্পন্ন করা হয়, পরে তাহাই শারীরিক বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই সত্য অনুধাবন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বর্ষে "ডাক্তার গ্যাচেল প্যারিস কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন (Vede the medical Cra, April 1901) "কোন যৌগিক পদার্থ যথা লবণ chloride of Sodium সহস্রগুণ স্পিরিট্ বা জলসহ দ্রবীভূত

হইলে উহার অনুগুলি তাড়িৎবিন্দুতে পরিণত হয়, এই পরিণতির নাম অনুবিয়োজন (Dissaciation of molicules) অনুমাত্রেই অচল (Passive) তাড়িৎবিন্দুগুলি কিন্তু সচল (Active)"। "তেজোময় পদার্থ বা মূর্ত্তিমতী শক্তি" তাঁহার বহুপূর্ব্বে আর্য্যঋষি বলিয়াছেন, "যথাস্যাৎ জারণা বহু তথা স্যাৎ গুণদো রসঃ।" পারদকে যত অধিক জারণ সূক্ষ্ম করা হইবে উহা ততই গুণশালী হইবে। কারণ যে সকল জীবানুদ্বারা রোগ উৎপন্ন হয় তাহা অতি সূক্ষ্ম-পরমাণুস্বরূপ, জীব + অনু = অনুপরিমাণ যে প্রাণী তাহাই জীবানু। অনু পরমানু অর্থে সূক্ষ্মতম অংশাংশ বিশেষ; মহামতি শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—"জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। তস্য ত্রিংশত্তমোভাগঃ পরমাণু স উচ্যতে॥" বাতায়নের ভিতর দিয়া যে সূর্য্যরশ্মি গৃহে প্রবেশ করে, সেই আলোকে পরিদৃশ্যমান একটী ধূলিকণার ত্রিশ ভাগের ১ ভাগই পরমাণু বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ সূক্ষ্মতম পরমাণুরূপ জীবানু সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বায়ু মণ্ডলের মধ্যে ভাসমান আছে। এই জীবানু অতি সূক্ষ্ম, তাই সূক্ষ্মতম শারীরিক উপাদানগুলির সহিত মিশিয়া রোগাৎপন্ন করিতে পারে, কারণ শারীরিক রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র প্রভৃতি উপাদান গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সেল (Cell) অর্থাৎ পরমানু গোলক দ্বারা গঠিত হয়। ১ বিন্দু শোণিতে লক্ষ লক্ষ সেল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; একএকটী সেল প্রটোপ্ল্যাজম্ ও নিউক্লিয়সের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং প্লাজমা প্ল্যাজননামক জলীয়াংশে ভাসমান থাকিয়া যকৃৎ ও প্লীহাস্থিত রঞ্জকাখ্য পিত্তদ্বারা লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হয়। এইরূপ সকল ধাতুই বহু সূক্ষ্মতম সেল হইতে এক একটী তন্তুতে (টিসুতে) পরিবর্ত্তিত হয় এবং টিসু সমূহের দ্বারাই এই অবয়ব গঠিত হয়। যেমন বিন্দু বিন্দু জলকণার সমষ্টিতে এক বিশাল বারিধির সৃষ্টি হয়, সেইরূপ এই ক্ষুদ্রতম শেল সমূহের দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক রস রক্তাদি দ্বারা সুগঠিত এই বিপুল অবয়ব নির্ম্মিত হয়, সূক্ষ্মতম রোগ জীবানু ক্ষুদ্রতম হইয়াই শারীরিক ক্ষুদ্রতম উপাদান গুলিকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় এবং যেমন ১টী ক্ষুদ্রবীজ দ্বারা একটী মহামহীরুহের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ একটী সূক্ষ্ম বীজানু হইতেও একটী বিরাট রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এই সকল প্যারাসাইট, ককাই ব্যাসিলাই স্পিরুলাম নামক ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতি জীবানুগুলি অতি সূক্ষ্ম বিধায় তাহাকে ধ্বংস করিতে হইলে ঔষধগুলি সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। তাই ধাতু প্রভৃতি ঔষধের উপকরণ পদার্থকে ও অতিসূক্ষ্ম রূপে বিভাজিত করিয়া সূক্ষ্মমাত্রায় ব্যবহার করিবার নিয়ম করিয়াছেন। একটী ১রতি অনুবটীকায় ৬০ খানি উপাদান থাকিলে ও তাহার প্রত্যেক খানিই যে কার্য্যকারী হয় তাহা নহে। রোগীর শরীরে যে জাতীয় জীবানুযুক্ত রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই জাতীয় ঔষধের উপাদানগুলি তাহার জীবনীশক্তির উপর কার্য্য করিয়া রোগ শক্তিকে পরাভূত করে, আর ঔষধের অন্যান্য উপাদানগুলি অনুপযোগী বিধায় পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চিকিৎসাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা, আসুরী, মানুষী ও দৈবী। শস্ত্রাদি দ্বারা চিকিৎসাকে আসুরী, কষায়াদি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসাকে মানুষী, এবং হোমাদিক্রিয়া দ্বারা রোগের প্রতিকারকে

দৈবী বলে। যে ক্রিয়ার দ্বারাই হউকনা কেন, শারীরিক ধাতু সকলের সাম্যভাব আনিতে হইলে, তাহাই ব্যাধির চিকিৎসা ও তাহাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন

"যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্॥

গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ বা ভূতাদি সংযোগে যে ব্যাধিসকল সমুৎপন্ন হয় তাহার প্রতীকার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যাদি শরীরে ধারণ বা স্বহস্তে দান করিবার ব্যবস্থা স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও সজীব ঔষধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে যে গ্রহবৈগুণ্য জন্য যে সকল রোগ সমুৎপন্ন হইলে যে সমস্ত পদার্থের দ্বারায় তাহার প্রতিবিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদেও ঐ সমস্ত রোগে সেই সকল উপাদান ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে। সেই সমস্ত উপাদানের সংস্পর্শে বা আঘ্রাণে রোগ আরোগ্য হয়, ভূত চিকিৎসা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদেরই একটী অংশ বিশেষ; তাই ভূতাভি-সঙ্গোত্থ মূর্চ্ছায় অপামার্গের মূল চূর্ণ সহ মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া নস্য লইলে বা সেবন করিলে আরোগ্য হয়। আর উহার দ্বারাই ভূত চিকিৎসক (রোজা) গণ ভূত ছাড়াইয়া থাকেন। স্মৃতিশাস্ত্রে রোগের প্রায়শ্চিত্ত স্থলে যে সকল বস্তু দান করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল রোগে সেই সমস্ত দ্রব্যই আয়ুর্ব্বেদে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন স্মৃতিশাস্ত্রে বিধান আছে শ্বিত্র বা কুষ্ঠ রোগে ১০০ পল তাম্র দান করিলে রোগ নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়। রসরত্ন সমুচ্চয় নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে।

"তাম্রং পিত্ত কফাপহং জঠররুক্
কুষ্ঠামজন্তুঘ্নকং"

তাম্র, পিত্ত, কফ, জঠররোগ ও কুষ্ঠাদি নষ্ট করে। "ভাব প্রকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সেই জন্য উদয় ভাস্কর ও অমৃতাঙ্কুর লৌহ প্রভৃতি কুষ্ঠ বা শ্বিত্র রোগের ঔষধের প্রধান উপাদান স্বরূপ তাম্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কুষ্ঠ বা শ্বিত্র রোগে তাম্র দান ধারণ বা সেবন দ্বারা যে কোন প্রকারেই হউক শরীরে সংস্পর্শ হইলে কুষ্ঠের জীবাণু নষ্ট হইয়া ব্যাধি বিমুক্তি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক রোগেরই প্রায়শ্চিত্ত স্থলে যে সমস্ত দ্রব্য দান করিবার বিধান আছে, আয়ুর্ব্বেদেও সেই সকল দ্রব্য ব্যবহারের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাম্র যে মাত্র কুষ্ঠাদি রোগ জীবাণু নাশক তাহা নহে; ইহার দ্বারা প্রায় সর্ব্ব প্রকার রোগ জীবাণুই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ইহা এই প্রয়োজনেই বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, দেবতা গৃহের তৈজস প্রভৃতি তাম্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে; সেই তাম্রের কোশাকুশিস্থিত চরণামৃত পান করিয়া অনেকে অনেক দুরারোগ্য রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন—ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা যায়। দেশে কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হইলে বা গৃহে রোগ বাহুল্য হইলে গৃহের প্রাচীনাগণ দেবতার উদ্দেশে তাম্রের পয়সা সমর্পণ করিয়া পানীয় জলের পাত্রের মধ্যে ফেলিয়া রাখেন, সেই তাম্রের সংস্পর্শে পানীয় জল

বিশোধিত ও বীজাণুরহিত হইয়া সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশক শক্তি সম্পন্ন হয়। গৃহে কোন সংক্রামক ব্যাধি প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সূর্য্যদেব যেমন জলকে সংশোধন, নির্ম্মল ও জীবাণু রহিত করেন, তাম্রেরও সেই সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকাতে শব্দ রত্নাবলী প্রভৃতি অভিধান কর্ত্তারা তাম্রকে "অর্ক", 'সূর্য্যাঙ্গ' প্রভৃতি "সূর্য্য পর্য্যায় নামকম্" সূর্য্যবাচক পর্য্যায়ে অভিহিত করিয়াছেন।

তাম্রের সংস্পর্শে জল পবিত্র ও বীজাণু রহিত হয়। গঙ্গাজলের যে পবিত্রতা ও রোগ বীজাণুনাশক শক্তি ছিল, তাহার কারণও তাম্র সংস্পর্শ। কিন্তু এখন আর তাহা নাই। তাহার কারণ কিছু বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম। ইংরাজগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আধিপত্য লাভ করিলেন, তখন এদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসার কৌতূহল প্রবলতর রূপে জাগিয়া উঠিল। সেই সময় তাঁহারা দেখিলেন, যে যে স্থলে গঙ্গার প্রবল প্রবাহ 'ছাপকাঠির' মোহানার নিকট আসিয়া পড়িতেছে, তথায় গঙ্গার তলদেশে প্রায় ৪ ক্রোশ ব্যাপীস্থান বিশুদ্ধ তাম্রে পরিপূর্ণ আছে, এবং সেই তাম্র রাশির উপর দিয়া গঙ্গার জলরাশি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা সেই তাম্ররাশি তথায় ঐরূপ ভাবে পড়িয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তাহা তথা হইতে উত্তোলন করিলেন ও প্রচুর মূল্যে বিক্রয় করিলেন, কিন্তু উত্তোলনের পর দেখিলেন যে, তথায় উপর হইতে বালি আসিয়া স্রোতের অন্তরায় ঘটাইতে লাগিল ও পদ্মার দিকে সেই প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া প্রবল স্রোতে বহিতে লাগিল এবং রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি সকল নাশ করায় পদ্মার নাম হইল কীর্ত্তিনাশা। গঙ্গার স্রোত মন্দীভূত হওয়ায় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং যাহাতে ঐ কথা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্ণগোচর না হয় সেই জন্য তাহার প্রতিবিধানে চেষ্টিত হইয়া তথায় বহু অর্থব্যয়ে বাঁশের দরমা কাঠের খোঁটা দিয়া বিস্তৃত করতঃ ঐ বালির রাশি অপসারিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই এইরূপ করিতে বহু অর্থব্যয় হওয়ায় তাহা সঙ্কুলানের জন্য নৌকার উপর ট্যাঙ্ক বসাইয়া কয়েক বৎসর চালাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে আর হইয়া উঠিল না, ক্রমশঃ গঙ্গার স্রোত মন্দীভূত হইল ও সেই স্রোতস্বিনী গঙ্গাবক্ষেও শেওলা জন্মাইতে লাগিল। গঙ্গার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বিনষ্ট হইল। আর্য্য ঋষিগণ বহু অভিজ্ঞতাফলে গঙ্গাবারির পবিত্র ও বীজাণু-রহিত; সর্ব্বরোগ নাশ করিবার নিমিত্তই এই সকল তাম্ররাশি তথায় নিহিত করিয়াছিলেন। তাই গঙ্গাজল বিষ্ণুপাদোদক বলিয়া তাহার মাহাত্ম্যে ঘোষিত ছিল। কিন্তু তাহা এখন জলের নদী না হইয়া মলের নদীতে পরিণত হইয়াছে। একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জল পরীক্ষা করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া গঙ্গাজলের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"মৌলিকভাবে এই পুস্তকখানি লেখায় আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে গঙ্গা ও যমুনার জল, কলেরাজীবাণুর উৎপত্তি পক্ষে অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। এই সকল কলেরা জীবাণু যে ঐ জলমধ্যে খাদ্যবস্তুর অভাব বশতঃ ধ্বংস হয় তাহা নহে, বস্তুতঃ গঙ্গার জলে এই জীবাণু

নাশক শক্তিসম্পন্ন এক বিশোধক শক্তির যথার্থ বিদ্যমানতা হেতুই ঐ সকল কলেরা কীটাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই নিগূঢ় বিশোধকের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে আমি কোন সূচনা করিতে পারি না।

এম, আর, ই. এইচ হ্যাঙ্কিনের "দি কজ এণ্ড প্রিভেনশন অব কলেরা" নাম্নী পুস্তিকার ৫ম সংস্করণের ভূমিকা...।

আবিষ্কারক ডাঃ হ্যাঙ্কিন যে গঙ্গাজলের এই জীবাণুনাশক শক্তির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার অনুসন্ধিৎসার অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার কারণ যে গঙ্গার জলরাশির মধ্যে তাম্ররাশির বিদ্যমানতা ও সংস্পর্শ, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এবং গঙ্গার সংস্পর্শেই যমুনার জল বীজাণুনাশক শক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল।

তাম্রের জীবাণুনাশক শক্তির আর একটী পরিচয় পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তির কোন দুরারোগ্য ক্ষত হস্ত পদাদিতে হইলে বহু চিকিৎসার পর অসাধ্য জানিয়া তাহার হস্তে বা পদে তাম্র নির্ম্মিত বালা পরাইয়া দিলে সত্বর এবং সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল দূষিত ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

দম্পতী জীবন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সূতিকাগৃহ

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

গর্ভের অষ্টম মাস হইয়া নবম মাসের একদিন আসিলেও প্রসব হইবার যোগ্যকাল উপস্থিত হয়। এই জন্য নবম মাস হইবার পূর্ব্বেই সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। কাহারও নবম মাসে, কাহারও দশম মাসে, কাহার ও বা একাদশ মাসে, কাহার ও বা দ্বাদশ মাসে সন্তান প্রসব হইতে দেখা যায়। অষ্টম মাসের পর দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত সন্তানের প্রসব হইবার প্রকৃত কাল বলা যায়। ইহার অতিরিক্ত সময় লাগিলে গর্ভের কোনরূপ দোষ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। গর্ভিণীর শরীর সুস্থ থাকিলে এবং গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে পাইলে সন্তান পরিপুষ্ট হইয়া প্রায় নয়মাসে বা দশমমাসে প্রসব হয়, আর যদি গর্ভিণী পুষ্টিকর খাদ্য না পায়, তাহা হইলে সন্তানেরও শরীর পুষ্ট হইতে না পারায় প্রসব হইতে দশম মাসেরও অধিক সময় লাগিতে পারে। পূর্ব্বকালের সহিত বর্ত্তমান সময়ের সূতিকাগৃহের তুলনা করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। চরকের যুগের সূতিকাগার যেন একটী ছোটখাট গৃহস্থের বাসোপযোগী বাড়ী ছিল। তথায়

প্রসবের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার, অগ্নি জালিবার জন্য বহুপ্রকার কাষ্ঠ, মলমূত্র ত্যাগের ও স্নান করিবার স্থান, পরিচারিকা এমন কি অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রতন্ত্রে পারদর্শী সদ্‌-ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসাতত্ত্বের বৈদ্য সংরক্ষিত হইত। প্রসবের ঘরটী দীর্ঘে আটহাত, প্রস্থে চারহাত, পূর্ব্ব দক্ষিণ অথবা উত্তর দিকে দ্বারযুক্ত হইত। আজকাল যেমন প্রসব বেদনা উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীকে আঁতুর ঘর বা ফাটক ঘরে প্রবেশ করান হয়, পূর্ব্বে সে রীতি ছিল না, সেকালে অষ্টম মাস অতীত হইলেই নবম মাসের প্রথমে শুভদিন শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া বহুবিধ মাঙ্গলিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতঃ গর্ভিণীকে উল্লিখিত সূতিকা-গারে প্রেরণ করা হইত। প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীকে ঐ সূতিকাগৃহেই থাকিতে হইত।

সহরে সূতিকাগৃহের দিকে সাধারণের একটুকু লক্ষ্য ও সঙ্কোচভাব কম থাকিলেও পল্লীগ্রামে আঁতুরঘরখানিকে এমন অপবিত্র ভাবে রাখা হয়, যেন তাহা একটী নরককুণ্ড! প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ না করিয়া পরিধানে মূত্র লাগিলেও দোষাবহ হয় না, পাইখানা বা মাঠে মলত্যাগ করিয়া কাপড় না ছাড়িলেও অপবিত্রতা আসে না, কিন্তু আঁতুরঘরের ছায়া মাড়াইলেও বিপদ, স্নান না করিয়া শুদ্ধ হইবার উপায় নাই, বিশেষতঃ আঁতুরঘরের মধ্যে গেলে মা গঙ্গা ভিন্ন আর কাহারও পবিত্র করিবার ক্ষমতা থাকে না, এইরূপ সংস্কার থাকাতে পল্লীগ্রামের অনেক স্থানেই আঁতুর ঘর উঠানের এক প্রান্তে খর দিয়া কুঁড়ে ঘরের মত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উহা দীর্ঘে প্রস্থেও এত ছোট যে, প্রসূতিকে একপাশে শুইবার পর পাশ ফিরিতে হইলে পুনর্ব্বার না উঠিলে চলে না। বর্ষাকালে এই সকল স্থানে প্রসূতিদিগের কিরূপ দুর্গতি হয়—তাহা মনে করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য উঠান সর্ব্বদা ভিজা থাকে, এস্থানে কুঁড়ে বাঁধিলে তাহার মধ্যদেশ যে কিরূপ জলময়, সেঁতসেঁতে হয়, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীরাই অবগত আছেন। এই সকল কারণে প্রায় প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বকালেও পল্লী-গ্রামে ঐরূপে নির্ম্মিত আঁতুরঘরে প্রসব হওয়ার পর প্রসূতি ও কুমার সুস্থকায়ে থাকিত সত্য, কিন্তু তাহার প্রধান কারণ জনক জননীর অক্ষত দৃঢ় স্বাস্থ্য। পুষ্টিকর দুগ্ধ-ঘৃত গুড় প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম খাদ্য খাইয়া জননীর এমন উত্তম স্বাস্থ্য থাকিত ও সন্তান এরূপ পুষ্ট ও বলশালী হইত, যে, তাহাতে সামান্য অনিয়মে শরীরের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিত না। দশ বার বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামে অনেক ভদ্র লোককে বর্ষার সময় বৃষ্টির ধারায় ভিজিয়া ক্ষেত্রের কার্য্য করিতে দেখিয়াছি, প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে দেখিয়াছি। ঐ জলধারা বা প্রবল রৌদ্রেও তাঁহাদের কোন অসুখ হইত না, তাঁহাদের খাদ্যও তেমনি ছিল। সকালে আট নয়টার সময় কতকগুলি মুড়িও খানিকটা গুড় জলযোগের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইত, মধ্যাহ্নে এখনকার লোকের অপেক্ষা তিন চারি গুণ চাউলের অন্ন এবং তদুপযুক্ত দাল তরকারী, অপরাহ্নে জলযোগের জন্য পুনর্ব্বার মুড়ি বা চিপিটক, গুঁড়া বা ভিজা চাউল, গুড় প্রয়োজন মত। রাত্রিতেও পুনর্ব্বার অন্ন।

নিমন্ত্রণের সময় তাঁহাদিগকে অনেকগুলি বড় বড় লুচি, দাল, প্রচুর তরকারী, মিষ্টান্ন ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে দেখিয়া মনে কি এক আহ্লাদের সঞ্চার হইত। দরিদ্র চাষারাও আমাদের দেশে কম পক্ষে অর্দ্ধসের দুধ খাইতে পাইত, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের আর কোন দিকেই তুলনা হইতে পারে না। আমরা সারাদিনে জোর একপোয়া চাউলের অন্ন খাই, রাত্রিতে আর একবার, তাহাতেও প্রচুর পরিমাণে তরকারী মিলে না, দুধ ঘৃতের নাম মাত্র শুনি বা মাঝে মাঝে জলময় শ্বেতপদার্থ দেখি! এই খাদ্য খাইয়া আমাদের দেহ যেরূপ গঠিত হয় ও তাহাতে সামান্য হিম লাগাইলেই সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি কাসিতে শয্যাশায়ী হইতে হয়, অল্প রৌদ্রে বেড়াইলেই মাথার বেদনায় ছটফট করিতে হয়। যাহা হউক এ দারিদ্র্যপীড়িত দেশে প্রসবের জন্য স্বতন্ত্র একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর নহে, তবে বাসাবাটীর মধ্যে যে ঘরটী সকল ঘর অপেক্ষা খারাপ, সেঁতসেঁতে, বাতাস-শূন্য, সে ঘরখানিকে প্রসব ঘর না করিয়া যেখানি শুকনা, আলোকযুক্ত, সেই ঘরটীকে আঁতুর ঘর করিলে, এবং উঠানের মধ্যে আঁতুর ঘর না করিয়া গৃহের উপর পীঠিকার এক পার্শ্বে ঐ ঘর নির্ম্মাণ করিলে গর্ভিণী বা শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না।

ক্রমশঃ।

মরণের পথে।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি।]

আহার বিহারের দোষে আমরা প্রতিদিন মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। "রোগ জন্মে নিজ দোষে"—নিজ দোষ যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম;—তবে অকাল মৃত্যু আমাদিগকে কখনই গ্রাস করিতে পারিত না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই আমাদের বুদ্ধির দোষে অথবা পাশ্চাত্য মোহে মোহিত হইয়া আমরা শিশুকে দিন দিন মরণের পথে অগ্রসর করাইয়া দিতেছি। তা'র পরে যদি সেই শিশুটী কোন প্রকারে বড় হইল, তখন সে কুশিক্ষায় ও সঙ্গ দোষে নিজের মরণের পথ নিজে পরিষ্কার করিতে লাগিল। শত শত হিতোপদেশ পূর্ণ পুস্তক ও শত শত অকাল মৃত্যু প্রতি নিয়ত আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, কিন্তু কয়জন তাহা দেখিয়া সাবধান হয়! বকরূপী-ধর্ম্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"এই পৃথিবীতে আশ্চর্য্য কি?" যুধিষ্ঠির তাহার উত্তর দিয়াছিলেন:—

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে,
শেষ থাকে যা'রা তা'রা ইহা মনে করে,
আপনারা চিরজীবি—না হইব ক্ষয়,
ইহা'পর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়!"

চিরজীবি যদিও কেহ নয়, তথাপি অকাল মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দীর্ঘ-

জীবি হওয়া আমাদের যে অনেকটা নিজেদের হাত একথা অনেকটা বলা যাইতে পারে। আমরা চেষ্টা করিলে নিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা এই দেহকে অনেক দিন পর্য্যন্ত নিরাময় রাখিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। এক্ষণে আমরা শিশু জীবন হইতে কি প্রকারে অল্পে অল্পে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শিশু ভূমিষ্ট হইল। গৃহে আনন্দ ধ্বনি পড়িয়া গেল। কিন্তু সে কালের মত এখন আর শিশু ও প্রসূতির সেবা হইতে দেখা যায়না। প্রসূতিকে তাপ সেক্, গরম জল আর দেওয়া হয় না। এদেশে প্রসূতিকে যে "ঝাল খাওয়ানর" রীতি প্রচলিত আছে, তাহা ইংরাজী শিক্ষিত বাবু দিগের সূতিকা গৃহে স্থান পায় না। এই কারণে অনেক প্রসূতি সূতিকা রোগে আক্রান্ত হন। সূতিকা দশমূল পাচন এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাহা না দিয়া ডাক্তারীমতে চিকিৎসা করাইয়া টাকার শ্রাদ্ধ করা হয়। যাহা হউক নানা কারণে এখনকার প্রসূতিরা সহজেই স্বাস্থ্যহীনা হইয়া থাকেন। অনেক সময়েই তাঁহাদের স্তনে দুগ্ধের অভাব লক্ষিত হয়। ফলে শিশুটী মাতৃ-দুগ্ধের অভাবে বিলাতী ফুড খাইয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারেনা। এই সব কারণে শিশুর মরণের পথ আমরা নিজেরাই পরিষ্কার করিয়া দিই। যদি শিশুকে মধ্যে মধ্যে কালমেঘের পাতার রস খাওয়ান হয়, তবে দেখিবে শিশু নীরোগ হইয়া দিন দিন পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

তারপর বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা, তাহাতে তাহাদের সহজেই তরল মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে থাকে। দেহের লাবণ্য চলিয়া যায়। দেহ খর্ব্বাকৃতি হইতে থাকে।

"যে দিন কুপথ্য যোগ,
সেই দিনে কি ঘটে রোগ?
কুপথ্য রোগের মূল বটে।"

এই যে কুপথ্য যোগ হইতেছে; ইহাতে যদিও কোন রোগ সেই সময়ে না হয়, কিন্তু তাহার দেহ ক্রমেই রোগের আকর হইতে থাকে। ক্রমেই সে মরণের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বালকের দেহ হৃষ্টপুষ্ট করিবার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হইলে তিনি Blood mixture অর্থাৎ ডিম, চিনি, ও ১নং ব্রাণ্ডি সমাবেশে যে ঔষধ হয় তাহাই খাইতে দিলেন। উহা দিন কতক খাওয়াইয়া উপকার হইল বটে কিন্তু কিছুদিন পরে পেটে কাঁসর ঘণ্টা দেখা দিল। আমাদের দেহ আমাদের দেশের জল বায়ুতে বর্দ্ধিত। বিদেশজ ঔষধ কি সেরূপ হইতে পারে?

"যস্য দেশস্য যো জন্তু স্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্।"

অর্থাৎ যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশজাত ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর। বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা রক্ষা করিতে যেমন আমাদের কবিরাজী ঔষধ, এমন আর কোন ঔষধ নাই। ডাক্তারী ঔষধে প্রথমে শীঘ্র শীঘ্র ফল দেখায় বটে কিন্তু দেহকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। ডাক্তারী ঔষধও আমাদের মরণের পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। †

১০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালাদেশে ডাক্তারী ঔষধ প্রচলন হয়, নাই তখন এখান-

† এবিষয়ে গতবারেও এম্বুয়ের "আয়ুর্ব্বেদে" "আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

কার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১৮০৫ সালে তাৎকালীন বড়লাট বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা এক্ষণে উদ্ধৃত করিলাম :—

"I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people where farm I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cost of Countenance and features. Their features are of the most classical European models with great variety at the some time."

অর্থাৎ আমি বাঙ্গালীর ন্যায় সুশ্রীজাতি কখনও দেখি নাই। মাদ্রাজীদেরও শরীরের গঠনের আমি পূর্ব্বে সুখ্যাতি করিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালীর গঠন তাহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মাদ্রাজীরা ক্ষীণকায়। বাঙ্গালীর গঠন উন্নত, পেশল, মল্ল জনোচিত এবং নিখুঁত। বাঙ্গালীর মুখশ্রী অতিশয় সুন্দর এবং তাহা প্রাচীন রোমক ও গ্রীক দিগের মূর্ত্তির অনুরূপ।

যখন দেশের ডাক্তারী বা বিজাতীয় চিকিৎসা আইসে নাই, তখন এ দেশের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল তাহা বড় লাটের উক্তিতে বেশ জানা যাইতেছে। তার পর স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;— "৫০।৬ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেরূপ বলবান লোক ছিল এখন তাহার কিছুই নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এ দেশীয় লোকের শরীর কোনও স্থলে অর্দ্ধ হস্ত ও কোথাও বা এক হস্ত পরিমাণ হ্রস্ব হইয়াছে।"

তা'র পর আদম সুমারির বিবরণে জানা যায় যে পূর্ব্বে বঙ্গ দেশে যে হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত এখন ক্রমশঃই তাহার হ্রাস হইতেছে। এরূপ হইবার কারণ কি? আমাদের বিবেচনায় আহার, বিহারের অনিয়মে ও তেজস্কর বিজাতীয় ঔষধই ইহার এক মাত্র কারণ। গত ফাল্গুন মাসের এই পত্রিকায় "ম্রিয়মান বঙ্গপল্লী" লেখক শ্রীক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে ইহার কারণগুলি দেখাইয়াছেন। সকলকে উক্ত সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি। এখন আর সাত্ত্বিক আহার নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা, যে অবস্থায় হউক আহার করিতেছেন। সাদা চীনে বাসন যেন সকলের একটা মজ্জাগত রোগ হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে পাথরে বা পাতায় আহার করিতেন। ধাতু পাত্রে খাদ্য দ্রব্য যেমন সহজে বিকৃত হয়; পাথরে, মাটির পাত্রে বা পাতায় তাহা হয় না। ইহাতে আমাদের শরীর একে একে খারাপ হইতে থাকে।

তার পর বিহার—ইন্দ্রিয় সংযম করিতে না পারায় কত লোক যে অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। পীড়িত হইলে এখন মাতা বা তাদৃশ গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা আর ভাল লাগে না। এখন সেই স্থান অধিকার করিয়াছে সেই :—

"দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী" স্ত্রী!

এই জন্য দেখিতে দেখিতে সেই সামান্য

জ্বর প্রাণঘাতী জ্বরে পরিণত হইল। অকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ব্রহ্মচর্য্যই মরণের পথ হইতে উদ্ধার হওয়ার এক মাত্র উপায়।

বীর্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।

আহার ও বিহারে সংযমী হইতে পারিলেই দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়।

পরিচ্ছদও আমাদিগকে মরণের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়। দেশের অনুরূপ পরিচ্ছদ না পরিয়া সাহেবী পোষাকে আমাদের মনে তামসিক ভাব জাগাইয়া দেয়। তামসিক ভাব মনকে কলুষিত করিয়া দেয়। বঙ্গদেশ যেমন বিজাতীয় পোষাকের অনুকরণ প্রিয়, এরূপ আর কোনোও দেশ নহে। সুখের বিষয় এখন দেশে সুবাতাস বহিতেছে। কবে সে সুখের দিন হইবে, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

—:•:—

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি)

কাণের ঘায়ে।—কাঁচা দুগ্ধ ও জল সমান ভাগে লইয়া যাহার কাণ পাকিয়াছে—তাহার কাণে কিয়ৎকাল রাখিয়া একটু কুলের তৈল পায়রার পালকে করিয়া দিতে হইবে। ২।৩ দিন এইরূপ করিলেই কাণের ঘা আরোগ্য হইবে।

আমাতীসারে।—(১) দাড়িমের কচি পাতা এক তোলা, তেঁতুলের কচি পাতা এক তোলা, জামের কচি পাতা এক তোলা, দাড়িমের ফুল একটা, জীরা চারি আনা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র বাটিয়া অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া খাইলে আমাতীসার এবং রক্তাতিসার আরোগ্য হয়। (২) কুড়চির ছাল এক তোলা, দাড়িমের ছাল এক তোলা, সাঞ্চি শাক এক তোলা, পুরাতন আম্রকেশী এক তোলা—এই কয়টি দ্রব্য ছেঁচিয়া আধ সের জল দিয়া পাক করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রাতে এক ছটাক ও বৈকালে এক ছটাক মধুসহ মিশাইয়া পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

অজীর্ণে।—পাকা জামের রস দুই সের, মিছরি আধ সের, গোলাপ জল এক পোয়া, একত্র পাক করিয়া প্রত্যহ একটু একটু খাইলে অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয় এবং ইহাতে উত্তম ক্ষুধা হইয়া থাকে। ইহা অরুচি নিবারণেরও উত্তম ঔষধ।

প্রমেহের যন্ত্রণায়।—(১) গোক্ষুর বীজ চারি আনা, খরমুজ বীজ দুই আনা, ক্ষীরার বীজ দুই আনা—একত্র বাটিয়া মিছরির সরবতের সহিত ২।৩ দিন পান করিলে প্রমেহ রোগের জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (১) স্থলপদ্মের পাতার ডাঁটা আধ তোলা বাটিয়া লইয়া জল দিয়া রাত্রে নূতন মাটির পাত্রে করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে।

প্রাতে উহা বেশ করিয়া চটকাইয়া সিটী ফেলিয়া পান করিবে। ইহাতে প্রস্রাব বেশ সরল হইবে এবং যন্ত্রণার উপশম হইবে।

রক্তপ্রদরে।—(১). চাঁপানটিয়া শাকের শিকড় দুই তোলা, জবাফুলের কলি দুইটা, পুরাতন কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইলে সদ্যঃ রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। (২) গব্য দুগ্ধ এক পোয়া, আম্রকেশী বাটা একটা, চাঁপা-কলা পাকা একটা, একত্রে চটকাইয়া দুই তিনদিন সেবন করিলে রক্তপ্রদর উপশমিত হয়।

দদ্রু রোগে।—বনপালঙ্গের পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া ঘুঁটিয়া দিয়া চুলকাইয়া ঐ রস কয়েক দিন দিলেই দদ্রু রোগ আরোগ্য হয়।

আধকপালে পীড়ায়।—নিসিন্দার মূলের রস, গোলমরিচ চূর্ণ, ছাগ দুগ্ধ ও গোমূত্র এই কয়টি দ্রব্য একত্র করিয়া নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত বা আধকপালে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহায়।—(১). হরীতকী, আদা ও চিরাতা—প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা, জলের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে ক্রমশঃ প্লীহা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) সোহাগার খই এক ছটাক, হরিদ্রা এক ছটাক, সাজিমাটি একছটাক ও বিটলবণ এক ছটাক—একত্র ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা প্লীহা রোগের চমৎকার ঔষধ।

দন্তনড়ায়।—তুঁতিয়া পোড়াইয়া তাহার সহিত সমপরিমাণে হিরাকস মিশাইয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে নড়া দাঁত শক্ত হয়।

বনৌষধি।

(কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

বচা (বচ্) হিং বচ্।

—:•:—

বচ্ বেনেদোকানে পাওয়া যায়। বচ দ্বিবিধ, লাল লাল বর্ণ ও শ্বেত বর্ণ, শ্বেত বচের গুণ অধিক। বচ—কাথ ও চূর্ণ উভয়বিধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাসির পক্ষে বচ একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বচের গুণ ক্রমে বলা যাইতেছে।

স্বরভঙ্গে বচ।—কফ জনিত স্বরভঙ্গে বচের টুকরা মুখে চিবাইয়া ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিলে স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়। শুষ্ক কাসে বচ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে কাসির উপশম হয়।

অতিসারে বচ। অতিসার রোগে অতি বিষা ও বচের কাথ বিশেষ ফল দায়ক।

অপস্মারে বচ—অপস্মার রোগীকে ঘৃত সেবন করাইয়া বচ চূর্ণ মধু সহযোগে সেবন করাইবে।

বমনে বচ:

বাতজ বমন রোগে বচের কাথ পান করাইয়া রোগীকে বমন করাইলে উহার নিবৃত্তি হয়।

মূত্র রোধে বচ—মূত্র রোধে কাঁচা দুগ্ধ ও শীতল জলের সহিত কিঞ্চিৎ বচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয়।

কফজ হৃদরোগে বচ—কফজ হৃদরোগে নিমছালের কাথের সহিত চারি আনা পরিমাণ বচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা সেবনে "বমন হইয়া হৃদরোগের উপশম হইবে।"

আমাজীর্ণে বচ — বচ চূর্ণ ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আমাজীর্ণ রোগীকে বমন করাইলে আমাজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উন্মাদে বচ—বচের চূর্ণ ও কুড় চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া মধুসহ যোগে উন্মাদ রোগীকে সেবন করাইলে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়।

অন্ত্র বৃদ্ধি রোগে বচ। বচও সর্ষপ একত্রে পেষণ করিয়া অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধি রোগ উপশম হয়।

অর্শ রোগে বচ। অর্শো রোগীর গুহ্যদ্বারে তিল তৈল মাখাইয়া বচ ও শুলফার ঈষদুষ্ণ পোট্টলির দ্বারা স্বেদ দিবে। ইহাতে অর্শের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়।

বহুবিধ রোগে বচের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

বচ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পাচক, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমন কারক হয়। এজন্য বচের আবশ্যক মত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, ইহা বায়ুনাশক ও বলপ্রদ।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে ও বাতের স্ফীতিতে বচের প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কর্ণমূল শোথে বচের প্রলেপ হিতকর। বচ জলের সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া ঐ জল ২।১ ফোঁটা কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কর্ণনাদ রোগ উপশমিত হয়।

ঘোড়া বচ শর্করা জনিত অপস্মারও পাথুরী রোগে বিশেষ হিত কর, ইহা মূত্র কারক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

মফঃস্বলে চিকিৎসার উপায়।—আমরা মফঃস্বলের অনেক স্থান হইতেই চিকিৎসকের অভাবের কথা শুনিতে পাইয়া থাকি। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে গত ২ বৎসরে ২৩ জন ছাত্র যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকজন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী ও হইয়াছেন। মফঃস্বলের যে সকল স্থানে চিকিৎসকের অভাব, সেই সকল স্থানের অধিবাসীবর্গ যদি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে চিকিৎসকের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আমরা উপযুক্ত চিকিৎসক পাঠাইয়া তাঁহাদের সে অভাব দূরীকরণে প্রস্তুত আছি। এরূপ ব্যবস্থায় একদিকে যেরূপ আয়ুর্ব্বেদেরও বহুল প্রচার হইতে পারিবে, সেইরূপ মফঃস্বলের অধিবাসীগণও নানারূপ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন বর্ষের সেসন আগামী আষাঢ় মাসে আরম্ভ হইবে। এখন হইতেই ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ করা হইয়াছে। যাঁহারা আগামী সেসনে ভর্ত্তি হইতে চাহেন, তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় আবেদন করিবেন। নতুবা গত বৎসরের মত এবারও অনেক ছাত্রকে পুনরায় আর এক বৎসর নূতন সেসনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী।—এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহা এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। শারীর স্থানে জ্ঞানার্জ্জন না করিলে চিকিৎসা শিক্ষা সুগম হয় না। এই জন্য এই বিদ্যালয়ে সর্ব্বাগ্রে অ্যানাটমী, ফিজিওলজি ও সার্জ্জারির শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। এই সকল বিষয় এই বিদ্যালয়ে অতি সুন্দর ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার চিকিৎসায় পারদর্শিতালাভে প্রকৃতভাবে যে সুচিকিৎসক হইতে পারেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিরাজ শ্রী[illegible] গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
৩২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৯—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

সংযমের কথা।

:•:

[শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)
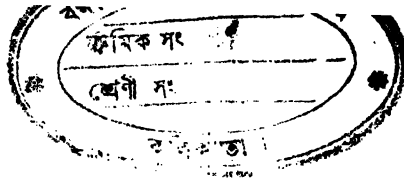
বাহ্যাড়ম্বর ও বিলাসিতা আজকাল পূর্ণ মাত্রায় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তখন কত সন্তোষ ছিল। আজ বাবু দাসত্বে প্রাণপাত করিয়াও তাঁহার বিলাসিনী-ভামিনীকে কোনক্রমেই সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না। নানাবিধ সৌখীন বস্ত্র ব্যবহার করিয়া সহরে মহিলাগণ যেন সখের নারী হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ সুসজ্জিত কাচের পুতুল লইয়া কি সংসার চলে? মোহন ছবিতে ঘর সাজান হয়—সোণার গহনায় দেহের শোভা বর্দ্ধন করে। কিন্তু দুর্দ্দিনের কাজে লাগিবে কাল শক্ত লৌহ, যাহা অনেক আঘাত—অনেক ঝড় তুফান সহ্য করিতে পারে—কাচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ নহে। ফুলের গাছে ফল হয় না। এই কুসুমশোভনা নারীগণ না পারেন সন্তানপ্রসব ও পালন করিতে, না পারেন গৃহকর্ম্ম করিতে। তাঁহাদের নয়নপ্রীতিকর সৌন্দর্য্যে ও কুসুমনির্য্যাস-সিক্ত গাত্র-পরিমলে চতুর্দ্দিক কেবল আমোদিত হয়। কিন্তু এত বাহ্য চাকচিক্য সত্ত্বেও তাঁহাদের ভিতরে সার নাই। এক ছটাক চাউলের ভাত হজম করিতে পারেন না, এক মাইল পথ চলিতে হইলে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া হাঁপাইয়া পড়েন এবং ২।৫টী পান সাজা ও বাবু খাইতে বসিলে তাঁহাকে হাওয়া দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারেন না। কেহ কেহ অতিকষ্টে ২।১টী সন্তান প্রসব করিয়াই ক্লান্ত হন। কেহ

কেহ ভোগ বিলাসে এত মাংস-মেদ-বহুলা স্থূলা হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের আদৌ সন্তান হয় না। তাঁহাদিগের পীনতা—রোগলক্ষণ, স্বাস্থ্যের চিহ্ন নহে। কৃষকেরা গ্রাম্যভাষায় বলিয়া থাকে—'ধানগাছ যদি হুড়ে যায় বা ঢোলা হইয়া পড়ে, তাহাতে ফল হয় না। সেইরূপ যে স্ত্রীলোক যৌবনে মহিষমর্দ্দিনীর ন্যায় ভীমাকৃতি হইয়া পড়ে, সে প্রায়ই বাঁচ্ছা দেয় না। ব্রহ্মদেশে একটী প্রবাদ আছে—"যে গাছে অতিরিক্ত পাতা হয়, উহাতে ফল হয় না; যে নারীর রূপ জেয়াদা—তাহার সন্তান হয় না" অনেক গরীবের গৃহলক্ষ্মী সাতবেটার মা হইয়া কেমন সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম আছেন। আর উচ্চ শিক্ষিতা, ভাবভুয়িষ্ঠা, অজীর্ণপীড়িতা নারীগণ একটী সন্তান প্রসব করিতে দশটা বড় ডাক্তার ও সতেরটা নামজাদা পাস করা ধাত্রী হাজির করেন।

কল, কৌশল ও কৃত্রিমতায় স্বাভাবিক যন্ত্রটা বেতাক হইয়া গিয়াছে। উহা আর নিজে চলিতে পারে না—পরের কোলে সর্ব্বদা বেড়াইলে সে আর নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না। যন্ত্রের self actingness স্বতঃক্রিয়াশীলতা তিরোহিত হইয়াছে। কাজেই অনুক্ষণ কৃত্রিম ঔষধাদির প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতি (nature) যেখানে ঠিক আছে, সেখানে এখনও কোনরূপ কৃত্রিমতার আবশ্যকতা হয় না। কুলি-পত্নী বনজঙ্গলেই অনেক সময় প্রসব করিয়া ফেলে—কোনপ্রকার ঔষধ সেবন বা অন্তঃক্ষেপ ইঞ্জেকশনের দরকার হয় না। যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে, গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব তাহাদের কাছে একটা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার নহে। মাতা হইবে বলিয়া ভগবান নারীকে নর হইতে কত পৃথক করিয়াছেন। নারীকে স্তন দিয়াছেন, নরের নয়নতৃপ্তি বা স্পর্শসুখের জন্য নহে—সুধাধারায় সন্তানের জীবন রক্ষা করিতে, রমণী-হৃদয়ে যে অনন্ত কোমলতা ও স্নেহের উৎস তাহাও সন্তানের মঙ্গলের জন্য। শক্তিশালিনী জগৎপালিনী জননীর অভাব হওয়ায়, আমাদের দেশে আজ কার্ত্তিক-গণেশের তুল্য সুপুত্র জন্মিতেছে না। মাতা সুস্থ ও সবল হইলে, তাঁহার গর্ভজাত সন্তানও হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে। সুবৃক্ষেই সুফল হয়। কুবৃক্ষে কি সুফল আশা করা যায়? সংযমী পুরুষের বীর্য্য অমোঘ এবং উহা প্রকৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া সুফল উৎপাদন করিবে। ইহাই ভগবানের নিগূঢ় সৃষ্টিতত্ত্ব। নারী যতই সুশিক্ষিতা ও নরের প্রতিযোগিনী হউন, তাঁহাকে মূলাধার ক্ষেত্ররূপে বীজধারণ করিতে হইবে। বিধির এই অকাট্য বিধান সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে। অসাধ্য সাধনকারী বিজ্ঞান কি এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে? জড় বিজ্ঞান ও নাস্তিকতার যুগে নারী আর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী নাই—উৎকট জীবনসংগ্রাম ব্যাপৃত ত্রিতাপদগ্ধ শিশ্নোদরপরায়ণ অবিশ্বাসী পুরুষের ক্ষণিক ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিবার যন্ত্রবিশেষ হইয়াছে। কেহ কাহাকেও অমিতাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিতেছে না। কাজেই পুরুষ-প্রকৃতি দিন দিন ক্ষীণ ও আয়ুহীন হইয়া অকালমৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইতেছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনং" এমন পুত্র হইবে যাহার দ্বারা কুল, সমাজ ও দেশ পবিত্র ও গৌরবান্বিত হয়। ঈদৃশ

সুপুত্রলাভের কামনা কয়জন নর বা নারী করিয়া থাকেন? ছাগছাগীর ন্যায় শুধু মাংসের মিলনে যে পুত্র জন্মে, সে কেবল কামজ পুত্র—পবিত্র চিন্ময় দাম্পত্য প্রেমের পরিণত সুমধুর ফল নহে।

ওহে আর্য্যসন্তান! তোমার প্রণয়িণীকে সুধাময়ী সহধর্ম্মিণী কর। আর্য্যনারী স্বামীর পোষাপাখী। যে বুলি শিখাইবে, মধুর স্বরে তাহাই বলিবে। যাহা করাইবে—তাহাই করিবে। মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, সুতা প্রভৃতিকে এমনভাবে তৈয়ারী কর - যাহাতে প্রত্যেক গৃহ যেন পুনরায় ধর্ম্মকর্ম্মের সমন্বয়ে পরম পবিত্র শান্তিময় তপোবনে পরিণত হয়। সুফল প্রত্যাশী প্রত্যেক গৃহীকে সর্ব্ববিষয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা পালন করিতে হইবে। সুবৃক্ষ পরিণত হইলেই সুফল প্রদান করে। তবে প্রথমে গাছের গোড়ায় জল দাও, সার দাও ও অতি যতনে গাছের পাট কর। তবেই সুমধুর ফল মিলিবে। প্রচুর ও উৎকৃষ্ট শস্য প্রার্থী বুদ্ধিমান্ কৃষক যেমন বহু যত্ন ও ক্লেশ সহকারে সর্ব্বাগ্রে ক্ষেত্রটাকে প্রস্তুত করে, সেইরূপ উত্তম পুত্রকন্যা কামী সুধীমাত্রেই বীজাধাররূপিণী মাতৃজাতির সমাদর ও উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হউন। নচেৎ—

If vain your tail, Blame the culture, not the soil. ওহে অবোধ কৃষক, যদি তোমার শ্রম সার্থক না হয় কিম্বা যদি আশানুরূপ ফল না পাও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, তুমি ক্ষেত্রের সমুচিত পাট কর নাই।

ত্যাগ ও সংযম ব্যতীত মানব কখনও দেবত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে না—গভীর অনাবিল প্রেম, আনন্দ ও শান্তির মধুর আস্বাদ পায় না। 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ'। অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বাল্যকালে সুনীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে—যৌবনে কুসঙ্গের প্রভাবে জঘন্য অস্বাভাবিক উপায়ে যুবকগণ অকালে রেতঃপাত করিতে থাকে। কাঁচা বাঁশে ঘুন লাগিলে যেমন উহা অন্তঃসার শূন্য হইয়া যায়, সেইরূপ হস্তমৈথুনে অপরিণত বয়স্ক যুবকের সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ শক্তি, তেজ ও ওজোহীন হইয়া অকাল কুষ্মাণ্ডের ন্যায় খর্ব্বাকার ও বিগতশ্রী হইয়া পড়ে। ইহার পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করতঃ পুনরায় অতিমাত্রায় স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া আরও ক্ষীণ ও ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া থাকে। এই সময়ে রোগ-প্রতিষেধক শক্তির অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় যুবকের নিস্তেজ দেহে অম্লপিত্ত, বহুমূত্র, বাত, কাস, মেহ, যক্ষা প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগের আবির্ভাব হয়। ঔষধ-পথ্যাদির সুনিয়ম পালন করিয়াও ভাঙ্গা দেহ আর গড়ে না। তখন অনেকেরই হয় ত স্বকৃতপাপের সমালোচনা করিয়া অনুশোচনা আসে। কিন্তু অনুতাপে আর ফল হয় না। কারণ যন্ত্র একবার বিগড়াইলে তাহাকে মেরামত করিয়া অধিক দিন চালাইতে পারা যায় না। দেহটাও একটা যন্ত্র—কত কল-কব্জা-চাকা-ইহার ভিতরে চলিতেছে—তাহার খবর কয়জন রাখে? পাঁচ টাকা দিয়া এক খানা ঘড়ি কিনিলে প্রত্যহ উহাকে কত যত্নে দম দিতে হয়—কত সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়—পাছে পড়িয়া যায়, পাছে নষ্ট হয়। কিন্তু হায়! আমরা কি অন্ধ! কি নির্ব্বোধ! এই জীবন্ত যন্ত্রখানার উপর

আমাদের মোটেই লক্ষ্য নাই—এই সুকোমল কলের প্রতি কত অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াছি। অমূল্য মানব জন্ম পাইয়া হায়রে! আমরা বুঝিলাম না—কেমন করিয়া দেহ-যন্ত্রকে ব্যবহার করিতে হয়—কিরূপ নিয়মে চলিলে এই মানব-ইঞ্জিনখানা দীর্ঘকাল সজীব, নীরোগ ও কর্ম্মপটু থাকে। চলিত কথায় আছে—"অযথা করিলে ব্যয়, শেষে দুঃখ পেতে হয়।" কিন্তু এই বিধি আজ পালন করেন কয়জন শিক্ষিত সুধী? বরং শিক্ষিত সমাজে অধিকতর অমিতাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করায় পুরুষ-প্রকৃতির অত্যধিক মিলন ঘটিয়া শীঘ্র শীঘ্র পরস্পরের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। ইহাকে পশুবিকৃতা বলিলেও অন্যায় ও অযৌক্তিক হয়। কারণ পশুরও কালাকাল ও পাত্রাপাত্র বোধ আছে। সুতরাং এবম্বিধ উচ্ছৃঙ্খলতাকে 'পৈশাচিকতা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকিলে লজ্জা ও ভয় বশতঃ অনেকটা শাসন ও সংযম থাকে। কিন্তু বিদেশে বাসায় যুবকযুবতীর অবাধমিলনের কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকে না। প্রাচীনা মাতা বা প্রাচীনা বিধবা ভগিনী সঙ্গে যাইতে চাহিলে তাঁহাদিগকে এই বলিয়া নিরস্ত করা হয়—"সে অনেকদুর মা, মগের মুলুক; না আছে মন্দির, না আছে গঙ্গাজল ফুল বেলপাতা প্রভৃতি পূজোপকরণ; সেখানে গেলে কি তোমাদের জাতিধর্ম্ম থাকে?"—ইত্যাদি যুক্তি তর্কের দ্বারা পথের কণ্টক অপসারিত করিয়া নবদম্পতী মনের আনন্দে বিদেশে ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে থাকেন। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে স্থানে স্থানে এই নিয়ম আছে—বালিকা—যুবতী না হইলে তাহাকে ভর্তৃগৃহে প্রেরণ করা হয় না। পতি সহবাসের যোগ্যকাল উপস্থিত না হইলে স্বামী-স্ত্রীর মিলন কখনও শুভদ নহে। অপরিণত বীজে সন্তান হইলে সে প্রায়ই কৃশ ও অল্পায়ু হয়। তবে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ, গৌরীদান প্রভৃতি প্রথা যখন প্রচলিত ছিল, তখন সমাজে এতটা চিত্ত দৌর্ব্বল্য, সংযম হীনতা, অমিতাচার ও পৈশাচিকতা প্রবেশ করে নাই। অল্পবয়সে শ্বশুর বাড়ী আনিলে নবোঢ়া বালিকাকে উত্তমরূপে শিখাইয়া পতিগৃহের উপযুক্ত গৃহিণী করিয়া লওয়া যায়। বুড়ো ময়না কি পোষ মানিতে চাহে? পরের খাঁচায় আসিয়া অহার অস্থির প্রাণটা কেবল উড়ু উড়ু করে—কিছুতেই তাহার মন বসে না। সেইরূপ অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রীলোকের মনে পতিগৃহের নূতন শিক্ষা-সংস্কারের ছাপ ভালরূপ পড়ে না। কাজেই পরের ঘরকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে তাহার অনেক সময় লাগে। বাল্যে বিবাহিতা বালিকার মনে তখন হইতে স্বামীর ছবি—স্বামীর ধ্যান ও ভজন দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইত। বাজারে, নটো-নভেলী ভাব সমুদায় তাহার তরল মনে চিত্রিত হইত না। সে তখন হইতে কায়মনোবাক্যে যথার্থ পতি-পরায়ণা সতী সহধর্ম্মিণী হইয়া, পরম সুখ ও সন্তোষের সহিত গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসার করিত। কোন বিষয়ে স্বৈরিণী বা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া স্বামীর মনে অসুখ ও অশান্তি উৎপাদন করিত না। এই আদর্শ গৃহী ও গৃহিণীর প্রেম ও শান্তিময় পবিত্র সংসার একবার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করুন।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

কন্যাকেও বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিতে ও সুশিক্ষা দিতে হইবে। নারী-জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যেন সে বিবাহের পূর্ব্বেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে। নচেৎ খেলাঘর হইতে একটী মেয়ে তুলিয়া আনিয়া তাহার মুখে ঘোমটা দিয়া পিঁড়িতে বসাইয়া সাত পাক দিলেই যে সে একটা সংসারের বহু দায়িত্বপূর্ণ গৃহিণী হইতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও কুফলদায়ক। তবে যে তাহাকে রাত্রি জাগিয়া, চব্বিশ ঘণ্টা ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দে নোট মুখস্থ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করতঃ জলমার্কা লইতেই হইবে এমনও নহে। আমাদের দেশে সুনীতি ও ধর্ম্ম-ভাণ্ডার অফুরন্ত। এই নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে—গুরুজনের উপদেশ, ভারত-রামায়ণ, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, ভূয়োদর্শন জনিত অভিজ্ঞতা প্রভৃতি হইতে। কিছু কিছু হিসাব, সন্তানপালন, ব্যবহারিক শিল্পচাতুরী প্রভৃতি গৃহিণীপনা আত্মীয় স্বজন ও প্রতি-বেশীর নিকট হইতে শিখিতে পারে। শিক্ষা লইতে হইলেই যে নারীকে স্কুলকলেজে পড়িতে হইবে, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে বাজারে নোট মুখস্থ করিয়া, রাত্রি জাগিয়া ও অন্যান্য বহু কারণে পাঠদশায় স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করতঃ উপাধি লইবার চেষ্টা করিলেই পরিণামে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, দৃষ্টিহীনতা ও চিররুগ্নতা অবশ্যম্ভাবী। ঈদৃশ শিক্ষিত রোগিণীগণ সমাজের কি কল্যাণ সাধন করিতে পারেন? প্রত্যেক নারীর নিকট হইতে দেশ চাহে—প্রথমতঃ বলিষ্ঠ ও নীরোগ সন্তান। তা'র পর অন্য কথা। নচেৎ শুধু উচ্চশিক্ষিতা, সুদীর্ঘ উপাধিধারিণী, ভাবময়ী, কুসুমপেলবা পোষাকী মহিলা হইতে কুল, সমাজ ও দেশের কি উপ-কার হইল?

নর ও নারী লইয়াই মানব সমাজ। এই সমাজকে সুস্থ ও শান্তিময় করিতে হইলে, মানবকে নীরোগ ও নির্ম্মল হইতে হইবে। পুরুষ—পবিত্র, সংযমী, ভূদেব হইলে তবে আশা করা যায়, তাহার নিত্য সহচরী অর্দ্ধাঙ্গিনীও সর্ব্বতোভাবে স্বামী-চরিত্রের অনুকরণ করিয়া প্রেমময়ী সুশীলা জগৎপালিনী দেবী হইবে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে বড় ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল—হিন্দুধর্ম্ম অতি কঠোর নিয়মে শাসিত হইত। অত কঠিন ছিল বলিয়াই আজও কত যুগের কত ধাক্কা খাইয়াও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় নাই। তবে আর বোধ হয় বেশী দিন টিকে না। হিন্দুজাতি বড় শীঘ্র ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—পতঙ্গের ন্যায় বর্ত্তমান সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোকে ঝাঁপ দিয়াছে। হায়, বুঝি অচিরে ভস্মীভূত হইয়া যায়। আজ সংযমের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে বলিয়া দেশে এত অধিক ধাতুদৌর্ব্বল্য, মেধাহীনতা, শুক্রতারল্য, জননেন্দ্রিয় ও শ্বাসযন্ত্রের ব্যারাম—যথা মেহ, প্রমেহ, উপদংশ, কাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি সমূহ প্রবেশ করিয়া সমাজের প্রাণ—জাতির মর্ম্মস্থল দিন দিন ফোঁপরা করিয়া ফেলিতেছে ইহা কি দেশীয় সাহিত্যরথীদিগের বিবেচ্য নহে? অনেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আক্ষেপ করেন—"মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা পাঁচটীও যক্ষ্মারোগী পাইতাম না; এখন শত রোগীর মধ্যে পঁচিশজনের দেহে শুক্র ও শ্বাসযন্ত্রঘটিত কুৎসিত অসাধ্য রোগ দেখিতে পাই।" ইহার কারণ কি? আমার বিশ্বাস—

—অর্দ্ধাসন—বসনক্লিষ্ট ক্ষীণ পুরুষপ্রকৃতির অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা, সুনীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, রঙ্গালয়ের কুরুচিপোষক অর্থশোষক চরিত্রহীনকারী নাট্যাভিনয়, তরুণতরুণীর চিত্তাকর্ষক আপাতমধুর পরিণাম বিষময় কামোদ্দীপক গল্প সাহিত্য, স্বেচ্ছাচারিতা. লজ্জাভয়হীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি দেশের দৈহিক ও নৈতিক অবনতির মূল কারণ। অধুনা ইংরাজী স্কুলের চতুর্থশ্রেণী হইতে তরল মতি অনভিজ্ঞ বালকগণ ধর্ম্মপথে পরিচালিত না হওয়ায় কুসংসর্গে মিশিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতে থাকে; অবলা বালিকাগণও দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই অসংযত কামুক নিষ্ঠুর স্বামীর হাতে পড়িয়া, রাত জাগিয়া, অশন বসন প্রভৃতি বিষয়ে বহুক্লেশ সহিয়া, কাঁচা বয়সে কতকগুলি দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

অনেক ভদ্র মহিলাকে প্রায় প্রতিবর্ষ সূতিকাগারে থাকিতে হয়। যেন তাঁহাদিগকে বৎসর বৎসর সন্তান দিতে হইবে। এমন ঘন ঘন গর্ভ হইলে সন্তানও নেংটে ইন্দুরের মত ছোট হয়, আর প্রসূতিও হাঁপ ছাড়িতে পায় না। একটী বাচ্ছার দাঁত উঠিবার পূর্ব্বেই আবার প্রসবের সময় উপস্থিত। কোন কোন শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিয়াছি—"আমার প্রথম পত্নীর অকাল মৃত্যুর কারণ—ঘন ঘন সন্তান প্রসব।" ইহাতে দোষ কাহার? পুরুষ যদি মিতব্যয়ী ও সংযতেন্দ্রিয় হয়, তাহার সহধর্ম্মিণী নিশ্চয়ই স্বামীর আচরণ অনুকরণ করিবে। আমাদের দেশে চিরদিনই এই প্রবাদ আছে—"অবলা কুলবালার বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।" কামালু অবিবেকী লম্পট পুরুষ যে নির্লজ্জও নির্ম্মমভাবে দুর্ব্বলা সরলা রমণীর প্রতি অনেক সময় অসদ্ ব্যবহার করেন, ইহা ঘোর কলির সপত্নীক সংসারী জীবমাত্রই মনে মনে বেশ জানেন। আমাদের দেশে, স্ত্রীলোকের প্রতি সম্যক্ যত্ন নাই—শতকরা ৫ জন মহিলা ঘৃত দুগ্ধ খাইতে পায় কিনা জানি না; গৃহস্থ বাড়ীর পুরুষগুলিকে উত্তমরূপে খাওয়াইয়া যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট যাহা থাকে উহাতেই তাহাদিগকে উদর পূর্ণ করিতে হয়। শাক সবজি, খাড়া, বড়ী, থোড় প্রভৃতি খাইয়া কোন গতিকে জীবন ধারণ করে। অথচ এই স্বল্পাশনক্লিষ্ট, অযত্ন পালিত নারীকেই যাবতীয় গৃহকর্ম্ম করিতে হইবে এবং বৎসরে বৎসরে বাচ্ছাও দিতে হইবে। কাজেই আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে কামিনীগণ নানাবিধ রোগে ভুগিয়া অকালে মরিয়া যায়। তাহাদের না আছে দেহের বিশ্রাম—না আছে মনের সুখ। পেটভরিয়া পুষ্টিকর আহার্য্য পায় না, বসন ভূষণেরও সাধ মিটেনা, অথচ গুরু জনের গঞ্জনা প্রভৃতি অসুখে অনেক গৃহলক্ষ্মী তুষানলে দগ্ধ হইয়া যখন মরিয়া যায়, তখন তাহাদের হাড় জুড়ায়। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান, নারীর প্রতি যত্ন যে দেশে নাই, সে দেশে কখনও বলিষ্ঠ পুত্রকন্যা হয় না। প্রসূতিকে বুক পুরিয়া না খাওয়াইলে, সম্যক্ স্নেহাদর না করিলে সে কি উত্তম বাচ্ছা দিতে পারে? ফাঁকি দিয়া ছানা বাহির করিতে গেলেই ধাড়াকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—নর নারী উভয়ে উভয়ের পূর্ণতা বিধান করিতেছে। শুধু নরেও

সংসার চলেনা, আবার নারীও নরবিহনে অসম্পূর্ণ। নরনারীর পবিত্র মিলনে পৃথিবী সুন্দর জনপদে সুশোভিত হয়। সহধর্ম্মিণী নরের নিত্য সহচরী জগৎ পালিনী দেবী—কামুক পুরুষের ক্ষণিক ইন্দ্রিয় লিপ্সা চরিতার্থ করিবার যন্ত্র বিশেষ নহে।

শিক্ষায় মানবকে এমন্ পশুর অধম করিয়া ফেলে কেন ? বৃষ ও গোপত্নীর যোগ্য কাল উপস্থিত না হইলে তাহারা সহবাস করে না এবং গাভী গর্ভবতী হইলে আর তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহে না। ছাগমেষও এ বিষয়ে 'কামান্ধ মানব অপেক্ষা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির পূর্ণ যৌবন না হইলে তাহারা স্ত্রী সঙ্গম করে না—কিম্বা অন্তর্ব্বত্নী হইলে তাহাকে আর স্পর্শও করে না। 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান' কেবল সভ্যতাভিমানী শিক্ষাদৃপ্ত আত্মম্ভরি মানবের মধ্যেই দেখিতে পাই। ভুয়োদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ জনিত অভিজ্ঞতা হইতে বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—'কলির অমিমৃশ্যকারী অহমিকাপূর্ণ, নাস্তিক নর ব্যতীত আর সব প্রাণীই সহবাস বিষয়ে মানব অপেক্ষা অধিকতর সাবধান, পরিমিত ও ও সংযমী'। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেও যেন মানব ছাড়া অপর সকলেই শুক্রক্ষয়কে মহাপাতক বলিয়া জ্ঞান করে। সে জন্ম তাহারা নিষ্ফল রতিবিলাস দ্বারা অযথা জীবন ব্যয় করতঃ শীঘ্র শীঘ্র আয়ুর্ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলে না। অদূরদর্শী মানব কেবল উদ্দাম যৌবনে অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলে—বার্দ্ধক্যের আশ্রয়, শেষের সম্বল স্বরূপ কিছুই সঞ্চয় করে না। সুতরাং পঞ্চাশ পার হইতে না হইতেই যখন জরা আসিয়া দেখা দেয়, তখন সেই অমিতব্যয়ী একেবারে ভীতিবিহ্বল ও হতাশ হইয়া পড়ে। তখন সে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখে—"তাহার কিছুই নাই, জীবনকোষ শূন্য; দেহে শক্তি নাই, মনে বল নাই, প্রাণে আশা নাই, প্রেম নাই, আনন্দ নাই, এক মহাশ্মশান—নীরস বিশুষ্ক মরুপ্রায় অন্তর খেদে, শোকে, দুঃখে ধূ ধূ জ্বলিতেছে। সে সব ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে—রিপুর বশে চলিয়া শেষের ভাবনা মোটে ভাবে নাই—কিছু রাখে নাই।" তখন তাহার আস্তিক বুদ্ধি আসে, বিষয়-মদের উৎকট নেশা ছুটিয়া যায় এবং চিত্তে অনুক্ষণ অনুশোচনার তীব্র দংশন-জ্বালা অনুভব করে। তখন আর সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে ব্যঙ্গ করে না, আপনা হইতে ভক্তি-ভরে মাথা নোয়াইয়া পড়ে; গৈরিক বসন পরিধান, আতপ অন্নভোজন, সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী, গীতা, গোবিন্দ প্রভৃতি হিন্দুর অবশ্য করণীয় জপ পূজাদিতে আগ্রহবান্ হয়; তখন তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হয়, হিন্দু ধর্ম্মের সব সত্য, এক বর্ণও মিথ্যা নহে। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়—"ভগবান্ আমার সহস্র পাপ—কোটী অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—দীনবন্ধু পতিতপাবন কৃপাপূর্ব্বক পতিতোদ্ধার করিবেন, ইত্যাদি"। তখন সে সম্যক্ বুঝিতে পারে—যৌবনে কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় পাশবিকবেগে—আসুরিক বলে উন্মত্ত হইয়া যে পথে চলিয়াছিলাম—উহা নরকের সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত পথ—স্বর্গের সোপান নহে। সে তখন তাহার ত্রিতাপদগ্ধ শেষ জীবনে ধর্ম্ম বারি সেচনে পুনরায় যথাসাধ্য সুখময় করিতে চেষ্টিত হয়। তখন তাহার ঠেকিয়া শিখিয়া,

জলিয়া-পুড়িয়া এই জ্ঞান হয়—"ধর্ম্মহীন কর্ম্মে মানবকে সুখী করিতে পারে না; সত্ত্ব রজের সুমধুর সমন্বয় সাধিত হইলেই পৃথিবীতে আবার প্রেম, আনন্দ ও শান্তি ফিরিয়া আসিবে; ধর্ম্ম কর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলনে ভূতলে আবার এক নব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

জিহ্বা ও উপস্থের ক্ষণিক সুখের লালসায় উন্মত্ত হইয়া জীব ইষ্টানিষ্টবোধ হারাইয়াছে। বিষয়ানলে পুড়িয়া ছারখার হইবে—ইহাই যেন তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প। তাই আজ মানব সর্ব্বদা মহাবেগে ধাবমান, তাহার গতি রোধ করিবার সাধ্য কাহার? রজোগুণের বৃদ্ধিতে রাজসিক পান ভোজনে শরীর অহোরাত্র গরম আগুন হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক আহার-বিহার ব্যতীত দেহমন কখনই শীতল হয় না। যাহারা রেলপথে দূরদেশে ভ্রমণকালে ৪।৫ দিন বাষ্পীয় শকটে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শরীর কিরূপ শুষ্ক, রুক্ষ ও অসুস্থ হয়। দারুণ জীবন-সংগ্রামে যাহারা লড়িতেছে, দারিদ্র্য, দুঃখ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতিতে তাহাদের মনে সুখ নাই—প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, দেহে বিশ্রাম নাই—কেবল ছুটাছুটি, দৌড়া-দৌড়ি—কেবল খাসবায়। ওই বুঝি ট্রেণ ধরিতে পারিলাম না, চাকরী গেল; ওই আজ স্নান হইল না, আফিসে যাইবার সময় হইয়াছে, হয়ত দুই গ্রাস অন্ন মুখে দিয়াই ছুটিতে হইল। এই যে ভয়ানক ছুট—এই যে অবিরাম গতি, এই যে প্রাণঘাতিকা দুশ্চিন্তা, ইহার কি কোন ফল নাই। কার্য্য হইলেই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। এই যে দিবারাত্র পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অমুক লোক্যালে কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া শেষ রাত্রিতে স্নানাহার, ভীষণ চিকিৎসা দ্বারা প্রবল জরাক্রান্ত কেরাণী বাবুর চাকরীর খাতিরে চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য লাভ প্রভৃতি প্রকৃতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার অপরিহার্য্য ফল—বায়ুপিত্ত কফের বিকৃতি-বৈষম্য ও তজ্জনিত অজীর্ণ, অম্ল ও রক্তপিত্ত, রক্তামাশয় অর্শ, বাত প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতের অধিকাংশ রোগ বায়ুপিত্ত কফের প্রকোপ হইতে উৎপন্ন। ইহার উপর বর্ত্তমান সভ্যতার তীব্রগতি ও বেগ সাহচর্য্যে উত্তাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় মানবদেহ আর ঠাণ্ডা হইতে পায় না। প্রাকৃতিক উত্তাপের সহিত কৃত্রিম উত্তাপের যোগ হওয়ায় আমাদের শরীর কামারে হাপরের ন্যায় সর্ব্বদা গরম আগুন হইয়া আছে! ভারতের গরম আর হাওয়ায় লোকের মাথা পেট একটু গরম হইয়া থাকে, তদুপরি গরম চা, কোকো, বিলাতী জিরেন রস, ঔদ্ধত্যবিকাশিনী গরম শিক্ষা, রেলগাড়ী ষ্টিমার ও হোটেলে গরম পাউরুটী-বিস্কুট-বিড়ি-সিগারেট, গরম মাংস, আলুর চপ ও হাঁসের ডিম, গরম পাঁপর, সিঙ্গেড়া, কচুরি, জেলাপী, ঝুড়ি-ভাজা প্রভৃতি গরম খাদ্য খাইয়া, ধূমধূলিপূর্ণ কোলাহল আকুলিত সহরে গিয়া, আপিসে আট ঘণ্টা বদ্ধঘরে গরম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গরম চক্ষুর অধীনে কলম পিশিয়া, নীরস ও ক্লান্তদেহে পুনশ্চ লোক্যালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ঠাকুরেবাবু যখন রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস করেন, তখন তাঁহার সারাদিনের অনিয়মে উত্তপ্ত দেহটা আরও গরম না হইয়া কি হিমানী সদৃশ শীতল হয়? কখনই নহে। 'বিষে বিষক্ষয়' নীতির বহু ব্যতিক্রম আছে। ইহা সকল স্থলে খাটে না। যদি বাঁচিতে চাও,

জিহ্বা ও উপস্থকে সংযত কর, আহার বিহারে মিতাচারী হও, এবং সর্ব্বদা মনে রাখিও "আমার বাড়ী গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে অবস্থিত; আমার দেহ মন ভারতের আবহাওয়ায় গঠিত; হিমমণ্ডলের গরম আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিলেই আরও গরম হইয়া আমার অকাল মৃত্যু ঘটিবে।" যাহার গরম লাগিয়াছে—তাহাকে ঠাণ্ডা কর; যাহার শীত লাগিয়াছে—তাহার উত্তাপ আবশ্যক—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম—খোদার ব্যবস্থা। খোদার উপর চাল চালিতে গেলেই মরিতে হইবে। ভারতের নর নারীকে সাত্বিক আহার বিহারে—পরিমিত পান ভোজনে জীবনকে সুশীতল করিতে হইবে। ইহাই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের দীর্ঘায়ু লাভের গূঢ় রহস্য।

আমাদের ভোজে দেওয়া হয়—প্রথমে পিত্তনাশক শুক্ত, শেষে বায়ুনাশক শৈত্য কারক দধি। বৈশাখ মাসে আমাদের দেশে ঠাকুরের শীতল ভোগ হয়—ঠাকুর ঘরে 'গ্রীষ্ম-কালে গরম চা, হালুয়া, পাঁউরুটী-বিস্কুট প্রভৃতি গরম খাদ্য বোধ হয় এখনও প্রবেশ করে নাই। প্রচণ্ড রৌদ্রে এখনও আমরা ডাবের জল, বেলের সরবৎ, মিছরী-চিনির পানা প্রভৃতি শৈত্যকর পানীয় ব্যবহার করিয়া উত্তপ্ত দেহ শীতল করি। ইহাই ভারত প্রকৃতির স্বাভাবিকী তীব্র আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিলেই অকালে মরিতে হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য। ফল কথা, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"। ইহাই যেন আমাদের মূলমন্ত্র হয়। শয়নে স্বপনে-জাগরণে—সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বত্র যেন শরীরের প্রতি যত্ন করিতে বিস্মৃত না হই। চাকরী না করিলে অনেকের উপায় নাই, কিন্তু পরের দাসত্বে যেন সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-দেহ অকালে হেলায় না নষ্ট হয়। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিবেন—অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কোথাও নাই। তবে সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় সুসভ্য মানব আমরা, কেন অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া জগতে দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিব? স্বাস্থ্য—স্বপ্নপ্রাপ্ত দৈব্য-বস্তু নহে। উহা আকাশ হইতে পড়ে না বা আকস্মিক ঘটনা নহে। স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন তপস্যার ফল—সাধনার ধন। 'যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন?

পাঁচের প্রভাব।

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

[৫]

নিবিড় নীরব নিভৃত অন্তঃপুরে নিদ্রাহীন কণ্টকশয্যায় শুইয়া—আমি পুস্তক পড়িতে-ছিলাম।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বরী পরিয়া—নক্ষত্রমালিনী নবযৌবনা নিশাসুন্দরী অভিসারে আসিয়াছেন। আমার

মাথার কাছে, একটা "ক্যাণ্ডেল ষ্টিক" জ্বলিতেছিল। অসাবধান ভৃত্যের হাতে—তাহার কাচ নির্ম্মিত "ডুমের" কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সেই রন্ধ্র পথ দিয়া দগ্ধবর্ত্তিকার পিঙ্গল ধূম ধীরে ধীরে বাহির হইতেছিল। মনে হইতেছিল—এ যেন আমারই ব্যাধিখিন্নক্লিষ্ট জীবনেরই ঈষৎ ধূম্র আভাষ।

এবার আমার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চন্দননগর—চাঁপাতলার চিন্তাশীল চিকিৎসক চূড়ামণি, বন্ধুবর ডাক্তার রাজেন্দ্র-মোহন নন্দী, আমার ভাবীমঙ্গলের জন্য আমাকে রোগী দেখিতে ও লেখাপড়া করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন। প্রথম আদেশটা আমি শান্তসুশীল বালকের মত এতদিন পালন করিয়া আসিতেছি; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় শাসনটী আমার পক্ষে নির্ব্বাসিত শাসনের ন্যায়ই কঠোর! ডাক্তার ভায়া আমার রোগ বুঝিয়াছেন—মনের দুঃখ তো বুঝেন নাই! তিনি বারণ করিয়াছেন—"বই পড়িও না"—আমি যে না পড়িয়া থাকিতে পারি না! তাই তাঁহাকে লুকাইয়া আমি লঘুসাহিত্যের একটু আলোচনা করি। বঙ্গ সাহিত্যই যে আমার হৃদয়ের বল, মনের আশা, আত্মার আনন্দ, জীবনের সর্ব্বস্ব। আমি অকিঞ্চন, অধম, অভাজন। আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, নাম নাই, উপাধি নাই, যশ নাই, কীর্ত্তি নাই, অর্থ নাই, কৃতিত্ব নাই; আছে কেবল জীর্ণদেহে কণ্ঠাগত প্রাণ,—আর সেই প্রাণের পরতে পরতে মাতৃভাষার উপর অসীম শ্রদ্ধা। আমি যে হীনবেশে দীন মূর্ত্তিতে ক্ষীণশক্তি লইয়া চিরদিন মাতৃভাষার সেবা করিতেছি। আমার দর্প-দম্ভ-পরিচয়ের শ্লাঘা—সমস্তই সেই মাতৃপূজার জগৎ জোড়া আকাঙ্ক্ষা। মাতৃভাষাই আমার স্বস্তি-শান্তি—আরাধনা। ডাক্তারের মুখের কথায় আমি কি বুকের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারি? নিদারুণ রোগের জ্বালা ভুলিবার জন্যই আমি পুস্তক পড়িতেছিলাম; পুস্তকখানির নাম—'কবির গান।"

একথা শুনিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই হয় তো শিহরিয়া উঠিবেন! কেন না বাবুদের বিশ্বাস—কবির গান জীবন্ত খেউড়! শিক্ষিত সমাজে—কবির গান ঘৃণিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত! তাহার কেন্দ্র—জঘন্য ইন্দ্রিয় লালসাময়ী পরকীয়া নায়িকা। সুতরাং 'কবির গান' ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্ম সুখে কুণ্ঠিত এবং অশ্লীলতায় অপবিত্র। এই বিরাগে—এই অবজ্ঞায়—কবির দল এতদিন বটতলায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন! হায়, সুরুচিসিক্ত সভ্যতা! তোমারই অলঙ্ঘ্য প্রতাপে—সোণার বাঙ্গালায় "কথকতা" উঠিয়া গিয়াছে, "চণ্ডী"-"রামায়ণ" লোপ পাইতে বসিয়াছে, "মান-মাথুর" নেড়ানেড়ির কুঁড়োজালিতে আত্ম-গোপন করিয়াছে! যাত্রা—"অপেরা" হইয়াছে, বড় লোকের বৈঠকখানায় আর কলাবিৎ কালোয়াৎ স্থান পায় না—সে আসন লীলা-চতুরা-চারুহাসিনীর দল কাড়িয়া লইয়াছে।

পুরাতন আজ পদদলিত, প্রাচীন অনুষ্ঠান—ইতিহাসের কুক্ষিগত! এখন দৈবাৎ কেহ কোন সৎকর্ম্ম করিলে সর্ব্বগ্রাসী সংবাদপত্রে তাহার জয় ঘোষিত হয়! এখন—দেশের উন্নতি, বরপণ নিবারণ, জল কষ্ট দূর—সমস্তই বক্তৃতায়! দরখাস্তে—দুর্ভিক্ষের প্রতিকার, ভিক্ষুক ভিক্ষা পায় 'সাবক্লপসনে'; কবিরাজের

আহ্বান রোগীর মৃত্যুকালে! এমনি নূতনের মোহ! এত বড় বিরাট জাতি- সর্ব্বশূন্য—আত্মভোলা!

"পুরাতনের" স্মৃতি অক্ষয় রাখিবার জন্য, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র শেষ জীবনে "হিন্দু সমিতির" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারই অমূল্য উপদেশে আমরা প্রাচীন অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা হারাই নাই। বিবর্ণ হউক, দুর্গন্ধ হউক, শত আবর্জ্জনায় আবিল হউক, আমরা—"পুরাতনকে" পুরাতন ঘৃতের মতই উপকারী মনে করি। তাই তোমাদের এই "নূতন খেলার দিনে"—উপেক্ষিত "কবির গান" রোমন্থন করিতেছিলাম। একদিন কবির বীণায় বিশ্বগ্রাসী বাসনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। দূরশ্রুত বন্যা কল্লোলের মত আমার কাণে সে সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। ভাব প্রধান ভারতবর্ষ—কল্পনার ধ্যানে পরমানন্দ পাইয়া—এক বিরহিণীর বিচিত্র বেদনার স্তরে স্তরে নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া কবি গাহিয়াছিলেন—

এ বসন্তে সখি! পঞ্চ আমার কাল হ'ল জগতে।
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ
পঞ্চত্ব পাই বুঝি পঞ্চ বাণেতে॥
পঞ্চ যাতনা পায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে॥
যদি পঞ্চামৃত করি পান,
নাহি জুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ,
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম করেছিলেন যাঁর,
এখন সেই দহে—দেহ পঞ্চ শরেতে॥
পঞ্চাক্ষর নাম মকরধ্বজ, বিরহি রাজ্যে রাজন,
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হল পঞ্চজন,
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চ শর,
রাজা পঞ্চ শর, অঙ্গে হানে পঞ্চ শর,
তাহে উনপঞ্চাশত মলয় মারুত সই!
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চ যোগেতে॥
সই! গ্রহ প্রকাশিলে পঞ্চমে মঙ্গল,
ফুল ঘ্রাণ মন পঞ্চ বাণ,
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যা'র—
তা'র কিরণেতে জ্বলে প্রাণ;
পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার রাক্ষসের প্রধান,
তার চিতা সম জ্বলিছে সখি! পঞ্চ দুঃখেতে প্রাণ,
যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই,
পঞ্চ রিপু নাই, পঞ্চ সহকারী নাই,
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে
আমি থাকি যেন সখি! পঞ্চ তপেতে॥
সই! পঞ্চপাণ্ডবেরা খাণ্ডব কানন
জ্বালায়ে ছিল যেমন,
তেমতি এ দেহ জ্বালায় লো সখি!
বসন্তের চর পঞ্চজন;
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ ক'রে করিতে চাহি ভক্ষণ,
তাহে প্রতিবাদী হয় না আসি প্রতিবাসী
পঞ্চজন!
বলে, পঞ্চ রিপু গিয়েছে,
স'য়েছে, এ পঞ্চ ক'দিন আছে,
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহে না,
এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি, পঞ্চ ভাগেতে।

বিরহের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! পুষ্পিত যৌবনা নারী—চ'ক্ষে লালসাগ্নির শত জিহ্বা বিস্তার; বক্ষে তাহার বিস্ফারণ, সর্ব্বশরীরে তাহার কম্পন। সে কোন্ হতভাগ্য নিষ্ঠুর—যে এমন তত্ত্বদর্পিত হৃদয়া—সুন্দরীর দীপ্ত সোহাগ—অবহেলা করিতে পারিয়াছে? কবির মায়াময় প্রেম বৃন্দাবনে—এমনি রাতে একদিন যে কামনার হিন্দোল লাগিয়াছিল, তাহারই ঢেউ এই যুগযুগান্ত পরে আমার হিয়ার উপর

আঘাত করিতে লাগিল। আমার চিত্তও আজ সেই সাহসিকা রাধার মত—ভাবমধুর কালিন্দীকূলের নীলশাখায় ঝুলনা বাঁধিবার জন্য হঠাৎ যেন অভিসার যাত্রা করিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—সংখ্যা দশক মধ্য স্থূলবাসী পাঁচকে (৫) লইয়া কবি তো বিরহিণীর বসন্ত-বিকার বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ঐ অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি 'পাঁচ' নাই কোথায়? পাঁচের প্রভাব যে সর্ব্বত্র! পাঁচ আছে বলিয়াই সংসার আছে। পাঁচে সৃষ্টি, পাঁচে স্থিতি, পাঁচেই লয়—ইহা যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। পাঁচ লইয়াই এ প্রপঞ্চময় জগত কল্পনা। সংসারের সর্ব্বস্ব—পাঁচ। হিন্দুর মত পাঁচের মহিমা বুঝিয়াছে কে? আজ আমি পাঁচের প্রভাব পাঠক মহাশয়ের কাছে প্রকাশ করিব।

প্রথমে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথাই পাড়া যাউক্। আমরা ভারতবাসী—আমাদের জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য—ধর্ম্মার্জ্জন। তাই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যঋষিগণ স্বস্ব-রচিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে—পাঁচের গৌরব ষোল আনা প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুর সাধের গ্রন্থ "পুরাণ" পঞ্চলক্ষণ যুক্ত। হিন্দুর মহাযজ্ঞের সংখ্যা পাঁচটী—পাঠ, হোম, বলি, তর্পণ, অতিথিসেবা। হিন্দু গৃহীর যজ্ঞ ও পাঁচটী—ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ও নৃ-যজ্ঞ।

আমাদের উপাসক সম্প্রদায় সৌর, শৈব, শাক্ত; বৈষ্ণব ও গাণপত্য—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের লক্ষ্য—সার্ষ্টী, সামীপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য ও সারূপ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি। মার্কণ্ডেয়, রৌহিণেয়, বট, কৃষ্ণ ও মহোদধি—আমাদের এই পাঁচটি তীর্থ। আমাদের সকল শুভকার্য্যের সূচনায় গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী—এই পঞ্চ কন্যা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া। যিনি শাক্ত—মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন ও মৎস্য—তিনি এই পঞ্চ 'ম'কারের ভক্ত; যিনি বৈষ্ণব—তিনি "রাস পঞ্চাধ্যায়ে" আসক্ত। "নারদ পঞ্চরাত্র" এবং "পঞ্চদশী" হিন্দুর প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক। হিন্দু দেবতাকে—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনী, এই "পঞ্চামৃত" দিয়া পরিতুষ্ট করেন; গোময়, গোমূত্র, দধি; দুগ্ধ এবং ঘৃত—এহ পঞ্চগব্য হিন্দুর পক্ষে সর্ব্ব-শুদ্ধি বিধায়ক। আমাদের ব্রাহ্মণ "পঞ্চপ্রদীপে" দেবদেবীর আরতি; করেন; আমাদের বৈদিক কার্য্য—অশ্বত্থ, আম্র, বট, পাকুড় ও উডুম্বর;—তান্ত্রিক কার্য্যে—আম্র, পনস, অশ্বত্থ, বট ও বকুল; এই পঞ্চ পল্লবের প্রয়োজন। ধান্য, মুদগ, তিল, যব ও শ্বেত সর্ষপ—এই পঞ্চ শস্য আমাদের সকল শুভ কার্য্যে, ব্যবহৃত হয়। জপ, হোম, তর্পণ, স্নান ও বিপ্র-ভোজন পুরশ্চরণের পাঁচটী অঙ্গ।

আমরা হিন্দু—অবতারবাদী, ভগবান আমাদের দেশে অনেকবার অবতার হইয়াছিলেন। সেই অবতার তত্ত্বে পাঁচের মহিমা পূর্ণ প্রকটিত। ত্রেতায় রামের কথা স্মরণ করুন। দাশরথি—পিতৃসত্য পালনের জন্য সানুজ সস্ত্রীক "পঞ্চবটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রজাগণের মন রক্ষার জন্য পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতা দেবীকে বনে পাঠাইয়াছিলেন। ইহারই নাম "রামায়ণ"। 'মহাভারতের" মতে —পঞ্চ পাণ্ডব ও পাঞ্চালীকে লইয়া তাঁহার দ্বাপর লীলা। কুরুক্ষেত্রে—'পাঞ্চজন্য" শাঁখ

বাজাইয়া—তিনি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারত তাই "পঞ্চমবেদ"।

গ্রহাচার্য্যের মতে—রত্ন পাচটী। কনক, হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ ও মুক্তা। গ্রহ-পীড়া প্রশমনের জন্য এই পঞ্চরত্ন ধারণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাকরণেও দেখুন পাঁচের প্রভাব। "বর্ণমালা"—পাচটী বর্গে বিভক্ত; এক একটী বর্গ আবার পাচটী করিয়া বর্ণ লইয়া পরিকল্পিত। পদ পাঁচ প্রকার—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া

আলঙ্কারিক বলেন—যতি, গতি, লালিত্য, শব্দ ও ভাব এই পাঁচটি লইয়াই "কাব্য"। উপনিষদে নচিকেতা ভিক্ষাপান "পঞ্চাগ্নি"।

ভূগোল শাস্ত্রেও—ঐ পাঁচ। এসিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি পঞ্চ মহাদেশ। উত্তর সাগরাদি পঞ্চ মহাসাগর (Zones); ইরাবতী চন্দ্রভাগাদি – পঞ্চনদ।

ইতিহাসেও পাঁচের প্রভাব অক্ষুন্ন-আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের অনুচর রূপে মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ—এই বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সম্রাট আরংজেবের সভায় উপস্থিত হইয়া ছত্রপতি শিবাজীর লাভ হইয়াছিল—"পাঁচ" হাজারী মনসুব দারী!"

এইবার আয়ুর্ব্বেদের পালা। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও পাঁচের প্রভাব কম নয়! ক্ষিতি অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূতে —আমাদের দেহ নির্ম্মিত। সেই দেহ আবার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান —এই পঞ্চ পবনে সঞ্জীবিত; পাচক, রঞ্জক, সাধক, ভ্রাজক ও আলোচক এই পঞ্চবিধ পিত্তের দ্বারা পালিত এবং ক্লেদক, অবলম্বক, রসন, স্নেহন ও শ্লেষ্মণ নামক পঞ্চ কফের সাহায্যে পরিচালিত। শুধু ইহাই নহে। আমাদের শরীরে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী—শোত্র, নেত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক; কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটী—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। মানব দেহের মূল কারণ যে "আত্মা"—তাহাও অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষে আবৃত। শরীরের নাশ মৃত্যু—তাহার নাম "পঞ্চত্ব প্রাপ্তি"।

মানুষের প্রধান সত্ত্বা—মন, গর্ভস্থ ভ্রূণ—পঞ্চম মাসে সেই মনের অধিকারী হইয়া থাকে। ভ্রূণের ভাবী শুভ কামনায় গৃহস্থ পাঁচ মাসে গর্ভিণীকে পঞ্চামৃত খাওয়ান। সূতিকা-গৃহের প্রথম শুদ্ধিবিধানের নাম—"পাঁচুট"।

জীব দেহে—ইচ্ছা পাঁচ প্রকার, মানুষের শরীরে যে রোগ হয়—তাহাও পাঁচ ভাগে বিভক্ত—যথা;—স্বাভাবিক, দোষজ, কর্ম্মজ, কুলজ ও আগন্তুক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গ পাঁচটী—রোগী, বৈদ্য, ঔষধ, পথ্য এবং ধন। রোগনাশক ক্রিয়া পাঁচটী—বমন, বিরেচনাদি "পঞ্চ কর্ম্ম"। চিকিৎসকের দোষও পাঁচটী—'কুচেল' (মলিন বস্ত্র পরিধান কারী) 'কর্কশ' (দুর্মুখ) 'স্তব্ধ' (কুড়ে), 'গ্রামিণ' (লোকের সঙ্গে ব্যবহার অনভিজ্ঞ) এবং 'স্বয়মাগত' (যিনি রোগীর গৃহে আপনা হইতে উপস্থিত হন),—এই পঞ্চবৈদ্য ধন্বন্তরির মত হইলেও—সমাজে তাহাদের আদর হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ নির্ণয়ের প্রধান সাধন ৫টী—নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক—বিষম জ্বর এই ৫

প্রকার। জঠরাগ্নি বিকার ৫টী—অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা। বিসূচিকা রোগের ৫টী ভয়ঙ্কর উপদ্রব—নিদ্রানাশ, অরতি, কম্প, মূত্রাঘাত ও সংজ্ঞা হীনতা। বৃদ্ধব্যক্তির অতিসার রোগে—শ্বাস, শূল, পিপাসা, ক্ষীণতা ও দৌর্ব্বল্য—এই ৫টী, উপসর্গ উপস্থিত হইলে সে আর বাঁচে না। পুরীষজ কৃমি ৫ প্রকার—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য এবং লেলিহ। পাণ্ডুরোগ ৫ প্রকার; গুল্ম রোগ ৫ প্রকার। গুল্মের অবস্থিতি স্থানও ৫টী—উভয় পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি হৃদ্রোগ ৫ প্রকার, নাড়ীব্রণ ৫ প্রকার ভগন্দর ৫ প্রকার; ভগন্দর হইতে—বায়ু, মূত্র, পুরীষ, কৃমি ও শুক্র এই ৫টী পদার্থ নির্গত হইলে তাহা আর আরোগ্য হয় না। উপদংশ রোগ, জিহ্বা রোগ, স্তন বিদ্রধি এবং মসূরিকা ৫ প্রকার। রক্ত পিত্তরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে ৫টী লক্ষণ উপস্থিত হয়—সদন (অবসন্নতা) শীতকামিত্ব (শৈত্যাভিলাষ) কণ্ঠধূমায়ন (কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি) বমি ও লৌহগন্ধি নিশ্বাস।

অরুচি, হিক্কা, শ্বাস, ছর্দ্দি ও কাস রোগ—৫ প্রকার। কাস রোগ জন্মে ৫টী কারণে। অরুচির উৎপত্তিও ৫টি কারণে যক্ষ্মারোগে—শুক্রাক্ষ, অন্নদ্বেষ, ঊর্দ্ধশ্বাস, মূত্র কৃচ্ছ্র এবং শুক্রক্ষরণ এই পাঁচটী লক্ষণের প্রত্যেকটী অসাধ্য।

ক্রুদ্ধ, ভীত, তৃষ্ণার্ত্ত, শোকার্ত্ত ও বুভুক্ষিত—এই ৫ রকম অবস্থায় মদ্য পান করা নিষিদ্ধ।

মূল, ত্বক, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল—বৃক্ষের অঙ্গ এই ৫টী। রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব—এই ৫টী—দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কষায় কল্পনাও ৫টী।

আরও দেখুন—কবিরাজ মহাশয়গণ—কথায় কথায় রোগীকে পাচনের ব্যবস্থা দেন। 'পঞ্চ লবণ" "পঞ্চতন্ত্র" "পঞ্চপল্লব" 'পঞ্চতিক্ত" "পঞ্চপিত্ত" "পঞ্চনিম্ব" "পঞ্চকোল" "পঞ্চমূল" "পঞ্চমুষ্টিক" "পঞ্চ জীরক গুড়" "পঞ্চামৃত পর্পটী" "পঞ্চানন রস" 'পঞ্চতৃণ" প্রভৃতি—কবিরাজী মতে মহৌষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনারা অনুসন্ধান করিলে, আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বত্র—এইরূপ পাঁচের প্রভাব দেখিতে পাইবেন।

সাপের "পাঁচপা" দেখিলে নাকি বড় লোক হওয়া যায়!

পাঁচই সংসারের সেরা। একটু নমুনা দেখাই;—

তপস্যার সেরা—"পঞ্চতপা", তাপসের সেরা—পঞ্চানন; তীর্থের সেরা পঞ্চক্রোশী কাশী, হরিভক্তের সেরা—পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব। জবা ও রুদ্রাক্ষের সেরা—"পঞ্চমুখী"। তিথির সেরা "বসন্ত পঞ্চমী", সুরের সেরা পঞ্চম সুর; তালের সেরা 'পঞ্চম সোয়ারী। রংএর সেরা 'পঞ্চ রং"। মস্‌লার সেরা—পাঁচফোড়ন। নেশার সেরা—পাঁচটী,—মদ, সিদ্ধি, তামাক, গাঁজা ও আফিং। পণ্ডিতের সেরা—ত্রিবেণীর ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। রাজার সেরা 'পঞ্চম জর্জ্জ"! যানের সেরা—ইলেকট্রিক ট্রাম—ভাড়া নগদ পাঁচ পয়সা!!*

---

* ইহা অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুবাজার হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত যাত্রীগণের জন্য। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বেশী।

সাহিত্যের আসরেও পাঁচ বড় বিখ্যাত। হাস্যরসে বিখ্যাত বিলাতি Punch ও স্বদেশী "পঞ্চানন্দ"? সংবাদ পত্রে বিখ্যাত—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়; ডিটেক্‌টিভ গল্পে বিখ্যাত পাঁচকড়ি দে। শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদে বিখ্যাত—ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। বিজয় মজুমদার বিখ্যাত—'পঞ্চক মালায়', হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত "পঞ্চপুষ্পে", রাধাজীবন রায় বিখ্যাত—"পাঁচ ফুলের সাজিতে।"

পাঁচের আদর সকলেরই কাছে! "পাচালীর" আদর সেকালের বুড়াদের কাছে; পঞ্চাঙ্ক নাটকের আদর একালের যুবকযুবতীর কাছে। "হাতের পাঁচের' আদর—পাকা তাস খেলোয়াড়ের কাছে। খেলার জয়চিহ্ন—যে 'পঞ্জা'—তাহাও পাঁচটী ফোঁটা মাত্র।

হিমালয় হইতে আসিয়া আর্য্যগণ প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—পঞ্চাপ প্রদেশে, (পঞ্জাব)। বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী সংগ্রহের খরচ—পাঁচসিকা! নববধূ সহস্র সুন্দরী হউক, প্রতিবেশীর কাছে সে "পাঁচ পাচী"।

পাঁচকে অনেক সময় ভয় করিয়াও চলিতে হয়। ধার্ম্মিক ভয় করেন পঞ্চ মহাপাতক কে? সূতিকা গৃহে শিশুজননীর ভয়—"পেঁচোয় পাওয়াকে"। প্রবাসী পুরুষ ও বিরহিণী নারীর ভয় কন্দর্প ঠাকুরের পঞ্চশরকে, সহরের রাস্তায় কাহারও কাহারও ভয়—পাঁচ আইনকে।

এই পাঁচ আবার অনেকেরই ভরসা। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর ভরসা—"পঞ্চতন্ত্র" দার্শনিকের ভরসা—"ব্যাপ্তি পঞ্চক"। উৎপীড়িতের ভরসা—পাঁচজন ভদ্রলোক। মৃত বৎসার ভরসা—পাঁচুঠাকুর। ঝড়তুফানে বাঙ্গাল মাঝীর ভরসা—দরিয়ার পাঁচপীর। পীরের ভরসা—সওয়া পাঁচ আনার সিন্নী। পল্লীগ্রাম বাসীর ভরসা—পঞ্চায়েৎ। আর অধমের ভরসা—

"শিবে! তোমার ও পদ রাজীবে,
স্থান দিও মা দয়াময়ি!
আমার পাঁচে পাঁচে যে দিন মিশিবে।"

দম্পতী জীবন।

—:o—

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ]

আসন্ন প্রসবকাল ও তাৎকালীন কর্ত্তব্য।

প্রসব কালে গর্ভিণীর এই সকল চিহ্ন প্রকাশ হয়। যথা শরীরের ক্লান্তি, মুখের ম্লান ভাব (মুখ শুখাইয়া যাওয়া) চক্ষুর শিথিলতা, বক্ষের বাঁধন যেন খুলিয়া গিয়াছে; এইরূপ বোধ, পেট নীচু হইয়া পড়া, নিম্ন শরীরের ভারবোধ, কুঁচকি স্থান, তলপেট, কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে সূচী দ্বারা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, যোনিস্রাব ও অরুচি। এই সমস্ত লক্ষণের পরই

প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, ও জল ভাঙ্গিতে থাকে, যখন গর্ভিণীর মনে হইবে যেন সন্তান হৃদয় হইতে খুলিয়া উদরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। যেন বস্তির নিকট পৌছিয়াছে, এবং অতিশয় বেদনা উপস্থিত হইবে, সেই সময় গর্ভিণী কুন্থন করিবে। প্রসব বেদনা না আসিলে কুন্থন করিতে নাই। প্রসব বেদনা না হইতে যে গর্ভিণী কুন্থন করে, তাহার সন্তান বিকৃত হয়, এবং শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও প্লীহা রোগ যুক্ত হয়।

বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে ভূমির উপর কোমল শয্যা পাতিয়া তাহাতে শয়ন করাইয়া তাহার কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নিতম্বদেশ, তলপেট প্রভৃতি স্থানে পরিচারিকাগণ ঈষদুষ্ণ তৈল মাখাইয়া আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিবে। এবং নানাবিধ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ পূর্ণ বাক্য বলিয়া গর্ভিণীকে সান্ত্বনা করিবে। যদি গর্ভিণী প্রসব বেদনায় কষ্ট পাইতে থাকে। অথবা প্রসব না হয়, তাহা হইলে তাহাকে উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে বলিবে, এবং হাই (জৃম্ভা) তুলিতে বলিবে। সে সময়ে গর্ভিণীকে কুড়, এলাচ, লাঙ্গুলীয়া, বচ, চিতামূল ও করঞ্জ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য দিবে। মধ্যে মধ্যে ভূর্জ্জপত্র অথবা শিশু কাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করাইবে।

একলাদি মূল, ঈশলাঙ্গুলা, বাসকমূল, ও আপাংমূল (চটপটের মূল), ইহাদের যে কোন একটী ভাল করিয়া বাঁটিয়া নাভি, তল পেট ও যোনিদেশে লেপন দিলে সুখে সন্তান প্রসব হয়।

কলসা ও শালিপানির মূল একত্র বাঁটিয়া ঐরূপে লেপন দিলে ও সন্তান প্রসব হয়।

এক হাত এক পায়ে রাখাল শঁসার মূল অথবা সুবর্চ্চলা ধারণ করিলে বিশেষ ফল হয়।

এক সিকি ঝুল, আমানি সহ পান করিলে সুখে সন্তান প্রসব হয়।

টাবলেবুর মূল, ও যষ্টিমধু চূর্ণ করিয়া সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া, তাহা ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে সন্তান প্রসব হয়।

হিং ও সৈন্ধব করণ, আমানি সহ পান করিলে গর্ভাশূল দূর হয়।

ফুল।

সন্তান প্রসব হওয়ার পর ফুল পড়িয়াছে কি না, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, ফুল না পড়িলে প্রসূতির নাভির উপরে দক্ষিণ হস্ত এবং বামহস্ত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া বলের সহিত চাপিয়া ধরিয়া কাঁপাইতে হয়।

অঙ্গুলীতে চুল জড়াইয়া তাহার দ্বারা গলদেশ ঘর্ষণ করিলে ফুল পড়িয়া থাকে।

লাঙ্গুলিয়ার মূল বাঁটিয়া হাত ও পায়ের তলে লেপন দিলে ফুল পড়ে।

তিক্তলাউ, সাপের খোলস, ঘোষাফল, শ্বেত সর্ষপ—এই সকল দ্রব্য পিষিয়া কিঞ্চিৎ সরিসার তৈল মাখাইয়া তাহার দ্বারা যোনি দেশে ধূম দিলে ফুল পড়ে।

ফুল পড়িবার জন্য কুলথ কলায়ের কাথে কুড় ও তালিশ পত্রের চূর্ণ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়।

মাথার তালুতে সীজের আঠা দিলে ফুল পড়ে। মদের সহিত শালগাছের মূল চূর্ণ অথবা পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, গোল মরিচ, গজ পিপ্পলী, রেণুকা, এলাচ, যমানী ইন্দ্রযব আকনাদি, জীরা, মরিচ, নিম,

কল, হিং, বামন হাটীর মূল, মুর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটকী এই সমুদয় চূর্ণ খাইলে ফুল পড়িয়া যায়।

সদ্যোজাত সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য।

সদ্যোজাত সন্তানের কর্ণের নিকট দুই খণ্ড প্রস্তর সংঘট্টন দ্বারা শব্দ করিতে হয় এবং শীত কালে উষ্ণ জল ও গ্রীষ্মকালে শীতল জল দিয়া আস্তে আস্তে মুখ সিক্ত করিতে হয়। ইহাতে প্রসব জন্য পরিশ্রম-ক্লেশ দূর হইয়া শিশুর বল সংরক্ষিত হয়, কর্ণের নিকট ঐরূপ শব্দ করার জন্য সত্বর চৈতন্য উদয় হয়। প্রসব হওয়ার পর সন্তান যদি কোন রূপ চেষ্টাশূন্য হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ তাহার জ্ঞান বা শরীরের ক্রিয়া না জন্মে, ততক্ষণ কাশ ঘাস নির্ম্মিত কুলা, তালের পাখা, অথবা কুলের বা নিমের শাখার পাখা বাঁধিয়া তাহার দ্বারা আস্তে আস্তে বাতাস করিবে। এইরূপ করিলে শিশুর শরীরে বল সঞ্চার ও চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে, ক্রমে শিশু প্রকৃতিস্থ হইলে নাড়ী কাটিয়া তাহাকে স্নান করাইবে এবং তাহার মলদ্বার ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে। পরিচারিকা নিজের নখ উত্তম রূপে কাটিবে, যেন বালকের অঙ্গ মুছাইতে বা ধুইতে গিয়া নখে ছিঁড়িয়া না যায়। খুব পাতলা নেকড়া কিম্বা বিশুদ্ধ কার্পাসের তুলা দ্বারা প্রথমে মুখ পরিষ্কার রূপে মুছাইয়া, পরে তালু ওষ্ঠদেশ ও গলা মুছাইয়া দিবে, এবং জিহ্বা পরিষ্কার করিয়া দিবে। তাহার পর কার্পাসের তুলায় ঘৃত অথবা তৈল ভিজাইয়া তাহার দ্বারা শিশুর তালু ঢাকিয়া রাখিবে। এই সময়ে আয়ুর্ব্বেদে সুবর্ণভস্ম, মধু ও ঘৃত দিয়া শিশুকে ভক্ষণ করাইবার বিধি আছে। তাহাতে শিশুর আয়ু, মেধা ও বল বর্দ্ধিত হয়। কেবল মধু ও ঘৃত লেহন করাইলেও উপকার হইয়া থাকে। (মধু ও ঘৃত সমান ভাগে লইতে নাই, যৎকিঞ্চিৎ ঘৃত এবং মধু তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় লইতে হয়)।

পরিচারিকাগণ নিজেরা শুচিভাবে থাকিয়া প্রসূতি ও শিশুর শুশ্রূষা করিবে, প্রসূতি ও শিশুকে মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়া সতত পবিত্র ভাবে রাখিতে হইবে। পরিচারিকা এবং প্রসূতির অপবিত্রতা, শিশুর অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য শিশু অনেক সময়ে গ্রহগণ কর্ত্তৃক আবিষ্ট হয়। নব্য সমাজ বালক-আক্রমনকারী এই গ্রহ উপদেবতা বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করেন কি না জানি না। কিন্তু শাস্ত্রে এই সকল গ্রহগণের সংবাদ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রহগণ হইতে বালককে রক্ষা করিবার জন্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এখনও অনেককে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। যথা আঁতুর ঘরের চালে কুল বা খদির বৃক্ষের শাখা সংস্থাপন করা। গৃহের চারিদিকে সরিসা, ময়লা ও চাউলের কণা ছড়াইয়া দেওয়া, আঁতুর ঘরের দ্বারদেশে লৌহের কুঠার, ছিঁড়া জাল, মই প্রভৃতি স্থাপন করা, বচ, কুড, হিং, সরিসা, মসিনা, রসুন ও অন্যান্য রক্ষোঘ্ন দ্রব্যের পুটুলী বাঁধিয়া আঁতুর ঘরের উত্তর দিকের চৌকাটে বাঁধিয়া রাখা, এবং ঐ সকল দ্রব্যের ক্ষুদ্র পুটুলী, সূতিকা ও শিশুর কণ্ঠে বাঁধিয়া দেওয়া, সূতিকাগারে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা ইত্যাদি।

(নাড়ী ছেদন বিধি)।

নাভি-মূল হইতে আট অঙ্গুলি পরিমিত বাদ দিয়া নাড়ী ছেদন করিতে হয়, যে স্থান ছেদন করিতে হইবে, সেই স্থানের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে চিহ্ন দিয়া, এবং আট অঙ্গুলি ছাড়িয়া সূত্র দিয়া সূত্র দ্বারা নাড়ী বাঁধিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য বা লৌহ নির্ম্মিত ছুরিকা দ্বারা নাড়ী ছেদন করিবে। আজ কাল আমাদের দেশে বাঁশের নীল দ্বারা নাড়ী কাটিতে দেখা যায়, তাহাতে কোন রূপ বিঘ্ন ঘটে না, নাড়ী ভালরূপে ছেদন না হইলে শিশুর উত্তুণ্ডিকা প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধি জন্মিতে পারে, এইজন্য অতি সাবধানে, নাড়ী ছেদন করিবে, নাড়ী ছেদনের পর নাড়ী বদ্ধ সূত্রটী শিশুর গলায় আল্‌গা আল্‌গা বাঁধিয়া দিবে।

নাভি যদি শুষ্ক না হইয়া পচিয়া যায়, তাহা হইলে লোধছাল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমান ভাগে মিশাইয়া সেই চূর্ণ তৈল সহ, মিশ্রিত করতঃ নাভিতে লেপন করিতে হয়। ক্রমশঃ

চরিত্র ও স্বাস্থ্য।

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্বনিধি, এম, এ]

—:o:—

ক্ষীণদেহ কঙ্কালসার ব্যক্তিরও ধনাগমের সহিত স্বাস্থ্যলাভ হইতে দেখা যায়। তাই কবি গাহিয়াছেন—"দারিদ্র দোষো গুণরাশী নাশী"। ইংরাজী ভাষায় অর্থের নামান্তর "silver tonic" বা "রাজত রসায়ন"। বাঙ্গালার রসিক কবিও বলিয়াছেন —"সার বস্তু, চাকী, আর সব ফাঁকি।" ইহা চর্ব্ব্য. চুষ্য, লেহ্য, পেয় বা অন্য কোনও রূপে ভোজ্য নহে অথচ ইহার এমন একটা আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, ইহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ করে। যাঁহার এই সুধা আছে, তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। আবার এই রৌপ্যখণ্ডের শ্রবণ-মাদক ঝঙ্কার শুনিয়া ইংরাজ কবি বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"Money, money, money !
Brighter than sunshine,
Sweeter than honey !

ইহার রূপও অপরূপ, নয়নের অমৃতাঞ্জন বোধ হয় ইহাই। দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে ইহার যেরূপ সমাদর, তাহাতে "টাকা দেখলে কাঠের ময়ূরে হা-করে"—কথাটাকে কোনোরূপে দোষাবহ অত্যুক্তি বলিতে ইচ্ছা হয় না। সেইজন্যই এ জগতে সকলেই পয়সার পক্ষপাতী। যাহার পয়সা নাই—তাহার আদর করে কে? একালের কথা ছাড়িয়া দিয়া যে যুগে আমাদের

দেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল—সে যুগেও ছিল একই কথা ;—

"যস্যার্থা স্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্যবান্ধবা।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ সাহপণ্ডিতঃ॥

টাকার এই মোহিনী শক্তির মূল কারণ কি? ইহার দর্শন বা স্পর্শে এমন কি শক্তি আছে—যাহাতে শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করে? পদার্থের দিক দিয়া ইহার এ প্রকার কোনও বৈদ্যুতিক শক্তি আছে কি না—তাহার বিচার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ধুরন্ধর পণ্ডিতেরা করিবেন। আমি যখন সে রসে বঞ্চিত - তখন আমার সে বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করাই শোভন। তবে আমি কেন এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়া লেখনী সঞ্চালন করিতে বসিয়াছি—তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাই। সেটা সন্তোষজনক হইবে কি না তাহার বিচার করিবেন সহৃদয় পাঠকগণ।

আমার মাথায় এই খেলিতেছে যে, টাকা জিনিসটার একটা অলৌকিক শক্তি আছে। ঐহিক বা লৌকিক পদার্থ সমূহের একটা ধর্ম্ম এই যে, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আসিয়া দেহ ও মনের উপরি প্রভাববান্ হয়। কিন্তু টাকা জিনিসটা সেরূপ নহে। রসগোল্লা রসনেন্দ্রিয়ের তোষামোদ দ্বারা দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, তার পর দেহের ও মনের ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধন করে। কমনীয় করস্পর্শ বা মধুময় গলহস্ত এই উপায়েই আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়তায় দেহ মনকে অভিভূত করিতে পারে। সৌম্যমূর্ত্তি শরৎশশধর সেইরূপ নয়নের সাহায্যে দেহ ও মনকে আকর্ষণ করে। শ্রবণ তর্পণ সঙ্গীত বা রাষভের কর্কশ শব্দ বিষয়েও সেই এক কথা, ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অভিন্ন উপায়ে কুসুম সৌরভ বা ক্লোরোফরম গন্ধ নাসিকার সাহায্যে দেহ ও মনকে অভিভূত করে। আমাদের দেহটা যেন একটা পঞ্চ-দ্বার রাজ-প্রাসাদ; মন তাহার রাজা। মনের নিকট কিছু আবেদন করিতে হইলে এই প্রাসাদের একটা দ্বার দিয়া প্রাসাদ মধ্যস্থিত মনের নিকট যাইতে হয়। কিন্তু টাকা জিনিসটাতে এ লৌকিক ধর্ম্ম নাই। ইহা প্রথমেই মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তা'র পর মনের প্রভাবে দেহ প্রভাবান্বিত হয়। অর্থাৎ ইহার প্রভাব প্রথমেই মনের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করে। তা'র পর মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতার জন্য দেহও সুস্থতা বা অসুস্থতা প্রাপ্ত হয়।

একটু মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ না করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে না। মন ও শরীর লইয়া মানুষ। মনের অসুখে শরীরের অসুখ এবং শরীরের অসুখে মনের অসুখ হয়। কিন্তু শরীর ও মনের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান একবার বিচার করিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, মনই শরীর অপেক্ষা বড়। মন আছে বলিয়াই মানব—মানব। মন ধাতু হইতেই মানব, মানুষ বা মনুষ্য শব্দ। মনেররোগ হইলে শরীরের এমন সাধ্য নাই যে, আহারাদির দ্বারা মনকে সুস্থ করে। মানসিক শোক হইতে নানা রোগের উৎপত্তি হয়। আবার মানসিক সুস্থতা হইতে সামান্য সামান্য শারীরিক অসুস্থতা দূর হয়।

মনের কার্য্য হইল চিন্তা করা। মন ধাতুর অর্থও তাহাই। সুতরাং চিন্তা লইয়াই মন। চিন্তা আবার দ্বিবিধ; সচ্চিন্তা ও দুশ্চিন্তা। ইংরাজীতে এই দুই প্রকার চিন্তার নাম "Positive thoughts" এবং "negative

thoughts" সচ্চিন্তা বা positive thoughts আয়ুর্বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধি করে এবং দুশ্চিন্তা বা negative thoughts আয়ুহরণ ও স্বাস্থ্যনাশ করে। মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে যে সকল psychic reseraeh society প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মতই হইল ইহাই। তাঁহারা বলেন-মন সুস্থ থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিবেই। আর মন সুস্থ রাখিবার একমাত্র উপায় মনের মধ্যে সচ্চিন্তার বাহুল্য এবং দুশ্চিন্তার অভাব। ইহারা আরও বলেন যে, মনের মধ্যে যদি দুশ্চিন্তা মোটেই না থাকে এবং মন যদি কেবলমাত্র সচ্চিন্তার আধার হয়, তাহা হইলে নশ্বর মানব অমর হইতে পারে। কিন্তু কে সে ভাগ্যবান্ যে, এ সংসারে আসিয়া দুশ্চিন্তা এড়াইয়া থাকিতে পারে? ইহারা বলেন যে, আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে যে মুনি ঋষি বাস করিতেন, তাঁহাদের দীর্ঘজীবন যাঁহারা কবিকল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা জানেননা যে, তাঁহাদের চিত্তে দুশ্চিন্তার স্থান ছিলনা। সেকালে আর্য্যগণের চারিবর্ণের মধ্যে বুদ্ধি ও জ্ঞানে মুনিগণই অগ্রণী ছিলেন বলিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহারা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ক্ষত্রিয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া তপোবনে বাস করিতেন কেন? ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—দুশ্চিন্তা পরিহার। সংসারে বাস ও দুশ্চিন্তা পরিহার একসঙ্গে হয় না। সংসার মানেই দুশ্চিন্তার বন্ধন। এখানে দুশ্চিন্তার সংখ্যা নাই। অন্নচিন্তা ও ঋণচিন্তা যাঁহার নাই এমন সংসারী লোক নিশ্চিতই ভাগ্যবান্। তাই অর্থের এরূপ অলৌকিক শক্তি। তাই অর্থবান্ লোক স্বাস্থ্যবান্।

দুশ্চিন্তা ও সচ্চিন্তা শব্দের অর্থটা একটু পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দময় তাহাই সচ্চিন্তা। সত্যভাষণ, মিথ্যার পরিহার, ভগবচ্চিন্তা, নির্লিপ্ত জ্ঞান চর্চ্চা—এই সব সচ্চিন্তা। যাহা ইহার প্রতিকূল তাহাই দুশ্চিন্তা। ঈর্ষা, ঘৃণা, লজ্জা, ভীতি প্রভৃতি নানাপ্রকারের মানসিক চাঞ্চল্যই দুশ্চিন্তা। এক কথায় নির্ভীকতাই সচ্চিন্তা ও ভীরুতাই দুশ্চিন্তা। কিন্তু এরূপ সরল বিশ্লেষণ মূলক সচ্চিন্তা বা দুশ্চিন্তা সংসারে বিরল। সংসারে যাহা আছে, যাহা লইয়া মানব মন ভারাক্রান্ত, তাহার প্রকৃতি অতি জটিল। সে হিসাবে ধরিতে গেলে বলিতে হইবে অর্থই অনর্থের মূল। অর্থে সংসারী লোকের দুশ্চিন্তা কতকটা দূর করে বটে, কিন্তু প্রকৃত সচ্চিন্তা দিয়া মনের স্বাস্থ্য আনিতে পারে না। কারণ ইহা হইতে লোভ নামক এক ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার উৎপত্তি হয়। তাই জ্ঞানের অবতার-ভূত মুনিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতেন। রাজ্যশ্রী ও বিষয় বৈভব ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতেন। কিন্তু এই দারিদ্র্যের ভিতর থাকিত আসল মনুষ্যত্ব, বাসনা-হীনতা। তাঁহারা অষ্ট প্রহর সচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, মন তাঁহাদের অলৌকিক ভোজ্যে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট হইত। তাই ঐহিক শক্তির প্রধান মালিক রাজা—মুনিকে ভয় করিতেন, সম্মান করিতেন। দৈহিক শক্তি—মানসিক শক্তির নিকট মাথা নোয়াইত, মানসিক শক্তির ভয়ে বিহ্বল হইত, মনের বলে বলীয়ান্ ঋষিগণ ইহলোকের রাজশক্তিকে নিতান্তই উপেক্ষা

করিতেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে 'বৃষল' বা 'শূদ্র' নামেই সম্বোধন করিতেন। অবনত মস্তকে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের আদেশ পালন করিতেন।

সচ্চিন্তা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। সচ্চিন্তার সহিত কোনও প্রকার ভয় বা সঙ্কোচ থাকে না। কিন্তু দুশ্চিন্তার সহিত ভয় বা সঙ্কোচ থাকিবেই থাকিবে। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় পাপীর চিত্তে ও দুশ্চিন্তা শল্যতীক্ষ্ণ ছিল। দুশ্চিন্তায় মনকে বিদ্ধ করে বলিয়া মনের বল থাকে না। সুতরাং মনের বল অর্জ্জন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই দুশ্চিন্তা বর্জ্জন আবশ্যক। আবার দুশ্চিন্তায় যেমন মনের বল নাশ করে, সচ্চিন্তায় সেইরূপ মনের বল বাড়ায়। সুতরাং মনের বল অভিপ্রেত হইলে দুশ্চিন্তা বর্জ্জনও সচ্চিন্তার সমাদর চাই। অর্থাৎ অন্য কথায় বলিতে গেলে চরিত্রের বলই মনের বল। যাহার চরিত্র আছে তাহার মনের বল আছে। চরিত্রহীনের মনে বল নাই; তাহার স্বাস্থ্যও নাই, আয়ুও নাই। সংসারী লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তাই প্রবল চিন্তা। সেই চিন্তা কতক পরিমাণে দূর করে অর্থ। তাই অর্থে চিত্তপ্রসাদ আনয়ন করে। তাহার ফলে অর্থবান্ লোক স্বাস্থ্যবান্ হয়। কিন্তু চরিত্রের বল না থাকিলে কেবল মাত্র অর্থের বলে মনের বল আশানুরূপ হয় না। নের বলের প্রধান ভিত্তি চরিত্র। সচ্চরিত্র দরিদ্র ব্যক্তিও লোকের ভয় ও ভক্তির পাত্র। এবং তাহার মন পবিত্রতার রসায়নে পরিপূর্ণ বলিয়া ব্যাধি সহজে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

আমরা যখন পূজার্চ্চনা বা ধর্ম্মচর্চ্চা করি, তখন আমাদের মনের মধ্যে একটা অলৌকিক আনন্দ অনুভব করি। সে আনন্দের তুলনা বোধ হয় আর নাই। কারণ কেবল মাত্র সেই সময়ে আমরা সংসারের জটিলতা হইতে দূরে থাকিয়া ভগবানের সহিত কথোপকথন করি। আর তাহার ফলে আমাদের দেহে স্বর্গীয় লাবণ্য বিকসিত হয়। অবশ্য যে ব্যক্তি মালা টিপিতে টিপিতে খাতকের সুদের হিসাব করে, তাহার ধর্ম্ম চর্চ্চায় ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশী। আমরা সেরূপ ধর্ম্মচর্চ্চাকে ধর্ম্মচর্চ্চা বলিতেই পারি না। সেটা অধর্ম্ম-চর্চ্চার চরম নিদর্শন। ধর্ম্মচর্চ্চা কাজটা অত সহজসাধ্য নহে। ইহা শিখিবার ও সাধনা করিবার বিষয়। বিনা সাধনায় ফল ফলে না। সেকালে আমাদের বালকগণের শিক্ষার সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়া থাকিত। তাই তাঁহাদের এত মনের বল ছিল, তাই তাঁহারা ত্যাগ ও কামনাহীনতায় তৃপ্ত হইতে শিখিতেন। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর দোষ কোথায়?—একথা যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি সর্ব্বপ্রথমেই ধর্ম্মচর্চ্চার অভাবের উল্লেখ করিব। পরধর্ম্মী রাজা বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন না বলিয়া আমরা যে ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান ভুলিয়া ধর্ম্মবিহীন পশুর সমান হইয়া পড়িতেছি—ইহার জন্য দোষারোপ আমি বিদেশী রাজশক্তির উপর করিতে পারি না। সে দোষ আমাদের, আর আমাদের অভাবগ্রস্ত দুর্ব্বল সমাজের। আজ ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই বলিয়াই আমরা

চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে দিবার আরম্ভ, এবং চারিদণ্ড রাত্রি হইলে দিবার অবসান হয়। এই জন্য দিবাভাগ পঞ্চযামক, আর রাত্রি ত্রিযামা। তন্নিমিত্ত রজনীর শেষে চারি দণ্ডের পূর্ব্বেই তাঁহারা বিনিদ্র হইয়া শৌচাদিকার্য্য সমাধা করিতেন। এই প্রকারে অহরহ প্রাতরুত্থান তাঁহাদিগের অভ্যস্ত ছিল বলিয়া, তাঁহাদের শৌর্য্য, বীর্য্যও দীর্ঘায়ুর কথা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে।

এতদ্দেশেও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বেড়াইলে গাত্রে বীরবায়ু সংলগ্ন হয়; তাহাতে মনুষ্য অমিতবলশালী ও পুরুষায়ুষজীবী হইয়া থাকে।

একজন অশীতিবর্ষীয় প্রাচীন লোক আমাকে বলিয়াছিলেন, প্রভাতে হনুমান ঠাকুর লঙ্কা হইতে কদলী বনে গমন করেন, এবং মধ্যাহ্নে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। তাঁহার যাত্রাকালের গাত্রবায়ু শরীরে স্পৃষ্ট হইলে মানব মহাতেজস্বী ও অমর হয়; আর তদীয় প্রত্যাবর্ত্তন কালীন বায়ু গাত্রে সংলগ্ন হইলে, মনুষ্য ব্যাধিগ্রস্ত ও ক্ষীণায়ু হইয়া থাকে।

এই কথাটির ভাবার্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া ইতস্ততঃ সংক্রমণে শরীর নীরোগ ও সুস্থ হইয়া থাকে; পরন্তু মধ্যাহ্নে রৌদ্রোত্তাপে পরিভ্রমণে অবশ্যই রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

আমরা পূর্ব্বে চাণক্যশ্লোকে দেখাইয়াছি যে, দিবা স্বাপ কিংবা প্রাতঃসংবেশ সত্যই আয়ুক্ষয়কারক। বাঙ্গালাতেও তদর্থবোধক একটি কবিতা আমাদের জানা আছে,—

সূর্য্য দেখে ঘুমাতে থাকে।
তারে নিতে তার ছেলেকে ডাকে॥

ইহার অর্থ এই—সূর্য্যদেব উদিত হইয়া যদি, কাহাকেও নিদ্রা যাইতে দেখেন; তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার পুত্রকে (যমকে) ডাকেন, অর্থাৎ দিবাকর উদিত হইয়া যদি দেখেন কোন ব্যক্তি ঘুমাইতেছে; অমনি তিনি নিজ পুত্রকে ডাকিয়া বলেন, 'ইহাকে লইয়া যাওত'; আর পৃথিবীতে রাখিওনা।

এই কথাটির ভাবার্থ এই যে, প্রাতস্বপনশীল ব্যক্তি কখনই প্রশস্ত জীবন লাভ করিতে পারে না। আর একটি প্রাচীন কবিতাও আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি,—

যে জন ঘুমায় দিনের বেলা।
ঘুচে যায় তার ভবের খেলা॥

এই কবিতারও ভাবার্থ এই যে, দিবা-নিদ্রাশীল ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন অসম্ভব।

দিবা নিদ্রা যে আয়ুর পক্ষে অহিতকারিণী, তাহার আর একটি শাস্ত্রীয় নিদর্শনও প্রদর্শন করিতেছি। ব্রাহ্মণ বালকগণের উপনয়ন কালে আচার্য্য বালককে বলেন—'মা দিবা স্বাপ্সীঃ' অর্থাৎ দিবা ভাগে নিদ্রা যাইও না। বালকও স্বীকার করে—'ওঁ বাঢম' যে আজ্ঞা, দিবসে নিদ্রা যাইব না। এস্থলেও স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে যে, বালককে এই রূপে প্রতিজ্ঞা পালনে আবদ্ধ করাইবার কারণ এই যে, অহঃস্বপন আয়ুষ্কালের সংস্থিতির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। তাহা হইলেই দেখুন দিবানিদ্রাভ্যস্ত বা প্রাতঃ স্বপনশীল ব্যক্তি কিরূপে পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্ত হইতে পারে।

গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার পুত্রগণ কেহ কখন ও দিবাভাগে

নিদ্রা যায় নাই, অথবা রাত্রিতেও দধি ভোজন করে নাই; কিংবা কেহ কখনও রজস্বলা বা গর্ভিণীতেও উপগত হয় নাই; তবে তাহাদের এইরূপে অকালে কালকবলিত হইবার কারণ কি?"

গান্ধারীর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন দ্বারা অবশ্যই বুঝা যাইতেছে যে, গুর্ব্বিনী গমন, রজস্বিনী সহবাস, দিবানিদ্রা ও রজনীতে দধি ভক্ষণ এই সমস্ত কার্য্য নিতান্তই আয়ুঃ ক্ষতিকারক।

ঋতুমতী-সম্ভোগের আরও নানাপ্রকার দোষের কথা বর্ণিত আছে। মনু লিখিয়াছেন:—

"নোপলচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপি স্ত্রিয়মার্ত্তবদর্শনে।"
ইহার অর্থ এই—রজোদর্শন হইলে, কামিনী-সংস্রব অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে।
পূর্ব্বোক্তরূপে নিষেধবাক্যের কারণ এই যে, প্রমদাগণের ঋতুর তিন দিবসের মধ্যে গর্ভোৎপত্তি হইলে, সেই সন্তান বিকলাঙ্গ ও অল্পায়ু হইয়া থাকে, তাহাতে এদিকে পুষ্পিতাগামী পুরুষেরও আয়ু ক্ষয় হয়।

মনু আরও লিখিয়াছেন:—
পুষ্পবতী নারীগমনে পুরুষের প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষু এবং আয়ুও নষ্ট নষ্ট হইয়া থাকে।

তবেই দেখুন, এই বিগর্হিত আচরণ দ্বারা পিতা ও পুত্র দুই পুরুষেরই মহানিষ্ট সাংসাধিত হইতেছে। পাঠকগণ এই সকল শাস্ত্রনির্দেশ নিরন্তর স্মরণ রাখিবেন।
অন্তঃসত্ত্বাগমনেও সন্তান অল্পায়ু হয়, বর্ত্তমান কালে যে Infantile leverএর স্রোত বহিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, অন্তর্বত্নী-সম্মিলনই ইহার প্রধান কারণ। আমাদের দেশে সসত্ত্বা যোষিদ্‌গণকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার যে প্রথা আছে—তাহা অতি উত্তম।

তৎকালে জামাতা শ্বশুর বাড়ী যাইলে শ্বশুর যদিও লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু আত্মহিতেচ্ছু ভর্ত্তার শাস্ত্রনির্দেশ স্মরণ করিয়া তাদৃশ সময়ে শ্বশুরালয় গমনে ক্ষান্ত থাকাই সৎপরামর্শ। গর্ভিণীগমন যে বহুদোষাস্পদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্র তাহা নানাপ্রকারে প্রতিপাদন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানকালে তৎ-সমুদায় শাস্ত্রনির্দেশের প্রতি এদেশের লোকের আর দৃক্‌পাতও দৃষ্ট হয় না। ইহার পরিণামও রোগশোক ও অকালমৃত্যু, তাহা ত নিরন্তরই আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আয়ুক্ষয়ের কারণ সামান্যতঃ পরিব্যক্ত হইল। ক্রমশঃ আমরা আয়ুবৃদ্ধির অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিব।

গোয়ালিয়া লতা।

(কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত এইচ, এল, এম, এস ।)

—:o:—

হংসপদী (Vitis Pedata) চলিত কথায় ইহাকে গোয়ালিয়া লতা বলিয়া থাকে।

ইহার আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাম ;—

হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা।

গোয়ালিয়া লতা দুই জাতীয়। বড় গোয়ালিয়া ও ছোট গোয়ালিয়া। বড় গোয়ালিয়া লতাকে এদেশীয় গোয়ালারা "গোঁড় গোবিন্দর" বলে। ইহার পত্রের আকৃতি হংসপদের ন্যায়। উভয় জাতীয় গোয়ালিয়া লতাই সমগুণীয়।

ইহার গুণ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে ;—

"হংসপদী, গুরু শীতা হন্তি রক্ত বিষব্রণান্। বিসর্প দাহাতীসার লুতা ভূতাগ্নি রোহিণী।" অর্থাৎ গোয়ালীয়া লতা, গুরুপাক শীতবীর্য্য এবং ইহা দ্বারা রক্তদোষ, বিষব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতীসার, মাকড়সার বিষ, ভূত দোষ, বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহের শান্তির জন্য ইহার মূল ব্যবহারের আদেশ আছে। কারণ আঘাত ও ব্রণ রোগাদি—মলিন গ্রহের কোপেই হইয়া থাকে।

নাড়ীব্রণ (Sinns) পৃষ্ঠব্রণ (Curbuncle) ও সর্ব্বপ্রকার দুষ্ট ক্ষতে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে আশ্চর্য্যরূপ ফল হইয়া থাকে।

বেদনাযুক্ত গ্রন্থিবৃদ্ধিতে ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি সত্বর উপকার হয়।

আঘাত জনিত বেদনা ও ফুলায় (Inflamation) বড় গোয়ালির মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। উক্ত মূলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ সোরা বাটিয়া দিলে অধিকতর উপকার হয়।

ছোট গোয়ালি পাতার স্থানীয় প্রয়োগে বিসর্প, দাহ, লুতাদি বিষ জনিত গরল সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়।

পশ্বাদির পা ভাঙ্গিলে ইহার স্থানীয় প্রয়োগে আশ্চর্য্য উপকার হয়।

আয়ুর্ব্বেদে নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ ও বিষাক্ত ক্ষতে হংসপদী তৈল ও হংসপদী ঘৃতের উল্লেখ আছে।

হংসপদী তৈল ;—

সর্ষপ তৈল ৴॥০ সের, জাতিপত্র, নিম্বপত্র ও গোয়ালির মূল মিলিত ৮ তোলা। একত্র সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়।

হংসপদীঘৃত।—গব্যঘৃত ৴॥০ আধসের, বড় গোয়ালীর মূল ৮ তোলা, একত্রে ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ঘৃত ছাঁকিয়া লইতে হয়।

দেহ পুষ্টির জন্য হংসপদী উত্তম রসায়ণ।

হংসপদীকল্প—(১) বড় গোয়ালির মূল—কাদা ও বস্ত্রখণ্ড দিয়া লেপিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে পুটদগ্ধ করিয়া, রাত্রে শিশিরে রাখিয়া দিবেন। ঐ মূল ৬ রতি মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে ।০ একসিকি চিনি সহ সেবন করিলে ক্ষয় রোগ নিবারণ হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন হয়। অভ্যাসানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়।

(২) বড় গোয়ালির মূল ৮ তোলা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবেন। তৎপরে চূর্ণ করিয়া ১৬ তোলা চিনি ও অল্প ঘৃত, মধু মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া ঐ মোদক ৵০ আনা মাত্রায় ঈষৎ গরম দুধের সঙ্গে প্রত্যহ ব্যবহার করিলে, প্রমেহ নষ্ট হইয়া দেহের ক্ষয় নিবারণ ও পুষ্টি সাধন করে। অভ্যাসানুযায়ী মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহা একটি সহজ সাধ্য ক্ষয়রোগ নাশক রসায়ণ।

রোগ-বিজ্ঞান।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য ব্যাকরণতীর্থ এইচ্-এম, বি।]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

অতঃপর জীবন কি—তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে। প্রাচীন দার্শনিক মহর্ষি কণাদ হইতে প্রতিচীন মহাত্মা ডল্টন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "পরমাণু এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতমজড় উপাদান। জড়—জগতের উপাদান,—কারণ পরমাণু পুঞ্জ সবিভাজ্য ও অবিনশ্বর বা নিত্য এবং নৈসর্গিক তাবৎ ব্যাপারের (যথা—মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝটিকা' ভূমিকম্প, প্রভৃতির) মূল, কিন্তু পরমাণু সকলের জড়ত্বের অপবাদ এখন অপনোদন হইতেছে। অধুনাতন পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বস্ত্র, ঘট,জল, বসন, বৃক্ষ, জীবদেহ প্রভৃতি পদার্থ মাত্রেই সূক্ষ্মকণায় গঠিত। এই সূক্ষ্ম কণিকার নাম অণু (Molecules)" কোটী কোটীটা অণুতে ১ ফোঁটা জল হয়। এই অণুর অণুকে পরমাণু (atoms) বলে। পদার্থ মাত্রেই অণুর সমষ্টি এবং অণুমাত্রেই পরমাণুর সমষ্টি। প্রসিদ্ধ প্রফেসর ল্যাবন বলেন—যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অতি সূক্ষ্ম প্রতিকণার ভিতরে এতশক্তি (enargy) রহিয়াছে যে, তাহারা বাহির হইতে শক্তি না পাইলেও আপনা হইতে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যখন কোন জড় বস্তু কোন কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার পরমাণুর এই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দেখা যায়। জড় বস্তু (matter) ও শক্তি (force) একই পদার্থের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। বৈজ্ঞানিক দিগের কথার ভাবে এই পর্য্যন্ত আভাস পাওয়া যায় যে, যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা বাস্তবিক জড় নহে। বঙ্গের অত্যুজ্জলরত্ন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—"জড়" শক্তির সঙ্ঘাত হইলে ও সেই শক্তি তাহাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, কেবল অবস্থাবিশেষে তাহা প্রকাশ পায়।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-পরীক্ষক অধ্যক্ষ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী—M. A. F. R. S. মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—......"পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ বুঝি আর কিছুই

নাই।" এখন দেখা যাইতেছে ... পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া টুকরা পাওয়া যাইতে পারে! এক এক টুক্‌রা আবার কত সূক্ষ্ম! ... এই কণিকা গুলির চাল ' চলন বড় অদ্ভুত। সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল চলা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য নহে। বস্তুত ইহারা তত্তুল্য বেগে অনেক সময় ছুটিয়া চলে। ... যে তাড়িৎ বা ইলেক্‌ট্রীসিটি-লইয়া মানুষে এই শত বৎসর ধরিয়া এত কারখানা করিতেছে, এখন দেখিতেছি জড় পরমাণুর এইসূক্ষ্ম কণিকা সেই তড়িতের সহিত অভিন্ন। ঐ সূক্ষ্ম কণিকাকে জড় বলিব কিনা তাহা বলাই দুষ্কর।... (প্রকৃতি—১৯০৯) লিভারপুলের ডাক্তার হেবার্ড (Hayward) সাহেব বলেন—"পরমাণুই জড় পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ" কিছু কাল পূর্ব্বে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু তাড়িৎ কণার সহিত তুলনায় এক একটী পরমাণু অতি প্রকাণ্ড—প্রত্যেক পরমাণুস্থ তাড়িতবিন্দু গুলির পরস্পর মধ্যে এত ব্যবধান বা আকাশ (অর্থাৎ শূন্য Space) পড়িয়া আছে। যে সৌর জগতের মহাকাশে নিজ নিজ কক্ষে প্রচণ্ড বেগে ভ্রাম্যমান গ্রহাদির ন্যায় উক্ত তাড়িৎ বিন্দুচয় অবাধে বিপুল বেগে ঐ পরমাণুর মধ্যেই আপন আপন কক্ষে নিয়ত আবর্ত্তন করিতেছে।"

বাঙ্গালা দেশের গৌরব বিশ্ব বিশ্রুতযশা বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু Kt.M.A D. Sc. ct. C. I. E., মহাশয়ের গবেষণাপূর্ণ Response in the Living and the Non Living নামক গ্রন্থ পাঠে যেন কতকটা আভাস পাওয়া যায় যে, জড়ে 'সাড়' বা বোধ (অর্থাৎ চেতনা শক্তি ও Sensitivity তেমনই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে ও অবস্থা বিশেষে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র।" বৈদান্তিকের পক্ষে এই তথ্য মোটেই নূতন নয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিতেছেন, হেকেল প্রমুখ মার্জ্জিত জড়াদ্বৈতবাদিগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন (vide ro Hoeckals Riddlle of the Uniner se PP ৫, 7, 86 এবং Wanders of life ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অনুপরমাণুতেই তিনটী গুণ বর্ত্তমান আছে—(১) ব্যাপ্তি (extensin), (২) বল (force) এবং সাড় বা অনুভূতি Sensation), বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একজন প্রধান নেতা আরেনিয়াস (Arrheniuos) সাহেবের মতে কোন দূর সজীব জ্যোতিষ্ক হইতে আদিম অতি সূক্ষ্ম জৈবীজ বিশ্বব্যাপী আলোকের চাপে চালিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের অন্যতম নেতা বেকেরেল (Beqeurel) সাহেব এই মতের প্রতিকূলে বলেন যে, ঐ আলোক তরঙ্গে এমন জীবাণুনাশক রশ্মি বর্ত্তমান আছে যে, তাহাতে উক্ত জীবাণু অঙ্কুর কখনই সজীব অবস্থায় পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে পারে না। আর উল্কাপিণ্ড বা আলোকের আঘাতে গ্রহান্তর হইতে জীবাণু-বীজ ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়া বা মহা শূন্যে জীবাণু বীজ ভাসিয়া বেড়ান"—মত মানিয়া লইলেও সহজে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, "উক্ত উল্কাপিণ্ডে বা গ্রহে বা অন্তরীক্ষে আদিম জীবাণু অঙ্কুর কিরূপ উদ্ভূত হইল? অর্থাৎ জীবাগম-সমস্যা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির মাপ কাঠির অতীত জড়বিজ্ঞান আজি ও মীমাংসা করিতে পারে নাই।

প্রাজ্ঞ রিকটার Richter সাহেব বলেন যে, মহাকাশের সর্ব্বত্রই অতি সূক্ষ্ম জীবাণু অঙ্কুরে পরিপূর্ণ; ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এই অঙ্কুর গুলি যথোপযুক্ত তাপ আদ্র্যাদি পাইলেই বর্দ্ধিত হয় ও কালক্রমে নানা লোকে নানা জীবরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে।'

এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই কৃমি দংশ-মশক-উৎকুণ-মৎকুণাদি প্রাণিগণ ক্লেদ হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইতেছে, তাই মহর্ষি মনু প্রভৃতি ইহাদিগকে স্বেদজ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। অন্ন ব্যঞ্জন দুগ্ধ দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য কয় দিন ফেলিয়া রাখিলে উহাতে "ছাতা ধরে" ও কিছুকাল পরে ঐ ছাতা ধরা জিনিষ পচিতে আরম্ভ হইলে উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পরিদৃষ্ট হয়। এই ছোট ছোট পোকা গুলি কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন কালের পণ্ডিত গণের ধারণা ছিল যে, এই কীটাণুচয় ঐ খাদ্য হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে—ক্রিমি কেঁচো কীটাদি পয়ঃপ্রণালী পুরিষাদিতে দৃষ্ট হয় সুতরাং ক্লেদ হইতেই জন্মে এই ধারণায় হয় ত তাঁহারা ইহাদিগকে "স্বেদজ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকিবেন, অর্থাৎ তাঁহারা "স্বতঃ জনন" (obiogenesis or Spamtaneous Generation, বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু রেডি, লীনওয়েল, হোয়েক, হেল্ম হোলৎজ্, পাষ্টেউর, টিণ্ডল, লিষ্টার প্রভৃতি লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য্যগণের ১৬৬০খৃঃ হইতে ১৮৬২খৃঃঅঃ পর্য্যন্ত প্রায় দ্বিশত বৎসরকাল ব্যাপী প্রভূত অধ্যবসায় ও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি সাহায্যে বহুবিধ কঠোর পরীক্ষার পর নিসংশয়রূপে নিরূপিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত কীটাদি স্বতঃজাত নহে—বায়ু তরঙ্গে ভাসমান ধূলিকণারূপী জীবাণু হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমরা ধূলা দেখিতে পাই, আচার্য্য টিণ্ডল পরম যত্নে নানা প্রকার পরীক্ষার পর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্ব্বব্যাপী এই ধূলি বাস্তবিক সর্ব্বাংশ ধূলি নহে, ইহার স্থূলভাগ ধূলিকণা ও সূক্ষ্মাংশ জৈব পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এই ধূলিকণারূপী অসংখ্য আনুবীক্ষণিক জীবাণু বীজ (Germs or bacilli) জল, স্থল, মরুৎ, ব্যোম ছাইয়া আছে, আমরা নিঃশ্বাস ও পানাহারসহ সহস্র সহস্র জীবাণু অহর্নিশ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিতেছি, ইহারাই ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, প্লেগ, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের মুখ্য কারণ ও বিস্তারক। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে জীবাণু এত প্রবল শক্তি সম্পন্ন যে, দেওয়ালের কোন স্থানে যক্ষ্মা-জীবাণু যুক্ত শ্লেষ্মা থাকার পর যদি সেই দেওয়ালের উপর চূণের কলি দেওয়া হয় এবং ২০ বৎসর পরে সেই চুণ খসিয়া কোন ওজঃ ক্ষীণ ব্যক্তির নাসিকায় নিঃশ্বাস সহ যায়, তবে তাহাকেও রোগ আক্রমণ করে, ঐ যক্ষ্মা জীবনে এতদিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে জীবিতাবস্থায় ছিল। বর্ত্তমান কালের কীটাণু তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এক এক জাতীয় জীবাণু হইতে এক একটী স্বতন্ত্র প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয়; যথা "কমা ব্যাসিলাস" "নামক কীটাণু ওলাউঠা রোগোৎপাদক, ব্যাসিলাস পেষ্টিস "প্লেগ মহামারীর উৎপাদক কারণ; ওলাউঠা, প্লেগ প্রভৃতি রোগগ্রস্থ ব্যক্তিগণের ভেদ বমনাদিতে উক্ত জীবাণুচয় পরিদৃষ্ট হয়। কোন কারণে আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া ওজঃ ক্ষয় হইলেই উক্ত জীবাণুচয় আমাদের দেহটীকে উহাদের আবাসভূমি করিয়া লয়; অর্থাৎ আমরা

স্বকার্য্য দ্বারা উহাদিগকে আমাদের শরীর মধ্যে আহ্বান করিয়া থাকি।

ভূমণ্ডলের নভোমণ্ডলে বায়ু মণ্ডল মধ্যে যে সকল ভ্রাম্যমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা পরিদৃষ্ট হয়; তাহার সর্ব্বত্রই যে রোগ জীবাণু আছে তাহা নহে, অনেক স্থানে ধূলিকণার রোগ-জীবাণু নাই তাহা নির্ণীত হইয়াছে, পরন্তু কোন কোন স্থলে ধূলি কণার দ্বারাই রোগ-জীবাণু নষ্ট হয় তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন যে, কয়লার খনির মধ্যে যে সকল কুলি কার্য্য করে—তাহারা প্রায়ই যক্ষ্মাকাসে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু পাহাড়ের উপরে খনক কুলিদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার কারণ কি? ধূলা! কিন্তু কয়লার খনিতেও ত ধূলা অল্প থাকে না। তবে পাহাড়ের ধূলা ও কয়লার খনির ধূলার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে?

এই সূত্র ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য যে সকল কার্য্যে পাথুরে ধূলার সংস্পর্শ আছে, সেখানকার অবস্থা কিরূপ। দেখা গেল যাহারা শান পাথরে ছুরি শান দেয় এবং যে সকল মিস্ত্রী পাথরের গাড়ী গড়ে, তাহারাও যক্ষ্মাকাসের অত্যাচারে জর্জ্জরিত—বৈজ্ঞানিক দিগের সন্দেহ বাড়িল। তাঁহারা শান পাথরের পরিবর্ত্তে ধাতু নির্ম্মিত শানের যন্ত্র গড়াইয়া লোক গুলিকে কার্য্য করাইতে লাগিলেন। ফলে তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ আশ্চর্য্যরূপে কমিয়া গেল। বৈজ্ঞানিকগণ তখন বুঝিলেন তাঁহারা ঠিক সূত্র ধরিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

বনৌষধি।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

অপামার্গ—আপাঙ্, শিস্ আপাঙ্,

হিং-চিরচিটা, লটজীরা।

—:০:—

অপামার্গ পল্লীগ্রামে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইহা বর্ষাকালে জন্মে, শীত কালে ফল পক্ক হয়। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প দৃষ্ট হয় এবং পরে পুষ্প ঝরিয়া চাউলের আকৃতি বা ফল ধারণ করে। অপামার্গের গাছগুলি ২ হাত আড়াই হাত উচ্চ হয়, গাছটীর শিরো ভাগ হইতে একটী শিশ উঠে, ইহাতেই ফল পুষ্প ধারণ করে। ফলগুলি নিম্নাভিমুখী থাকে। বস্ত্রে লাগিলে, পক্ক ফলগুলি বস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া যায়।

অপামার্গ দুই জাতীয়, শ্বেত ও রক্ত, রক্ত অপামার্গের পত্রে বিন্দু বিন্দু রক্ত বর্ণের দাগ দৃষ্ট হয়। অপামার্গ ফলের খোসার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাকেই অপামার্গ তণ্ডুল বলে। ইহার স্বাদ তিক্ত।

অপামার্গের পত্র, শাখা, মূল, তণ্ডুল, সমস্তই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অর্শে অপামার্গ—প্রত্যহ প্রাতে চারি আনা পরিমাণ অপামার্গের মূল, আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অর্শরোগের উপশম হয়। ইহা রক্তার্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিরোবিরেচনে অপামার্গ — অপামার্গ তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া তদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে

নাসিকা দ্বারা প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মস্তকের ভার লাঘব হয়। ইহাকে শিরো বিবেচন বলে।

ক্রিমিরোগে অপামার্গ—স্নেহ দ্রব্য দ্বারা (রেড়ীর তৈল বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল) পিচকারী প্রদানান্তর অপামার্গের রস মধু সহযোগে পান করিলে উদরস্থ ক্রিমি পতিত হয়। (পরিমাণ অর্দ্ধ তোলা রসও চারি আনা ওজন মধু)।

বিসূচিকা রোগে—চারি আনা অপামার্গ মূল পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে বিসূচিকা নিবৃত্তি হয়।

রক্তস্রাবে অপামার্গ।—কোন স্থান কাটিয়া গেলে ঐ ক্ষতস্থানে অপামার্গ পত্র হস্তে মর্দ্দন করিয়া অথবা শিলায় পেষণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে অনতিবিলম্বে রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে। রক্ত বন্ধের ইহা দৃষ্ট ফল মুষ্টিযোগ।

নেত্র রোগে অপামার্গ—নেত্রনালী হইয়া চক্ষুর কোণ দ্বারা পুয় নির্গত হয়। কয়েকটী অপামার্গের পত্র সামান্য চুণের জলের সহিত অর্দ্ধ পেষিত করিবে, চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় চক্ষুর পাতার উপর উহা স্থাপন করিবে, তৎপর একখানি কচি কলাপাতা দিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু বন্ধন করিয়া রাখিবে। এক দিবস রাখিয়া পরদিবস বন্ধন খুলিয়া পুনরায় ঐরূপে বন্ধন করিবে। ২।৩ দিবস এইরূপ করিলে নেত্র নালী আরোগ্য হইবে।

কর্ণনাদ ও বধিরতায় অপামার্গ—অপামার্গ মূল, পত্র ও ডালের সহিত উহাকে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিবে, ঐ ভস্ম তিল তৈলের সহিত পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণ নাদ ও বধিরতা বিনষ্ট হয়।

চোক উঠায় অপামার্গ—অপামার্গ মূল তামার পাত্রে দধির মাতের সহিত ঘর্ষণ করিয়া উহা কবুতরের পালক দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তরে লাগাইলে চোক উঠা আরোগ্য হয়।

অনিদ্রায় অপামার্গ।—কাক জঙ্ঘা (কাউয়া ঠুঁঠী) ও সমূলক অপামার্গ সমভাগে কাথ করিয়া ঐ কাথ পান করিলে সুনিদ্রা হয়।

উন্মাদ রোগে অপামার্গ—শ্বেত বেড়েলার মূলের ছাল ৭ তোলা, অপামার্গ মূল ২ তোলা একত্রে কুট্টিত করিয়া এক সের এগার ছটাক জল ও আধসের এক ছটাক গব্য দুগ্ধ সহ কাথ প্রস্তুত করিবে। জল শেষ করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট রাখিবে, ঐ দুগ্ধ প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

শোথে অপামার্গ—অপামার্গ ও কোকিলাক্ষের কাথ দ্বারা বাষ্পস্বেদ দিলে শোথ আরোগ্য হয়।

মূল শাখা পত্র সহ অপামার্গ ৫ তোলা পাচ ছটাক জলে ২০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলেও শোথ আরোগ্য হয়।

অপামার্গের সাধারণ প্রয়োগ—মূত্রকৃচ্ছ্রতা, রক্তবদ্ধতা, অতিসার, আম, রক্তাতিসার শোথ, জলোদর, চর্ম্মরোগ, গলগণ্ড রোগে ইহা প্রয়োজ্য। শুষ্ক কাশিতে অপামার্গ কাথ সেবন করিলে কাসি তরল হইয়া উঠে।

বিষদোষে অপামার্গ,—অপামার্গ বিষঘ্ন, সর্প, কুক্কুর কিম্বা অন্যান্য বিষধর প্রাণী কর্ত্তৃক দংশন করিলে ইহা সেবনে ও ক্ষত স্থানে লেপনে বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

অতি পুরাতন ক্ষত স্থানে অপামার্গ পত্রের প্রলেপ বিশেষ হিতকর। ইহা ক্ষত পুরক।

প্রেরিত পত্র।

মাননীয় "আয়ুর্ব্বেদ"-সম্পাদক মহাশয়
সমীপে—

মহাশয়, কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। ভরসা করি, আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে "আয়ুর্ব্বেদে"র পাঠক ও লেখক মহোদয়গণ তাঁহাদের মতামত "আয়ুর্ব্বেদে" লিখিয়া জানাইবেন।

১। "ভাবিংং কাশীরাজেন ছাগমেব নপুংসকম্" এই বচন ভিন্ন নপুংসকছাগ গ্রহণের পোষক প্রমাণ কোন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে আছে কিনা? প্রাগুক্ত কাশীরাজ কে? ইনি কি সুশ্রুতোক্ত কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি অথবা অন্য কেহ? প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় নপুংসক ছাগ গ্রহণের কোন বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয় না। মহর্ষি সুশ্রুত চতুষ্পাদ প্রাণীর মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংসই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। (যথা—"স্ত্রিয়শ্চতুষ্পাদেষু পুমাংসো বিহগেষু * * সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়।) চরক সংহিতায় এ বিষয়ের কোন উল্লেখই নাই।

২। হাকিম মাসিহ রহমন প্রণীত "হেকিমি দ্রব্যগুণ শিক্ষা" নামক পুস্তকে অশ্বগন্ধার গুণ-পরিচয়ে দৃষ্ট হয় যে,—অশ্বগন্ধা দুই প্রকার; নাগরী ও দক্ষিণী। উভয়ের মধ্যে নাগরীই শ্রেষ্ঠ"। আয়ুর্ব্বেদের কোন গ্রন্থে অশ্বগন্ধার প্রকার ভেদের উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যদি দ্বিবিধ অশ্বগন্ধাই থাকে, তবে উভয়ের আকৃতি গত পার্থক্য কি? এবং গুণের তারতম্য আছে কি না?

৩। প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে "নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের" অধিবেশন হইয়া থাকে। উহাতে নানা প্রদেশ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলী সমবেত হইয়া থাকেন। উক্ত সভায় সন্দিগ্ধ ভেষজ সম্বন্ধে আলোচনা হয় কিনা? হইলে কোন্ কোন্ ভেষজ সম্বন্ধে এ যাবৎ আলোচনা হইয়াছে এবং উহাদের সম্বন্ধে কি মীমাংসাই বা হইয়াছে?

প্রতি বৎসরের সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত হয় না কেন?

৪। "বিষ-বিজ্ঞানে"র কৃতী লেখক মহোদয় সর্পবিষের ঔষধ রুদ্রজটা বা শঙ্করজটা গাছের আকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পাতাল গড়ুরী গাছ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। পাতাল গড়ুরী গাছের আকৃতি কিরূপ? রুদ্রজটা ও পাতাল গড়ুরী গাছের বীজ অথবা চারা—লেখক মহাশয় দিতে পারেন কিনা?

৫। প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে কস্তুরী পরীক্ষার যে সমস্ত উপায় বর্ণিত আছে তাহা ব্যতীত, অন্য প্রকার (আয়ুর্ব্বেদ অথবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে) কি কি নিয়ম আছে?

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "জ্বর চিকিৎসা" নামক গ্রন্থে মৃগনাভি পরীক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে,—বিশুদ্ধ মৃগনাভি আগুনে দিলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া যায়।" কিন্তু এই মতটী আয়ুর্ব্বেদের বিরোধী। কারণ আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন,—

* "দাহং যা নৈতি বহ্নৌ চিমি চিমি কুরুতে চর্ম্মগন্ধা হুতাশে"। এ বিষয়ে কৃতবিদ্যমহোদয়গণের পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান মূলক মতামত জানিতে চাই।

শ্রীহৃদয়নাথ ভৌমিককবিরত্ন কবিরাজ।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ
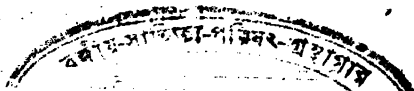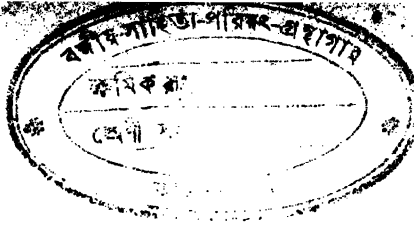
৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৯—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

ভেষজ-মীমাংসা *

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ, এল-এম-এস]

বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের একটা অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। এখন ভারতের সকল স্থানে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়—এমন কি ডাক্তারেরাও—আয়ুর্ব্বেদের শরণাপন্ন হইতেছেন। এখন অনেক ডাক্তারের পরিবারবর্গের মধ্যেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা চলিতেছে। শিক্ষিত জনসাধারণের অধিকাংশ এখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করাইতেছেন। ডাক্তারদের অনেকেই এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ ব্যবহার করিতেছেন। আপনারা বোধ হয়, অবগত আছেন যে প্রবল প্রজামতের অনুকূল হইয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্টও এখন "আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণার্থ" কমিটি নিযুক্ত করিয়া এই চিকিৎসার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। তদ্ব্যতীত যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে "ঋষি-কুল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে" দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ঐ প্রতিশ্রুতি টাকার মধ্যেও পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে বলিয়া আমার নিকট পত্র আসিয়াছে অবশিষ্ট লক্ষ টাকা তাঁহারা শীঘ্রই দিবেন—এরূপ আশ্বাসও পাওয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ডাক্তারদিগের অনুরাগ, জনসাধারণের অনুরাগ এবং গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যপ্রদর্শন বাস্তবিক আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। আরও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখন প্রায় প্রতি মাসেই ডাক্তারী মাসিক পত্রিকাগুলিতে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের উপর অযথা আক্রমণ হইতেছে। নিজে প্রকৃত

* গত ১৪ই আষাঢ় থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ১ ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতেছি।—আঃ সাঃ

সবল না হইলে কখনও প্রবল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু এই প্রবল পক্ষের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান যে কিরূপ অদ্ভুত—তাহা শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইবেন। তাঁহারা "ইন্‌ডিজিনাস্ ড্রগ্‌স্" সম্বন্ধে রিচার্স করিবার যে উদ্যোগ অনুষ্ঠান সম্প্রতি করিয়াছেন, সেই বিভাগ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে একবার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত সার্কুলারে "শিলাজতু বৃক্ষ" (!) সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গবেষণার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। শিলাজতু ধাতুবহুল পর্ব্বতের ঘর্ম্ম বিশেষ, পর্ব্বত-গাত্র হইতে বহির্গত হয় বলিয়াই উহার নাম শিলাজতু। 'জতু' শব্দের অর্থ গালা বা আঠা। এহেন দ্রব্যকে বৃক্ষরূপে দাঁড় করাইয়া তাহার গবেষণা করিতে গেলে যে তাহার ফলে "গরু খোঁজাই" হইবে,—ইহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, ডাক্তারেরা ভেক, মুষিক, শশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়া ঔষধের শক্তি নির্ণয় করিতে চাহেন, সে চেষ্টারও সাফল্য সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ সকল ঔষধই সমস্ত প্রাণি শরীরের উপর সমান ক্রিয়া করে না—ইহা স্থির নিশ্চিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, অহিফেন বা আফিম্ মানবদেহে প্রয়োগ করিলে গভীর অবসাদ আনে, কিন্তু ভেকের দেহে উহা অবসাদ তো আনেই না, বরং আক্ষেপ (convulsion) আনে—ইহা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টা যে সর্ব্বত্র ফলবতী হইবে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজের গুণ-নির্ণয়ের সময় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া ডাক্তারেরা কেন যে আবশ্যক বোধ করেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তৃতীয়তঃ আয়ুর্ব্বেদের রহস্য উদ্ঘাটনে সংস্কৃত জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। ইংরেজি জ্ঞান না থাকিলে ডাক্তারী শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ হয়, সংস্কৃতে ভাল জ্ঞান না থাকিলে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অবতরণিকায় আমি অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। ডাক্তারদের আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ভ্রাতৃবর্গের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই অবতরণিকায় এতগুলি কথা বলিতে হইল। তাঁহাদের গবেষণার বিষয় লইয়া আজ অন্যে এত পরিশ্রম করিতেছে, অথচ তাঁহারা উদাসীন রহিয়াছেন! কেন এ উদাসীনতা? চেষ্টা করিলে কি তাঁহাদের ভেষজের পরীক্ষা তাঁহারা করিতে পারেন না? আমার বিশ্বাস—ভেষজ-পরীক্ষা মনুষ্যেরই সুস্থ দেহে ও রুগ্ন দেহে করা উচিত। আর এই সকল পরীক্ষার মূলভিত্তি শাস্ত্রকারেরা যেরূপ স্থাপন করিয়াছেন—সেই ভিত্তির উপর চলিলেই কার্য্য সহজ হইবে।

সম্প্রতি আয়ুর্বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। এখন এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করার একান্ত প্রয়োজন। ইহা আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদিগের নিকট এরূপভাবে ভেষজ পরীক্ষার আলোচনা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এবিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া আমি আয়ুর্ব্বেদের গৌরব স্বরূপ কয়েকটী গুণগর্ভ দুর্লভ ভেষজের যে সন্ধান পাইয়াছি, আজ আমি আপনাদিগের নিকট

তাহাই বলিব। আমরা অনেক স্থলেই এই সকল ভেষজ পরিত্যাগ করিতে বা তাহাদের প্রতিনিধি কল্পনা করিতে ও স্থল বিশেষে কৃত্রিম বস্তু লইতে বাধ্য হইয়াছি। সেইরূপ কয়েকটী ভেষজের মীমাংসা করিতে আজ আমি চেষ্টা করিব। ইহাতে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব কি না—বলিতে পারি না।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ভেষজ ত্রিবিধ—যথা, জান্তব, ঔদ্ভিদ ও পার্থিব। ডাক্তারীতেও এরূপ ভেদ আছে—Animal, Vegetable and Mineral; তন্মধ্যে চর্ম্ম, নখ, রোম, রুধিরাদি জান্তব। পত্র পুষ্প-ফল-মূল-কন্দ প্রভৃতি ঔদ্ভিদ এবং সুবর্ণ-রজত-মণিমুক্তা-প্রবালাদি পার্থিব ভেষজ। জান্তব ভেষজে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে যে গুলিতে প্রায় গোলযোগ, তন্মধ্যে আমার অদ্যকার প্রদর্শনীয়—প্রথম দ্রব্য—

মৃগনাভি।

এতৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট কৃত্রিমতা চলিতেছে। মৃগনাভি অনেক প্রকার দেখা যায়। আমি কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয় প্রকার মৃগনাভিই দেখিয়াছি। এই সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব জানিবার সুযোগ সম্প্রতি দেরাদূনে ও সিমলা পাহাড়ে পাইয়াছিলাম।

মৃগনাভি—'কস্তূরী মৃগের' নাভিজাত কোষের মধ্যে জন্মে। এই নাভিকোষকে চলিত কথায় "নাভা" বলে। বাজারে বিক্রীত এক প্রকার "নাভা দেখিয়া অনেকে ভ্রান্ত হন এবং আসল নাভিকোষ বলিয়া উহা খরিদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা আসল মৃগনাভি নহে। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমাদের মেটিরিয়া মেডিকার প্রফেসার রসেল সাহেব বলিতেন—এক গ্রেণ মৃগনাভিতে এক পাউণ্ড মাস্ক্ তৈয়ার হয়। প্রকৃত ভাল জিনিষ হইলে ইহা অনেকটা সম্ভবপর, সন্দেহ নাই। সিমলায় দুইজন রোগী আমার নিকট চিকিৎসিত হইতে আসিয়া প্রাণের দায়ে আমাকে মৃগনাভির রহস্য বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন নাভা হইতে আসল দ্রব্যটা শলাকা (বোমা) দিয়া সরিষার মত বাহির করিয়া লইয়া ঐ পথে কিঞ্চিৎ মৃগনাভি মিশ্রিত খয়ের গোলা ইনজেকশনের রীতিতে প্রবেশ করাইয়া উহা পূর্ণ করিতে হয় পরে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া ঐ নাভাই বাজারে আসল বলিয়া বিক্রয় করা হয়। যথার্থ আসল দ্রব্য যাহা আমাকে তাঁহারা দিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ এখানে আনিয়াছি,—আপনারা দেখুন (এই বলিয়া আনীত মৃগনাভি সকলকে দেখান হইল। ঐ মৃগনাভির শিশির ঢাকনি খুলিবা মাত্র সভার বৃহৎ হল ঘরটী কস্তূরীর মনোহর সুগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল)।

যেরূপ প্রক্রিয়ায় আমি মৃগনাভির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া থাকি, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। ইহা সরিষা-প্রমাণ হাতে লইয়া কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া দু' হাতে উত্তম রূপে রগড়াইতে হয়। দ্রব্য খারাপ হইলে কিছুক্ষণ পরে হাতে এক রকম দুর্গন্ধ পাওয়া যাইবে। আর যদি দ্রব্য উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা হইতে মনোরম সুগন্ধ পাওয়া যায়। পরে হাত শুকাইলে ৫ পার্সেণ্ট কার্ব্বলিক্ সোপ দ্বারা হাত ধুইয়া ফেলিলেও উহাতে মৃগনাভির মধুর সুগন্ধ পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা আমি বহুবার করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এই উপায় অবলম্বন করিয়া আপনারা মৃগনাভি খরিদ

করিতে আরম্ভ করিলে আর প্রবঞ্চক বিক্রেতারা নকল দ্রব্য আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে সাহস করিবে না। উৎকৃষ্ট মৃগনাভি ডাক্তারী ষ্ট্রিক্নিন, ডিজিটেলিন, প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে গুণবীর্য্যবিশিষ্ট,—ইহা আমি অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এরূপ মৃগনাভি গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ রোগীর জিহ্বায় উহা লাগাইয়া রাখিয়াও আমি আশ্চর্য্য উপকার পাইয়াছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার নাড়ী সতেজ ও দেহ বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়াছে—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

আমার দ্বিতীয় প্রদর্শনীয় দ্রব্য—

খট্টাশী।

ইহা গন্ধ-বিড়ালের সুগন্ধি অণ্ডকোষ। আয়ুর্ব্বেদীয় তৈলের গন্ধপাকে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল অনেকেই উহা গন্ধপাকে ব্যবহার করেন না। গন্ধ পাক না করিলে বাতব্যাধির তৈলগুলি তেমন উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হয় না। আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ নিতান্ত কৈ মাছের মত, তাই বহু অত্যাচারেও অদ্যাপি ইহা জীবিত আছে। নিয়মিত রূপে গন্ধ-পাক করা আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ তৈলগুলি চিকিৎসা-জগতে অমূল্য রত্ন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এই বৈশিষ্ট্যে বৈদেশিক চিকিৎসক-সমাজ কবে বিস্মিত হইবেন বলিয়া আমি চাহিয়া আছি। পূর্ব্বোক্ত খট্টাশী বা খাটাশী তৈল পাকের শেষে ফুটন্ত তৈলে ডুবাইয়া রাখিলে অল্পে অল্পে গলিয়া যায়। ঐরূপ ভাবে খট্টাশীর দ্বারা গন্ধ-পাক-করা শ্রীগোপাল তৈলে আমি অদ্ভুত উপকার পাইয়াছি। ডাক্তারেরা পুরুষত্বহীনতায় মেষাদির অণ্ডকোষ হইতে সার (Extract) বাহির করিয়া উহা খাইতে দেন বা Injection করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের "শ্রীগোপাল তৈল" মর্দ্দন তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকারী।

আমার তৃতীয় প্রদর্শনীয় বস্তু—

গোরোচনা।

ইহা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বাজারে ইহারও কৃত্রিমতা যথেষ্ট, সেইজন্য ইহা অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়। আমি কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয় প্রকার গোরোচনাই সংগ্রহ করিয়াছি, আপনারা দেখুন (দ্রব্য প্রদর্শন)। যথার্থ গোরোচনা গরুর পিত্তের থলিতে পাথুরীর (গলষ্টোনের) মত সঞ্চিত হয়। অকৃত্রিম গোরোচনা বালকের নিউমোনিয়ায় এবং বয়ঃস্থের "গল্‌ষ্টোনে" অদ্ভুত উপকারী। কৃত্রিম গোরোচনার ইংরাজী নাম "গ্যাম্বোজ", সংস্কৃত নাম কঙ্কুষ্ঠ।

এই পর্য্যন্ত তিনটী জান্তব পদার্থের প্রদর্শন ও সংক্ষিপ্ত গুণের বিষয় বলা হইল। অতঃপর উদ্ভিদ ভেষজ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সোমলতা।

সুশ্রুতের ২৯ অধ্যায়ে সোমলতা নামে এক প্রকার ভেষজের উল্লেখ আছে। সোম অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে ইহার বড়ই নিকট সম্বন্ধ, শুক্ল পক্ষে ইহার এক একটী পাতা বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণিমায় ১৫টী পূর্ণ হয় এবং পুনরায় কৃষ্ণপক্ষে এক একটী করিয়া পাতা ঝরিয়া অমাবস্যায় ইহা পত্রশূন্য হয়। ইহা তিব্বত অঞ্চলে পাওয়া যায় বলিয়া আমি শুনিয়াছি, দেখিতে ইহা ঠিক পুঁই শাকের মত। এই জন্যই বোধ হয় ইহার স্থলে যাজ্ঞিক-গণ পুঁই শাক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রামের 'রহিম' নামের ন্যায় অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নাম কালক্রমে পরিবর্ত্তিত

হইয়া গিয়াছে। বারংবার রাষ্ট্রবিপ্লবেই এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয় এজন্য অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ আয়ুর্ব্বেদীয় নামের খোলস ছাড়িয়া 'হাকিমী' নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অলক্ষ্যে আত্ম-গোপন করিয়া রাখিয়াছে— এ সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব।

অষ্টবর্গ।

দুষ্প্রাপ্য অষ্ট বর্গের মধ্যে **ক্ষীর কাকোলী** নামে যাহা বাজারে পাওয়া যায়, তাহা এই (দ্রব্য প্রদর্শন)। ইহা এক প্রকার পেঁয়াজের ন্যায় কন্দ বিশেষ, শাস্ত্রোক্ত ক্ষীরকাকোলীর সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। এ সম্বন্ধে "পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরা ক্ষীরকাকোলী" এই প্রকার পরিচয় ভিন্ন শাস্ত্রে অধিক কথার উল্লেখ নাই। সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা দ্বারা আমি যতদূর সন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার হস্তস্থিত এই দ্বিতীয় দ্রব্যটীই (প্রদর্শন) যথার্থ ক্ষীরকাকোলী। বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে হাকিমেরা "সফেদ মুসলী" বলিয়া থাকেন। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা ইহার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম বদলাইয়াছেন। ইহা উত্তম বৃষ্যগুণ-সমন্বিত।

কাকোলী। ইহাও ক্ষীরকাকোলীর মত দ্রব্য, অধিকন্তু "এষা কিঞ্চিদ্ ভবেদ্ কৃষ্ণা" বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহা হইলে হাকিমদিগের 'স্যাহ মুসলীকে'—'কাকোলী' বলিতে হয়। "রাজ নির্ঘণ্টু"ও ইহাকে ঈষৎ কৃষ্ণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ঔরঙ্গজেবের সময়ের হাকিম মহম্মদ আর্জানী-দ্রব্যগুণে "সকাকুল মিশ্রী" নামে দ্রব্যকে বৈদ্যদিগের কাকোলী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

জীবক-ঋষভক। রাজ নিঘণ্টু মতে ইহারা শৃঙ্গাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের আর এক নাম বিষাণিকা। মদনপালও ঋষভককে বিষাণী বলিয়াছেন। আমি দেখিতেছি আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদের মত হাকিমেরাও জোড়া-মিলান নাম দিয়াছেন। আমাদের 'জীবক'কে তাঁহারা "সফেদ্ বাহমন" এবং ঋষভককে "সুর্খ বাহমন" বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন। দ্রব্য ২টী এই (প্রদর্শন)। এস্থলে বাহমন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ— এই পবিত্র শব্দ দ্বারা তাঁহারা ঋষি প্রযুক্ত দ্রব্যের একটু প্রাচীন গন্ধ রাখিয়াছেন ; সম্পূর্ণ নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই। হাকিমেরা এই ২টী দ্রব্য বৃষ্য বলিয়া বহু স্থলে ব্যবহার করেন। স্বর্গীয় তারা প্রসন্ন কবিরাজ মহাশয়ের নেপালী শিষ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দরাম আমাকে এই দ্রব্যের অনেকগুলি পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমাকে সেই সঙ্গে এই সকল হাকিমী নাম তখন দেন নাই।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। বিশেষতঃ উহাদের ফল বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে। বৃক্ষ ও ফল না দেখিলে উহাদের মীমাংসা করিবার উপায় নাই।

মেদা, মহামেদা। এই দুইটী দ্রব্যই কন্দজাতীয়। মেদা—হাকিমী দ্রব্যগুণে "ছোটী শালিমমিশ্রি" এবং মহামেদা "বড়ী

শালিম মিশ্রি" নামে খ্যাত। এই সকল দ্রব্য কাবুল অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে জন্মায়,মিশরেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে "মোরঙ্গায়াং প্রজায়তে"—উল্লেখ আছে। মোরঙ্গা অর্থে মিশর দেশ। মিশর জাত বলিয়া দ্রব্য ২টীর মিশ্রি নাম।

অষ্টবর্গের মধ্যে আমি ৬টী দ্রব্য পাইয়াছি বলিয়া শাস্ত্রীয় "চ্যবনপ্রাশ" এবং অন্যান্য বৃষ্য ঔষধে এইগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকি। এ সকলের প্রভূত উপকারিতা আমি বহুশঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

লক্ষ্মণামূল।

আয়ুর্ব্বেদীয় আর ১টী দুষ্প্রাপ্য ভেষজ "লক্ষ্মণামূল।" এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার "পুত্র কাকারারক্তাল্পবিন্দুভির্লাঞ্ছিতা" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই বচনে পাঠের অসঙ্গতি আছে। ইহার অর্থ সঙ্গতি করা সহজ বোধ হয় না। এ নামের আমি দুইটী দ্রব্য দেখিয়াছি। তন্মধ্যে ১টী চীনদেশে "জেনসান্' নামে খ্যাত। ইহা তথায় নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া স্বর্ণের দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়. ইহার ক্ষেত্রে সশস্ত্র পাহারা নিযুক্ত থাকে। ইহার যত কন্দ হয়, তাহার অর্দ্ধেক রাজাকে দিতে হয়, অপরার্দ্ধ দ্বিগুণ স্বর্ণমূল্যে বিক্রীত হয়। আর এক প্রকার লক্ষ্মণামূল আমার শিষ্য কবিরাজ শ্রীমান্ রাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ দ্বারভাঙ্গা হইতে আনিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণামূলের কয়েকটী লক্ষণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু রক্তবিন্দু লাঞ্ছন নাই, তাহা আপনারা দেখুন (দ্রব্য প্রদর্শন)। ইহা "বস্তগন্ধা কৃতি" বটে কিন্তু যাহা পুত্রকাকার তাহা বস্ত বা ছাগলের আকার হইতে পারে না, সুতরাং বর্ণনার পাঠে "পুত্রকাকার" না হইয়া "পুত্তিকাকার" হইলে অর্থ সঙ্গতি হয়। "পুত্তিকা" অর্থে এক রকম লাল পোকা বুঝায়। সেইরূপ "লালবিন্দু চিহ্নিত"— এইরূপ অর্থ সঙ্গত। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে ইহা নাকি পুষ্যা নক্ষত্রে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

অতঃপর রসাঞ্জন, খর্পর প্রভৃতি পার্থিব ভেষজ সম্বন্ধে আমি আগামী বারে আলোচনা করিব। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর আমার নীরস বক্তৃতায় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। আমার অদ্যকার এই শুষ্ক আলোচনা শুনিবার জন্য আপনারা যে বর্ষার বাদল উপেক্ষা করিয়া আসিয়া এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই স্থানেই অদ্যকার মত নিবৃত্ত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

পরীক্ষায় স্বাস্থ্যহানি।

[শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্বনিধি, এম-এ]

—:o:—

বহু শিক্ষিত লোকের মুখে আজকাল শুনা যাইতেছে যে, পরীক্ষার জন্য খাটিয়া বালকগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে এবং সেই জন্য তাঁহারা আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী এবং শিক্ষা বিভাগের পরিচালকবর্গ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা স্যর্ আশুতোষের উপর বাণী বর্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না যে, আজকালকার ছাত্র সম্প্রদায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে। প্রবেশিকা হইতে এম,এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া এই বুঝা যায় — আজকাল ছাত্রগণ আদৌ পরিশ্রম করেনা এবং করিতে চাহেনা। দুই একটী মেধাবী ছাত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয় যে, আজকাল ছাত্রগণ উপযুক্ত পরিশ্রমই করে না ; অতিরিক্ত পরিশ্রমের কথা দূরে থাকুক। ছিল একদিন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যার্জ্জনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন এবং বড় বড় বই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানিও হইত না। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এরূপ উদাহরণ অনেক ছিল। তাঁহারা অল্পায়ু ছিলেন না। দশবৎসর পূর্ব্বে ছাত্রগণের যেরূপ শ্রমশীলতা দেখা যাইত, এখন তাহা নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বালকগণের মানসিক পরিশ্রমের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে এবং কোনও কিছু কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবার শক্তি থাকিতেছে না, এমন কি, অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অতি নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ও বন্ধু বর্গের নাম মনে রাখিতে পারেন না।

আজকাল বালকগণ কেবল ফাঁকি খুঁজে। বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াই তাহারা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট জানিতে চাহে—তাহার কোন্ কোন্ অংশ বিশেষ দরকারী। Important অংশ চিহ্নিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা আজকালকার বালকগণের মধ্যে একটা প্রবল ও সংক্রামক ব্যাধি রূপে বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছে। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষাদান কার্য্যে যতই পরিশ্রম করুন না কেন, তিনি যদি পাঠ্য পুস্তক গুলিতে লাল নীল পেন্সিল দিয়া দাগ না দেন এবং সাময়িক পরীক্ষায় সেই সকল অংশ হইতে প্রশ্ন নির্ব্বাচন না করেন, তাহা হইলে তিনি ছাত্রপ্রিয় হইতে পারিবেন না। শুধু তাহাই নহে, শিক্ষক মহাশয় যদি অর্থ পুস্তক ও প্রশ্নোত্তর পুস্তক লিখিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যাহাই লিখুন না কেন, তাঁহার পুস্তক বেশ কাটিবে। শিক্ষাবিভাগের পরিচালকগণ ইহার নিবারণ করিতে পারিবেন না। যে বৎসর ছাত্রেরা পরীক্ষা দিবে, সে বৎসর প্রত্যেক ছাত্রই Test papers পড়িবে। আবার এক পৃষ্ঠায় ইতিহাস, তিন ঘণ্টায় ভূগোল প্রভৃতি কত অদ্ভুত নাম বালকগণের পরীক্ষারোগের কতই যে হোমিওপেথিক ঔষধ

বাজারে আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করে কে? মূল পুস্তক বা প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ কোনও কিছু পড়িবার প্রবৃত্তি বা জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা ছাত্রদিগের নাই। অথচ অশ্লীল নভেল বা কুৎসিৎ ভাবপূর্ণ বই পড়িবার প্রবৃত্তিও যেমন, অবসরও তেমনি আছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয়—প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর অপ্রত্যক্ষভাবেই হউক প্রতারণা-প্রবৃত্তিই ছাত্রগণের শিক্ষার মূলীভূত উপাদানরূপে গজাইয়া উঠিতেছে। আর তা'র চরম পরিণাম দাঁড়াইতেছে এই যে, পরীক্ষায় চুরি দিন দিন বাড়িতেছে। সহরের জটিলতার কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় সমূহেও পরীক্ষায় চুরির অতি বিচিত্র প্রণালী ছাত্রগণের মাথায় আবিষ্কৃত হইতেছে। কি ভীষণ নৈতিক অবনতি!

আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানির কারণ কি? তাহা হইলে আমি বলিব—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম তাহাদের স্বাস্থ্যহানির কারণ নহে। উপযুক্ত মানসিক বিকাশের অভাব ও তন্নিবন্ধন পরীক্ষা বিষয়ক দুশ্চিন্তাই বালকগণের স্বাস্থ্যহানির কারণ। নৈতিক অবনতিও তাহার সহায়। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন আশানুরূপ হইলে তাহার কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে অবিমিশ্র আনন্দ বালকগণকে মানসিক উৎফুল্লতা দান করে, সে আনন্দলাভ আজকাল কয়জন বালকের ভাগ্যে ঘটে? সকলেই জানেন যে, গণিতবিষয়ক কোনও জটিল প্রশ্নের সমাধান যখন বালক করিতে না পারে, তখন তাহার মনে একটা কষ্ট হয়। আবার যখন সেইটার সমাধান হয়, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ তাহার মনকে আপ্লুত করিয়া ফেলে। এইরূপ একটা বড় রকমের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কোনও গ্রীক দার্শনিক নগ্নবেশে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান সংবাদ জানাইতে গিয়াছিলেন। জ্ঞানচর্চ্চাজনিত আনন্দলাভ করিতে পারিলে বালকের শরীরের সকল অবসাদ দূর হইয়া যাইবে। স্বাস্থ্যহানি হইবে কেন? বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে সেই কৃতকার্য্যতার ফলে বালকের দেহের লাবণ্য, মনের শান্তি ও রোগের নাশ হয়। আয়ুও বাড়িয়া যায়। তাহার অভাবে মানসিক অশান্তি, শারীরিক অবনতি ও আয়ুহানি হয়। আবার তাহার সঙ্গে যদি থাকে পরীক্ষার দুশ্চিন্তা, তবে ত সোণায় সোহাগা! যাহার প্রকৃত জ্ঞানানুশীলন হইয়াছে, জ্ঞানের আলোকে যাহার মুখশ্রী দীপ্ত, জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসায় যাহার মন মজিয়াছে, সে সামান্য পরীক্ষাকে ভয় করিবে কেন? কে জানে, সে জ্ঞানের পরিচয় দিতে ভীত হইবে কেন? যে জানে না, সেই ভয়ে আক্রষ্ট হইবে ও সেই ভয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রোগভোগ করিবে।

জ্ঞানচর্চ্চার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যেমন একটা উৎফুল্লতা ও অনাবিল আনন্দ বালকগণ পাইতে পারে, প্রতারণা প্রবৃত্তির বৃদ্ধি ও কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ একটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দামতার ভাব ছাত্রমহলে বিস্তৃত হইতেছে। আলোকের পার্শ্বে যেমন অন্ধকারের বৃদ্ধি হয়, 'সু'র পার্শ্বে তেমনি 'কু' বাড়িতে থাকে। একদিকে যেমন সুরগণের অভ্যুত্থান ও অপরদিকে তেমনি অসুরগণের বংশ বৃদ্ধি। যখন অসুরগণ খুব প্রবল

হইয়া উঠে, তখনই দধীচির ন্যায় মহাত্মের বিনিময়ে তাহাদের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিতে হয়। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া বর দিলেন, "তুমি যাহার মাথায় হাত দিবে, তাহার মাথা উড়িয়া যাইবে।" বর পাইয়া উৎফুল্ল অসুর বলিল, "ঠাকুর, দাঁড়াও, পরীক্ষা করিব তোমার মাথায় হাত দিয়া।" কৃতকার্য্যতার সহিত উদ্দামতার এইরূপেই বৃদ্ধি হয়। আমাদের বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীকে Ass's Bridge বা 'গাধার সাঁকো' বলা হয়। তাহার কারণ এই সাঁকো পার হইলেই উদ্দাম-প্রবৃত্তি বালকগণের উদ্দামতা বাড়ে। তাহার ফলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, চতুর্থ শ্রেণীর বালকগণ সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, তাহারা ঐ সময়ে একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া উৎফুল্ল হইবার অবসর পায়। আর একটা পরীক্ষা—প্রবেশিকা পরীক্ষা—দিয়া বালকগণ আরও একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়। কারণ এই অবস্থায় তাহাদের অধ্যয়নের স্থান বদলাইয়া যায় এবং অধিক স্থলে তাহারা পিতামাতার শাসন হইতে স্বাধীন হইয়া পড়ে। আবার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ শ্রেণীতে তাহারই পরীক্ষার দুশ্চিন্তায় একটু দমিয়া যায়। তৃতীয় বর্ষ শ্রেণীতেও তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় বটে, তবে তাহার প্রকোপ কিছু কম। কিন্তু ডিগ্রিপ্রাপ্তির পর Law Classএ গিয়া তাহারা একটু বিশেষ ভাবে চঞ্চল হইয়া পড়ে। এই সকল স্থানে পরীক্ষার কৃতকার্য্যতামূলক চঞ্চলতার প্রধান কারণই হইল প্রতারণায় কৃতকার্য্যতা। "আহা! বেশ ফাঁকি দিয়াছি! কিছুই পড়ি নাই, কিছুই শিখি নাই, অথচ ফাঁকি দিয়া কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করিয়াছি!" এই ভাব না থাকিলে তাহাদের এরূপ উদ্দামতা দেখা যাইত না। প্রকৃত জ্ঞানজন্য কৃতকার্য্যতায় গাম্ভীর্য্য আসিবে, চাঞ্চল্য নহে। চিত্তপ্রসাদ আসিবে, অহঙ্কার নহে। শিষ্টাচার আসিবে, দৌর্জ্জন্য নহে।

চাষের ক্ষেতে আগাছা জন্মিলে কৃষক তাহা নিড়াইয়া ফেলে। নতুবা ফসল হইবে কেন? শিক্ষার চাষে যে আগাছা জন্মিতেছে—তাহারও মূলোচ্ছেদ আবশ্যক। নতুবা সুকল্পিত ও সুচিন্তিত শিক্ষা পদ্ধতিতে কোনও ফল লাভ হইবে না। যে আগাছায় আজ শিক্ষার প্রতিক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। ইহার ফলে জটিলতা-ভারাক্রান্ত শিক্ষকগণ ফসলের উৎকর্ষের দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবসর পাইতেছেন না। যে চাষার জমিতে কেবলই ঘাস ও আগাছা, সে সেই আগাছা নিড়াইয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ফসলের উৎকর্ষের বিষয়ে ভাবিবার অবসর পায় না। যে শিক্ষক বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র পুলিসের ন্যায় শান্তিরক্ষা করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তিনি শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষের বিষয় ভাবিবেন কি প্রকারে? এই যে আগাছা—এই যে ছাত্র দিগের মনে দুশ্চিন্তা ও নৈতিক অবনতির ভার—যাহা সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িল; তাহার মূলোচ্ছেদের উপায় কি? কে সেই চাণক্য, যিনি এই আগাছার মূলদেশে মধু ঢালিয়া পিপীলিকা লাগাইয়া দিবেন? কে সেই দধীচি—যাঁহার বিনিময়ে এই দৈত্য প্রতাপ নির্ম্মূল হইবে?

এই বিশ্বব্যাপী অনর্থের জন্য দায়ী কে?

শিক্ষকবর্গ নহেন। তাঁহারা ইহার সৃষ্টিও করেন নাই এবং ইহার পুষ্টিতে তাঁহাদেরই অসুবিধা বাড়িতেছে। অভিভাবকবর্গকেও সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায় না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছেলেকে দেখিবার সময় ও সুযোগ অভিভাবকের নাই। আমাদের সমাজের জটিলতা এই প্রকার বাড়িয়াছে যে, পিতা পুত্রে এক গৃহে বাস করিলেও অধিকাংশ স্থলেই পিতাপুত্রে আলাপ করিবার সুযোগ সারাদিনের মধ্যে ঘটেনা। অন্নচিন্তায় পিতা এতই আকুল যে, পুত্রের বিষয়ে ভাবিবার অবসর তাঁহার থাকেনা, আবার এরূপ লোকের সংখ্যাও অনেক—যাঁহারা ভোরবেলা উঠিয়াই রেলে চড়িয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যান, আবার কর্ম্ম-ক্লান্তদেহে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরেন। গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়েও পুত্র নিদ্রিত, ফিরিয়া বাড়ী পৌঁছিবার সময়েও তাহাই। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে চোখোচোখিই হয় না, আলাপ ত পরের কথা। অনেক ক্ষেত্রে আবার ছেলের বাপ থাকিতেও অভিভাবক মা। কারণ বাপ অন্ন চিন্তার তাড়নায় চির-প্রবাসী। ফলে ছেলেরা গৃহের শাসন পায়না; যে পিতার রক্ত-শোষণ করিয়া তাহার অঙ্গের পুষ্টি, যাহার যত্নে তাহার বাল্যজীবনের সমস্ত সুখ গঠিত, সেই পিতাকে না মানিলে কোনও ছেলেরই চলেনা। কিন্তু সেখানে যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ তাহার ঘটে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতাই স্বাভাবিক। সে ভাবিতে শিখে—"বাবাকে ত ফাঁকি দিতে কোনও কষ্টই হইল না। এখন শিক্ষক মহাশয়কে ফাঁকি দিতে পারিলেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা।" ধীরে ধীরে এই চিন্তা ও এই প্রবৃত্তি যে ছাত্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, সে শিক্ষককে কখনই আপনার লোক বলিয়া ভাবিতে পারেনা। আপনার লোকের শাসন যখন কিছুই নাই তখন 'একটা—কোথাকার-কে" শিক্ষকের শাসন মানিবার একমাত্র কারণ হয় 'ভয়',—'ভক্তি' নহে। ছিল একদিন যখন অন্তেবাসী গুরুর অন্তঃপুরে বাস করিত। গুরুকুলে বাস করিয়া সে গুরুকেই পিতৃস্থানে বরণ করিয়া লইত। সুতরাং পিতা পুত্রের খোঁজ লইতে না পারিলেও তাহার শিক্ষা অঙ্গহীন হইত না। তাহার চরিত্র বিকৃত হইত না,—তাহার মন কুপথে যাইত না। এখনকার শিক্ষক ছাত্রের পিতৃস্থানীয় ত নহেনই, অধিকন্তু ছাত্রদিগের দত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত। আবার শিক্ষকগণও বাণীকমলার বিরোধ হেতু দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হওয়ায় আমাদের সমাজে সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন না। এই সকল নানা কারণে আমাদের বালকগণের মনোরাজ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি ও উদ্দামতা রূপ অসুর দিন দিন প্রবল হইতেছে। অথচ বালকের অভিভাবকবর্গ ভাবিতেই পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনও ত্রুটি আছে। আমাদের পূর্ব্বকালে যেমন পুত্রকে গুরুকুলে পাঠাইয়া দিলে পিতা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, এখন আর তাহা চলেনা। অবশ্য কলেজ সংলগ্ন যে সকল ছাত্রাবাসে ছাত্রের চরিত্র কলঙ্কিত হয়, তাহার জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবর্গ দায়ী।

তাহা হইলে এখন কর্ত্তব্য কি? যাহা-

বলিয়াছি তাহাতেই আমার মত পরিস্ফুট। আমার মতে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার এখন অভিভাবকবর্গের হাতে। শিক্ষকগণের সহিত অভিভাবকবর্গের মেলা মেশা চাই। একত্র এক উদ্দেশ্যে কাজ করা চাই। পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান চাই। তাহা হইলেই ছাত্রগণের প্রকৃতজ্ঞান চর্চ্চা হইবে, জ্ঞানস্পৃহা বাড়িবে, প্রতারণা প্রবৃত্তি তিরোহিত হইবে। তাহা হইলেই জ্ঞানের আনন্দে ও চরিত্রের গাম্ভীর্য্যে ছাত্রগণের মনের বল বাড়িবে, জ্ঞানদীপ্ত মুখশ্রী উজ্জ্বল হইবে, দেহ-লাবণ্য ও কান্তির আধার হইবে, অকাল মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইবে।

চশমার অপব্যবহার।

"হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ"

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ]

বুড়ো বুড়ীর চশমা চোখে দে'খতে ভাল লাগে।
ছেলের নাকে চশমা দেখে গাত্র জ্বলে রাগে॥

মানব প্রকৃতি স্বভাবতঃ অন্যায় অসহিষ্ণু। সে পীরেরও অন্যায় দেখিতে পারেনা। রামায়ণ পাঠকালে লোকের মনে কৈকেয়ী ও মন্থরার প্রতি এবং অশোক বনে সীতাদেবীর দুর্দ্দশা পড়িলে রাক্ষসরাজ দশাননের প্রতি কেমন একটা ক্রোধ উপস্থিত হয়। আবার মহাভারত পাঠক মাত্রেই দুর্য্যোধনাদির প্রতি জাতক্রোধ হইবেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি সত্যনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের প্রতি কেমন একটা প্রাণের টান—কেমন একটা আন্তরিক সহানুভূতি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। ন্যায় ও সত্যের প্রতি মানবাত্মার ইহাই স্বাভাবিকী নিষ্ঠা। এই সরল ও সহজ ভাব কৃত্রিম সভ্যতার সংস্পর্শে বিকৃত ও বক্র হইয়া গিয়াছে। তাই আজ মানব হৃদয় পরপীড়নে আনন্দানুভব করে। "অমৃতং বালভাষিতং।" কিন্তু ছেলের মুখে পাকা কথা শুনিলে বড়ই শ্রুতিকটু লাগে। যদিও সুধীর ব্যক্তি বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও জ্ঞানেই পরিপক্ক হয়, তথাপি অকাল কুষ্মাণ্ডের বাগাড়ম্বর শুনিলে কেমন একটা অপ্রীতিকর ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। ইহা প্রায় সকলেই অনুভব করেন। আজকাল দেউড়ীতে পাকা মাথার মধ্যে যখন কাঁচা মাথায় হাত পা নাড়িয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া তর্ক করে, তখন অন্ততঃ যাঁহার মোসাহেবী করা আদৌ অভ্যাস নাই—তাঁহার কাণে যেন কেমন খটমট লাগে।

অস্বাভাবিকতা দেখিলেই মানবপ্রকৃতি

কষ্ট হয়। দুনিয়ার যেখানে যাহা সাজে ভাল, বিশ্ববাগানের মালী তাহাই দিয়া সাজাইয়াছেন। কাজেই প্রকৃতির যে দিকে চাহিবেন, কোথাও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য নাই—সব স্বভাব সুন্দর, অব্যাজ মনোহর। ঠিক বয়স না হইলে কোন গাছে ফুল বা ফল হইবে না। বর্ত্তমান ব্যস্ততা ও কৃত্রিমতার যুগে অতি সত্বর ফল প্রাপ্তির আশায় কলম বাঁধার যে প্রথা হইয়াছে, উহাতে অল্প বয়সেই বৃক্ষাদি ফল প্রসব করে বটে, কিন্তু উহার ফলবত্তা বেশী দিন স্থায়ী হয় না এবং ফলের আকৃতি ও মাধুর্য্যেরও তারতম্য ঘটে। খুব ছোট গাছে মুকুল হইলে ফলকামী গৃহস্বামী স্বহস্তেই উহা ভাঙ্গিয়া দেন; কারণ অকালে ফলপ্রসব করিলে উহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, আর ক্ষুদ্র একটী গাছে দেড়সের আম ঝুলিলে বৃক্ষটী বাঁচিবেই বা কেন? 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজ'—এ কথাটা আমরা কোনরূপ অস্বাভাবিকতা ও এঁচড়ে পক্কতা দেখিলেই বলিয়া থাকি। চোখে চশমা সাজে ভাল, কিন্তু নাকে চশমা দেখিলেই মন চটিয়া উঠে। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ ভগবানের দান। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষতঃ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবকে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অমূল্য রত্নগুলি অকাতরে মুক্ত হস্তে দিয়াছেন। যত্ন ও বিচার পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে উহারা বহুকাল বিশ্বস্ত সেবকের ন্যায় কাজে লাগে। দূরদর্শী ধীর ব্যক্তিকে কখনও শুষ্ক গাত্রে আকন্দের আঠা দিতে হয় না—খোদার চোখের উপর কৃত্রিম চোখ লাগাইতে হয় না। অতি প্রাচীন বয়সেও তাঁহার দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম থাকে।

আমাদের দেশে সবই বাড়াবাড়ি, কাজেই গর্হিত কর্ম্মেরও ছড়াছড়ি। অতি দর্পে লঙ্কা হতশ্রী, অতি বলে কৌরবকুল নির্ম্মূল এবং অতিদানে বলিরাজ বদ্ধ হইয়া 'অতি' শব্দের কটুতিক্ত কুচাল বিঘোষিত করিল। অতি ধর্ম্মে—অতি ভাবুকতায় ভারত বহুবার বৈদেশিক শত্রুর লোভ ও কোপে পড়িয়া ছারখার হইয়াছে। দেশে যখনই ধর্ম্মের বান ডাকিল—প্রেমের বন্যায় যখনই দেশ ডুবু ডুবু হইয়া উঠিল, তখন ভাবোন্মাদে ভারত আত্মবশ হারাইয়া কঠোর কর্ম্মীর কুঠারাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। তাই বলি 'এমন প্রেম করিতে হয়, চিরদিন যা' রয় সয়'। সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। অধিক মাত্রায় ঔষধ খাইলে যেমন সুফল ফলে না, তেমনি বেআন্দাজ প্রেমসুধা পান করিলেও উহাতে একপ্রকার নেশা হইয়া মানবকে মাতাল করিয়া রাখে—সংসারে ভগবানের প্রেরিত কর্ম্ম করিতে দেয়না। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে যাঁহার ভাবাবেশ হয়, তিনি যে ভাগ্যবান্ ভক্ত—তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে যিনি ভাবের নেশায় অচৈতন্য হইয়া মূল গায়কের বপু জড়াইয়া ভূতলে পড়েন, তিনি নিজেও জড় অবশ বলিয়া তখন কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না এবং অপর সকলের আনন্দ নাশ করিয়া গরম আসরের জমাট ভাঙ্গিয়া দেন। ধর্ম্মের নেশায় বুঁদ হইয়া দেশের রাজা ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের সীমান্তে যে সকল মহাবীর কর্ম্মী আসিয়া দুয়ারে হানা দিতেছিল, মহাত্মা নৃপতি ধর্ম্মমদে মাতোয়ারা হইয়া উহার কিছুই খবর রাখেন নাই। মুক্ত

হস্তে দান করিতেছেন—দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিতেছে। এই ভাবে যেই ভারত অতি ধর্ম্মে অতি প্রেমে চক্ষু মুদিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িল, অমনি পার্থিব কর্ম্মকেশরী আসিয়া একলাফে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত শুষিয়া নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। তাই বলি—সব জিনিষেরই একটা মাত্রা আছে,—কোন কাজেই বাড়াবাড়ি ভাল নহে। 'আদেখ্‌লের ঘটী হ'ল, জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল'। দেশে যখন চশমা নাকে দেওয়া রেওয়াজ হইল, তখন গঙ্গার ঘাটে, পথে, মাঠে, বাটে, খাইতে, আচমন করিতে, শুইতে, বসিতে, চলিতে, খেলিতে, গাহিতে, হাসিতে, কাঁদিতে, পড়িতে, পড়াইতে সদা সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় নাকে চশমা শোভা পাইতে লাগিল। আর চশমা না লাগাইয়া একমুহূর্ত্ত থাকা যায় না। কুঅভ্যাস এত শীঘ্রই বদ্ধমূল হয়; কিন্তু সদ্‌গুণ ও সুনীতি প্রচার বহুযত্ন ও সময় সাপেক্ষ।

বুড়ীরা বিশেষতঃ যে সকল বিধবা পূর্ব্বে 'বুড়ো' সূতা কাটিয়া পৈতা প্রস্তুত করিতেন, তাঁহারাই বৃদ্ধ কালে চোখে চশমা লাগাইয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। আর সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নকারী, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, খলিফা, ঠিকুজী-কোষ্ঠ প্রস্তুতকারী আচার্য্য, পুরোহিত গণক, জ্যোতিষী, মুহুরী, কবি, দার্শনিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কাজ করিবার সময় চোখে চশমা ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ যে সকল সূক্ষ্ম কার্য্যে চক্ষুর বিশেষে পরিচালনা হয়, উহাতেই চশমার প্রচলন ছিল। এখনও যাঁহাদের মাথার খাটুনি ভয়ানক, সর্ব্বদা লেখা পড়া করিতে হয়, তাঁহাদের উপনেত্র ব্যবহার সার্থক। কিন্তু সখের খাতিরে কতকগুলি মাথার ঘাম পায়ে ফেলা দাসত্ব লব্ধ টাকা দিয়া অহোরাত্র চশমা পরিয়া কিম্ভুত কিমাকার বাবু সাজিয়া বেড়াইলে দর্শকের মনস্তৃপ্তি না হইয়া চক্ষুঃপীড়া উপস্থিত হয়। চোখে চশমা দেওয়ারও নিয়ম আছে। কলুর বলদকে ঘানি টানাইবার সময় চোখে ঠুলি দিয়া দেয়; পাছে সে বুঝিতে—পারে 'আমাকে ক্ষুদ্র এক ঘরে ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে পাক দিতেছে অবিরত'। যদি সে জানিতে পারে যে, একই ঘরে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে, তাহা হইলে সে অবশ্যই বজ্জাতি করিয়া ঘানি টানিবেনা। কিন্তু সদা সর্ব্বদা ঠুলি দিলে সে বেচারার সহ্য হইবে কেন? ঠুলি দেওয়ার সময় আছে। তাহাকে উত্তমরূপে খৈল বিচালী খাওয়াইয়া কলু যখন ভবের গাছে জুড়িবার জন্য ঠুলি লইয়া আসে, তখন বেচারা আপনা হইতেই গলা বাড়াইয়া স্থির হইয়া চশমা লয়। কারণ সে জানে যে, এইবার খোল বিচালীর দাম উসুল করিতে কলু তাহার দ্বারা ঘানি চালাইয়া তৈল বাহির করিবে। দুনিয়ায় শুধু কে কাহাকে আদর করে? নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে সুদুর্ল্লভ। যাহাতে প্রতিদানের আশা আছে, সেটা প্রেম নয়—ব্যবসা ও বিনিময়। তুমি ভাল করিয়া আমার কাজ কর, আমি তোমায় স্নেহযত্ন করিব। বর্ত্তমান সভ্য যুগের মূল-নীতি—Give and take—ফেল কড়ি, মাখ তেল। যাহা হউক কলুর বলদের ন্যায় যেমন চাকরীজীবী আসল চোখে কাজ করিতে চাহেন না বা পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে অন্ততঃ মনিবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে তাঁহাদিগের উপাক্ষ ব্যবহার বিশেষ দোষাবহ নহে।

আর্য্যসভ্যতা বহুকাল নিজের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই সে ক্ষীণচিত্ত অবিবেকীর ন্যায় বড় বেশী নাগর হইয়া উঠিল। ভারতের অনুকরণপ্রিয়তা সাতিশয় বলবতী। আমরা যখন যে আলোকের সম্মুখে আসিয়া পড়ি, তখন মরি বাঁচি জ্ঞান থাকে না—হতভাগ্য পতঙ্গের ন্যায় উহাতে আত্মহারা হইয়া মজিয়া যাই। বর্ষাকালে রাত্রিতে উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া কত যে রং বেরংএর পোকা আসিয়া মহোল্লাসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অহার ইয়ত্তা নাই! আমরাও যখন বৈদেশিক সভ্যতালোকে ঝাঁপ দিই, তখন 'যা আছে কপালে মাসী, যাই কাশী চলে'—এই ভাবে অঙ্গ ঢালিয়া সখ মিটাই। প্রথম আবেগের উচ্ছ্বাসে পরিণাম মোটেই ভাবিনা—আমাদের বিমৃষ্যকারিতা ও দূরদর্শিতা একবারে লুপ্ত হয়। মোগল পাঠানদিগের রাজত্ব কালে অনেক সৌখীনতা ও বিলাসিতা আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিল। সমাজের নেতৃবৃন্দ অন্ধ হইয়া অনুকরণ করিতে লাগিলেন—একবারও ভাবিলেন না, এ সব বিদেশী রীতি পদ্ধতি ভারতের সাত্ত্বিক ধাতুতে সহিবে কি না। কালস্রোতে মোগল পাঠান শাসন ভাসিয়া গেল, কিন্তু আর্য্যঠাকুর পূর্ব্বের অভ্যাস বশতঃ তাঁহার মোহন বাঁশরীরূপ কলি-হুকাটী এখনও রগে হাত দিয়া তেমাথা এক করিয়া বসিয়া টানিতেছেন। একবেলা ভাত না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু মৌতাতের সময় এক ছিলিম তামাক না পাইলে পৃথিবী টক লাগে। আবার এখন ভাগ্যচক্রে ভারত পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখঝলসান তীব্র আলোকের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন উহার বাহ্য চাকচিক্যে তাহার মন গলিয়া গেল। সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হাত পা ছাড়িয়া সেই রঞ্জিত ফানুস দেখিয়া পাগল হইল। হৃদয়ের অদম্য আবেগে ঝুপ ঝাপ করিয়া পৈতা ফেলিল, টিকি কাটিল, ভাঁড়ে নাই ভবানী—তথাপি কত কষ্টে বিধবা মাতা যৎসামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, উহার দ্বারা ইংলিস বুট কিনিয়া পরিয়া ধরাকে তৃণ জ্ঞান করিয়া এমন কি স্বধর্ম্মে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া ঠাকুর ঘরে পর্য্যন্ত সবুট যাইতে উদ্যত হইল; হ্যাট কোর্ট টাই পরিয়া পা ফাঁক করিয়া চুরুট টানিতে লাগিল; হোটেলে জুতা পায়ে দিয়া কাঁটা চামচ লইয়া সাগ্রহে বড় রেকাব হইতে চপ কটলেট খাইতে আরম্ভ করিল; নাকে রঙ্গীন চশমা পরিয়া উহার উপর নীচে দিয়া তাকাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কতই আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিল। নব অনুরাগে বোতল ২ বিলাতী জিরেন রস খাইয়া, হেসিয়া দুলিয়া পগারে পড়িয়া শ্বমূত্র স্পর্শে পবিত্র হইল। সে আদৌ বিচার করিল না—'শীত প্রধান দেশের মানুষ ভারতে আসিয়া শত শত বর্ষ বাস করিয়াও তাহাদের জাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কিছুমাত্র ছাড়িল না, আর আমরা কেন গ্রীষ্মমণ্ডলে নিজের বাড়ীতে বসিয়া বিলাতী আদব কায়দা খানা পানি-পোষাক অনুকরণপূর্ব্বক গরম ধাতু আরও কুপিত করিয়া, বায়ুপিত্তের প্রকোপ জন্মাইয়া আমাদিগকে চিররোগী করিয়া ফেলি।" সে একবারও ভাবিল না—'এসাজ আমার মানাইবে কি না, এ খানা আমার সহিবে কি না; এই সব বিলাসিতা

আমি চিরদিন চালাইতে পারিব কি না। এই সব সখের দাস হইলে আমার দারিদ্র্য জ্বালা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইবে কিনা। ভারতের গরম আবহাওয়ায় আমার জন্ম, আমি যদি বিলাতী চা, কফি, কোকো, মদ, পাঁউরুটী, বিস্কুট, সিগারেট, সোডা, লেমনেড প্রভৃতি খাই, তাহা হইলে আমার প্রাচ্য ধাতুতে রস মিশিয়া আমাকে দুই নৌকার মাঝামাঝি ফেলিবে। আমার তাঁতি কুলও যাবে, বৈষ্ণব কুলও যাবে। আমি না হইব এবার সাহেব (কারণ গায়ের রং আমার কাল, মনেও তেমন বল নাই) আবার খাঁটি দেশীও হইতে পারিব না। "হংস মধ্যে বকো যথা," আমিও ভারতে থাকিয়া ইউরোপ আমেরিকার চাল চালিতে গেলেই সেইরূপ শোভাহীন ও হাস্যাস্পদ হইয়া পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করিব। হ্যাট-কোট টাই পরিয়া, নাকে চশমা দিয়া, পা ফাঁক করিয়া চুরুট টানিয়া, হেলিয়া, দুলিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেই আমি যে দেশী—সেই দেশী—কি আশ্চর্য্য, দেশীর গন্ধ তবুও গেল না। তবুও আমি ইউরোপ আমেরিকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিপুলোদ্যম সাহসী কর্ম্মবীরের ন্যায় বিশেষ নূতন কিছুই প্রস্তুত করিতে পারিলাম না। আমি পিতামাতা ভাই ভগিনী একপ্রকার ত্যাগ করিয়া কলির স্ত্রীদের কামদাস হইয়া স্বাভাবিক লজ্জাশীলা আর্য্যরমণীর ঘোমটা খুলিয়া মাঠে-ঘাটে-বাটে দাঁড় করাইলাম, এক নৌকায় পত্নীর মাথায় ছাতা ধরিয়া কত রৌদ্রে কত ঝড় তুফানে স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করিলাম, স্ত্রীর জন্য আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু সকলকে উপেক্ষা করিয়া কত ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তপ্তনিশ্বাস বাহির করিলাম, তথাপি ভাগ্য দোষে সর্ব্বতোভাবে সাহেব হইতে পারিলাম না। কত জিহ্বা উল্টাইয়া চোখ ঘুরাইয়া ইংরাজী বলিলাম, তবুও উচ্চারণ দোরস্ত হইল না—তবুও আমি পূর্ণ মাত্রায় সরল সাহেবী ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিলাম না। এখন বুঝিলাম—ভারত ইউরোপ আমেরিকা নহে; বহু চাতুরীতে ময়ূরপুচ্ছ গুঁজিলেও যে কাক সেই কাকই থাকে। কার্য্য কালে তাহার স্বজাতীয় স্বভাব পরিব্যক্ত হইয়া পড়ে। আম-কাঁঠালে কলম বাঁধা যায় কি? আমের সহিত আমের কলম হয়; আম-কাঁঠালে, জাম-লিচুতে, পেয়ারা-নেবুতে কি মিলন হয়? Mechanical Mixture বা যান্ত্রিক মিলনে একপ্রকার সংযোগ হয় মাত্র—সংমিশ্রণ হয় না। লৌহ চূর্ণ ও গন্ধক দুই শত বৎসর পাশাপাশি থাকিলেও, উভয়ে বেমালুম মিশিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন ও পৃথক্ বস্তু উৎপাদন করিতে পারে কি না তাহা বিশেষজ্ঞই বলিতে পারেন। যাহা হউক, ইউরোপ ও এশিয়া একত্র মিশিয়া যদি ভৌতিক বা অচিৎজগতে 'ইউরেশিয়া' হয় বটে, কিন্তু ভারতের সত্ত্ব ও পাশ্চাত্য রজো মিশিয়া সত্ত্বরজের অপূর্ব্ব মিলন সম্ভূত একটা আশ্চর্য্য পদার্থ এখনও মনোরাজ্যে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যেদিন দেশী কালা কৃত্রিম সাজা সাহেবের মধ্যে ভারতের দয়া, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস জ্ঞান আনন্দের অমৃত নির্ঝরের সহিত আসল পাশ্চাত্য কর্ম্মী সাহেবের উদ্যম, সাহস, একাগ্রতা অধ্যবসায়, ত্যাগ, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম, একতা, শাসন শৃঙ্খলা, বশবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিব, সেইদিনই বুঝিব প্রাচ্যপ্রতীচ্যের—ধর্ম্মকর্ম্মের

মধুর সমন্বয় হইয়াছে—সম্বরজের অপূর্ব্ব কলম ভারতের আবহাওয়ায় বেশ লাগিয়াছে।

উত্তেজনার পর অবসাদ; বাত্যার পর প্রশান্ততা; ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঠেকিয়া শিখিয়া ভারত অনেক বিষয়ে সাবধান হইয়াছে; অনেক পাশ্চাত্য বাবুয়ানা, বিলাতী ঢং ও কায়দা ছাড়িয়াছে। কিন্তু চসমা লওয়া দিন দিন বাড়িতেছে, পেট থেকে পড়িয়াই যেন চশমা লইলে ভাল হয়। এ আবার কোন্ জাতীয় সথ? আসল চোখের উপর নকল চোখ লাগাইয়া খোদার চোখের মাথা খাওয়া—এ আবার কোন্ শ্রেণীর বিলাসিতা! যৌবন সুলভ হাসি-তামাসায় প্রাণের খেয়ালে চশমা লইয়া শেষে অনেকেই খেদ করিয়া থাকেন। অল্প বয়সের স্ফূর্ত্তিও রঙ্গরস যখন স্ত্রী-পুত্রকন্যাদির ভরণ পোষণ চিন্তায় ভাসিয়া যায়; যখন কন্যাদায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মাথার ঘায়ে পাগল কুকুরের ন্যায় দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে হয়; তখন হয়ত মনে হয়—সোণার চশমাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এই দুর্দ্দিনে অন্ততঃ একখানা কাজচলা বাজেমার্কা চশমাই বা কেমন করিয়া কিনি; আচ্ছা দেখি বিনা চশমায় কাজকর্ম্ম করিতে পারি কিনা। ওমা, তাই বা হয় কই; এযে দিনদুপুরে গভীর আঁধার। অহো! যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কি কু-অভ্যাসই করিয়াছি—শুষ্কগাত্রে আকন্দের আঠা দিয়া কি কুকর্ম্মই হইয়াছে—এখন যে ঘা শুকায়-না। 'না জেনে করেছি পাপ, এখন পাই যে বড় মনস্তাপ।' এইরূপ হা হুতাশে বাবু তখন স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার—অনুতপ্ত হইয়া অহর্নিশ বিষণ্ণচিত্তে কালক্ষেপ করেন। তখন তাঁহার সদাই সেই 'নেকড়ে বাঘ ও রাখাল বালকে'র গল্প স্মরণ হয়। সত্যই যে দিন নেকড়ে বাঘ আসিল, তখন রাখালের মজামস্কারার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল। ঠিক সেইরূপ বড় মজায় চশমা লইয়া তামাসা করিয়াছিলেন। এখন সত্যই চক্ষু দৃষ্টি হীন, চশমা খুলিলেই বুঝিতে পারেন—নীরোগ নয়নে কৃত্রিম নয়ন লাগাইয়া চোখের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছেন; এখন, আর তামাসা নয়, সত্যই 'চাল্‌সে নেকড়ে' আসিয়া চোখের মাথা খাইয়াছে। অদূরদর্শী অনভিজ্ঞ কৌতুহলী যুবক যৌবনে পরের দেখাদেখি এমন অনেক কাজ করে—যাহার জন্য সারাজীবন আক্ষেপ করিতে হয়। কাঁচা বয়সে খেয়াল ও উদ্দাম ইন্দ্রিয়-ঘোটকের মুখে লাগাম না দিলে উহারা যথেচ্ছ অপথে কুপথে লইয়া গিয়া খানা ডোবায় ফেলিয়া আরোহীর অশেষ লাঞ্ছনা এমন কি প্রাণবিনাশ পর্য্যন্ত করিতে পারে।

আমাদের দেশে এমনই কুরীতি বদ্ধমূল হইয়াছে যে, চল্লিশ পার হইতে না হইতেই চশমা লইতে হইবে। 'চাল্‌শে' যেন একপ্রকার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। যে চল্লিশ পার হইয়াছে অমনি 'চালশে' আসিয়া তাহাকে ধরিবে। যাঁহার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে, তিনিও প্রথার বশে যেই শুনিলেন, তাঁহার বয়স চল্লিশ অতিক্রম করিয়াছে, অমনি উপনেত্রের জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। চক্ষু বেশ আছে, তথাপি কেমন যে একটা খট্‌কা—'গাইত' চল্লিশ পার হইল, চাল্‌শে বোধ হয় লেগেছে; দেখি একবার চশমা লইয়া কেমন পড়া যায়। এইরূপে বাপ খুড়া জ্যেঠার চশমা নাকে দিয়া পরীক্ষা

করিতে করিতে অবশেষে ২।১ বৎসরের মধ্যে একখানা চশমা কিনিয়া অনেকে তবে নিশ্চিন্ত হন। দৃক্‌শক্তি ভাল হউক বা মন্দ হউক, তিনি তাহা বড় বেশী দেখেন না। এখন যে রীতি দেশে দাঁড়াইয়াছে 'চালশে' লাগিলেই চশমা লইতে হয়,—অনেকেরই এইরূপ ধারণা। স্বাধীন চিন্তা যেন অনেকেরই নাই। অভ্যাস ও প্রথার শক্তি কি ভয়ানক! কি অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা—কি অন্ধ বিশ্বাস! যেই লোকে বলিল 'তোর কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে', আর কাণে হাত দিয়া দেখা নাই, অমনি কাকের পিছনে ছুট্‌। যেই স্ত্রী বলিল—"তোমার বয়স এখন বেয়াল্লিশ, বিনা চশমায় কেমন করিয়া দেখিতে পাও?' অমনি তাঁহার মনে খট্‌কা লাগিল 'তা হ'তেও পারে, চাল্‌শে বোধ হয় লেগেছে'। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মকথায় ত এমন অন্ধ অটল বিশ্বাস দেখিনা। কই ত বাল্যে মাতার উপদেশ মত বনে জঙ্গলে পাহাড়ে সর্ব্বত্র পদ্মপলাশলোচন হরি আছেন বালকের ন্যায় এই সরল বিশ্বাসে জগৎসংসার ত্রিভুবন হরি ময় দেখিনা। তার বেলায় ইউরোপ আমেরিকার দার্শনিকগণের মতের সহিত মিলাইয়া যদি মনঃপুত হয় তবেই বিশ্বাস হইবে। নচেৎ হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, দর্শন পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি সাপের মন্ত্র, বাজেকথা ও কাল্পিত আখ্যানে পূর্ণ বলিয়া উপহাস করিব।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—বর্ত্তমান শিল্পবিজ্ঞানের যুগে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মে আস্থাহীন ও নাস্তিক করিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে মনের বল নাই, সেইখানেই কুরীতি কুপ্রথা কুঅভ্যাস ও কুসংস্কারের প্রাবল্য। যে ভূতের ভয় করেন, তাহার কাছে গভীর অন্ধকার। শ্মশানেও ভূত নাই। আবার যাহার চিত্ত দুর্ব্বল সে পূর্ণিমার কৌমুদীস্নাত বিমল রজনীতেও কদলীবৃক্ষের মধ্যে শত শত ভূত দেখিয়া ভার্য্যার অঞ্চল ধরিয়াও বাহিরে যাইতে পারেনা। মন ব্যতীত আর কোথাও ভয়ের অস্তিত্ব নাই। বীরের হৃদয় ভীতিশূন্য; সৎসাহস তাহাকে অভয় দিয়া বলে—ওরে বীর! সত্য যদি মানুষ হ'তে চাও, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিওনা, তবেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পক্ষান্তরে বলহীনের চিত্তে সদাই সন্দেহ সংশয় আসিয়া তাহার সুখের স্বপ্ন কেবলই ভাঙ্গিতেছে। বাতরোগী অমাবস্যায় অন্নগ্রহণ করেনা—সেদিন রুটী খাইয়া থাকে। কোনদিন হয়ত পঞ্জিকা দেখিতে মনে নাই, অমাবস্যায় ভাত খাইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত খেলা করিতেছে। বেলা চারিটার সময় হঠাৎ কেহ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিয়াছে —আজ ভরা অমাবস্যা, অমনি দাদাঠাকুরের গা হাত পা কামড়াইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ জ্বরভাব—আর তাসখেলা হইলনা। হাঁই তুলিতে তুলিতে অতি কষ্টে বাড়ী চলিয়া গেলেন। আফিংখোরেরও মনের শক্তি এইরূপ। মৌতাতের সময় আফিং ফুরাইয়াছে। অথচ তখন দোকান খোলা নাই, আর অনেকটা পথও যাইতে হইবে। ইতিমধ্যে কেহ গায়ের ময়লা তুলিয়া মটরের মত গুটিকা প্রস্তুত করিয়া দিলেও, তিনি নিঃসঙ্কোচে উহা গলাধঃকরণ করতঃ সুস্থ হইবেন। তবে তাঁহার শুষ্কদেহে জীবন সঞ্চার হইবে। কিন্তু ঠিক এই সময় যদি কেহ বলিয়া উঠে—

"খুড়োমহাশয়, আপনাকে আফিং দেওয়া হয় নাই; উহা গায়ের ময়লা।' শ্রবণমাত্র খুড়োমহাশয়ের অঙ্গ অবশ—দেহ শিথিল হইয়া আসিল; সমস্ত পৃথিবী যেন গাঢ়তিমিরাচ্ছন্ন দেখিয়া খুড়ামহাশয় বসিয়া পড়িলেন। ক্ষীণ-চিত্ত ব্যক্তিগণ পাঁচজনের দেখাদেখি কুঅভ্যাসের দাস হইয়া পড়েন। অনেকক্ষেত্রে আত্মগ্লানি ও আক্ষেপ বশতঃ যখন কুরীতি পরিহার করিবার চেষ্টা হয়, তখনও সেই "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক গর্ত্ত কাটিয়া গর্ত্ত ভরাট করেন। উদাহরণ স্বরূপ সুরাপায়ীর অহিফেন ধরিয়া মদিরা ত্যাগের কথা উল্লেখ যোগ্য।

দারুণ জীবন-সংগ্রামে কোটি কোটি চাকরীজীবী দরিদ্র লোকের খেয়ালই নাই, কখন্ দিন হইতেছে, কখন্ রাত্রি আসিতেছে; বায়ু-চালিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সংসার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে। ভীষণ অন্নসমস্যায় লোকের বাপ দাদার নাম ভুলাইয়া দিয়াছে। আজ এই কার্য্য করিতেছি, ইহার ফল কি হইবে, এ চিন্তা করিবার সময় নাই। দশজনও ইহাই করিতেছে, তাহাদেরও যে দশা আমারও সেই দশা হইবে। কেরাণী বেশ বিনা চশমায় আফিসে কাজ করেন; কাজের ভিড় থাকিলে অনেক সময় বাড়ীতে কাগজ পত্র আনিয়া রাত্রিতেও লেখাপড়া করেন। কিন্তু যে দিন একদিন তামাক খাইতে খাইতে স্ত্রীর মুখে শুনিলেন—'তুমি ত কই চশমা লওনা; তোমার সাধ সখ বড় কম।' ওপাড়ার নবীনবাবু কেমন সোণার চশমা নাকে দিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া আফিসে যায়; আর তোমার বয়স তেতাল্লিশ হইল, তুমি নাতির ঠাকুরদাদা হইতে চলিলে, এখনও চশমা লওনা কেন?' সেই দিন রাত্রিতেই তাঁহার মনে হইল—তাই ত চোখটাও যেন কেমন একটু খারাপ হইয়াছে; তা হ'বারই ত কথা, কারণ চল্লিশের উপর তিনটে বছর কাটিয়াছে, এতদিন যে চসমা লইতে হয় নাই, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য; খুব যত্নে দুধ ঘি খাওয়াইয়া বাপ মা মানুষ করিয়াছিলেন, আর মায়ের দুধের জোর কত! যাই হোক, স্ত্রীর কথাটা অবহেলা করাও উচিত নয়; সে বরাবরই আমার হিতৈষিণী; ও যখন বলিতেছে, তখন চোখটা অবশ্যই খারাপ হইয়াছে"। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া শীঘ্রই একজন চক্ষু রোগের ডাক্তারকে কিছু পূজা দিয়া তাঁহার উপদেশ মত অমুক দোকান হইতে এক খানা চশমা কিনিয়া মনের খট্‌কা দূর করিলেন। স্ত্রীই কলির কামদাসদিগের জীবন কাঠি মরণ কাঠি। জীবন কাঠি স্পর্শে বাঁচিবেন, মরণ কাঠি ছুঁইলে মরিবেন। স্ত্রী যাহা বলিবেন তাহা প্রলয়ঙ্কর হইলেও শিরোধার্য্য। পুরুষের যেন নিজের বিশেষ কোন বিচার বুদ্ধিই নাই।

যাঁহারা আট, দশ ঘণ্টা আফিসে কলম পিষিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই লেখাপড়া করিতে হয়, তাঁহারা 'চালশের' ওজর দেখাইয়া চশমা লইতে পারেন। কিন্তু স্কুল কলেজের বহুসংখ্যক ছেলে মেয়ে কেন চশমা লয় ইহাও কর্ত্তাদের বিবেচ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা যে একটা সভ্যতার অঙ্গ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চক্ষুর কোন ব্যারাম নাই, তথাপি দেশে যখন চশমার ঢেউ লাগিয়াছে, তখন সেই সাময়িক বন্যায় গা ঢালিতেই হইবে।

ছড়ি চশমা, ঘড়ি, বিড়ি প্রভৃতি না হইলে ফুল বাবুই হইল না। স্কুলের তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত বেশ চলিল; তার পর যেই ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে উঠিল, অমনি তাহার চোখে এক চশমা দেখা দিল। অভিভাবকের দেখিবার অবকাশ নাই। তিনি প্রাণ সময়ে পড়িয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অহোরাত্র ল'ড়িতেছেন—ছেলে কি করিতেছে, কোন পথে চলিতেছে সেদিকে তাকাইবার অবসর নাই। স্ত্রীর মুখে শুনিলেন—ছেলের চোখ খারাপ হইয়াছে। কাজেই তাহাকে টাকা দেওয়া হইল। সে অমুক ডাক্তার বাবুর নিদেশানুসারে অমুক পাউয়ারের চশমা কিনিয়া চোখে দিতে লাগিল। মাতা ভাবিলেন—ছেলে আমার লায়েক হইয়াছে; হাতে ঘড়ি, মুখে বিড়ি, চোখে চশমা যখন ধরিয়াছে, তখন অবশ্যই হাল ফ্যাসানে সংসার করিতে পারিবে। পিতা মাতা মোটেই ভাবিলেন না—ছেলেটা বর্ত্তমান সভ্যতার আবর্ত্তে পড়িয়া আর কিছুদিন পরে যে স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বিব্রত হইয়া হাবুডুবু খাইবে। তখন তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী, অথচ বাল্যের কু-অভ্যাস গুলিও ছাড়িতে পারে না। এই সব কৃত্রিম ভাবুকতায় দেশটা আরও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হইতেছে। যাঁহার মাসিক আয় চাল্লশ টাকা, তাঁহার চা, দুধ, চিনি, পান, তামাক, সিগারেট প্রভৃতি বাজে খরচ পাঁচ টাকা। ইহার উপর আবার ফুলকুমারী স্ত্রীর জুলুম—মিছরী দানা চুড়ী, বেগমবাহার শাড়ী, তরল আলতার শিশি, দাঁতে দিবার মিশি, কেশরঞ্জন তৈল, ভিনোলিয়া সাবান, সিরাজগঞ্জের তাম্বুলবিহার, অমৃতসরের জরদা, পটলডাঙ্গার পানের খিলি ইত্যাদি।

অবশ্য ছেলেদের অল্পবয়সে যে চোখ খারাপ হয় না একথাও বলা যায় না। দেশে ভীষণ দারিদ্র্য—দারুণ অন্ন সমস্যা, তদুপরি বর্ত্তমান শিক্ষার অত্যধিক চাপ পড়ায় ছাত্র-সমাজ ক্রমশই দমিয়া যাইতেছে। বহু ছাত্র কঠোর মানসিক ব্যায়ামের হিসাবে মোটেই পুষ্টিকর আহার্য্য পায় না। প্রায় অষ্ট-প্রহর ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দে নোট মুখস্থ করিতেছে, আর খাইবার সময় সেই মামুলী খাড়া বড়ী থোড়—কলায়ের ডাল, সজিনার শাক আর পান্তা ভাত। এই খাদ্যে তখনকার লোকে বেশ সুস্থ ও সবল থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার ভীষণ গতি, প্রতিযোগিতা, দুশ্চিন্তা, স্নায়বিক অবসাদ প্রভৃতির সহিত লড়াই করিতে হইলে সেই অনুপাতে শারীরিক বল—সেইরূপ দৃঢ় মাংসপেশী—সেই পরিমিত তেজস্কর ভোজ্য অত্যাবশ্যক। স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিয়া অনেক ছাত্র জল খাবার খায়, কিন্তু তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি বা ক্ষতিপূরণ কিছুই হয় না। পাঁচ ঘণ্টা কয়েদের পর এক পয়সার মুড়ি মুড়কী বা গজা পক্কান্ন খাইলে কি আর ছাত্রের দেহে বল থাকে? কাজেই এই সব অন্নাশনবসন ক্লিষ্ট ছাত্রদিগের চক্ষুই আগে নষ্ট হয়। আবার একটা পাশ করিলেই আই, এ, বি, এ, পড়িতেই হইবে—ইহাই আমাদের দেশের রীতি। সুতরাং এই সব ভগ্নস্বাস্থ্য ছাত্র যখন সহরে গিয়া অতি কষ্টে ছেলে পড়াইয়া এক হোটেলে খাইয়া আর এক খোপে শুইয়া নিদারুণ ক্লেশের মধ্য দিয়া উপাধি লইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় জীবনের

মাথার জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে থাকে, তখন তাহার দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, দৃষ্টি-শ্রুতিহীনতা প্রভৃতি রোগে অভিভূত হইয়াও যখন নামের গায়ে সেই সর্ব্বজন বাঞ্ছিত'বড় সাধের উপাধি লইয়া ঘরে আসে, তখন লাভের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ দেহ ও যৌবন বার্দ্ধক্য লইয়া এবং রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়াও সে নামের শেষে ভুবন বিদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলমার্কা দেখিয়া প্রসূতি যেমন সূতিকাগারে সদ্যোজাত পুত্রের মুখারবিন্দ দেখিয়া সকল জ্বালা ভুলিয়া যায়, সেইরূপ খিদ্যমান মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিয়া থাকে। হায়রে! উপাধিলাভের জন্য কি অনিরোধ্য উৎকট বাসনা! কয়েক দিন এই ভাবে উপাধি দেখিয়া দেখিয়া যখন নব অনুরাগ পুরাতন হইয়া যায়, তখন দারিদ্র্য-তাড়ণে অগত্যা ভগ্নদেহে একটা মাষ্টারী জুটাইয়া লইতেই হয়। কারণ পেটের দায় বড় দায়—শুক উপাধি দেখিয়া কি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটে? এই ত গেল মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলেদের অবস্থা! তার পর যাহারা সুন্দর ভদ্রঘরের ছেলে তাঁহাদের মধ্যে বার আনা লোক চশমা লইয়া পুরা বাবু সাজিয়া বেড়ান। তবে চক্ষু খারাপ না হইলেও, তাঁহাদিগের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা সমভাবেই শোচনীয়। বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী হইতে বহির্ভূত উচ্চ উপাধি মণ্ডিত সুশিক্ষিত বাবু-দিগের জামা খোলা চেহারা দেখিলে সত্যই বুক ফাটিয়া যায়। তখন যদি কেহ বাল্মীকির ন্যায় হৃদয়বান্ মহাপুরুষ উপস্থিত থাকেন, তাঁহার রসনা হইতে মনের আবেগে নিশ্চয়ই এই মর্ম্মবাণী বাহির হইবে:—

'ওমা কলির কাষ্ঠ ভারতি! তুমি কি নিষ্ঠুর—কি পাষাণী! সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহেও কি ব্যবসাদারী ঢুকিয়াছে! ছেলের হাতে একটু মিঠাই দিয়া মা যেমন মোহরটী ভুলাইয়া লয়, তুমিও মা সামান্য একটু ধর্ম্মনীতি-হীন অগভীর অর্থকরী বিদ্যার পাঁচফোড়ন দিয়া দেশের আশা ভরসা স্থল মেরুদণ্ড স্বরূপ যুবকবৃন্দের জীবন-শোণিত শোষণ করিয়া লইতেছ!' আহা! বাছাদের দেহে আর কিছু নাই—কেবল হাড় আর চামড়া! দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। বায়ু রৌদ্র রহিত বদ্ধ স্থানের ম্লান ও নিষ্প্রভ তৃণের ন্যায় বিবর্ণ, রুগ্ন, অজীর্ণ পীড়িত, হেটমুণ্ড রগবসা, দাঁত-নড়া, জ্যোতিহীন চক্ষু বিশিষ্ট, উপাক্ষধারী, দাম্ভিক, ভাবভূয়িষ্ঠ, সংসার অনভিজ্ঞ, স্বধর্ম্মে আস্থাহীন, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট জীবন্মৃতের আকৃতি দেখিলে মনে হয়—'ভারতের সাত্ত্বিক ধাতুতে রজতমঃপ্রধান পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা এখনও সম্পূর্ণরূপে সহ্য হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

ব্যাধি-তত্ত্ব ।

জ্বরের স্বরূপ ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রী—পাইকর, বীরভূম]

জ্বর যে জীবের গাত্র তাপের অবস্থান্তর—ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইবার আমরা এই তাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই তাপের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম পরিপাক করা। যাঁহারা গায়ত্রীর অন্তর্গত ভর্গ শব্দের অর্থ ও কার্য্য-তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন—এই ভর্গের দ্বারা সমস্ত জগতের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, জগতের সৃষ্টি রহস্য ভেদ করিলেও জানা যায় যে, এক পদার্থ যে অন্য পদার্থে পরিণত হইতেছে তাহাও আলোচ্য পাকক্রিয়ার পরিণাম মাত্র। এই পাকক্রিয়ার ফলেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা জগতের যে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে—তাহারই নাম সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, আলোচ্য পাককার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে শুধু তাপের সাহায্য লইলে চলিবে না। এই কার্য্যের জন্য তাপ ব্যতীত বায়ু ও জলের বিশেষ প্রয়োজন। সমগ্র জগতের মধ্যে যেমন পাকক্রিয়া চলিতেছে, দেহমধ্যেও তদ্রূপ বায়ু, তাপ ও জলের সাহায্যে পাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। জগতের মধ্যে যে পাক কার্য্য চলিতেছে তাহার সাহায্যে জগতের আবশ্যকীয় যাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, আর দেহ মধ্যে যে পাকক্রিয়া—সম্পন্ন হইতেছে—তাহার ফলে দেহের আবশ্যকীয় রস রক্তাদি ধাতুগুলি উৎপন্ন হইতেছে। তাই আয়ুর্ব্বেদকার বলেন:—

বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিল যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিল স্তথা॥

অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু যেমন যথাক্রমে শৈত্যদান, তাপদান ও সঞ্চালন ক্রিয়ার দ্বারা জগতের ক্ষয় পূরণ করিয়া—তাহাকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত কফও দেহের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া দেহের ক্ষয় পূরণ পূর্ব্বক তাহার সংরক্ষণ করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শারীরিক তাপকে উষ্মা নামে অভিহিত করেন। এই উষ্মার পরিচয় দিতে গিয়া বলেন:—

উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরো নাস্ত্যুষ্মনা বিনা।
তস্মাৎ পিত্ত বিরুদ্ধানি ত্যজেৎ পিত্তাধিকেঽধিকম।

অন্বয়। পিত্তাৎঋতে উষ্মা নাস্তি, উষ্মনা বিনা জ্বরো নাস্তি, তস্মাৎ পিত্ত বিরুদ্ধানি ত্যজেৎ, পিত্তাধিকে তু অধিকং-ত্যজেৎ।

অর্থাৎ মানুষের শরীরে পিত্ত ভিন্ন তাপ নামক আর কোন বস্তু নাই। জ্বর নামক পদার্থ এই উষ্মা বা তাপ ভিন্ন আর কোন

কিছুই নহে। অতএব পিত্ত বিরুদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার বা কার্য্য সাধন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যখন পিত্তের আধিক্য ঘটে তখন এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখাই উচিত।

অতএব দেখা যায় যে, দেহের উষ্মা বা তাপের মূল পিত্ত। এক্ষণে এই পিত্ত দেহের কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই অবধারণ করা আবশ্যক। বৈদ্য চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, যকৃৎ হইতে যে রস চোয়াইয়া থাকে তাহারই নাম পিত্ত। অতএব যকৃৎ যন্ত্রই পিত্তের মূলাধার। যাঁহারা কেবল শাস্ত্রের কথায় সন্তুষ্ট হইবেন না আমরা তাঁহাদিগকে ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও অনুরোধ করি। অনেকেই অবগত আছেন যে, যাহাদের যকৃতের দোষ থাকে, তাহাদের শরীরের তাপ কিছু বেশীই হইয়া থাকে। আবার ঘৃতপক্ক ও তৈলপক্ক দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলেও পিত্তাধিক্য ঘটিয়া শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়, এমন কি যকৃতের ঐ দোষ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিলে অথবা দোষ না থাকিলেও ঐ সকল দ্রব্য অযথা পরিমাণে ব্যবহার করিলে সেই তাপ জ্বরে পরিণত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল—তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, দেহের স্বাভাবিক উষ্মাই জ্বর নামে পরিচিত। অপিচ, যকৃৎ নামক পিত্ত যন্ত্রই যে ইহার মূল বাসস্থান এবং এই বিশাল দেহ যে তাহা রসশক্তির ক্রিয়া ক্ষেত্র তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, জ্বরের কথা শুনিলেই আমাদের প্রাণে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতএব এ হেন ভয়াবহ জ্বরের মূল উষ্মা বা তাপ মূলতঃ আমাদের দেহের হিতকর কি অহিতকর তাহারই আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেহের বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, ইহার পদ, নখাগ্র হইতে শিরোদেশের কেশ পর্য্যন্ত যাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গই এক একটী ক্রিয়া সাধন করিতেছে। জীবাত্মার শক্তি গুলিই বিভিন্ন নামে এই সকল যন্ত্রের যন্ত্রী। অতএব জীবাত্মার যন্ত্র সমষ্টি স্বরূপ এই দেহ তাহার কোন ব্যষ্টিযন্ত্রের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারে না। কারণ ঈদৃশ সম্পর্ক ত্যক্ত হইলেই জীবাত্মার ক্রিয়ার হানি হয়। যন্ত্র গুলির মধ্যে আবার কতকগুলি মুখ্য এবং আর কতকগুলি গৌণ। বলা নিষ্প্রয়োজন, আলোচ্য যকৃত যন্ত্র একটী মুখ্য যন্ত্র। কারণ কোন জীবদেহই ইহার সহায়তা ব্যতিরেকে গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে না। যকৃত যন্ত্র উষ্মা উৎপন্ন করে এবং এই উষ্মাই পাকস্থলী-নিঃসৃত পাচক রসের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অতএব পাঠক দেখুন, যকৃৎ যন্ত্রটী আমাদের দেহ-পরিচালনের পক্ষে একটী মুখ্য যন্ত্র কিনা।

উল্লিখিত উষ্মা বা তাপের আবশ্যকতা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা এই দেহ-যন্ত্রটীকে এক খানি ষ্টীম ইঞ্জিন অর্থাৎ বাষ্পীয় কলের সহিত তুলনা করিব। অনেকেই অবগত আছেন যে, ইঞ্জিন চালাইতে হইলে পাথর কয়লা, জল ও তাপ আবশ্যক। ইঞ্জিনের বয়লারের মধ্যে কয়লা জ্বালিয়া জল ফুটান হয় এবং এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে বাষ্প উৎপন্ন হয় তাহারই সাহায্যে ইঞ্জিন চলিতে থাকে। এইরূপ আমাদের পাকস্থলী নিহিত খাদ্য দ্রব্য

যকৃৎ নিঃসৃত আপমর রসে ফুটিয়া রস উৎপন্ন করে এবং তাহাই হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে রক্তে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এই রক্তই ষ্টীম বাষ্পের ন্যায় শক্তিশীল হইয়া আমাদের যন্ত্র সমষ্টি স্বরূপ দেহের পরিচালন ক্রিয়া সম্পাদন করে। অতএব দেখা যায় যে, ইঞ্জিন চালাইতে হইলে যেমন অগ্নির সাহায্য অপরিহার্য্য, দেহের ক্রিয়া পরিচালন করিতেও তদ্রূপ উষ্মা বা তাপের আবশ্যকতা আছে। শুধু ইহাই নহে, ইঞ্জিন চালাইয়া তাহার চলৎ-শক্তি অব্যাহত রাখিতে হইলে যেমন তাপের অবিচ্ছিন্নতা আবশ্যক, তদ্রূপ দেহযন্ত্র চালাইয়া তাহার ক্রিয়া অব্যাহত রাখিতে হইলেও পিত্তজ উষ্মা অপরিহার্য্য। সুতরাং তাপ যে দেহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা বেশ বুঝা গেল।

এ হেন অত্যাবশ্যকীয় উষ্মা কি প্রকারে আমাদের দেহের অনিষ্টকর হইবে—এইবার তাহারই আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। লোকে একটা চলিত কথায় বলে যে, "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং" অর্থাৎ কোন কিছুরই বাড়া-বাড়ি ভাল নয়। অতএব আমাদের আলোচ্য উষ্মার বাড়া-বাড়িও যে ভাল নয় তাহা স্বীকার্য্য। কারণ, যে পরিমাণ তাপ শরীর যন্ত্র পরিচালন জন্য আবশ্যক, কেবল সেই পরিমাণ তাপই হিতকর। অধিকতর হইলেই তাহা যে অনিষ্টকর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এদেশের যাবৎ চিকিৎসাশাস্ত্রেই লেখা আছে যে, আহার বিহারাদি ব্যাপারের অত্যাচার করিলেই জ্বর হয়। এলোপ্যাথি, হোমিও-প্যাথি প্রভৃতি বিদেশী শাস্ত্র এইরূপ অত্যাচারের কথা বলিয়াই নীরব। বিদেশী কোন কোন গ্রন্থে অত্যাচার জনিত বায়ু পিত্ত ও কফ বৃদ্ধির জন্য জ্বর হয় বলিয়া একটা মোটামুটী উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ইহার যেমন সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়াছেন তেমন আর অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বাগ্‌ভট্‌ বলেন,—

মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং দোষাহ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিঃ জ্বরদাঃস্যুঃ রসানুরগাঃ।

অন্বয় মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং আমাশয়াশ্রয়াঃ দোষাঃ রসানুগাঃ (সন্ত।) কোষ্ঠাগ্নিং বহির্নিরস্য জ্বরদাঃস্যুঃ।

বঙ্গানুবাদ—। দূষিত বা দুষ্পাচ্য খাদ্য ভোজন এবং অনিয়মিত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি বিহার এই দ্বিবিধ কার্য্যের দ্বারা আমাশয়ে বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ উৎপন্ন হয়। সেই দোষের সংঘর্ষে কোষ্ঠস্থ অগ্নি স্থানচ্যুত হইয়া অজীর্ণ রসের অনুগমন করে। অজীর্ণ রস এইরূপে তাপযুক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হয় এবং তাহার ফলে শরীরের স্বাভাবিক তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব উল্লিখিত দোষজ প্রতপ্ত অজীর্ণ রসই জ্বরদায়ক হয়।

আয়ুর্ব্বেদকার আরও বলেন—

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষাস্তস্মা লঙ্ঘনমাচচেৎ॥

অন্বয়। আমাশয়স্থ ! সামঃ দোষঃ
অগ্নিং হত্বা মার্গান্ পিধাপয়ন
জ্বরং বিদধাতি, তস্মাৎ লঙ্ঘনমাচরেৎ।

বঙ্গানুবাদ। আমাশয়ে সমাগত বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ তত্রত্য উদরাগ্নিকে হীনবল করতঃ তাহার পরিচালন পথগুলিকে

অবরোধ করে এবং তাহার ফলে তাপের গতি রুদ্ধ হইয়া তাপ বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্বর হয়। অতএব এরূপ দোষ উপস্থিত হইলে উপবাস করা উচিত। কারণ পাচকাগ্নির মার্গ রুদ্ধ হইলে তাহা যথাস্থানে উপনীত হইয়া খাদ্য বস্তু জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। ফলে তাহা সমাগত দোষেরই বর্দ্ধক হয়।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে জ্বরের পূর্ব্ব অবস্থা যে শরীরের স্বাভাবিক তাপ তাহা বুঝা যায়। তাপ ও জ্বর যে অগ্নির ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট—তাহাও বুঝিতে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ কম তাপ হইতে বেশী তাপ হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে, কিন্তু পিত্তই যে তাপের মূল তাহা স্বীকার করিতে গিয়া ইতস্ততঃ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি বটে কিন্তু সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইলে পিত্তই যে তাপের মূল—তাহার ব্যবহারিক প্রমাণ আবশ্যক। সুখের বিষয় সুশ্রুতই ইহার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব আমরা সুশ্রুতেরই লিখিত সংস্কৃত ভাষা উদ্ধৃত করিয়া তাহারই বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

অত্র জিজ্ঞাস্যং কিং পিত্ত ব্যতিরেকাদান্যোঽগ্নি রাহোস্বিং পিত্ত মেবাগ্নিরিতি।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে দেহ মধ্যে পিত্ত ভিন্ন অন্য কোন অগ্নি আছে কি পিত্তই অগ্নি? অত্রোচ্যতে:—ন খলু পিত্ত ব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নি রুপলভ্যতে।

ইহার উত্তরে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পিত্ত ভিন্ন অন্য কোন দ্বিতীয় অগ্নিরই উপলব্ধি হয় না।

অতঃপর শাস্ত্রকার এরূপ উপলব্ধির কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন:—

আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তে দহন পানাদিষভি— বর্ত্তমানে অগ্নিবদুপচার ক্রিয়তে।

ইহার অন্বয় যথা,—দহন পচনাদিষু অভি-বর্ত্তমানে পিত্তে আগ্নেয়ত্বাৎ অগ্নিবৎ উপচার ক্রিয়তে।

অর্থাৎ অগ্নি যেমন দগ্ধ করিতে ও পাক করিতে সক্ষম, পিত্ত তদ্রূপ দহন পচন ক্রিয়ায় সমর্থ। সুতরাং পিত্তের মধ্যে আগ্নেয়ত্ব থাকা প্রযুক্ত পিত্ত অগ্নির সমধর্ম্মী তাহা প্রমাণিত হইল।

শুধু ইহাই নহে। শাস্ত্রকার পিত্তকে অগ্নির ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া—তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন:—অন্তরগ্নি ক্ষীণে সতি তৎসমান দ্রব্যোপযোগাৎ অতিবৃদ্ধে শীত ক্রিয়াপযোগাৎ আগমাচ্চ পশ্যামো ন খলু পিত্ত ব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরিতি।

এইবার শাস্ত্রকার তিনটী প্রমাণ দিতেছেন:—

(১) অন্তরগ্নি অগ্নি গুণে ক্ষীণে সতি তৎসমান দ্রব্যোপযোগাৎ। অর্থাৎ যখন অন্তরগ্নির অগ্নির গুণ কমিয়া আসে তখন তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য অগ্নি বর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়।

(২) অতিবৃদ্ধে শীতোপযোগাৎ অর্থাৎ অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জললেকাদিরই ব্যবস্থা করিতে হয়।

এবং ৩য় প্রমাণের উল্লেখ করিতে গিয়া সুশ্রুত বলিতেছেন—আগমাৎ চ। অর্থাৎ বেদাদ শাস্ত্র পাঠেও পিত্তের আগ্নেয়ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদকারক এইরূপে পিত্তের আগ্নেয়ত্ব প্রমাণ করিয়া তাহাকে যথাক্রমে পাচকাগ্নি, সাধকাগ্নি, রঞ্জকাগ্নি, আলোচকাগ্নি ও ভ্রাজ-

কাগ্নি এই পঞ্চপ্রকার অগ্নি নামে অভিহিত করিয়া দেহ মধ্যে তাহার পঞ্চ প্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব পিত্ত যে অগ্নির সমধর্ম্মী—তাহা কি ব্যবহারিক কি শাস্ত্রতঃ দুই প্রকারেই প্রমাণিত হইল। আমরা বায়ু, পিত্ত ও কফের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে পিত্ত সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিব বলিয়া এখন আর তৎসম্বন্ধে বেশী কিছু বলিলাম না।

(ক্রমশঃ)

রথযাত্রা।

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

বর্ষার বারি-সিক্ত বিরস-সন্ধ্যায়—অন্ধকার কক্ষে বসিয়া বহিঃপ্রকৃতির বিস্তীর্ণ বক্ষে, অবিরল ধারাপাতের দিকে চাহিয়াছিলাম। ঘন-মসী-লিপ্ত দূর দিগন্তের ক্রোড় হইতে প্রবল ঝঞ্ঝা ছুটিয়া আসিতেছিল; আমার মনে হইতেছিল—"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" বিরহী যক্ষের চ'ক্ষের জল বৃষ্টিছলে ধরাতলে আজ বুঝি ঝরিয়া পড়িতেছে, ঝটিকা তাহারই ক্ষুব্ধ আত্মার দীর্ঘশ্বাস।

ঠিক এই সময়—খাকীরঙের পোষাক পরা একজন পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী আসিয়া হাজির। তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম। প্রাপ্তির সময় ও নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া আমি উহা গ্রহণ করিলাম। পড়িয়া দেখিলাম —বালেশ্বরের জমীদার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার অরবিকার হইয়াছে, তিনি আমাকে ক্ষিপ্রগতিতে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। সেই বিপদবার্ত্তা ও সানুনয় আহ্বান—বিজাতীয় অক্ষরে লেফাফা বদ্ধ হইয়া আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত।

এইখানে রমেশ বাবুর একটু পরিচয় দিব। তিনি বালেশ্বরের জমীদার হইলেও তাঁহার বাটী চুঁচুড়া সহরে। আমি তাঁহার প্রতিবাসী। তিনি চিরদিন স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, দশের কার্য্যে অগ্রণী। তাঁহার বয়স প্রায় ৭০,—কিন্তু মুখমণ্ডলের ভাবব্যঞ্জনা এখনো তরুণ জনোচিত। মাথার চুল পাকিয়াছে, ভূয়িষ্ঠ-রোম ভ্রূযুগ শুভ্র হইয়া গিয়াছে, তথাপি বার্দ্ধক্য—তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একটীও রেখাপাত করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গিতে—মহৎকুলোদ্ভব পুরুষ-প্রধানের মহিমা পরিস্ফুট। তিনি—আয়ুর্ব্বেদের ভক্ত, ইউনানীর উপাসক, জীবনে কখনও ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করেন নাই।

রমেশ বাবুর পীড়িতা কন্যাকে আমি আমার কন্যার মতই ভাল বাসিতাম। আমার চ'ক্ষের সম্মুখে—ক্ষুদ্র সূতিকা গৃহের ক্ষীণ দীপালোক সহসা উজ্জ্বল করিয়া, মর্ত্ত্যের বাতাসের সঙ্গে এই বালিকার প্রথম নিশ্বাস মিশ্রিত হইয়াছিল। এখনও আমার জীর্ণ শরীর—তাহার শৈশব-দৌরাত্ম্যের [illegible]

স্মৃতির মাঝে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের "পুঁটী" আর সে পুঁটী নাই,—পঞ্চদশ বৎসরের আনন্দময় স্মৃতি আমাদের মধ্যে লোপ পাইয়া গিয়াছে। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা —এখন "গণেশ জননী"—দুই তিনটী ক্ষুদ্র শিশু তাহার অঙ্কশোভা করিয়াছে; কিন্তু আমার কন্যা-স্নেহ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া, সেই আদরিণী গণেশ জননী—অদ্যাপি আমার কাছে অষ্টম বর্ষীয়া গৌরী রূপেই বিরাজিতা!

সেই 'পুঁটীর' সাংঘাতিক রোগ, আমি কি স্থির থাকিতে পারি? পরদিন অতি প্রত্যুষে বালেশ্বর যাত্রার সঙ্কল্প করিলাম। আমার সঙ্গী হইলেন—আমার সুখ দুঃখের অকৃত্রিম সুহৃদ —আমার সাহিত্য সাধনার সর্ব্বপ্রধান সহযোগী—"চুঁচুড়া বার্ত্তাবহের" সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় দীননাথ মুখোপাধ্যায়।

হাওড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া, বি, এন্ আরের বুকিং আফিসে গিয়া, দীননাথ দুইখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন। পুরীযাত্রী ট্রেণ ছাড়িবার তখনও দেড় ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। দীননাথ পুল পার হইয়া বড়বাজার হইতে কতকগুলি আবশ্যকীয় জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। এইবার ট্রেণে উঠিবার পালা। আমি কিন্তু বিপদে পড়িলাম; প্রত্যেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়—দেখি—শালপ্রাংশু শ্বেতাঙ্গ দল এক একখানি সম্পূর্ণ বেঞ্চ অধিকার করিয়া,—স্থিতিস্থাপকতা গুণে সোজা শুইয়া আছেন, তাঁহাদের পদতলে— লোলজিহ্ব রক্ত চক্ষু ভীষণ কুক্কুর বসিয়া বসিয়া লালা-প্রসেক ও শ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে। আমি নগণ্য 'নেটিভ,'—সাহেবের কুকুরের সহযাত্রী হইতে সাহস করিলাম না। মধ্যম শ্রেণীর এক অপ্রশস্ত কক্ষে উঠিয়া বসিলাম। দীননাথের দেহে যথেষ্ট বল ছিল,—তিনি সাহেবদের সঙ্গে তর্ক করিয়া কুকুর গুলাকে অন্য গাড়িতে তুলিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, শেষে কিন্তু আমার অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মধ্যম শ্রেণীর আরোহী হইলেন। বন্ধুবরকে দেখিয়া তখন বোধ হইতে লাগিল—যেন প্রলয়-সহচর বৃকোদর— কৌরব সভায় দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা দেখিয়া, অনেক কষ্টে আপনাকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন! গাড়ীতে ভয়ানক ভিড়। আমি খর্ব্বাকায়—কোনও প্রকারে একটু বসিবার স্থান করিয়া লইয়াছিলাম; বিরাটকায় দীননাথ সেকেণ্ড ক্লাসের অধিকারী হইয়াও— আমারই সঙ্গ দোষে—মধ্যম শ্রেণীর দ্বারদেশে, কালের মত অখণ্ড দণ্ডায়মান। গাড়ীর ছাদ সংলগ্ন—বক্রাস্য লোহার সিকে—ছাতার বাঁট আট্‌কাইয়া দিয়া কোনও মতে স্ব-শরীরের ঋজু-ভাব রক্ষা করিতেছিলেন। বন্ধুর শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া আমি বড় লজ্জিত হইলাম। কিন্তু তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না। ট্রেণ তখন হুহু শব্দে চলিতেছিল। কুত্তার-কামুড়ে কসৌলি যাত্রার চেয়ে, দাঁড়াইয়া থাকিয়া লম্বেগো হওয়াও ভাল—এই কথাটাই আমার মনে পড়িতেছিল।

এইরূপ দুর্দ্দমনীয় দুঃখ ভোগ করিতে করিতে—বন্ধু একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলেন। ট্রেণ সাঁতারগাছি ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। একটা লোক নামিয়া গেল। উত্তরাধিকারী সূত্রে দীননাথ তাহার স্থানে একটু কাৎ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। ট্রেণ আবার চলিতে লাগিল। একজন চন্দন লিপ্ত ভাল স্ফীতোদের মাড়োয়ারী—তাহার গাঁট্রী হইতে গোটাকতক আম বাহির করিয়া—ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যাত্রার দলের একটা বয়াটে ছেলে—গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে লাগিল। আমার সম্মুখে বসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের এক ভদ্র লোক তাম্রকূট সেবনে তন্ময় ছিলেন, এতক্ষণ পরে তাঁহার একটু হুঁস্ হইল। তিনি ভস্মশেষ কলিকাটী—হুঁকা হইতে নামাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—' কর্ত্তা! তামাক ইচ্ছে করবান্?" আমি ইচ্ছে" করিলাম না দেখিয়া, তিনি আবার উহা টানিতে লাগিলেন। হয়ত আমাকে অসভ্যও ভাবিলেন! ভদ্রলোকটীর পার্শ্বে পঞ্চত্রিংশ বর্ষীয়া এক প্রৌঢ়া বসিয়াছিলেন—বোধ হয় সম্বন্ধে পত্নী। রমণী একটা কার্পেটের ব্যাগ হইতে একটী টিনের কৌটা বাহির করিলেন। এই কৌটার মুখ দুই দিকে। একদিকের মুখের ঢাকনী খুলিয়া—রমণী কিঞ্চিৎ তামাকু বাহির করিলেন, অন্য দিকের মুখ হইতে—টিকা বাহির হইল। তামাকু ও টিকার রাসায়নিক সংযোগে আর একটী কলিকা প্রস্তুত হইল। আমার বিশ্বাস ছিল—এবার বোধ হয় রমণীটি তামাকু ইচ্ছা করিবেন, কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা দেখিলামনা,—পুরুষটী, উহা টানিতে আরম্ভ করিলেন।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চক্ষে কেন্দ্রীভূত করিয়া আমি সেই অপূর্ব্ব ধূম্রপান দেখিতে লাগিলাম। আমার ধারণা জন্মিল—তামাকুর কলিকা হইতে—কল্কী অবতার, কলিযুগ ও কলিকাতা সহরের উৎপত্তি। তাই তামাকু খাওয়াটা—নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিরই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। একজন রসিক বলিয়াছিলেন—অতিথি অভ্যাগতকে তামাকু দেওয়া—গৃহস্থের পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। একথা অবিশ্বাস করা চলে না। কেন না প্রত্যেক ষ্টেশনেই স্ত্রীলোকটী এক একটী নূতন কলিকা প্রস্তুত করিয়া পুরুষটীকে দিতে লাগিলেন। নিজে একবারও খাইলেন না। ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। স্ত্রীজাতির প্রণব উচ্চারণে অধিকার নাই, কিন্তু পূজার উদ্যোগ আয়োজন করিয়া দিবার অধিকার আছে। স্ত্রী-জাতি তামাকু খাইতে পারিবেন না, কেবল সাজিয়া দিতে পারিবেন। ক্রমে হুঁকার অবস্থা দুঃখজনক হইয়া উঠিল। তথাপ বিরাম নাই,—ভদ্র লোক ধূমপান করিতে লাগিলেন এবং পুঁটলী হইতে একখানি পকেট সংস্করণের গীতা বাহির করিয়া অনুচ্চস্বরে পড়িতে লাগিলেন। বোধ হয় তিনি সেই অধ্যায়টী পড়িতেছিলেন—যে অধ্যায়ে শ্রীভগবান বিভূতি বর্ণনায় বলিয়াছিলেন—"বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽহং" তাহারই উপসংহারে অর্জ্জুন-সখার লেখা উচিত ছিল—নেশানাং তাম্রকূটোঽহং।" তাহা হইলে সৃষ্টি রহস্যও অনেকটা সরল হইয়া আসিত। হায় ত্রিকালজ্ঞ বাসুদেব! তোমারও এত ভ্রম!!

মহাকায় দৈত্যের ন্যায়—আমাদের মত—ক্ষীণ, সবল, দীর্ঘ, খর্ব্ব, ভদ্র, অভদ্র,—স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি মানুষকে বিরাট উদরের গহ্বরস্থ করিয়া ট্রেণ চলিতেছিল। অষ্ট ঘটিকা ব্যাপী সুদীর্ঘকাল—তাহারই কুক্ষিতলে বিলীন হইয়া গেল। গোধূলির হিরণ্যদীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে অবলিপ্ত করিয়া আমরা দুই-বন্ধুতে বালেশ্বরে অবতরণ করিলাম। রমেশ বাবুর লোক

ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা অশ্বযানে আরোহণ করিয়া—"বার বাটীতে" উপস্থিত হইলাম।

এইখানে রমেশ বাবুর বাড়ী। বড়লোকের অট্টালিকা। কক্ষগুলি বৃহৎ, প্রত্যেক দ্বার ও বাতায়ন বৃহদায়তন। চারিদিকে বারান্দা। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ জলাশয়, উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ঘাস-শস্যাবৃত প্রান্তর, তাহারই মাঝে মাঝে—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চারিটী আম কাঁঠালের গাছ—পূর্ব্বতন সযত্ন রক্ষিত উদ্যানের অবশেষ।

দ্বিতলের এক সুসজ্জিত গৃহে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর আমি বালিকাকে দেখিতে গেলাম। সে দিন জ্বরের দ্বাদশ দিন—জ্বর খুব বেশী, উদরাধ্মান, শুষ্ককাস, অসহ্য তৃষ্ণা, এই গুলি প্রধান উপসর্গ। তবে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। দিন কতক ভুগিয়া কন্যা ভাল হইবে—রমেশ বাবুকে ইহা বুঝাইয়া দিলাম। আমার কথায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিশ্রাম গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখি—বিরাট ব্যাপার! মর্ম্মর মণ্ডিত বৃত্তাকার টেবিলের উপর—খাঁটী দুগ্ধের প্রস্তুত "চা", —তাহার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুপান—খাঁটী ঘৃতে ভাজা খাঁটী ময়দার শশি-শুভ্ররুচি গরম লুচি। সকালে—অদৃষ্টে অন্ন জুটে নাই, হাওড়া ষ্টেশনে—যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইয়াছিলাম। মরুময়ী ক্ষুধা—আমাদের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল! আবেশ তরল নেত্রে—খাদ্য দ্রব্যের পানে চাহিয়া—বন্ধু আমার ভাবিতেছিলেন—এই বুঝি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার! এই বুঝি মানবের ইহকালের সর্ব্বস্ব। পথকষ্ট ভুলিয়া—আমরা আহার করিতে বসিলাম। ভোজন পুরাণের এক একটী অধ্যায়ের মত আমাদের পাতে—সন্দেশ, রসগোল্লা, কচুরি, খোঁদে, গজা, মোহনভোগ স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। আঁকড়ার" দধি, "সর"র সুমিষ্ট-ক্ষীর, "বালেশ্বরের" তাজফেনী—গোমুখীর ধারার ন্যায় অশ্রান্ত ধারায়—আমাদের বুভুক্ষা-ক্ষাম-কণ্ঠ মুহূর্ত্তের মধ্যে সরস করিয়া তুলিল! মরি! মরি! আষাঢ়ের দারুণ 'গুমটে'—বসন্তের এ মধুর মলয়োচ্ছ্বাস—কোন্ যাদুকরের আমদানী? হায়—রমেশচন্দ্র! দুইটী ক্ষুদ্র জীবকে মজাইবার জন্য—এ তোমার কি মারাত্মক প্রলোভন! ঈশ্বর! তুমি মানুষের হাত পা' চক্ষু কর্ণ—সমস্তই দুইটী দুইটী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ—পেট্ কেন দুইটী কর নাই? একটা পেটে আর কত খাবার ধরিবে? হে অপরিণামদর্শী—বিশ্বস্রষ্টা! মরণের দেবতা শিবের শুনিয়াছি পাঁচটী মুখ, আমাদের কেন তাহাই দিলে না? না হয়—খাইয়াই মরিতাম। এ খাবার ফেলিয়া রাখা যে—পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বলক্ষণ!

তরুণ পাঠক! পেটুকতার এই আতিশয্য ও অসঙ্গতিতে হয় ত তোমরা বিরক্ত হইতেছ; কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি—সে' সময়ের সেই খাঁটি ঘৃতে ভাজা তপ্ত লুচি—এখন তোমরা হজমও করিতে পারিবে না! তোমাদের যুগ—ভেজালের যুগ;—ডিস্‌পেপসিয়া তোমাদের জীবনসঙ্গিনী; ভোজনের মর্ম্ম তোমরা কেমনে বুঝিবে? এখন যে বেশী খায়—তোমাদের কাছে সে অসভ্য!

বালেশ্বরে মাত্র দুই দিন থাকিয়া দীননাথ বিদায় লইলেন। রমেশ বাবু আমাকে ছাড়িলেন না। "কন্যা আরোগ্য না হইলে—আমার আর যাওয়া হইবে না। দীননাথ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সম্পাদক—তিনি কি আমার অপেক্ষায় থাকিতে পারেন? সুতরাং আমাকে একা ফেলিয়া বন্ধুবর প্রস্থান করিলেন।

প্রায় এক পক্ষ—কখনও অজ্ঞান কখনও সজ্ঞান অবস্থায় রোগের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বালিকা সে যাত্রা রক্ষা পাইল। আমারও কর্ত্তব্য ফুরাইল। আমি দেশে ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম। তথাপি রমেশ চন্দ্র আমাকে ছাড়িতে চাহেন না। নানা ওজর আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। শেষে একদিন বলিলেন—"রথের আর ছয় দিন বিলম্ব আছে। এত নিকটে আসিয়া সে রথ দেখিবেন না? আপনাকে এবার পুরীতে লইয়া যাইব ভাবিয়াছি। তাই আপনার চুঁচুড়া যাত্রায় বিলম্ব ঘটাইয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

বালেশ্বরে—অপরিচিত স্থানে একটী বন্ধু পাইয়াছিলাম। তিনি—প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ হাজরা। দেবেন বাবু—অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রূপে এক বর্ষ কাল বালেশ্বরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা—"রথ যাত্রা" দেখেন। রমেশ বাবুর প্রস্তাব—তিনি সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। স্থির হইল—৩ দিন পরে আমরা পুরী যাত্রা করিব।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইবার শুভযোগ আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত। রথ দেখার আশা, স্বর্ণ মৃগের মত, আমার চিত্ত-রাঘবকে বারংবার প্রতারিত করিতে লাগিল। আমি সম্ভাবিত আনন্দ স্বপ্নে মগ্ন। বাসনা ও তৃপ্তির মধ্যে আর ৪টী দিন ব্যবধান! তৃতীয় দিবসে—প্রাতঃকালের ট্রেণে আমরা পুরী যাত্রা করিলাম। আমার সহযাত্রীর দলটী বেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্ব সমেত আমরা কুড়ি জন। সৌমমূর্ত্তি ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ হাজরা—তাঁহার জামা, কাপড় ও চাদরে—অসাবধানতার বিনাশ—ইউকেলিপ্‌টাস্—মাখিয়া অ্যান্টিসেপ্‌টিক্ ও ব্যাক্‌টেরিয়া শূন্য করিয়া লইয়াছিলেন। হরিচরণ বাবু—একজন হোমিওপাথ—তাঁহার হাতে—"পলশেটিলা, নক্স সম্বলিত বক্স"। রমেশ বাবু স্বয়ং, তাহার দুই জন ভৃত্য, একজন দাসী, ম্যানেজার, গোমস্তা, পাচক,—তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী প্রভৃতি। পূর্ব্ব হইতে গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের গমন পথ পুষ্প ময়।

বেলা ১১ টার সময় আমরা পুরী পৌঁছিলাম। সেই পুরী—যেখানে বৌদ্ধ যুগের জীর্ণ স্তূপের ভিত্তির উপর—অভিনব নয়নাভিরাম হর্ম্ম্যরাজি সুশোভিত; যেখানে ভাস্বর্য্য ও শিল্পের জ্যোতিঃ—জ্বলজ্বলায়মান! যেখানে—সমাজের ক্ষুদ্র বা জীবনের অশান্তি জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা—মর্ত্ত্যের মলিন মৃত্তিকায় মিশিয়া গিয়াছে। সাগরমেখলাপুরীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি মুগ্ধ হইলাম।

সেবার মহা প্রভুর "নবরাগ", কাজেই বহু লক্ষ যাত্রীর একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্র—মহামানবের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত। পথ, পল্লী, প্রান্তর, চত্বর কোলাহল চঞ্চল। চারিদিকে বিরাট জনতা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত

মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান। এমন ভিড়, এত লোক—জীবনে কখনও দেখি নাই। পুরীর পুণ্যভূমিতে আজ—একাধারে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা! জগতের জীব—জগন্নাথের জয় ধ্বনি, করিতে আসিয়াছে। এই বুঝি মত সমন্বয়ের—ধর্ম্ম সমন্বয়ের জাতি সমন্বয়ের অভ্রান্ত নিদর্শন!

আমরা—বহুকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া রমেশ বাবুর সমুদ্র তীরস্থ বাঙলাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম

সকালে—পুরীর পথে, চুঁচুড়া নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডেবুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত দীন নাথ দে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল—এবার ভয়ানক কলেরা হইতেছে। আমার বুক একেবারে দমিয়া গেল। বন্ধুগণ জানেন-আকাশে মেঘ দেখিলে আমি নৌকায় চড়িতে পারি না, কোথাও কলেরা হইতেছে শুনিলে সেখানে থাকিতে ভরসা করিনা,—ইহাই আমার জীবনের দুর্ব্বলতা। পুরীতে সেবার রথের যেমন ধুম, কলেরারও তেমনি প্রাদুর্ভাব। বাসার ফিরিবার সময়—রাস্তায়, চটিতে অনেকগুলি শব পতিত রহিয়াছে দেখিলাম। আমার দেবদর্শন কামনা-গভীর বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

আর কি পুরীতে থাকিতে সাহস হয়? রমেশ বাবুকে বলিলাম—"আজই বাড়ী ফিরিব—জগন্নাথ দেখা আমার মাথায় থাক।" দেখিলাম—তাঁহার চির প্রফুল্লমুখ—আমার কথায়—কাল বৈশাখীর অপরাহ্নের মত নিতান্তই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ডাক্তার হালদার, হোমিওপ্যাথ্ হরিবাবু, আমাকে ভরসা দিতে লাগিলেন।

রাত্রে আমার ঘুম হইল না—প্রহরে প্রহরে গৃহ প্রাচীরে আমি কেমন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতেছিলাম। আর ভাবিতেছিলাম—কেমন করিয়া ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই? আমার অবস্থা তখন—রোম ধ্বংসকালীন পলাতকের মত। সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিলাম। সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। সেই সুযোগে শয়ন গৃহের অর্গল বদ্ধ দ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া,—বাহিরে আসিলাম। কবরের পার্শ্বচারী প্রেতের মত খানিকক্ষণ পথে পথে ঘুরিলাম, তার পর একেবারে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। মূর্খের সম্মুখে—অক্ষরময় গ্রন্থের ন্যায়—আমার সম্মুখে মহাপ্রভুর সিংহ দ্বার চিররুদ্ধ হইল।

চুঁচুড়ায় আসিলাম। দীননাথ অনেক তিরস্কার করিলেন. বলিলেন—"জীবনে আমি এই একজন মূর্খ দেখিলাম, যে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া জগন্নাথ না দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে!" সকলের বিদ্রূপ উপহাসের মধ্যে—আমার অবস্থা ভীম হস্তে নিগৃহীত জয়দ্রথের মত শোচনীয় হইয়া উঠিল! হায়! অনুশোচনায় অতীত তো ফিরিয়া আসিবে না। পৌনঃপুনিক জন্ম বিজৃম্ভিত, অশীতি লক্ষ যোনিতে ভ্রাম্যমান্ জীব আমি—সত্যই কি কাষ্ঠের রথে দারুভূতো মুরারিকে দেখিলে মুক্তি লাভ করিতাম? সত্যই কি পুরীধামে গিয়া জগন্নাথ না দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আমি একটা মস্ত ভুল করিলাম?

ঋষি বলিয়াছেন—"রথস্থ বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" বাঙ্গালী কবি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

"চক্র নেমির ঘর্ঘর নাদে নির্ঘোষি রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজের রথ।

কে আছিস্ ওরে আয় চেয়ে দেখ একবার,
রথের উপরে বামণ দেবতা, জন্ম হবে না আর।"

কৈ প্রাচীন ঋষি, নবীন কবি, কেহই তো রথের উপর জগন্নাথ দেখিবার উপদেশ দিতেছেন না; বামণ কে দেখিতে বলিতেছেন। তোমরা হয় তো তর্ক তুলিবে—জগন্নাথের অনন্ত বিশেষণ, বামণ তাঁহারই একটী নাম। উত্তরে আমি বলিব বামণ শব্দটী অতি রহস্যময়। যিনি সর্ব্বস্থানে প্রবেশ করিতে পারেন, যিনি অণোরনীয়ান' হইয়াও ত্রিলোক ব্যাপক—তিনিই "বামণ"। এই বামণের আর একটী উপাধি—কাল। কালই একদিন দানবরাজ বলিকে ত্রিপাদ দর্শনচ্ছলে বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত—নিজের এই ত্রিবিধ গতি বুঝাইয়াছিলেন, ত্রিভুবন—কালাক্রান্ত, কালরূপী বামণ—জীবের আত্মা। তোমরা একবার ভাল করিয়া পুরাতন রথের রূপকটা শুন;—

মানুষের শরীরই রথ, আত্মা—সেই রথের "রথী"। বুদ্ধি—"সারথি;" মন—অশ্ব রজ্জু, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব"। এই শরীর রূপ রথে আত্মারূপী, বামণকে যে দেখিতে পারে—তাহারই আর পুনর্জ্জন্মের ভয় থাকে না। কিন্তু শরীরস্থ আত্মাকে দেখা কি যাহার তাহার কাজ? তাই তোমার আমার মত মোহমুগ্ধ জীবের জন্য—"রথযাত্রার" ব্যবস্থা। আগে কাঠের রথে কাঠের জগন্নাথ দর্শনে ভক্তিমার্গে উন্নীত হও, তবে আত্মাকে দেখিবার শক্তিলাভ করিবে। এই কঠোর আধ্যাত্মিক ভাবই "রথোৎসব"।

তাহার পর দেখ—জগন্নাথ যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানের নাম 'পুরী"। আমাদের এই দেহেরও একটী নাম পুরী। এই জন্যই জীবাত্মাকে 'পুরুষোত্তম" বলে। পুরুষোত্তম অর্থাৎ জীবাত্মার দর্শন লাভ ঘটিলে, জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তাই মুক্তি লাভের আশায়—মুমুক্ষু সাধক জন্ম জলধির কূলে অধিষ্ঠিত, পরমাত্মাকে দেখিবার জন্য—ব্যগ্র হইয়া, রূপকচ্ছলে বঙ্গসাগরের কূলে—পুরীধামে পুরুষোত্তম জগন্নাথকে দেখিতে যান।

যেমন যোগাভ্যাস করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে "কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রসন্ন করিতে হয়, তেমনি পুরীধামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে "বিমলাদেবীকে" পূজা করিতে হয়। পুরীক্ষেত্রে—"ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর" "শ্বেতগঙ্গা" প্রভৃতি ছয়টী তীর্থ আছে, ঐ ষট্‌তীর্থে যাত্রীগণ অনেক বৈদিক কর্ম্ম করেন। ইহার অর্থ—ষড়ঙ্গ যোগে সিদ্ধ হইতে না পারিলে, সাধকের আত্মজ্ঞান জন্মে না।

দারা, পুত্র, মায়া মমতাদি—তত্ত্বজ্ঞানের অষ্টাদশ প্রকার বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে প্রথমেই এই সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিতে হইবে। পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ ১৮টী নালা" আছে। ঐ "আঠারো নালা" পার হইলে—তবে মহাপ্রভুকে দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক প্রবাদ—তত্ত্বজ্ঞানের মহা বিঘ্ন বোধে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার অষ্টাদশ পুত্রকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিলেন; সেই অষ্টাদশ পুত্রই "আঠারো নালায়" পরিণত হইয়াছে।

পুরী—সমুদ্র তীরে অবস্থিত। পুরীধামে প্রবেশ করিলে অনেক দূর হইতেই—সেই নর্ত্তনশীল ফেনিল জলধির গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাপ্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে

দাঁড়াইলে –সিন্ধুর সে অশান্ত জলোচ্ছ্বাস শুনিতে পাওয়া যায় না। মুক্তিমার্গে দণ্ডায়মান সাধকের কর্ণেও সংসারের মোহময় কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে না।

"রথযাত্রা" "পুরী" এবং "পুরুষোত্তম" সম্বন্ধে সকল কথাই তো সংক্ষেপে বলিলাম। কেবল একটী কথা বলিতে বাকী আছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—শরীরই যদি রথ হয়, আর আত্মাকে দেখিলেই যদি জগন্নাথ দর্শন করা হয়, তাহা হইলে তো সকল সময়ই তাহা দেখা চলে। তবে আবার আষাঢ় মাসে "রথযাত্রা" কেন? ইহারও কারণ আছে। আষাঢ় মাস—মিথুন রাশি, জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে আষাঢ়ের একটী নাম "মিথুন"। আমাদের এই শরীরও—প্রকৃতি-পুরুষাত্মক "মিথুন" অর্থাৎ পিতামাতার শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন। মিথুন হইতেই "মৈথুন" নাম হইয়াছে। এই রহস্য বুঝাইবার জন্যই আমাদের "রথযাত্রা"র উৎসব আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা নিতান্তই মূর্খ—কোন কথা তলাইয়া বুঝিতে চাহি না। তাই আমাদের পদে পদে বিড়ম্বনা। তাই "রথ" দেখিতে গিয়া, কেবল "কলা বেচিয়া" ফিরিয়া আসি।"

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—কলিকাতা গ্রেষ্ট্রীটস্থ আয়ুর্ব্বেদ সভাটির ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সংপ্রতি এ বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গঠন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ করিব।

দাতব্য চিকিৎসালয়। যে কোনো স্থানেই হউক আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসালয়ের উন্নতির কথা শুনিলে আনন্দিত হইতে হয়। চুঁচড়ার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতির কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। ৺নৃত্যগোপাল সেন গুপ্ত বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত উহার পরিচালক। দৈনিক ৩০।৪০ জন রোগী ঐ চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইতেছে। ঐ চিকিৎসালয় হইতে চুঁচুড়া অঞ্চলের দরিদ্র ব্যক্তিগণের মহদুপকার সাধিত হইতেছে।

জ্বর জ্বালা।—আমরা মফঃস্বলের সকল স্থান হইতেই জ্বর জ্বালায় সংবাদ পাইতেছি। কলিকাতাতেও ইহার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। কলিকাতায় এই জ্বর—ইন-ফ্লুয়েঞ্জা মূর্ত্তিতে অধিক পরিপুষ্ট। সহর মফঃস্বল—সকল স্থানের অধিবাসীদিগকেই এ সময় আমরা সাবধানে থাকিতে পরামর্শ প্রদান করিতেছি।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৬ষ্ঠ বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩২৯—শ্রাবণ।	১১শ সংখ্যা।

নাতা-কাতার হাঁড়ি

(বা সেকালের গৃহচিকিৎসার বাক্স)

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম, এ]

বানের জল পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিলে দু'একটী নদীর মাছ পুষ্করিণীতে আসিয়া থাকিয়া যায় বটে, কিন্তু পুষ্করিণীর সমস্ত মাছ বানে ভাসিয়া যায়। কিছুই থাকে না। সেইরূপ বিজাতীয় সভ্যতার স্রোত যখন কোনও মানব সমাজের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তখন সে সমাজের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত উপাদান, সকল স্মৃতি ধুইয়া লইয়া যায়। কিছুই রাখে না। আমাদের হইয়াছেও তাহাই। আমরা এখন নূতন বৈদেশিক সভ্যতার অত্যুগ্র আলোকে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের এই পতঙ্গবৃত্তির ফলে আমাদের যাহা কিছু ছিল সব হারাইতে বসিয়াছি। আলোকে দগ্ধ হইয়া পাখা ছিঁড়িয়া গেলেও পতঙ্গ উড়িবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না; তা' উড়িবার শক্তি থাকুক আর না থাকুক। আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। বৈদেশিক সভ্যতার বাহ্য আকর্ষণে আমরা দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি; অথচ একবার আমাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছি না। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি এবং দিন দিন কি হইতে চলিয়াছি—তাহা আদৌ চিন্তা করিয়া দেখিতেছি না।

আজকাল নিষ্কর্ম্মা লোকের একটা নূতন অবলম্বন হইয়াছে হোমিওপেথিক্ গৃহ-চিকিৎসার বাক্স। একটা গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ও "গৃহ-চিকিৎসা" পুস্তক লইয়া

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিয়া অনেকেই যশোলাভের পথে সহজেই অগ্রসর হইতেছেন এবং কিছুকাল পরেই 'শতমারী' বৈদ্য ও 'সহস্র মারী' চিকিৎসকের আসনে আসীন হইয়া দু'পয়সা আমদানির পথ খুলিয়া লইতেছেন। দেখিতে দেখিতে এলোপেথিক গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ও কবিরাজী গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ব্যবসায়-বুদ্ধিতে প্রবীণ লোকের কল্পনায় স্থান পাইল। গ্রামে গ্রামে বিনা শিক্ষায় চিকিৎসকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া যশস্বী হইয়া পড়িলেন বহু হাতুড়ে ডাক্তার ও হাতুড়ে কবিরাজ। তাহার উপর সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়েব সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। এইরূপে চিকিৎসা-ব্যবসায়ের প্রসার দিন দিন নানাভাবে বাড়িতেছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে আমাদের পল্লীগ্রামে দিন দিন বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। যে জিনিসের অভাব ছিল, যাহার অভাবে পূর্ব্বকালে পল্লীবাসিগণের অশেষ অসুবিধা সঙ্ঘটিত হইত, কত নিরুপায় লোক বিনা চিকিৎসায় ব্যাধি-রাক্ষসের নিকট আত্ম-বলিদান করিত, সেই অভাবের পূরণ, সেই সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি ও পল্লীবাসীর চিকিৎসার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কই? পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া সুস্থ ও নীরোগ লোকের দর্শন বেশী পাওয়া যায় কই? ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা ও অন্যান্য নানা ব্যাধি আজ পল্লীতে পল্লীতে এত প্রতিষ্ঠালাভ করিল কেন? এত সুবিধার মধ্যে যদি দেশের অবস্থা এত শোচনীয় হয়, তবে যখন প্রতীকারের এত ব্যবস্থা ছিল না, তখন কি পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষা হইত না? তখন কি লোকে আত্ম-রক্ষা করিত না?

যিনি কখনও অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিবার অবসর পাইয়াছেন, যিনি ভাবিতে জানেন ও ভাবিয়াছেন, যিনি একাল ও সেকালের ইতিহাসে দুইশত বৎসরেরও তুলনা মূলক চিত্র মনোমধ্যে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের অপেক্ষা সুস্থ ও দীর্ঘ-জীবি ছিলেন। আমাদের ন্যায় রোগ ভোগ করিয়াই তাঁহারা জীবনপাত করিতেন না। এখনও আমাদের মধ্যে যে-সকল প্রাচীন লোক বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য আমাদের মধ্যবয়স্ক নব্য শিক্ষিত যুবকগণের তুলনায় অনেক ভাল। সেই অশীতিপর বৃদ্ধদিগের নিকট আমাদের যুগের তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণ নিতান্তই অকালবৃদ্ধ। অনুসন্ধান করিলেই হয়ত দেখিতে পাইবেন যে, অশীতি-পর বৃদ্ধও কৃষ্ণকেশ ও দন্তবান্, এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। অথচ যুবকগণের অনেকেই পলিত কেশ ও দন্তহীন, এবং কঠোর পরিশ্রমে অসমর্থ। ইহার কারণ কি?

কেন আমরা দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি—একথা চিন্তা করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে, আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ আমাদের জ্ঞান ও স্বাবলম্বনের অভাব। ছিল একদিন যখন আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম জানিতাম, সংযম ও নিয়ম পালনে অভ্যস্ত ছিলাম, পরিশ্রমকে ভয় করিতাম না এবং সামান্য ব্যাধির আক্র-মণে বিহ্বল হইতাম না। সামান্য সর্দ্দি বা

অজীর্ণ রোগে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতাম না। তখন আমাদের ডাক্তার ছিল ঘরে ঘরে। এক দিকে যেমন পল্লীর শ্যামল ক্ষেত্রে লক্ষ্মীশ্রী ঢেউ খেলিত, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবের অভাবে পল্লীবাসী অতিথি-ভক্তও দারিদ্রের প্রতি দয়াবান ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ পল্লীবাসীর সুস্থ দেহশ্রীতে পল্লীপথ সমুজ্জ্বল ছিল, পল্লীর বকুলতলা তরুণের ব্যায়াম-ক্রীড়া ও বৃদ্ধের গল্প গুজবে মুখরিত থাকিত। তখন পল্লীবধূ আপন পুত্র কন্যার যত্ন করিতে জানিত এবং প্রবীণা গৃহিণী ছিলেন গৃহচিকিৎসক। নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া তিনি তাঁহার গৃহচিকিৎসার বাক্সে প্রকৃতি প্রদত্ত অসংখ্য ঔষধ বিনা-মূল্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং গৃহমধ্যে কাহারও কোনও পীড়া হইলে তিনিই রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেন।

এই গৃহচিকিৎসার বাক্সের নাম ছিল **নাতাকাতার হাঁড়ি**। এই হাঁড়ির মধ্যে থাকিত একখানি শতগ্রন্থি পুরাতন কাপড়—সেই কাপড় বা নাতার (সংস্কৃত 'নেত') নাম হইতে হাঁড়ির নাম হইয়াছে নাতাকার হাঁড়ি। এই কাপড়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, বাঁধা থাকিত অসংখ্য, অমূল্য ঔষধ। এই সকল ঔষধ সাধারণতঃ প্রসূতি ও শিশুর চিকিৎসার উপযোগী ছিল। তাই বলিয়া যে সাধারণ রোগের ঔষধ থাকিত না তাহা নহে। ইহাতে থাকিত—

১। শুষ্ক পলত
২। আদা
৩। শুঁঠ
৪। পিঁপুল
৫। যব
৬। সমুদ্রফেণ
৭। অহিফেন
৮। জোয়ান
৯। সৈন্ধব লবণ
১০। ফটকিরি
১১। তুঁতে
১২। গোসাপের মাথা
১৩। রক্তচন্দন
১৪। গেরিমাটি
১৫। কাপাস
১৬। গোরোচোনা
১৭। কর্পূর।
১৮। বকুল বীজ
১৯। ঘেঁচিকড়ি
২০। গাঁট হলুদ
২১। সিদ্ধি
২২। চা-খড়ি
২৩। ময়ূরপুচ্ছ
২৪। মৃগচর্ম্ম
২৫। হরিণের শিঙ
২৬। বাঘনখ
২৭। ভালুকের লোম
২৮। নাগেশ্বর ফুল (শুষ্ক)
২৯। রসমাণিক
৩০। রসসিন্দুর
৩১। মুচুকুন্দ ফুল (শুষ্ক)
৩২। রশুন
৩৩। কৃষ্ণ তিল
৩৪। গঙ্গামাটি
৩৫। শিল-মাটি। (শিলাবৃষ্টির শিলার ভিজা মাটি)
৩৬। গুলুই

৩৭। বচ

৩৮। মুসব্বর

৩৯। গন্ধক

৪০। মেটে সিঁদুর

৪১। আধ সুপারি (আধ কপালির জন্য)

৪২। জাতি হরীতকী

৪৩। বাঘের জিভ

৪৪। রাত চোরা পাখীর হাড়

৪৫। বংশলোচন

৪৬। সোমরাজ

৪৭। ইসব গুল

৪৮। গর্ভ খরসরে। (যে খরগোসের পেটে বাচ্চা মারা যাইত, সেই মৃত বাচ্চার মাংস শুকাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া রাখা হইত—স্থতিকা রোগে পথ্য দিবার জন্য)। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এই সকল ঔষধ লইয়া ঘরের প্রবীণা গৃহিণী নানা রোগের চিকিৎসা করিতেন। ইহা ছাড়া বহু সহজ-প্রাপ্য ঔষধ তিনি রান্না ঘর, উঠান ও পুকুর পাড় হইতে সংগ্রহ করিতেন। মধু ও গব্য ঘৃত সকল গৃহের বাড়ীতেই থাকিত। তুলসী, দুর্ব্বা ও কলাপাতা প্রভৃতি আরও কত ঔষধ উঠানে, পুকুর পাড়ে ও নানা স্থানে পাওয়া যাইত। এই সকল ঔষধ জর্ম্মনী বা আমেরিকা হইতে ইণ্ডেণ্ট করাইতে হইত না। নির্ব্বাচন (prescription) বা মিশ্রণের (compounding) জন্য কোনও খরচ হইত না। গৃহিণীর আদেশে বধূগণ compounderএর কাজ করিতেন এবং হাতে কলমে বাক্স ব্যবহার করিতে শিখিতেন। হাঁড়ির দু'এটা ঔষধের ব্যবহার— (১) সমুদ্রের ফেনা গাল ফুলিলে প্রলেপ দেওয়া হইত। (২) অহিফেনও গলার বেদনা ও সর্দ্দিজন্য গালফুলায় প্রলেপ রূপে ব্যবহৃত হইত। (৩) চক্ষু রোগে ফটকিরির জল ও (৪) দন্তরোগে গুঁড়ো ব্যবহৃত হইত। (৫) শিশুর কফে গোসাপের মাথা ঘষিয়া চাটিতে দেওয়া হইত। (৬) প্রবল শিরঃপীড়ায় দারুচিনি সহ রক্তচন্দনের প্রলেপ দিত। (৭) বাত্রে গিরিমাটির উষ্ণ প্রলেপ চলিত। (৮) শিশুর সর্দ্দিতে গোরোচনা ব্যবহৃত হইত। (৯ বকুল বীজের প্রলেপ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা নিবারণ করিত। (১০) দন্তশূল ও মুখ রোগেও বকুলবীজ ব্যবহৃত হইত। (১১) ময়ুরপুচ্ছ পোড়াইয়া মধুসহ চাটিতে দিলে শিশুর কফ নিবারণ হইত। (১২) মূত্ররোগে নাগেশ্বর এবং শিঃপীড়ায় মুচকুন্দ ফুল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইত। (১৩) কাশিতে বচ মুখে রাখা হইত। (১৪, শিশুর রস-তড়কা হইলে জলুই (বা আঁইস-বঁটি) পোড়াইয়া ছেঁকা দিত। (১৫) শৃগাল-কুকুরের দংশনে রোগীকে বাঘের জিভ ঘষিয়া খাইতে দিত। (১৬) শিশুর বাতরোগে রাতচোরা পাখীর (বাদুড়ের) হাড় বাঁধিয়া দিত। (১৭) প্রসূতির স্তনের ঠুনকো রোগে শিলমাটির প্রলেপ দিত।

এই ছিল সেকালের অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতালোক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব যুগের বঙ্গবাসীর আত্মনির্ভরশীলতার একটা উদাহরণ। তখন স্বাবলম্বন ও জ্ঞানের প্রভাবে পল্লীগৃহে চিকিৎসকের শুভাগমন কালে কস্মিন্ হইত। আর এখন? ভাই বঙ্গবাসি! একবার তুলনা করিয়া দেখুন, আমরা এখন

কোন্ পথে চলিতেছি? উন্নতি না অধঃপতন? যে সভ্যতা স্বাবলম্বন ভুলাইয়া দেয়, সে সভ্যতা সভ্যতা নহে। কুসংস্কারের আবর্জ্জনা। যে শিক্ষায় দেহরক্ষার নিয়ম-পালন ভুলাইয়া দেয় তাহা কুশিক্ষা। আমাদের বর্ত্তমান যুগের ডাক্তার-প্রিয়তার একটী চিত্র "দাস-দ[illegible]" নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে। পত্নীর সর্দ্দি জ্বর ৯০ ডিগ্রির উপরে না উঠায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলেন—ডাক্তার কিছু জানেনা। তাঁহার চিকিৎসা সেরূপ ডাক্তারের হাতে হইতে পারে না। আমার স্বামী আমার যত্ন করিতেছেন না, কত বড় বড় ডাক্তার কলিকাতায় থাকিতে একটা উজবুক ধরিয়া আনিয়াছেন। স্বামী বলিলেন "জ্বর বেশী নাই, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।" পদদলিতা ফণিনী ফোঁস করিয়া উঠিলেন—"তুমি আমায় ভাল বাস না, তাই আমার চিকিৎসায় তোমার এত অবহেলা। তাই আমার সামান্য অসুখ! ঝির জ্বর হইলে হয় একশ চার, পাঁচ, আর আমি এত বড় একজন উকীলের স্ত্রী, আমার স্বামী কত রোজগার করেন, আমার জ্বর কিনা নাইনটি নাইন? তোমার একবার অসুখ করুক, দেখো আমি কত ঘটা ধ'রে চিকিৎসা করাব। ৩২৲ টাকা ভিজিটের ডাক্তার দুয়রে বেঁধে রাখ্‌ব।"

আমাদের চিন্তার গতি কতকটা ঐরূপই নহে কি?

ব্যাধি তত্ত্ব।

[শ্রী পাইকর-বীরভূম]

পুর্ব্বানুবর্ত্তী।

এক্ষণে কথা এই যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, যখন পিত্ত ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দেহে বিদ্যমান নাই, তখন পিত্ত হইতে শরীরের স্বাভাবিক তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই স্বাভাবিক তাপই বৰ্দ্ধিত হইয়া জ্বর নাম ধারণ করে। অতএব এক্ষণে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, পিত্ত হইতে স্বাভাবিক তাপ এবং স্বাভাবিক তাপ হইতে জ্বর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ পিত্ত, স্বাভাবিক তাপ ও জ্বর যেন বংশদণ্ডের এক একটী পর্ব্ব বিশেষ। বংশের পর্ব্বগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইলেও তাহারা যেমন একই বংশদণ্ডের অংশ বিশেষ তদ্রূপ পিত্ত, স্বাভাবিক তাপ ও জ্বর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পদার্থ হইলেও মূলতঃ এক। এক্ষণে ইহাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং এক অবস্থা হইতে পরবর্ত্তী অবস্থার পরিণতি হওয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করা আবশ্যক।

এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, পিত্ত আমাদের ভুক্ত ও পীত দ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং তাহার ফলে অসার অংশ মল মূত্রাকারে নিঃসৃত হইয়া গেলে যে সারাংশ থাকে, তাহারই নাম জীর্ণ রস। পিত্ত এই জীর্ণ রসের শরীর রক্ষক (body guard) স্বরূপ তাহার সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া থাকে এবং ঐ জীর্ণ রস বায়ুর সাহায্যে শরীর মধ্যে বিস্তৃত হইলে তাহার কিয়দংশ দেহের শ্লেষ্মা ও অবশিষ্টাংশ রক্তে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য পিত্ত এইরূপ সর্ব্বদাই দেহ রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকে। শ্লেষ্মা ও রক্তের মধ্যে যে পিত্ত থাকে—তাহাই দেহের স্বাভাবিক তাপ। অতএব দেখা যায় যে, পিত্তই আমাদের দেহের রস ও রক্তকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রক্ষী স্বরূপ অহরহঃ বর্ত্তমান থাকে। অন্য কথায় ইহাও বলা যায় যে, রস ও রক্তকে রক্ষা ও পাক করাই পিত্তের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। আবার দেখা যায় যে, পিত্তের সাহায্যে এই রস ও রক্ত পরিপাক হইয়া শরীরের মাংসাদি সপ্ত ধাতু গঠিত হয়। অতএব পিত্ত যে স্বাভাবিক তাপের মূর্ত্তিতে সর্ব্ব শরীর ব্যাপক তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই স্বাভাবিক তাপ যে কেবল শরীরকে রক্ষা করিতেছে তাহা নহে। পরন্তু শরীরে সাম দোষ উপস্থিত হইলে পিত্ত তাহারও পরিপাক করিবার চেষ্টায় নিয়ত নিরত। এই দোষ সাধারণতঃ ত্রিবিধ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফজ। এই ত্রিদোষের মধ্যে কখন একটী, কখন দুইটী, এবং কখনও বা তিনটী দোষই একই সময়ে প্রধানতঃ ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের অপরিপাক রস দেহ মধ্যে উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে শারীরিক তাপবিশেষ বিচলিত হইয়া তাহাদের মূলোচ্ছেদ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। দোষ যেরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়, তাপও তদনুপাতে শক্তি সম্পন্ন হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সুতরাং দোষ বেশী হইলে তাপও যে বেশী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বলা বাহুল্য, তাপের এবম্বিধ অবস্থান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ বৃদ্ধির নামই জ্বর। কাহারও বাড়ীতে অনধিকার চড়াও করিলে বাটীর প্রহরী যেমন তাহাকে উক্ত বাটীর সীমানা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হয়, দেহের রক্ষী স্বরূপ স্বাভাবিক তাপও তদ্রূপ নিজ অধিকৃত দেহরাজ্যের মধ্যে দোষরূপ অনধিকার প্রবেশকারী শত্রু উপস্থিত দেখিয়া তাহাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে। অতএব দেখা যায় যে, স্বাভাবিক তাপ বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্বর দ্বারা আমাদের কোন অনিষ্ট সাধিত না হইয়া ইষ্টই সাধিত হয়। কেবল অনিষ্ট সাধিত হয় দোষের দ্বারা। কারণ দোষেরই উপস্থিতিতে আমাদের দেহ দুষিত হয় এবং সেই দুষিত দেহ সংশোধিত করিবার জন্য জ্বর যে সংগ্রাম উপস্থিত করে, তাহার ফলে আমাদের শারীর যন্ত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব ইহা স্থির যে, জ্বর নিবারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দোষেরই নিবারণ করা উচিত। মূল দোষ বা দোষের কাল উপেক্ষা করিয়া কেবল জ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত নহে। কারণ জ্বর যখন স্বভাবের ক্রিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন তাহার ক্রিয়াকে বাধা দেওয়া

কদাচ সম্ভাব্য নহে। দোষকে আক্রমণ করাই যখন জরের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তখন দোষের উপস্থিতি সত্বে জরকে বাধা দিলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ অস্বাভাবিক ক্রিয়ারই অবতারণা করা হইবে।

জগদম্বা যেমন বরাভয় মূর্ত্তিতে তাঁহার শান্ত পুত্র সুরগণের শান্তিদায়িনী ও অশান্ত পুত্র অসুরগণের নিকট খড়্গ খর্পরধারিণী হন, তদ্রূপ দোষের অবর্ত্তমানে পিত্তও বরাভয়া মূর্ত্তিতে স্বাভাবিক তাপরূপে উপস্থিত হইয়া শান্তিপ্রদ এবং দোষের বিদ্যমানতায় খাঁড়া-খর্পর ধরিয়া অশান্তি বিধায়ক হইয়া থাকে। তবে ইহাও স্থির যে, জগদম্বার উল্লিখিত মূর্ত্তি-দ্বয়ের ন্যায় পিত্তেরও এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি ধারণের উদ্দেশ্য মঙ্গলজনক। তাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এই দোষ নাশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দান করিয়াছেন।

হিন্দু স্বাস্থ্যনীতি।

[ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

বঙ্গে স্বাস্থ্য হীনতা আর অকাল মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষতঃ জীবন-সংগ্রামে বাঙ্গালীকে বর্ত্তমান সময়ে উদরান্নের জন্য উৎকট পরিশ্রম করিতে হয় এই কারণে স্বাস্থ্যহীনতা এবং আয়ুধ্বংসকর নিয়মের অধীনে চলিতে হয়। যে সকল মনস্বী স্বাস্থ্য তত্ত্বালোচনায় বঙ্গদেশের পল্লিসমাজের আট কোটি বাঙ্গালীর পরমায়ু বৃদ্ধির এবং সুস্থসবল রাখিবার উপায় বিধান করিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মায়ের কৃতীপুত্র।

এই উদ্দেশ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রে বহু প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। আজ আমিও এই উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদ পত্রে হিন্দু স্বাস্থ্যনীতি নামে প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, ভরসা শ্রীভগবান।

পল্লীমাতার নিঃস্ব পুত্রগণ এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিয়মানুযায়ী চলিলে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই তাঁহারা সুস্থ ও সবল হইতে পারিবেন, জীবন-সংগ্রামে সুনিপুণ যোদ্ধা বলিয়া গণ্য হইবেন। বলা বাহুল্য আমার এই "হিন্দু স্বাস্থ্য নীতি" প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ্য রূপে ধারা বাহিক নিয়মে আলোচনা করিব। অধিকাংশ স্থানে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

আহার ও পান।

১। প্রত্যহ আহার করিবার অগ্রে প্রস্রাব করিবে এবং হস্ত পদ ধৌত করিয়া সুস্থ মনে আহারে বসিবে। শরীরস্থ বায়ু কর্ম্মনিবন্ধন জন্য উষ্ণ হইয়া পাকাশয় ইত্যাদি যন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করিয়া রাখে বলিয়া স্বভাবে পরিপাক কার্য্য হয় না। প্রস্রাব কার্য্য দ্বারা বস্তি শোধন এবং শরীরস্থ বিকৃত জলীয়াংশ

বাহির করা আহারের সময় আবশ্যক, তাই আর্য্য ঋষি প্রস্রাব করণ কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

২। সাত্ত্বিক বস্তু আহার দীর্ঘজীবন লাভের এবং দেহ সুস্থ রাখার প্রধান উপায়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে খাদ্য ত্রিবিধ। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার অশঙ্কায় কোন্ খাদ্য সাত্ত্বিক, কোন্টি রাজসিক তাহার বিস্তৃত আলোচনা আপাততঃ করিবনা। মাত্র সংক্ষেপে ইহাই বলা হইল যে, যে খাদ্যে শরীর মন স্নিগ্ধ ভাবে থাকিয়া তেজ, বীর্য্য, কান্তি, স্মৃতি, মেধা পুষ্টি পায় ও সংরক্ষিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক খাদ্য। মৎস্য, মাংস দূষিত, পচিত ও উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য মাত্রেই তামসিক এবং রাজসিক। ঘৃত, দুগ্ধ, শাক, সব্জী, ডাউল, তরকারী, ফল মূল সাধারণতঃ সাত্ত্বিক মধ্যে গণ্য।

৩। আহারের অগ্রে একটুকু জল পান করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই জন্যই বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ গণ্ডুষ করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রপুত বিন্দু মাত্র জলপান করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া অগ্রে অধিক জল পান নিষিদ্ধ। যেহেতু পাচক রস অত্যধিক জল দ্বারা বিকৃত হইয়া থাকে।

৪। আহার্য্য বস্তু দক্ষিণাংশে রাখিয়া আহার করিবে। অর্থাৎ খাদ্য প্রবৃত্তিকে দেহের দক্ষিণাংশে রাখিয়া আহার করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্ষুধার সময় দেহের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ পাকস্থলীর পাইলোরিক গ্লাণ্ডে pyloric gland এবং লিভারের দক্ষিণ দিকে ক্ষুৎ শক্তি উদ্দীপ্ত থাকে।

৫। উদর পূর্ণ করিয়া আহার সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। পেটের অর্দ্ধেক খাদ্য সিকি, অংশ জল, বাকি চারিভাগের ভাগ বায়ুর জন্য শূন্য রাখিয়া আহার করিলে সুন্দর রূপে পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই মহা সত্যটি বাগভটাদি আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থে পরিষ্কার রূপ বুঝান আছে।

৬। পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় আহার করা অভ্যাস করিতে হয়; কেন না শরীরের ক্ষয় প্রতি মুহূর্ত্তে ঘটিতেছে, উহা পূর্ণ করাই পুনঃ পুন খাদ্যের কার্য্য।

৭। ক্ষুধাতুর ও কুষ্ঠাদি কুৎসিৎ পীড়া গ্রস্থ ব্যক্তি, ঋতুমতী স্ত্রী, অন্নাহারী বুবুক্ষু জীব, হিংস্রক, কুটিল, নীচজাতী, নিম্নবর্ণ ইত্যাদি পক্ষ হইতে খাদ্য দূরে রাখিয়া বা আবৃত ভাবে রাখিয়া আহার করিবে। ইহার কারণ বোধ হয়—বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা আহার কারীর দেহের অন্য রূপ অনিষ্ট হইতে পারে।

এই নিয়মটির প্রতি বোধ হয় নব্য শিক্ষত ব্যক্তিগণ এবং তথাকথিত পল্লীসুলভ চরিত্র শালী ব্যক্তিগণ আর্য্যঋষির উপর বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু ভাই! ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষির ব্যবস্থায় কোন যুক্তি হীনতা বা অবৈজ্ঞানিকতা নাই। আহার কালীন উপরোক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ও জীব জন্তুর শরীর ও মনস্থ "উষ্মা" অদৃশ্য বায়ু (গ্যাস) খাদ্য দ্রব্যে সংক্রামিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বায়ুর ইলেকট্রোন (Ilectrone) বৈদ্যুতিকাস্থ উপর লিখিত অবস্থায় প্রশ্বাস বায়ুতে মিশিয়া খাদ্যকে তদভাবাপন্ন করিবার যথেষ্ট শক্তি রাখে।

সুতরাং ঐরূপ লালসা পূরিত খাদ্যে অনিষ্ট হওয়া অসঙ্গত নহে।

৮। অধিক খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ হওয়া যেমন উচিত নহে সেইরূপ দীর্ঘকাল শূন্য উদরে থাকাও উচিত নহে।

৯। খাদ্য বস্তুতে যাহাতে অন্যের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস না পড়ে তাহার উপায় বিধান করা উচিত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ুর তড়িত বহন শক্তি দ্বারা একের খাদ্য অন্য দ্বারা দূষিত হইতে পারে, এই জন্য অন্যের নিঃশ্বাস বাহিত খাদ্য আহার করিলে পীড়া হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। আহার কালে মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরদাঁড়া বক্র করিয়া কখন বসিবে না। ইহাতে জীবন যন্ত্র পরিচালক মজ্জা বক্র ভাবে থাকার জন্য পাচক রস ও অন্যবিধ দৈহিক শক্তি সমান ভাবে কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং পরিপাক কার্য্য সুচারু রূপে নিষ্পন্ন হয় না।

১১। ঘৃতে এবং দুগ্ধে কখনা লবণ ব্যবহার করিবে না, কারণ লবণ দ্বারা ঘৃত, দুগ্ধের এলবুমিন (অণ্ডলাল) সংযত হইয়া উহাকে বিকৃত করে। বাঙ্গালী ভদ্রাভদ্র ব্যক্তি মাত্রেই ঘৃত,ভাত আর লবণ এক সঙ্গে আহার করিয়া থাকেন—ইহাতে তত দোষ হইতে পারে না—কেননা ভাতের শ্বেতসার অংশ দ্বারা ঘৃত, লবণ মিশ্রিত দোষ রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। সাধারণতঃ খাদ্য দ্রব্য সহ অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করা উচিত নহে। যাহার লবণ খাওয়া অধিক অভ্যাস, তিনি সাধ্যমত সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করিবেন। সমস্ত লবণই অগ্নিতাপে ভাজিয়া খাওয়াই উচিত। ইহা হিন্দু স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের সুপরামর্শ।

১২। আহারের পূর্ব্বে কিম্বা আহারের পরে সুপক্ক মিষ্ট ফলমূল আহার করা অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। ইহাতে আয়ু এবং কান্তি বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যগ্রস্থ ব্যক্তির এবং পিত্ত বৃদ্ধিকারক দেহের পক্ষে এই নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট।

আমরা ইউরোপীয়গণের কুব্যবহারের অনুকরণেই পটু। কিন্তু তাঁহাদের সুনিয়ম গুলির আদর্শ লইলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই ইহা বুঝিতে পারি না। ইউরোপীয়গণ আহারের পরে অবস্থা বিশেষে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু ফলমূল আহার করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের জাতীয়রীতি। দেখিয়াছি হরিদ্বার-"ঋষিকুল" আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ এই নিয়মের এবং হিন্দুস্বাস্থ্যনীতির পূর্ণ পরিপালক। তাই তাঁহারা ৫০।৬০ বর্ষের বৃদ্ধ যুবকের ন্যায় কার্য্যক্ষম এবং কান্তিশালী। স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়মভঙ্গকারী ব্যক্তি যে রুগ্ন এবং দুর্ব্বল ইহা বোধ হয় আর লিখিয়া বুঝাইতে হইবে না।

১৩। জলপান কালে ধারার জলপান অনিষ্টকর—চুমুক দিয়া বা হস্তের অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া জলপানই প্রশস্ত। এক দমে যতটা জল পান করা যায় তাহার অধিক পান করা উচিত নহে। থাকিয়া থাকিয়া জল পান অতি অনিষ্টজনক। হাতের অঞ্জলিতে জলপান অদ্যাপি হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। ইহারা এইজন্য বোধ হয় অম্ল এবং অজীর্ণ পীড়ায় অতি কম পীড়িত। বঙ্গের কৃষকগণ পর্য্যন্ত ধারায় জলপান

রাজিয়াও পরিশ্রমশীল হইয়াও অজীর্ণ ও অম্ল পীড়ায় পীড়িত। বঙ্গের কৃষকে আর হিন্দুস্থানী কৃষকে প্রভেদ যথেষ্ট। সামর্থ্যে এবং কৃষি কার্য্যে হিন্দুস্থানী কৃষক শ্রেষ্ঠ। হিন্দুস্থানে শস্য প্রস্তুত করিতে কূপ হইতে জল সিঞ্চন করিতে হয়, কৃষক হইতে কৃষককামিনী পর্য্যন্ত হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, পিপাসায় দুই হাত ভরিয়া জল খায়—বাঙ্গালার কৃষক নদী মাতৃক দেশের লোক, বৃষ্টিধারার দিকে চাহিয়া ক্ষেত্রের কার্য্য করে,—ঘারায় জলপান করে। বস্তুত হিন্দু স্থানে এখনো পূর্ব্বের ঋষি রক্ষিত স্বাস্থ্যনীতি প্রচলিত আছে। বাঙ্গালীর ন্যায় ইহারা অদ্যাপি সাহেবী সভ্যতা শিখে নাই।

১৪। পানীয় জলই দেহ এবং জীবন রক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। এই জলকে বিশুদ্ধ ভাবে নিয়ম মত পান করিলে জলের "জীবন" নামের প্রকৃত সার্থকত্ব রক্ষিত হয়। জলকে পরিষ্কার করিতে হিন্দুগণ বহুভাবে জানিতেন ও করিতেন। কিন্তু পানীয় জলকে উষ্ণ করিয়া পান করিতেই অধিক উপদেশ দিয়াছেন। একান্ত অভাবে জলপাত্রে নির্ম্মলী ফল বা ফিটকিরী খণ্ড রাখিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রথাই হউক আর হিন্দু প্রথাই হউক—জল পরিষ্কার করিয়া অথবা রৌদ্র বাতাস লাগে এরূপ স্রোতের কি বাপীর জল পানই প্রশস্ত।

১৫। দুগ্ধের সহিত ভাত বা অন্য কোন রূপ বস্তু মিশাইয়া ঘন করিয়া খাওয়া উচিত। ইহাতে দেহের পক্ষে যথেষ্ট উপকার করে। অল্পে অল্পে দুগ্ধ পান করাই ব্যবস্থা, এক দমে দুধ পান করা এবং পানান্তে পথ চলা উচিত নহে।

১৬। অপরের উচ্ছিষ্ট আহার করিবে না এবং অপরকেও করিতে দিবে না। কেননা একের মুখনিঃসৃত লালা—অপরের পক্ষে অনিষ্ট-জনক। একের লালা মিশ্রিত গুপ্ত পীড়ার বিষ এইরূপ উচ্ছিষ্ট আহার দ্বারা অপরের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। এই স্থানে একটি আচার সম্পন্ন কথার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দু জাতি যাহার তাহার অন্ন আহার করে না ইহা স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রকৃষ্ট নিয়ম।

যাহার তাহার হাতে খাইলে তাহার শারীরিক ও মানসিক দোষগুণ অন্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। এই শরীররক্ষাবিধি হিন্দুর জাতি বিচার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বাপর প্রত্যেক জাতি তাহার স্বজাতির হস্তে আহার ব্যতীত অন্য জাতির পৃষ্ট অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি এক জাতি অন্য জাতির জল পর্য্যন্ত পান করে না। যাহারা এই সূক্ষ্ম দর্শী হিন্দুজাতির "স্পর্শদোষ" প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ লিখিয়া আসর জমকাইতেছেন, তাঁহারা সুস্থ সবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানশালী জাতির গুঢ়তত্ত্ব আদৌ বুঝিতে অক্ষম। এই প্রথার বিপর্য্যয় করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি রুগ্ন, দুর্ব্বল এবং বহুবিধ আগন্তুক ব্যাধি গ্রস্থ। হোটেলে ভোজন, অপরিচিত মিঠাই ওয়ালার হাতে প্রস্তুত বিকৃত ঘৃত পক্ক মিঠাই নামক বিষভোজন—রেল, ষ্টীমারে যাহার তাহার হাতের খাদ্যগ্রহণ এবং অপরিচিত অপরিষ্কার কুচরিত্র লোকের প্রস্তুত বরফ, সোডা, লেমনেড খাইয়া বাঙ্গালী যে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য হানি করিতেছে—ইহার নিবারণ করিবে কে? হায়! বিকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত ভারতবাসী সতর্ক হও, তবেই শক্তি

শালী জাতি বলিয়া আবার পরিগণিত হইতে পারিবে।

এখনো পল্লীতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা এই সকল কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী না হইয়া সুস্থ ও সবল শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেছেন। আর নব্যবঙ্গ বাঙ্গালী চল্লিশের কোটা পার হইতে না হইতে বহু প্রকার আকস্মিক ব্যাধির যাতনা ভোগ করিয়া জীবন লীলা শেষ করিতেছেন।

১৭। পরিশ্রম করিয়া বিশ্রামান্তে আহার করিতে হয়। কেননা শ্রমক্লিষ্ট দেহে আহার করিলে পাকস্থলীর বৈদ্যুতিক শক্তি নিঃসরণ হওয়ার জন্য পরিপাক ক্রিয়া মন্দ হইয়া পড়ে হৃদপিণ্ড অবশ হয় - ফুসফুসে অত্যধিক শ্লেষ্মা জমিয়া যায়। স্নায়ুশক্তি নিস্তেজ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইতে হয়। দেখা গিয়াছে পরিশ্রম করিয়াই আহার করিতে থাকিলে—অনেক সময় "বিষম লাগিয়া" দুই চারিজন লোক জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়াছে।

১৮। অধিক রাত্রে অর্থাৎ রাত্রি ১২টার পর আহার করা উচিত্ নহে। উহাতে নিদ্রার ও পরিপাকের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আবার পূর্ণ উদরে পথ চলা উচিত নহে। ইহাতে পরিপাকে বিঘ্ন তো উপস্থিত হইবেই, প্রত্যুত প্রস্রাবের ব্যাধি বহুমূত্র বা মধুমেহ (Daibetes) ও বেরিবেরি প্রভৃতি জন্মিতে পারে। বর্ত্তমানে চাকুরীজীবি বাঙ্গালী পূর্ণউদরে পথ চলিয়া আর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ধাতু দৌর্ব্বল্যাদি পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকেন। আফিসের বাবুগণ যাঁহাদিগকে বেশী পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, প্রায়ই তাঁহাদিগের বহুমূত্র বা মধুমেহ পীড়া হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কিন্তু এই সকল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব নাই, কেননা তাহারা হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া তামাকু টানিতে টানিতে নিদ্রাতুর হয়, পরে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আহার করিয়া বিশ্রাম করে। পূর্ণ পেটে পরিশ্রম আর একেবারেই পরিশ্রম না করা এই সকল ব্যাধির মূল।

১৯। খাইব কি না খাইব—এরূপ স্থলে আহার না করাই সঙ্গত। উপরোধ অনুরোধে আহার না করাই উচিত। বাঙ্গালার নব্য-শিক্ষিত সমাজ এবং পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত নব্যব্যক্তিগণ বাজি রাখিয়া আহার করিয়া জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছে—এরূপ কত কথা শুনা গিয়াছে। নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া যাহারা বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া জেদ করিয়া অতিভোজন করেন—তাহারা অজীর্ণ পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকে। ইহারা আহারের কুনিয়ম জন্য কষ্ট ভোগ করে। এমন একদিন গিয়াছে, যেদিন ব্রাহ্মণগণ জোর ফলাহারের পরেও ২।৩ সের মিষ্টান্ন খাইয়া সহজে পরিপাক করিতেন—বর্ত্তমানে "তে হিনো দিবসা গতা" বর্ত্তমানে নানাবিধ আচার ব্যবহারে বাঙ্গালী দুর্ব্বল এবং স্বাস্থ্যহীন, এ অবস্থায় এরূপ আহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

২০। রাত্রিবাস পরিত্যাগ না করিয়া বা অস্নাতাবস্থায় পাক কার্য্য করিতে নাই। শরীরের ক্লেদ ঘর্ম্ম এবং উষ্ণতা স্নান দ্বারা দূর করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্থির মনে পাক করাই সঙ্গত। অসাধ্য স্থানে বস্ত্র পরিত্যাগ

করিয়াও গঙ্গা কি তুলসী জলস্পর্শে মনের শুচিতা সম্পন্ন করিয়া পাক করাই সুসঙ্গত। বলা বাহুল্য যে রাঁধুনীগণ এবং বোর্ডিং হোটেলের পাচকগণ এই নিয়মের পূর্ণ বিঘ্নকারী। তাহারা রাত্রিবাস বা অতিকদর্য্য পরিচ্ছদ লইয়া প্রায়ই রন্ধন করিয়া থাকে। আবার অধিকাংশ হোটেল, বোর্ডিংএ চরিত্রভ্রষ্টগণই পাচিকা ও পরিচারিকার কার্য্য করে।

দুর্ভাগ্যের কথা বর্ত্তমান বঙ্গে হিন্দুবংশধরগণ ঐরূপ খাদ্য নিত্য গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং বোর্ডিং হোটেল প্রভৃতির সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ ইহার প্রতিকার করিবেন কি ?

২২। ধীরে ধীরে চিবাইয়া চিবাইয়া লালার সহিত খাদ্য ভক্ষণ প্রশস্ত। বিশেষতঃ অজীর্ণ ও অম্ল পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির এবং বৃদ্ধের পক্ষে এই নিয়ম অবশ্য পালনীয়। যাহারা তাড়া-তাড়ি বিদ্যালয় ও আফিসে যাইবে বলিয়া খাদ্য গলাধঃকরণ করেন, তাহারা অধিকাংশই "ডিসপেপটিক" অর্থাৎ অজীর্ণ ও কোষ্ঠ-বিশৃঙ্খলা গ্রস্ত। নানা কারণে বাঙ্গালায় অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, মধুমেহ, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি একাধিপত্য করিতেছে। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে বাঙ্গালীর মত এত অসুখ নাই। হিন্দুস্থানে উক্ত ব্যাধিগুলি অতি অল্প—দৈবাৎ যাহাদের হয় তাহারা প্রায়ই মারা যায়।

২২। সাধ্যানুসারে দুগ্ধের রূপান্তর কোন বস্তু আহার করা একান্ত আবশ্যক। যেহেতু দুগ্ধই 'অমৃত'। দেহ রক্ষা কার্য্যে দুগ্ধের তুল্য কান্তি, স্মৃতি, মেধা পুষ্টিকারক আর কিছুই নাই। "আর্য্য-সাহিত্যে অমৃত" বলিয়া যে একটী মহাবস্তুর পরিচয় আছে, উহা দুগ্ধ অথবা দুগ্ধের রূপান্তর ঘৃত, ছানা, রাবড়ি, দধি, মাখন ভিন্ন অন্য বস্তু নহে।

ঘৃতপক্ক দ্রব্য উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং স্বাস্থ্যজনক। ইহা প্রফুল্ল চিত্তে আহার করিতে হয়। বাঙ্গালীদিগের দৈনিক খাদ্যে তৈলের ব্যবহার অধিক। ইহার কারণ এই বাঙ্গালী জাতি মৎস্য ও মাংস আহারী—মাছে তৈল ভিন্ন ঘৃত দিয়া পাক করিলে গুরুপাক হইয়া উঠে। যে প্রদেশের লোকে মাছ খাওয়াকে পাপ বলিয়া গণ্য করে, তাহারা নিতান্ত দরিদ্র হইলেও ঘৃত ভিন্ন তৈল ব্যবহার করে না। বেদের বা বৌদ্ধযুগের "মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি" মন্ত্রের অনুশাসিত এই হিন্দুস্থানে মাছ সম্বন্ধে গ্রাম্য শ্লোকে পর্য্যন্ত আছে যে

'তিল ভর্ মছলি খাকে কোট গৌকরে দান
তৌঁভিবেশথ হোগে ভেইয়া নরকে নিদান'।

বঙ্গের অতি সামার্থ্য পরিবারেও দৈনিক ঘৃত ব্যবহার অতি কম। বোধ হয় ইহারই ফলে বাঙ্গালী; আসামী এবং উড়িয়া জাতি ভিন্ন অন্য অঞ্চলের লোক অধিক পরিশ্রমী এবং দৃঢ়কান্তিশালী। উড়িয়া, আসামী ও বাঙ্গালী মাত্রেই কোমল এবং পরিশ্রমকাতর। কোন পুষ্টিজনক খাদ্য একেবারে পরিত্যাগ করা এবং একেবারে উহার অধিক ব্যবহার করা কখনো উচিত নহে। বলিতে কি তৈলের ব্যবহারে বাঙ্গালী—প্লেগের ন্যায় মহা-ব্যাধিকে পরাজয় করিয়াছে। বহুদেশী ও বিদেশী ডাক্তারের অভিমত এই যে, বাঙ্গালীর সর্ষপ তৈল ব্যাবহারে প্লেগ বঙ্গে একাধিপত্য করিতে পারে

নাই। যাহা হউক নিত্য খাদ্যসহ ঘৃত ব্যবহার অতি আবশ্যক। ঋষিরা ঘৃতকে পরমায়ু বলিয়াছেন। স্বাস্থ্যতত্ত্বের হিসাবে কথাটি সম্পূর্ণ সত্য।

২৩। আহারান্তে তাড়াতাড়ি কুল্লী করিবে না। অন্ততঃ ১০।১২ মিনিট বাদে আচমন করিবে। আবার আহার করিতে বসিয়া কখনো মুখে জল না দিয়া উহা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। উহাতে পাচক সাহায্যকারী লালা ধৌত না হইয়া পরিপাকে বিঘ্ন উপস্থিত করে। মুখ পরিষ্কার না করিয়া কোন কার্য্য যথা হাস্য, ক্রন্দন, সঙ্গীত করণ বা বাক্য কথনও করিবে না। উত্তমরূপ আচমন হওয়া চাই, নহিলে খাদ্যকণা নিঃশ্বাস পথে গিয়া ফুসফুসের ব্যাধি উপস্থিত করিয়া কাস উপস্থিত করে—মুখের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের পীড়া জন্মায়। আচমণ করিবার সময় মুখে জল পূর্ণ করিয়া প্রস্রাব করিতে হয়। ইহাতে জল দোষের পীড়া জন্মে না এবং থাকিলে তাহা আরোগ্য হয়। কেননা জলে জল আকর্ষণ করে। (ক্রমশঃ)

চশমার অপব্যবহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ]

চশমাধারী ফুলবাবুদের মধ্যে সহরে আজ কাল জুয়াচোরের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে ইতর, ভদ্র, সাধু অসাধু চেনা সুকঠিন। আপনি হয়ত কালিঘাট যাইবার জন্য ট্রামে উঠিয়া বসিলেন, আপনার পার্শ্বেই একজন সভ্য ভব্য বাবু আতর গোলাপের সুবাস ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। আপনি অবশ্যই ভাবিবেন— ইনি কোনও বড় ঘরের ডাক্তার বা উকীল, ব্যারিষ্টার বা জমীদার হইবেন; চোখে সোণার চশমা, হাতে ঘড়ি ও হাতীর দাঁত বাঁধান একগাছি বহুমূল্য ছড়ি, দশ আঙ্গুলে দশটা চক্‌চকে আংটী, পায়ে মখ্‌মলের জুতা, গায়ে সিল্কের জামা, পরিধানে উত্তম ফরাসডাঙ্গার বা হাওড়ারধুতি, মাথায় টেরী; এসেন্সের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত; কি সুন্দর শোভা, যেন স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র সহরের বিদ্যুৎচালিত যানারোহণের উৎকট বাসনা দমন করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া উপস্থিত; হাতে একখানি খবরের কাগজও আছে, যেন উহা কতই নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছেন। কিন্তু আপনি একটু অন্যমনস্ক হইলেই এই দেবরাজ নিমেষ মধ্যে আপনার চক্ষে ধূলি দিয়া আপনার বুক-পকেট হইতে টাকা বাঁধা রুমাল খানি তুলিয়া লইয়া বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইবেন। আপনি তখন হাঁ করিয়া বেকুব হইয়া ভাবিবেন— কি আশ্চর্য্য! বর্ত্তমান সভ্যতা ঠিক যেন

মাকাল ফল; বাহিরে কি অপরূপ মনোহারিণী শোভা, কিন্তু ভিতরে একবারে থাক্ থু! বাহ্যাড়ম্বরে মানুষকে বোকা বানাইয়া দিয়াছে উপরে চক্‌চকে পালিস দেখিয়া কোন ক্রমেই বুঝিবার উপায় নাই যে, ভিতরে কেবল ফাটা চটা-পুডিং আঁংটা; উপরে বার্ণিস বাহার ও বাহ্য ভড়ং দেখিয়া কে চোর কে সাধু কিছু মাত্র ঠিক করা যায় না।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অভিভাবক-গণও অনেক পরিমাণে দায়ী। সংসারের অন্নবস্ত্র সংস্থান করিতে তাঁহারা এত ব্যস্ত যে, মাসে একবারও সন্তানদিগের খোঁজ লইতে অবকাশ পান না। যাঁহারা বড়লোক তাঁহারা বড়জোর একটা পেশাদার মাষ্টার রাখিয়া মনে করেন যে, তাঁহাদিগের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে। ছেলে মেয়েরা পাচকের হাতে খায়, চাকর চাকরাণীর সঙ্গে বেড়ায়, এবং মাষ্টারের কাছে এক আধ ঘণ্টা পড়ে—স্নেহময় পিতামাতার অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ প্রেম, শিক্ষা, লালনপালন ও শাসনের সুফল পায় না। অনেকে হয়ত জানেনইনা যে, পুত্রটী কোন্ শ্রেণীতে পড়িতেছে। চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নত হওয়ার পর তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে ছেলেটী এবার উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়াছে, তাহার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হইবে। পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকগণের উপেক্ষায় যে ছাত্রসমাজ দিন দিন কৃশ ও রুগ্ন হইতেছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পিতা ছেলেকে চশমা কিনিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে কয়দিন অন্তর স্নান করে, তৈল মাখে কি না, কিরূপ আহার করে, উত্তমরূপে চর্ব্বণ করে কি না, কতক্ষণ মুক্ত বায়ুতে অঙ্গচালনা করে, প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া দন্তধাবন করে কি না, তাহার পরিপাক শক্তি কিরূপ, তাহার সঙ্গিদিগের চরিত্র কেমন, কোন্ দিকে তাঁহার স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে ইত্যাদি বিষয়ে কোন খবরই রাখেন না। আজকাল ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত যে অতিরিক্ত পান বিড়ি ও নস্য খোর হইয়াছে—জল খাবারের পয়সা দিয়া পরিমল নস্য কিনিয়া নাসিকারন্ধ্রে দিবারাত্র ঢালিতেছে—ইহা কি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে? নানাবিধ কার্য্য ও জঘন্য অভ্যাস যে ছাত্র সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক দেশের যুবকদিগের জীবনীশক্তি নাশ করতঃ তাহা-দিগকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে ইহা কয়জন লক্ষ্য করিতেছেন? উচ্চ ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম বা চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত বেশ ঢল্‌ঢলে ফুল্লকুসুমবৎ সুন্দর, নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল চরিত্র বালক দেখা যায়। যেই তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিল অম্‌নি তাহার মনে চাঞ্চল্যের উদয় হইল, যৌবনের সংস্পর্শ মাত্র সে রসিক নাগর হইয়া কুসঙ্গে মিশিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে আয়ুঃক্ষয় করিতে লাগিল। তাহার আর সে বাল্যের অকলঙ্ক জ্যোতিঃ নাই, তাহার মুখে ব্রণ, চক্ষু, কোটরগত হনু উদ্গত—কেমন একটা আব হাওয়া আসিয়া তাহার নিষ্পাপ শৈশবের পবিত্র নিখুঁত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহার আর পড়ায় ভাল মন লাগেনা; সে কেবল নাটক, উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য পড়িয়া রামী শ্যামীর লুকোচুরিতে মজিয়া হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে যত শীঘ্র ও যেরূপ প্রবলভাবে যৌবন উপস্থিত হয়, পৃথিবীর অপর কোথাও এমন হয় কি না জানিনা। তাই বলি আমরা বড়ই ব্যস্তবাগীশ—আমাদের সবই তাড়াতাড়ি

আমরা জন্মাই তাড়াতাড়ি, শশিকলার ন্যায় ধাঁ ধাঁ করিয়া বর্দ্ধিতও হই এবং যমের বাড়ী যাইও তাড়াতাড়ি। কাজেই অকালপক্ক বৃদ্ধের সংখ্যা আমাদের দেশে এত অধিক। যৌবন পূর্ণ হইতে না হইতে—অপরিণত বীজেই ক্ষয় আরব্ধ হয়। যৌবনে বার্দ্ধক্য দেখিলে দেশের শিক্ষা দীক্ষায় ধিক্কার না দিয়া থাকা যায় না — স্মৃতি শক্তি লুপ্ত প্রায়, চক্ষু দীপ্তিহীন, শরীরে সামর্থ্য নাই, মনে তেজ ও সাহস নাই, চরিত্রের নির্ম্মলতা নাই, পাপীর সদাই বিষাদ,—সদাই ভয়। সে লোক লোচনের সমক্ষে থাকিতে চাহে না—নির্জ্জন বাস তাহার বড় প্রিয়। পূর্ব্বের ন্যায় অসাধারণ মেধাবী ছাত্র আর প্রায় দেখা যায় না কেন? একে ত অসংযত ও দুর্ব্বল পিতামাতার ক্ষীণ শুক্র শোণিতে জন্ম, তদুপরি দেশের হাল্‌কা আব হাওয়ায় এঁচড়ে পাকে বলিয়া ছাত্রদিগের প্রতিভাও সুপ্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরিণত না হইলে কি মানব রসজ্ঞ হইতে পারে? তাহারা নিজে নীরস বলিয়া সুরসের আস্বাদ পায় না এবং পরকেও রসদান করিতে পারে না। এঁচড়ে পাকা কাঁঠাল দেবমানব কাহারও ভোগে লাগে না।

অনেক সুশিক্ষিত অভিভাবক বাড়ীতে পড়িবার জন্য 'রবিন্সন ক্রুশো' 'টমকাকার কুটীর' 'রবার্ট ম্যাকেয়ার' প্রভৃতি পুস্তক ছেলেকে কিনিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ছেলের চরিত্র গঠন ও নৈতিক উৎকর্ষের জন্য ধর্ম্ম ও সুনীতি পূর্ণ কোনও উপদেশ পুস্তক তাহার হাতে দেওয়া হয় কি? রামায়ণ মহাভারতের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। অন্ততঃ বর্ত্তমান সভ্যতার কোন সার গর্ভ সৎভাবপূর্ণ পুস্তক ছাত্রের হাতে দিয়াছেন কি? ছেলের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যতটা করা উচিত তাহার শতভাগের একাংশও আমাদের দেশে যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় কি না সন্দেহস্থল। খোদার নৌকা দহে চলিতেছে - না আছে গুরু, না আছে গোসাঁই, না আছে কর্ণধার। ঠেকিয়া শিখিয়া যদি সে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে তবে চল্লিশ বছরের পর তাহার দেহ, মন, চরিত্র ও ধর্ম্ম বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হয়। তখন সে স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারে, যথার্থ মানুষ হইতে হইলে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা একান্ত আবশ্যক সে তখন বুঝিতে পারে, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে—কিরূপ নিয়ম পালন করিলে সুস্থ ও নীরোগ দেহে অর্থ, জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যায়। অভিভাবক 'ডিজ লণ্ঠন' কিনিয়া দিয়াছেন, কিন্তু টেবিল চেয়ারে বসার তিনি ভয়ানক বিরোধী। ছেলেটী সেই সাবেক প্রথায় মাদুরে বসিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমগ্র মেরুদণ্ড অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বাঁকাইয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অত্যুজ্জ্বল অনাবৃত দীপ শিখার সম্মুখে 'তোতা পাখীর' মত ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দে পাঠাবৃত্তি করিতেছে। পূর্ব্বে মাটির প্রদীপে সর্ষপ বা রেড়ীর তৈল জ্বালাইয়া পড়া হইত; ঠাণ্ডা ও মৃদু আলোকে চোখের কোন অনিষ্ট হইত না। আজকাল চোখ ঝলসান 'ডিজলণ্ঠন' একটা ঘরে থাকিলে প্রথমতঃ কেরাসিন তৈলের দুর্গন্ধে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠে, দ্বিতীয়তঃ ঘরের দুয়ার জানালা বন্ধ থাকিলে একরূপ ভয়ানক গরম বোধ হয়।

বহু ছাত্র আবার ঈদৃশ তীব্র অনাবৃত আলোকে পড়িয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সাবেক প্রদীপের আলোতে মোটেই দেখিতে পায় না। চক্ষু অতি কোমল যন্ত্র; সাবধানে ব্যবহার করিলে বহুকাল কর্ম্মক্ষম থাকে। রাত্রিতে কাজকর্ম্ম করিবার জন্য যে পরিমিত আলোক দরকার উহার বেশী হইলেই প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোতে নেত্রের ক্ষতি বৈ উপকার হয় না। অতি উজ্জ্বল আলোকে পড়ার জন্য প্রত্যহ যে 'ফাজিল' আলোটুকু অপকার করিতেছে, উহা দশ বিশ বৎসর ক্রমাগত জমিয়া একেবারে চক্ষুর মাথা খায়। চোখ খারাপ হইয়াছে বলিয়া অভিভাবক ধাঁ করিয়া কাঁচা পয়সা খরচ করিয়া একখানা ভাল চশমা ছেলেকে কিনিয়া দেন। কিন্তু রাত্রিতে পড়ার জন্য কোন মৃদু আলোকের ব্যবস্থা করেন কি? ছেলে যে অষ্টাবক্রের ন্যায় বাঁকিয়া, কখনও শুইয়া, কখনও বসিয়া, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমঠামে হেলিয়া, দুলিয়া, মুখ নীচু করিয়া, চিৎ হইয়া, দেয়ালে ঠেস দিয়া, রাসভ-রাগিনীতে চীৎকার করিয়া চোখ ঝলসান বিলাতী অনাবৃত আলোকের সম্মুখে গভীর রজনী পর্য্যন্ত পড়িয়া স্বাস্থ্যনাশ করিতেছে ইহার অর্থ কি? রাত্রিতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য না হয় বিলাতী তীব্র আলোক ব্যবহৃত হইল। কিন্তু পড়ার সময় কি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় প্রদীপের বন্দোবস্ত হয় না? কিম্বা যাঁহাদিগের গত্যন্তর নাই তাঁহারা মাথার উপরে ঝুলাইয়া বা যাহাতে অগ্নিশিখাটা চোখে না লাগে এমন ভাবে কাচের ফানুসের চারিদিকে আবরণ বা পর্দ্দা লাগাইয়া রাত্রিতে লেখা পড়া করিতে পারেন। স্বীকার করি, পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তারখানা ও 'চশমার দোকানের অভাব নাই। কিন্তু এমন অমূল্যরত্ন হেলায় হারাইয়া নকল ঠুলি পরিয়া ভবের হাটে ঘুরিয়া বেড়ান কি বিজ্ঞের কর্ম্ম? দাঁত থাকিতে লোক দাঁতের মর্য্যাদা জানে না। তাই আজকাল দাঁত ও খুব শীঘ্রই পড়িয়া যায়। সম্মুখে জরা-রাক্ষসী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন—বাগে পাইলেই পাড়িয়া ফেলিবে। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে সর্ব্বাগ্রে নষ্ট হয় পরিপাক শক্তি, চক্ষু ও দন্ত। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতে হয়, কিন্তু সহরের গাত্রোত্থান দ্বিবিধ—নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানায় শুইয়া বা বসিয়া, হাঁই তুলিতে তুলিতে হস্তদ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে চা-হালুয়ার জন্য ব্যাকুল হওয়া—ইহার নাম 'কাঁচা উত্থান'; পরে চা হালুয়া সেবার দ্বারা তন্দ্রানাশ করতঃ পান-সিগারেট সাহায্যে মলত্যাগের বাসনা জন্মাইয়া যে শয্যাত্যাগ—ইহাই "পাকা উত্থান' নামে অভিহিত হয়। প্রায় অষ্টপ্রহর ছাগ-ছাগীর ন্যায় বাজারে ভ্রষ্ট চরিত্র নরনারীর সাজা তাম্বূল চর্ব্বণ করিলে ও দীপশলাকা বা ঝাঁটার কাঠি দ্বারা যখন তখন দাঁত খুঁটিলে অকালে দাঁত পড়িয়া যায় এবং পরিশেষে অজীর্ণ জন্মিয়া জীবন অসহনীয় করিয়া তুলে। বর্ত্তমান সভ্যতার বান ডাকিয়া আর্য্যপুকুরের কত মাছই বাহির করিয়া দিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকার 'লণ্ঠনে'র প্রচলনে একটা সুবিধা দেখিতেছি, মা জননীদর সন্ধ্যাকালে প্রদীপ বাট করিতে, তুলসী তলায় প্রদীপ দেখাইতে, পিলসুজ মাজিতে এবং সলিতা পাকাইতে হয় না। তবে এখন ইক্‌মিক্ 'কুকারের' দাম কম হইলে বা গ্রামে গ্রামে

ও পাড়ায় পাড়ায় হোটেল খুলিলে আর তাঁহাদিগকে ভিক্ষা কাঠে ফুঁ দিয়া নানা ক্লেশ সহিয়া রাঁধিতে হইবে না। আহা! সেদিন কবে হবে গো, যেদিন বাজার হ'তে ভাত খেয়ে মাসে মাসে বিলের টাকা ফেলে দিব গো!

অদূরদর্শী ভোগীর রোগ অনিবার্য্য। যেখানে মানব, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ, সেইখানেই রোগ, শোক ও অকালমৃত্যু। খোদার উপর চাল চালিতে গেলেই মরিতে হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য। পরম পিতা পরমেশ্বরের কি অপার করুণা! যে দিকে চাহি, সেইদিকেই তাঁহার কৃপার ভূরি ভূরি পরিচয় পাই। সবুজবর্ণ চক্ষুর অহিতকর নহে; পাছে জীবের চক্ষুহানি হয় এই আশঙ্কায় দয়াময় ভগবান বৃক্ষলতা গুল্মগুলিকে সবুজ পত্রে এবং ধরিত্রীকে হরিৎ তৃণে সুশোভিত করিয়াছেন। অজ্ঞ আমরা তাঁহার সাধু সঙ্কল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সূর্য্যদেব প্রায় বার ঘণ্টা আলোক উত্তাপ দিয়া অস্ত যাইবার সময় পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের দিবাচর প্রাণীদিগকে যেন সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; "ওহে জীবগণ! আর পরিশ্রম করিওনা; আপন আপন গৃহে গিয়া বিশ্রাম কর; দিবা পরিশ্রমের জন্য, কিন্তু রাত্রিতে সুগভীর নিদ্রা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের অন্যতম সহায়?" হায়! এ নিয়ম আজ পালন করেন কয়জন গৃহী? কবি, সাহিত্যসেবী, উকীল, মুনসেফ, সংবাদ পত্র সম্পাদক, জমীদার, দোকানদার প্রভৃতি কর্ম্মিগণ রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে শয়ন করেননা। যাঁহারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও চক্ষুর পরিচালনা করেন, তাঁহাদিগের শেষ জীবন প্রায়ই দুঃখময়। মহাকবি মিল্টন ও হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়া যে কত খেদ করিয়াছেন তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? প্রাণে অনন্ত প্রোজ্জ্বল জ্ঞান রাশি, অথচ চক্ষুহীন বলিয়া নিজে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। যদিও সুবোধ পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু সতত কবির নিকটে থাকিয়া গণপতির ন্যায় তাঁহার প্রাণের কথাগুলি লিখিয়া রাখে, তথাপি দুধের তৃষ্ণা কি আর ঘোলে মিটে? জীবনের মহারত্ন হারাইলে দুনিয়ায় আর কি লইয়া থাকিবে? প্রবল পরাক্রান্ত কেশরী যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে স্ফূর্ত্তিহীন ও ম্রিয়মান হইয়া ছটফট করিতে থাকে, সেইরূপ বিপুল কর্ম্মিগণ নেত্রাভাবে তুষানলে দগ্ধ হইয়া সতত ক্ষুণ্নমনে কাল যাপন করেন। কিন্তু প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য নিয়ম! যেই সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকার আসিল, অমনি অঙ্গ অবশ, শরীর অবসন্ন, হাঁই উঠিতে লাগিল, চক্ষু আর মেলিয়া থাকা যায় না; যেন স্বর্গের ঘুম আসিয়া দুনিয়ার সকল জ্বালা জুড়াইবে—সকল শোক-তাপ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইবে। শিশু সারাদিন খেলা করে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার হইলেই সে যেখানে সেখানে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার নিষ্পাপ প্রকৃতি এখনও কৃত্রিমতার দ্বারা বিকৃত হয় নাই, সুতরাং ক্ষুধা, মল, মূত্র, নিদ্রা, আনন্দ সব ঠিক আছে। পরন্তু যেই জ্ঞানগর্ব্বিত সুসভ্য মানব নিজে কর্ত্তা হইয়া খোদার স্থানে বসিল, অমনি ভগবান্ তাঁহার শান্তিময় সুকোমল ক্রোড় হইতে তাহাকে দুনিয়ার জ্বলন্ত অনলরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; সে তখন হইতে ভগবৎকৃপায় বঞ্চিত হইয়া ত্রিতাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। কৃষকেরা সারাদিন মাঠে ভীষণ পরীক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এমন ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে আর তাস,

পাশা, দাবা খেলায় বা কলের গান শোনায় তাহাদের মোটেই মন লাগেনা। তাহারা সায়াহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া সুখে নিদ্রা যায়। মশারির ভিতরে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় টানাপাখার নীচে শুইয়া শ্রমবিমুখ বাবুর ঘুম হয়না, আর কৃষক হয়ত মেজের উপরে পড়িয়াই ঘুমাইতেছে। ক্রিয়া না হইলে কি প্রতিক্রিয়া হয়? দুঃখ না পাইলে কি সুখের আস্বাদ মিলে? শ্রম না করিলে কি বিশ্রামের প্রয়োজন হয়? এক প্রাচীন কৃষক প্রায় প্রতি দিনই তিনচারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নগরে কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত। প্রখর রৌদ্রে বেলা তৃতীয় প্রহরে বাড়ী গিয়া উঠানের কোণে পা ছড়াইয়া বসিয়াই প্রকাণ্ড এক লোটা ঠাণ্ডা জল গলায় ঢালিয়া কেবল এই কথা কয়টী বলিত—"ওরে বড় লোক বাবুরা কি জলের এমন আস্বাদ পায়! আঃ! কি মধুর! কি মধুর! যেন অমৃত অপেক্ষাও শান্তিপ্রদ!" ঘুম কাহারও খাতক নয়; সে রাজপ্রাসাদ মোটেই পছন্দ করেনা, শ্রমশীল গরীবের ভগ্নকুটীর তাহার বড় প্রিয়। এক ঘুমে কৃষক উঠিয়া দেখে রাত্রি প্রভাত, পূর্ব্বাকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। দোয়েল মিঠা রাগিণীতে আগমনী ধরিয়া মনের আনন্দে বিভু-গুণগান করিতেছে। কৃষক উঠিয়াই চোখ মুখ হাত ধুইয়া লাঙ্গল গরু লইয়া লইয়া মাঠের দিকে আগুয়ান। আর সুসভ্য ও সুশিক্ষিত মানব রাত্রিতে ঘুমাইবে কি, রাত্রি না থাকিলে ভাল হইত। রেল কোম্পানির পক্ষে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সূর্য্যালোক থাকিত, তাহা হইলে দৈনিক আরও কাঁচা পয়সা রোজগার হইত। কিন্তু ভগবানের অন্ধকার একবারে ত তাড়ান যায় না। যতদূর সম্ভব গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোকে রজনীর গাঢ় তিমির নাশ করতঃ চোর ডাকাতের ভয় অনেকটা কমাইয়াছে বটে, কিন্তু লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষতঃ কোমল চক্ষু যেন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। হাওড়া, খড়্গাপুর প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে বোধ হয় যেন কোন অজ্ঞাত প্রভালোকে আসিয়া পঁহুছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আর আলোর দিকে তাকান যায় না, যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়। রাত্রিতে যাঁহারা night duty করেন তাঁহাদিগের মার্কামারা চেহারা দেখিলেই চেনা যায়—কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, তাঁহারা খোদার নিয়ম ভঙ্গ করেন। যেখানে প্রকৃতিবিরোধ, সেই খানেই কেমন একটা কলুষ বিষাদ কালিমা জাজ্জ্বল্যমান। যাত্রাথিয়েটার প্রভৃতি রঙ্গালয়ের পেশাদার অভিনেতৃবর্গের, আফিসে রজনী কার্য্য নিযুক্ত কেরাণীবৃন্দের ও রাত্রিজাগণকারিণী নরঘাতিনী গণিকাগণের বিশ্রী আকৃতি বিশেষতঃ নিষ্প্রভ নয়ন দেখিলেই প্রকৃতি বিরোধের অবশ্যম্ভাবী ফল পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা night duty করেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা দশজনও দীর্ঘায়ু লাভ করেন কি না জানিনা। ভগবানের রাজ্যে কোথাও অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলতা নাই। সভ্যতাদৃপ্ত মানব নিজে কর্ত্তা হইয়া প্রাকৃতিক বিধি লঙ্ঘন করতঃ প্রতিনয়িত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উকীল-ডাক্তারের পাদপদ্ম পূজায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। কিন্তু সে আর হটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইতেছেনা —কারণ বর্ত্তমান সভ্যতা ক্রমোন্নতি

শীল ও অগ্রগামী। তবে যেরূপ বাড়াবাড়ি দেখিতেছি, এইভাবে চলিলে তাহার সুখশান্তি লোপ অনিবার্য্য। আত্মম্ভরি মানব! স্বীকার করি তুমি জ্ঞানাবিজ্ঞান বলে আজ ত্রিভুবনে অধীশ্বর, কিন্তু প্রকৃতি-জননীকে অবহেলা করিয়াছ ও খোদার হুকুম তামিল কর নাই বলিয়া তোমার বিদ্যাদীপ্ত হৃদয়েও অবিদ্যার অন্ধকার লুকাইয়া রহিয়াছে। তাই তোমার সোণার সংসার ছারখার হ'ল—তোমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। তবে হতাশ হইবার কারণ নাই। এখনও সময় আছে। যাও নাস্তিক, খোদার কাছে ক্ষমা চাও—তিনি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যাও কর্ম্মিন্! ধর্ম্মের আশ্রয় লও, প্রেমভক্তির প্রতিষ্ঠা কর, তবেই তোমার ভবের হাট সুখময় হইবে। তবেই তোমার আঁধার প্রাণ এক অপূর্ব্ব বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আর সৎসঙ্গ, বিবেক, ধর্ম্ম, নীতি, পরকাল ভুলিয়া ইহসর্ব্বস্ব ভোগপাগল, জড়সভ্যতার প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপ দাও, পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে। তোমার আশা ভরসা কিছুই মিটিবেনা। তুমি যেথানে পঁছিবার জন্য মহাগর্ব্বে চলিয়াছ, ও পথে যাইলে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে কিনা ঘোর সন্দেহস্থল।

প্রকৃতির নিষ্পাপ রাজ্যে কেবল প্রেম, আনন্দ ও শান্তি—রোগ শোকের বিকট মূর্ত্তি অতীব বিরল। এদেশে এক প্রকার পাখী দেখা যায়, উহারা বাড়ীর কাছে বৃক্ষশাখায় বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকে—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল,। সভ্যতাভিমানী নাস্তিক মানবের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া যেন উহাদেরও হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, তাই সাবধান করিবার জন্য সাগ্রহে বলিতেছে—"ওহে সংসারী জীব! দেখ আমাদের গোলাবাড়ী নাই, সঞ্চিত শস্য নাই। তথাপি কেমন মনের আনন্দে ধ্রুবপদ গাহিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতেছি। আর তোমরা কামিনীকাঞ্চনে উন্মত্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া শীঘ্র শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় করিয়া ফেলিতেছ! তোমাদের মনে বিশ্বাস নাই, প্রাণে আশা নাই—কেবল সংশয়, কেবল সন্দেহ। কর্ত্তৃত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া ধ্বংস সাগরের দিকে ছুটিয়াছ। বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছ, তথাপি বাসনার নিবৃত্তি নাই। ওহে বিষয়িন্! গতস্য শোচনা নাস্তি। একবার উঠিয়া সেই পরম দয়াল পতিতপাবনের শরণ লও, তোমার মরুময় বিশুষ্ক প্রাণে আবার আশারবর্ষার সুশীতল বারিপাত হইবে! আবার সুনীতির অনুসরণ কর,—'আজ খেয়ে ন্যাড়া নাচে, কালিকার গোবিন্দ আছে'। পাখী সত্যই বলে—'চোখ্ গেল', 'চোখ্ গেল।' আমরা যে চোখের মাথা খাইতেছি, তাহা পাখীর প্রাণেও লাগিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, বর্ত্তমান সভ্যতার তীব্র জ্যোতিতে মানুষের চোখ্ই আগে নষ্ট হইবে। তাই বিষয়ান্ধ জীবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য কাতর স্বরে বলে—চোখ্ গেল, চোখ্ গেল। ওহে কর্ম্মিন্, আর কেন? জীবনের শেষ কয়টা দিন আরামে হরিভজনে অতিবাহিত কর। অনেক খাটিয়াছ, অনেক ক্লেশ পাইয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছ, এখন একটু ভোগ কর। সরকারী বৃত্তি পাইয়া গৃহে বসিয়া পরকালের কাজ কর,—আবার কেন

ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া অমূল্য জীবন বৃথা ব্যয় করিয়া ফেলিতেছ? তোমার অজপা যে ফুরাইয়া আসিল, এখনও তোমার উৎকট বিষয় নেশা ছুটিল না—বেলা গেল, এখনও তুমি পারে যাবার জোগাড় করিলে না! ধন্য বিষয়-মদিরা, মদের নেশা কাটে, কিন্তু এ নেশা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। ওহে সুবোধ! এখনও চিত্ত সংযত কর,—এখনও মনের মুখে লাগাম দাও, নচেৎ তোমার, কামিনীকাঞ্চনের দুর্নিবার বাসনা উধাও ছুটিয়া নিশ্চয়ই তোমায় খানা-ডোবায় ফেলিয়া মারিবে। সাধু সাবধান, সময় থাকিতে শেষের সম্বল গ্রহণ কর।

সুবিশাল মানব সমাজে—বহু লোকপূর্ণ মহানগরীতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা বড় কঠিন। এক ক্ষুরে সব মাথা মুড়াইয়াছে। এক কলের ময়দা, এক কলের তৈল,এক কারখানার ঘৃত, এক সওদাগরের চিনি, এক ব্যবসায়ীর লবণ প্রভৃতি সহরের সর্ব্বত্র বিক্রীত হইতেছে। আপনার একটু বাছাবাছি স্বভাব থাকিলেও পৃথক্ বস্তু পাইতেছেন কোথায়? সবাই যাহা খাইতেছে আপনাকেও বাধ্য হইয়া তাহাই লইতে হইবে। কলিযুগের সহরে সব গাদার শিব—শিবের ডিপো। সবার ভাগ্যেই সেই মন্ত্র এক ফুল, এক বেলপাতা. এক ফোঁটা গঙ্গাজল। ছোট বড় সব মহাদেবের এক দশা—এ বিরাটগঞ্জে মুড়ি-মিছরীর এক দর। বিশাল বাজারে যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সহরে তাই—সেই adultery and adulteration (সংমিশ্রণ ও ব্যভিচার); buying, selling and amusement (ক্রয়, বিক্রয় ও আমোদ) সকলেই ব্যবসা ও চাতুরী দ্বারা পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে—কামিনী কাঞ্চন সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাপ্রেমিক নিতাই গৌরের মত প্রেমের বন্যায় দুনিয়া ভাসাইবে কে? কে সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় স্থির ধীর ও পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক সত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ ত্রিভুবন বিমোহিত করিবে? এখানে সত্বের সুমধুর প্রাণ মাতান সৌরভ নাই বলিলেই চলে—আছে কেবল কসাইখানার মত রজস্তমের আঁশটে দুর্গন্ধ——স্বার্থের কচকচি—স্থৈর্য্যনাশক গতি ও কোলাহল। এই ভীষণ প্রলোভনের মধ্যে যথার্থ প্রাণায়াম করিবে কে? প্রবল বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় কর্ম্মস্রোতে নগর অনুক্ষণ তোলপাড় করিতেছে। এই ভয়ানক আড়োলন বিলোড়ন ও উত্তেজনার মধ্যে কে স্থির হইয়া এক মুহূর্ত্ত চঞ্চলচিত্তকে সেই ধ্রুব-পদের দিকে চালিত করিতে পারে? এ গোলমালে স্বয়ং মহাদেবেরও ধ্যানভঙ্গ হয়। সকলেই এই ভয়ঙ্কর কর্ম্মাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আত্মাকে হারাইয়া অহোরাত্র ঘুরিতেছে। ক্ষুধার সময় সম্মুখে ছাইভস্ম যাহা পাইল, তাহাই অম্লানবদনে পাকস্থলীতে পাঠাইয়া দিল; কাজের তাড়নায় অস্থির হইয়া অস্থান কুস্থানে গমন করিল। এই অবিরাম বেগের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় নাই—ধাঁ করিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে। সাঁতার জান, উজাইয়া উঠিতেও পার; নহিলে হাত পা ছাড়িয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া দাও। ভগবান্ কি চক্রী! ছয়টী রিপু দিয়া মানুষকে সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন; তাহারা এখন পরস্পর কামড়া কামড়ি করিয়া মরিতেছে। মানুষ যখন পাপে লিপ্ত হয়, তখন স্বীয় দুষ্কৃতের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে

তাহার চৈতন্য থাকে না। এজন্য বিশাল জন পদ সমূহে এত অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, রক্তাতিসার, প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, মেহ, উপদংশ, ফিরঙ্গ, যক্ষ্মা, বাত, কাশ প্রভৃতি কদর্য্য দুরারোগ্য ব্যাধি সকল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। প্রত্যেক ডাক্তারখানায় প্রায় প্রত্যহ 'চোখ গেল, চোখ গেল' এই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়। চোখের ব্যারাম এত বেশী যে পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে বিশেষজ্ঞ অক্ষি-চিকিৎসকের ও চশমার ডিপো স্থাপিত হইলে ভাল হয়। যেখানে রোগের এত প্রাবল্য সেখানে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা কিরূপে সম্ভবপর? কি সূক্ষ্মভাবে—কোন্ সূত্র ধরিয়া যে রোগ-বীজ দেহে প্রবেশ করে তাহা কে বলিতে পারে? চতুর্দ্দিকে ভেজাল ও ব্যভিচারের মধ্যে পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সুদূরপরাহত। 'সাত বিধবা, এক 'এয়ো' সবাই বলে আমার মত হ'ও।

শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জগতে মানসিক ব্যায়াম ও চক্ষুর চালনা সাতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। কবি, সাহিত্যিক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, বিচারক, উকীল ডাক্তার, অধ্যাপক শিক্ষক, পোষ্ট মাষ্টার ও কেরাণী মহলে মাথার খাটুনি অতিরিক্ত বাড়িয়াছে। চিন্তাশীল মস্তিষ্ক যেন সর্ব্বদা শূলে চড়িয়া আছে—পাশ ফিরিবার যো নাই। খবরের কাগজের সম্পাদক মহাশয় যেন এক প্রকার লিখন যন্ত্র বিশেষ—নিত্য নূতন ঘটনা প্রকাশ করতঃ সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। গতকল্য রাত্রিতে যে ঘটনা ঘটিয়াছে উহা যাঁহার কাগজে সর্ব্বাগ্রে বাহির হইবে, তিনি কিছু মোটা-টাকা লাভ করিবেন। তাঁহার একমুহূর্ত্ত মাথা চুলকাইয়া গড়িমসি করিবার সময় নাই। আজকাল সব গরম গরম দেওয়া চাই—বাসি জিনিষের কদর নাই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে গরম চা, গরম হালুয়া, গরম লুচী, গরম আলুর দম, গরম মেজাজ। বর্ত্তমান সভ্যতায় ঠাণ্ডা হইলেই তিনি জীবন-সংগ্রামে ভূতলশায়ী হইবেন। দুনিয়ার যেখানে যাহা ঘটিতেছে উহা গরম গরম খোস খবর প্রিয় বাবুদের নাকের সাম্‌নে ধরিতে হইবে। আজ মাথা ধরিয়াছে বা পেট কামড়াইতেছে বলিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেই কাগজের পসার গেল। সামান্য ঘটনাকেও বেশ রং দিয়া সাজাইয়া গরম গরম প্রকাশ করতঃ লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে। তবেই আপনি সুরসিক সুলেখক বলিয়া সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবেন। আজ-কাল কুড়ের অন্ন নাই। সর্ব্বদা কুড়ের মুখে লাগাম দিয়া সজ্জিত করিয়া রাখা চাই—ইঙ্গিত মাত্র ছুটিতে হইবে। 'এক যো, শতেক পো। বিংশ শতাব্দীর অন্নসমস্যায় মৃতজননীর সৎকার ফেলিয়া চাকরী বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু এই যে ভীষণ ছুট, ভয়ানক মস্তিষ্ক চালনা, দারুণ অন্ন-সমস্যা, প্রাণ ঘাতিকা দুশ্চিন্তা, ইহার অনুপাতে পর্য্যাপ্ত, তেজস্কর ও আয়ুবর্দ্ধক খাদ্য পায় না। কাজেই লোকের মগজ খালি হইয়া যায়। পেটে খেলে পিটে সয়। যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ কাজ, সেরূপ সমুচিত ক্ষতিপূরণ হয় না। সুতরাং ক্রমশঃই শরীর নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। একদিন হঠাৎ heart failure হইয়া রোগীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়। বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষের চিত্তকে সগুণ ধনুর সহিত তুলনা করা যাইতে

পারে। সর্ব্বদা ছিলা লাগান থাকিলে যেমন জোর থাকে না, সেইরূপ অনুক্ষণ মস্তিষ্ক চালনা করিলে চিত্ত বিশ্রাম না পাইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও বক্র হইয়া যায়। তাই আজকাল সব মানুষের মনই বাঁকা; কামিনী-কাঞ্চন-বাসনা-রূপিণী জ্যা আরোপিত থাকায় মানবের সরল চিত্ত বক্র হইয়া গিয়াছে—আর সোজা করা যায় না। এত অধিক স্নায়বিক অবসাদ ও ক্ষয় হইলে কি মানুষ দীর্ঘায়ু হইতে পারে? জীবন ডাক্তার অক্ষয় নহে—আয়ুষ্কাল অতি অল্প। এই সামান্য পুঁজি শীঘ্র শীঘ্র ব্যয় করিয়া ফেলিলে আর কি লইয়া ব্যবসায় চালাইবে? কাজেই অধুনা চল্লিশ পার হইতে না হইতে শিরোঘূর্ণন, অপস্মার, মূর্চ্ছা, হৃদ্‌রোগ, অজীর্ণ, বহুমূত্র, অর্শ, বাত, কাশ প্রভৃতি একটা না একটা ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে। যেখানে অপরিমিত অন্ধ ভোগ, সেইখানেই রোগ শোকের হুলুস্থূল ব্যাপার। আর্য্য-শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—

রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসনানিচ।
আত্মাপরাধ বৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্।

চশমা-প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলিয়াছি। আর একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গে আমাদের সমাজে অনেক বিদেশী আদব্‌কায়দা ঢুকিয়াছে। বিয়ের ফর্দ্দে বরা-ভরণ জন্য বরের পিতা ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, আংটী, প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই কন্যার পিতার নিকট হইতে জুলুম করেন। একটা পাশ করিলেই হাজার টাকা, দুইটা পাশে দুই হাজার, এইভাবে পাশ পিছু হাজার টাকা বাঁধা দর হইয়া গিয়াছে। আজকাল গরুর বাজার যেমন চড়া, বরের বাজারও তেমনি। অনেক দাম না দিলে আর ভাল গরু মিলে না। দুধের সের হিসাবে গাভীর দর হয়, যেমন সের করা চল্লিশ টাকা হিসাবে দু'সের দুধ দেওয়া গাভীর মূল্য আশী টাকা; সেইরূপ দুটা পাশ করা ছেলের দাম দুই হাজার টাকা। এতদ্ব্যতীত আনুসঙ্গিক অন্যান্য খরচও আছে! অনেক সময় কন্যাদায়গ্রস্ত বেচারার দুঃখে কাতর হইয়া ছেলের বাপ একটু সমবেদনা প্রকাশ করিলেও তাহার গর্ভধারিণী মাতা মনোমত দর না পাইলে তাঁহার বড় দুঃখের নাড়ী ছেঁড়া পাশ করা অমূল্যনিধি ছাড়িতে চাহেন না। মাতার কিছুতেই মনসন্তুষ্টি হয় না। পাত্রীর কুল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র প্রভৃতি কিছুই আগে দেখা হয় না। টাকার ব্যাপার, দেনা পাওনার কথা সর্ব্ব প্রথম। বর্ত্তমান বিবাহ যেন টাকার সহিত—পুরুষ প্রকৃতির শুভ-পরিণয় নহে। আর যত দোষ করিয়াছে সেই নন্দ ঘোষ। পাশ করা ছেলের উপর যত ব্যয় হইয়াছে তৎসমুদয় হতভাগ্য কন্যার পিতার নিকট হইতে উস্থূল করা হয়! বেচারা যেন চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে—অপরাধ কি? না তাঁহার স্ত্রী একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। শিক্ষিত সমাজে এইরূপ জোর জুলুম পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। আজকাল ভাল গরু কেনাও যেমন দুর্ঘট, ভাল ছেলের সহিত গরীবের মেয়ের বিবাহ ও তদ্রূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে সেকেলে পিতা কন্যাদায়গ্রস্ত নবমীর পাঠা বলি দিবার সময় একটু সদয় ভাবে আস্তে কোপ মারেন। কিন্তু শিক্ষিত বাবুর চাণক্য নীতির কাছে কে যুক্তি খাটাইবে? "আমার ছেলে মানুষ করিতে তিন হাজার টাকা ব্যয়

হইয়াছে—এ টাকাটা আমার আদায় করিতেই হইবে"। যাহা হউক বরা-ভরণ ফর্দ্দে ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, সাইকেল প্রভৃতির উল্লেখ হইলেও চশমা লওয়ার কথা উত্থাপিত হইয়াছে কিনা না জানি ঃ। গর্ভধারিণী মাতা তাঁহার পাশ করা নবকার্ত্তিক ছাড়িবার সময় বোধ হয় আর কিছুদিন বাদে বিয়ের ফর্দ্দে জোর করিয়া আর দুইটা বাব্ বাড়াইবেন :—"আমার দুটা-পাশ করা ছেলে সওদাগর আফিসে ত্রিশ টাকা মাহিনায় চাকরী করে; খেটে খেটে বাছার দেহে আর কিছুই নাই. চোখটাও একটু খারাপ হইয়াছে; সুতরাং বিয়ের সময় এক খানা সোণার চশমা লইতে হইবে; শুধু পাশ করিলেই ত দাম বেড়ে যায়, আমার ছেলে আবার আফিসের কেরাণী; এক্ষেত্রে চশমা লওয়াটা খুব ন্যায় সঙ্গতই হইবে। আর ছেলেটা সন্ধ্যা-বেলা নিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় নীরস দেহ শুষ্কমুখে বাড়ী আসে; বাড়ীতে একটু আমাদের জন্য বিয়ের সময় একটা গ্রামোফোন লইতে হইবে; বাছা আমার সারাদিন আফিসে কলম পিশিয়া গৃহে ফিরিয়া রাত্রিতে দু'খানা ভাল কলের 'গান শুনিলেও একটু সুস্থ হইবে। সহরে নগরে এখন ঘড়ীর দোকান মাত্রেই চশমা ও সাইকেলের সরঞ্জাম আছে। অতএব গ্রামবাসীকেও আর বহু অর্থব্যয় করিয়া দূরবর্ত্তী সহরে ছুটিতে হইবে না! অদূর ভবিষ্যতে বিয়ের ফর্দ্দে সোণার চশমা ও বাইজীর গানওয়ালা গ্রামো-ফোন এই দুইটা বাব্ সন্নিবেশিত হইলেই, ঘড়ী, চেন, সাইকেল, চশমা ও কলের গান এই পঞ্চাভরণ শোভিত বর দেখিয়া আকাশ হইতে দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণ করিবেন এবং সেই বিবাহ রাত্রিতে ব্রহ্মলোক হইতে স্বয়ং বিরিঞ্চি পঞ্চমুখে আর্য্য-পুত্রের বিলাস বিভব কীর্ত্তন করিতে থাকিবেন।

দম্পতী জীবন।

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন, ধন্বন্তরি, কাব্য-ব্যাকরণ তর্কতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রসূতি চর্য্যা।

প্রসবের পর গরম জল দ্বারা প্রসূতির ক্লেদাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়া মৃদু বায়ু সঞ্চা-লন, শরীরে হাত বুলান, প্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রসব ক্লেশ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুস্থ হইলে প্রসূতিকে তৈল মাখাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মৃদু মৃদু অগ্নিস্বেদ দিবে, তাহার পর পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃত সহযোগে পান করাইয়া

প্রসূতির উদরে ঘৃত ও তৈল একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে, এবং একখানি বড় কাপড় দিয়া উহার উদর চাপিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ করিলে প্রসব-ক্লেশ জন্য দূষিত বায়ু উদরে প্রবেশ করিবার অবসর না পাওয়ায় কোনরূপ বিকার জন্মাইতে পারে না।

সূতিকা-গৃহের অন্ন, পানীয়, পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, প্রসূতি ক্ষুধিতা হইলে প্রথমে তাহাকে যথাযোগ্য মাত্রায় ঘৃত পান করাইতে হয়, জীর্ণ হইলে উপরি লিখিত পিপুল প্রভৃতি দ্রব্যের কাথে যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঐ যবাগূ খাইতে দিতে হয়, অন্ততঃ পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে দুই বেলা, ঘৃত সহ উক্ত চূর্ণ ও যবাগূ পান করাইয়া পরে অল্প অল্প পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিতে দেওয়া উচিত। যাহাদের ঘৃত পরিপাক করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহাদিগকে উক্ত নিয়মে যবাগূ খাইতে দিবে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রসূতিকে যবাগূ খাইতে দেওয়ার রীতি প্রায় দেখা যায় না। যেদিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন কোনও দ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় না। পর দিন দশমূল পাচন ও ঘৃত সহ উল্লিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ, অথবা শুঁঠ, পিপুল ও গোলমরিচের চূর্ণ খাইতে দেওয়া হয়, ক্ষুধার সময় ঘৃত যুক্ত চিঁড়া ভাজা ও অল্প পরিমাণে দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয়, তিন দিন এই নিয়মে রাখিয়া চতুর্থ দিবসে মিহি পুরাণ চাউলের অন্ন, ঘৃত, অল্প লবণ ও বেশী গোলমরিচের ঝাল যোগে কলা, পটল, মাগুর বা কই প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল খাওয়ান হয়। এইরূপে খাদ্য বিষয়ে কিছু দিন কঠিনতা অবলম্বন করিয়া পরে পুষ্টিকর অন্যান্য খাদ্য দেওয়া হয়। প্রসব হওয়ার পর অন্ততঃ দেড় মাস পর্য্যন্ত প্রসূতি অতি লঘু পথ্য ভোজন, প্রতিদিন তৈল মাখিয়া স্বেদ গ্রহণ, হরিদ্রা ও তৈল মর্দ্দন করিবেন। অধিক পরিশ্রমের কাজ এবং বিহারাদি পরিত্যাগ করিবেন। আমাদের দেশে প্রসূতিরা নয়, এগার, তের, অথবা একুশ দিনে সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়া স্নানান্তে অন্য গৃহে প্রবেশ করেন।

শিশু-চর্য্যা।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু সম্বন্ধে যে নিয়ম অবলম্বন করা উচিত, তাহা "নবকুমারের নিয়ম" নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার খাদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। 'চরক' পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রথম দিন যেমন ঘৃত, মধু ও সুবর্ণ ভস্ম, অথবা মধু ও ঘৃত শিশুকে পান করান হয়, তেমনি স্তন্যও পান করিতে দিতে পারা যায়, কিন্তু অনেক সময়ে তিন চারিদিন প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় না। সেই কারণে এবং স্বজাতীয় উপযুক্ত ধাত্রীর অভাববশতঃ এখনও অনেক স্থানেই তিন দিন শিশুকে নারী স্তন্য খাইতে দেওয়া হয় না। এই তিন দিন পাতলা নেকড়ার পলিতা করিয়া তাহার দ্বারা গোরুর দুধ পান করান হয়। চতুর্থ দিন হইতে মাতৃ স্তন্যও পান করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথম দিনে যদি বিশুদ্ধ মাতৃ দুগ্ধ ক্ষরিত হয় অথবা স্বজাতীয়া কোন স্নেহশীলা স্ত্রীর স্তন্য শিশুকে পান করাইবার সুবিধা থাকে, তাহা হইলে নারী-দুগ্ধ পান করানই ভাল বলিয়া মনে

হয়। যেহেতু গর্ভে স্থিতিকালে শিশু যে সকল রসাদি দ্বারা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, নারী-স্তনের দুগ্ধ তজ্জাতীয় রস। উহা পূর্ব্ব হইতে কিছু সাত্ম্য বলিয়া প্রসবের পর খাওয়াইলেও হঠাৎ নূতন বস্তু খাওয়ার জন্য শিশুর কোনরূপ অসুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নারীগণের দুগ্ধের জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শিশুর ধাত্রীর বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ আছে। আমাদের দেশে সম্প্রতি সর্ব্বগুণ সম্পন্না স্বজাতীয় ধাত্রী মিলে না এবং তিন চারিদিন মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয় না বলিয়া অগত্যা গো-দুগ্ধ পান করাইবার রীতি চলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নারী দুগ্ধের অভাবে গো-দুগ্ধ অথবা ছাগ-দুগ্ধই শিশুকে পান করান উচিত। গো দুগ্ধ বা ছাগী-দুগ্ধে নারী-দুগ্ধের অনেকটা সমান গুণ আছে। তবে ঐ দুগ্ধ যেন অগ্নি সংযোগ বেশী ঘন করা না হয়।

শিশুর পক্ষে দুগ্ধের মত আর কোন বস্তুই সুপথ্য ও হিতকর হইতে পারে না, কেবল দুগ্ধ দ্বারাই শিশু বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ দুগ্ধের একটী সার্থক নাম দিয়াছেন, সেই নাম বালজীবন।

শিশু রক্ষার জন্য আজকাল অনেকেই বিদেশ হইতে আনীত জমাট কৃত্রিম দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ঐ দুগ্ধ শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষার পরিপুষ্টির প্রতি কত যে উপযোগী তাহা বিশেষজ্ঞেরাই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। জলীয় দ্রব্যকে জমাট ভাব করিতে হইলে এবং তাহাকে অবিকৃত অবস্থায় দীর্ঘকাল রাখিতেই গেলে অবশ্যই অন্যান্য ভেষজ দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ অথবা ছাগলের দুগ্ধও যদি কৃত্রিম দুগ্ধের উপাদান হয়, তাহা হইলেও অপরাপর ঔষধ দ্রব্যের সংযোগ থাকাতে উহাতে যে গুণান্তর আসে না বা শিশু-শরীরের অনিষ্ট করে না তাহার প্রমাণ কি? আহার্য্য দ্রব্যের সহিত প্রথম হইতে অনভ্যস্ত অনিষ্টকারী ঔষধ দ্রব্য খাওয়াইলে বালকের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য। কৃত্রিম দুগ্ধের আর একটী দোষ "যে তাহাতে—অধিক মাত্রায় চিনি অথবা অন্য কোন মধুর দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। সেই জন্য ঐ দুগ্ধ ব্যবহার করাইলে শিশুর অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা মেদোধাতু অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, মেদ বৃদ্ধির জন্য শরীর আপাততঃ মোটা হয় বটে, কিন্তু বলশালী না হইয়া চিরকালের জন্য নিস্তেজ ও অলস হইয়া পরে, (দুগ্ধ দিবার সময়) প্রথমে স্তনটী পরিষ্কার করিয়া লইয়া এবং কিছু দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া বালককে খাইতে দিতে হয়। গালিয়া না ফেলিলে হঠাৎ বেশী দুধ মুখে যাওয়ায় গলনালী বদ্ধ হইয়া যাইতে পারে ও কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। ঠিক সময়ে দুধ না খাওয়াইলে বিষমাশন জন্য অনেক প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধারও বৃদ্ধির হয়, এইজন্য কেবল স্তনের দুধে পেট ভরে না, সে সময়ে ক্রমে ক্রমে গোরু বা ছাগলের দুধ নিয়মিত সময়ে খাওয়াইতে হয়। অন্ততঃ ছয় মাস পর্য্যন্ত শিশুকে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য সাগু বা বার্লি প্রভৃতি খাওয়ান উচিত নহে, ছয় মাসের মধ্যে শিশুর কঠিন বস্তু পরিপাক করিবার

ক্ষমতা আসে না, ছয় মাসের মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য খাইতে দিলে শিশুর অজীর্ণ, উদরাময়, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি রোগ জন্মে। মোট কথা আজকাল যে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ ও মাতৃদুগ্ধের অভাব এবং অসময়ে কৃত্রিম দুগ্ধ ও সাগু-বার্লি প্রভৃতি শিশুর অনুপযোগী দ্রব্য সমূহের ব্যবহার। মাতা অথবা ধাত্রী ক্ষুধান্বিতা শোকার্ত্তা, পরিশ্রান্তা অথবা গর্ভবতী হইলে এবং জ্বরের অবস্থায় শিশুকে স্তন্যপান করাইবেন না, শিশু খাইতে না চাহিলে তাহাকে কোনক্রমেই খাওয়ান উচিত নহে।

শিশুকে হরিদ্রা ও তৈল মাখাইয়া রৌদ্র পক্ক জলে সপ্তাহমধ্যে স্নান করাইতে হয়, এবং প্রত্যহ চোখে কাজল দিতে হয়, কাজলের দ্বারা চক্ষুর জল শুকাইয়া নির্ম্মলতা জন্মে এবং চক্ষু বড় হয়।

শিশুকে আলোকযুক্ত, চারি ধারে বাতাস শূন্য, অথচ একদিকে বাতাসযুক্ত গৃহে ঋতুর অনুরূপ মনোহর কোমল শয্যায় শয়ন করাইবে, শয্যা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক, শিশুর ব্যবহৃত কাপড়ের জিনিসগুলি ময়লা বা মলমূত্রাদিযুক্ত হইলে তাহা উত্তমরূপে সাবান অথবা ক্ষারাদির দ্বারা ধুইয়া তাহাতে যব, সরিষা ময়না, হিং গুগ্‌গুল্, বচ, হরীতকী, জটামাংসী, চোরকাঁটা প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশাইয়া উহার ধূম দিয়া লইতে হয় এবং সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে সৌরভযুক্ত করিতে হয়।

শরীর দৃঢ় হইতে না হইতে অনেকে আদর করিয়া শিশুকে বসাইতে চেষ্টা করেন, এরূপ আদরে যে শিশুর অঙ্গ চিরদিনের মত বিকৃত হইতে পারে ইহা অনেকেই অবগত নহেন, বসিবার উপযুক্ত শরীরের দৃঢ়তা না আসিলে শিশুকে বসাইলে শিশু কুব্জ হয়।

শিশু কোনরূপ উৎপাত করিলে অথবা আহার করিতে না চাহিলে, ভূত প্রেতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে বশে আনিবার চেষ্টা করা, আমাদের দেশে একটা সাধারণতঃ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে যে শিশুর মানসিক অবস্থার কত অবনতি ঘটিতে পারে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষের মনে সাহস থাকা নিতান্ত আবশ্যক, প্রথম হইতে যদি অযথা ভাবে শিশুর মনে ভয় সঞ্চার করা হয়, তাহা হইলে তাহার মন দৃঢ় না হইয়া ভীরু হইবেই, বাল্যকালের এই কুসংস্কার বশতঃ সে বড় হইয়াও ভয় ত্যাগ করিতে না পারায় চিরকালের জন্য সাহসশূন্য হইয়া পরে, এই কারণে শিশুকে ভয় দেখান কর্ত্তব্য নহে।

(ক্রমশঃ)

বনৌষধি।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

পারিভদ্র—পাল্‌দেমাদার,

হিং ফরহদ্‌।

—:০:—

মাদার দুই জাতীয় দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থলে শিমুল বৃক্ষকেও চল্‌তি ভাষায় মাদার বলিয়া থাকে, শিমুল বৃক্ষ হইতে তুলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পালদেমাদার হইতে তুলা জন্মে না, উহার শিমের ন্যায় ফল হয়, পুষ্পগুলি দেখিতে সুদৃশ্য—উল্লিখিত দুই জাতীয় মাদারের মধ্যে অপরের নাম জলমাদার। উভয় মাদার বৃক্ষে কণ্টক জন্মে। আমরা লিখিত প্রবন্ধে পালদেমাদারের গুণ ব্যাখ্যা করিব। ইহা পল্লীগ্রামে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বহুলোকে এই মাদারের ডাল দ্বারা জমির বেড়া দিয়া থাকে।

পালদেমাদারের পত্র—কৃমিনাশক, ইহার রস অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করাইলে কৃমি নষ্ট হয়। কৃমি রোগাধিকারোক্ত ঔষধে পালদেমাদারের রস সহপান করিতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

উদক মেহে পাল্‌দেমাদার—উদক মেহাক্রান্ত রোগীকে পাল্‌দেমাদারের মূলের ছালের কাথ সেবন করাইলে উদক মেহের শান্তি হয়।

অধোগত অম্লপিত্তে—পাল্‌দে মাদারের পাতা এবং আমলকী সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথ সেবনে অধোগত অম্লপিত্ত নিবৃত্ত হয়। ইহা বিরেচন।

পাল্‌দে মাদারের পত্র রজঃপ্রবর্ত্তক। যে সকল নারীর অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতু দর্শন হয়না, অথবা প্রথম ঋতু হইয়া পরবর্ত্তী কালে ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা যাহাদিগের কষ্টের সহিত অল্প ঋতু নির্গত হয় ইহাদিগের পক্ষে অর্দ্ধতোলা পরিমাণ পাল্‌দে মাদারের রস প্রত্যহ সেবন করাইলে রজদর্শন ও রজ বর্দ্ধক হইয়া থাকে।

পাল্‌দে মাদারের পত্র স্তন্য বর্দ্ধক। যে সকল প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ কমিয়া যায় তাহাদিগের পক্ষে নারিকেল দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ পাল্‌দে মাদারের রস সেবনে স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পাল্‌দে মাদার পত্র বাগী বিলীন কারক—এই পাতা গরম করিয়া বাগীর উপরে বাঁধিয়া রাখিলে বাগী বসিয়া যায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র পাল্‌দে মাদার পত্রের রস হিতকারক। ইহাতে মূত্র সরল হইয়া নির্গত হয়।

কালাজ্বর।*

[ডাক্তার শ্রীগণপতি পাঁজা এম্-বি]

আজকাল বাঙ্গালাদেশে কালাজ্বর বেশী দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে আসামেই ইহার বেশী প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেকদিন জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া যাহাদের পেটজোড়া পিলে হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই প্রকৃত ম্যালেরিয়া নয়, কালাজ্বর। কালাজ্বরের সৃষ্টি এদেশে নূতন হয় নাই, পূর্ব্বে ডাক্তারেরা কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়া ভাবিতেন এবং ইহার নিদান ও চিকিৎসা তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এখনও যে কত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যেও এখন কালাজ্বর হইতেছে।

কালাজ্বর কথার অর্থ এই যে—যে জ্বরে রং কাল হইয়া যায়। যাহাদের রং কাল কালাজ্বরে তাহাদের ললাট, গণ্ডদেশ ও শরীরের স্থানে স্থানে কাল হয় বটে, কিন্তু যাহারা ফর্সা তাহাদের রং আরও ফ্যাকাসে হইয়া যায় এবং স্থান বিশেষে সামান্য কাল দাগ পড়ে মাত্র। কেহ কেহ কালাজ্বর কথাটীর অর্থ অন্যরূপ করিয়া থাকেন, যথা—কালস্বরূপ জ্বর অর্থাৎ যে জ্বরে মৃত্যু অনিবার্য্য। কবিরাজেরা কালাজ্বরকে বিষমজ্বর কহেন। কালাজ্বরের নাম—দমদমার জ্বর, কালাজ্বর ও ইংরাজীতে Black fever। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম লিশম্যান একটি মৃত সৈনিকের প্লীহা হইতে কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ঐ সৈনিকটীর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদম্ নামক স্থানে জ্বরের সূত্রপাত হয় এবং ঐ জ্বরেই তাহার পরিশেষে প্রাণবিয়োগ হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডনোভন্ সাহেবও কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই কারণে কালাজ্বরের জীবাণুকে "লিশম্যান ডনোভন জীবাণু" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আসামে Black water fever নামক এক প্রকার জ্বর হয়। উহা কালাজ্বর নহে। উহাতে গাঢ় লালবর্ণ রক্তপ্রস্রাব হয়।

যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে গারো পর্ব্বতে কালাজ্বরের প্রথম সৃষ্টি হয়। তথা হইতে উহা আসাম ও আসাম হইতে বাঙ্গালা দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই কালাজ্বর হইতেছে। সিংহলে, আফ্রিকার অন্তর্গত সুদানে, আরব এবং চীনদেশেও কালাজ্বর আছে।

কালাজ্বরের জীবাণু আক্রান্ত ব্যক্তির যকৃৎ, প্লীহা ও অস্থির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। উহাদের মধ্য হইতে রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জীবাণু পাওয়া যাইবে। জীবাণুগুলি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র কড়ির মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত উহাদিগকে দেখা যায় না। খরগোসের রক্ত লইয়া তাহাতে উহাদিগকে জমাইলে উহারা ক্ষুদ্র পিষ্টকের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং উহাদের একটী করিয়া শুঁয়া

* "সাহিত্য" হইতে গৃহীত।

বাহির হয়, যাহা দ্বারা উহারা চলা ফেরা করিয়া বেড়াইতে পারে।

কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীর ধমনী হইতে অথবা আঙ্গুল ফুটাইয়া রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রক্তের জমাট বাঁধিবার শক্তি খুবই কম এবং এই জন্যই কালাজ্বরের অনেক স্থলে নাক অথবা দাঁত হইতে রক্ত পড়ে। যদি কোন রোগী কিছুদিন ধরিয়া যকৃৎ ও প্লীহা-ঘটিত জ্বরে ভুগিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে নাক অথবা দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়িতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রোগীর খুব সম্ভবতঃ কালাজ্বর হইয়াছে।,

কালাজ্বরে রক্তের আর একটী প্রধান পরিবর্ত্তন হয়। রক্তের শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা উভয়েরই সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু শ্বেত কণিকা,—যাহারা আমাদের দেহ—দুর্গ রক্ষার জন্য যোদ্ধার ন্যায় কার্য্য করে, তাহারা অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। সুস্থকায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রক্তে শ্বেত কণিকাগুলির সংখ্যা ৮০০০ হইতে ১০০০০। কালাজ্বরে উহাদের সংখ্যা ৫০০০ হইতে ৫০০, এমন কি ১০০ পর্য্যন্তও হইতে পারে। দেহ এইরূপে যোদ্ধাবিহীন হওয়ায় যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, রক্তামাশয়, গণ্ডের দুষ্ট ক্ষত ইত্যাদি ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রতি ৫০০ হইতে ৬০০ লোহিত কণিকায় একটী করিয়া শ্বেত কণিকা আছে। কালাজ্বরে শ্বেত কণিকাগুলি এত কমিয়া যায় যে, প্রতি ১১০০ অথবা এতদপেক্ষা অধিক লোহিত কণিকার মধ্যে কেবল একটী করিয়া শ্বেত কণিকা পাওয়া যায়।

কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের নেপিয়ার সাহেব কালাজ্বর নিবারণ করিবার জন্য রক্তের একটী সহজ নূতন পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। ধমনী হইতে রক্ত লইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দেওয়া হয়। রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় এবং পরে তাহা হইতে অল্প হলদে রংএর তরল পদার্থ (Serum) নিঃসৃত হয়। ঐ তরল পদার্থে একফোঁটা ফরম্যালিন মিশাইলে উহা জমিয়া গিয়া সিদ্ধ ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় আকার ধারণ করে। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও একটী সহজ পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। অঙ্গুলি হইতে একবিন্দু রক্ত লইয়া পরিশ্রুত জলে মিশাইলে জল ঘোলাটে হইয়া যায়, এবং তলায় পলি পড়ে।

কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীর রক্ত যদি খরগোসের রক্তে জমান যায় তাহা হইলে শুঁয়াওয়ালা জীবাণুগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ রোগীর রক্ত অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জীবাণু অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কালাজ্বরের বীজ কি প্রকারে অন্য দেহে চালিত হয়। এটী একটী প্রধান বিষয়। কারণ এইটী ঠিক হইলেই রোগের বিস্তার বন্ধ করা যাইতে পারে। ইহার এখনও ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ছারপোকা দ্বারা রোগ চালিত হয়। কেহ বলেন দূষিত পানীয় দ্বারা হয়। যাহাই হউক না কেন—মানুষের সংস্পর্শেই কালাজ্বর চালিত হয়। দেখা গিয়াছে এক বাড়ীতে ৩।৪ জনের হইয়াছে। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী গিয়াছে।

সুতরাং কালাজ্বর হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে পানীয় ও ছারপোকা সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। এবং রোগীর সংস্পর্শ না হওয়াই বিধেয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে— কালাজ্বর খুব সংক্রামক নহে।

কালাজ্বরগ্রস্থ রোগীর বিষ্ঠা কিনাইল দিয়া শোধন করা বা পুড়াইয়া ফেলাই ভাল।

পাবনার কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, কালাজ্বর কুইনাইন খাইয়া হয়। কুইনাইন দ্বারা নবজ্বর বিষমজ্বরে পরিণত হয়। তাঁহার বক্তব্য এই যে,—অনেক সময় কালাজ্বর টাইফয়েড্ জ্বরের ন্যায় অকস্মাৎ দেহকে আক্রমণ করে এবং কুইনাইন না খাইলেও তাহা কালাজ্বরে পরিণত হয়।

কালাজ্বরের সূত্রপাত চারি প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টাইফয়েডের ন্যায় জ্বর হইয়া কালাজ্বর আরম্ভ হয়। রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্লীহা ও যকৃৎ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। রোগী টাইফয়েডে ভুগিতেছে কি কালাজ্বরে ভুগিতেছে তাহা এক এক সময়ে ঠিক করা খুবই শক্ত হইয়া পড়ে। রোগীর একটী লক্ষণ দেখিয়া কালাজ্বর হইতে টাইফয়েডের তফাৎ করা যাইতে পারে। টাইফয়েডে রোগী নির্জীবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু কালাজ্বরে ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী জ্বরসত্বেও রোগী কথাবার্ত্তা কহে এবং উঠাবসা প্রভৃতি করিতে পারে। অধিকন্তু টাইফয়েডে নাড়ীর গতি জ্বরের অনুপাতে হয় না, কালাজ্বরে যেমন জ্বর বাড়ে; নাড়ীর গতিও তেমনি বেশী হয়। অনেক সময় জিহ্বার অবস্থা দেখিয়াও টাইফয়েড ধরা যায়।

টাইফয়েড সারিয়া যাইবার পর রোগী কিছুদিন ভালই থাকে, তৎপরে পুনরায় অল্প অল্প করিয়া জ্বর হইতে থাকে এবং যকৃৎ প্লীহা আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত কালাজ্বরে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ কালাজ্বরে কখন কখন পেটের অসুখ বা রক্তামাশয় হইয়া সূত্রপাত হয়। রক্তামাশয়ে উদরস্থ খাদ্যনালীতে ঘা হয় এবং মলের সঙ্গে শত শত জীবাণু বাহির হয়।

তৃতীয়তঃ রোগী কিছুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে থাকে, জ্বর শীত করিয়া আসে, ছাড়িয়া যায়, কুইনাইনে বন্ধ হয়, কিন্তু প্লীহা একেবারে কমে না। তৎপরে হয়ত একদিন টাইফয়েডের ন্যায় জ্বর হইয়া কালাজ্বরে পরিণত হয়। অথবা শেষে এরূপ অবস্থা হয় যে কুইনাইনে আর কিছুমাত্র উপকার হয় না। এখানে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, এক দেহে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া দুই থাকিতে পারে। পল্লীগ্রামস্থ অধিকাংশ ডাক্তার কালাজ্বর বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকায় কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়া ভাবিয়া রোগীকে কুইনাইনের উপর কুইনাইন খাওয়াইয়া শেষে যখন কোনও উপকার বুঝিতে পারেন না, তখন কলিকাতা বা অপর কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া দেন।

চতুর্থতঃ কালাজ্বর ধীরে ধীরে আসিয়াও দেখা দেয়। রোগীর ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হইতে থাকে, শীতও করে না, কোন সময়ে ছাড়ে, কোন সময় ছাড়ে না-- যকৃত ও প্লীহা বাড়িয়া উঠে।

রজার্স সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, কালাজ্বরে অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার জ্বরের বৃদ্ধি হয়। দুইবার জ্বরের বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ ও প্লীহা বৰ্দ্ধিত থাকিলে—কালাজ্বর বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়া অপেক্ষা কালাজ্বরে যকৃত বহুগুণ পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয় এবং ইহা দ্বারা অনেক সময় ম্যালেরিয়া হইতে কালাজ্বরের পার্থক্য বুঝিতে যায়।

যাহার শরীরে কালাজ্বর ভালরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার শরীরের অস্থিচর্ম্ম সার হয়; পেটটী খুব বড় হয়, পেটে জলও জমে, পা'দুটী একটু একটু ফুলে; গাল দু'টী বসা, নাকটী সুস্পষ্ট, কপালে অথবা গালে কাল কাল দাগ থাকিতে পারে। মাথার চুল পাতলা, গা খস্‌খসে এবং সময়ে সময়ে স্যাবাও হয়। ক্ষুধা

বেশী, জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। অতিরিক্ত ক্ষুধা কালাজ্বরের একটি প্রধান লক্ষণ। মেডিকেল কলেজে কালাজ্বর ওয়ার্ডে দ্বিগুণ পরিমাণ পথ্য দিতে হইত। অধিকন্তু কোন কোন রোগী অপরের খাদ্য চুরি করিয়া খাইত।

সম্প্রতি ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী দেখাইয়াছেন যে কালাজ্বরের জীবাণুতে সর্ব্বাঙ্গে উপদংশের ন্যায় স্ফোটক বাহির হয় এবং ঐ স্ফোটকগুলিতে অসংখ্য জীবাণু থাকে। রোগীর রক্তে জীবাণু থাকে, যকৃৎ প্লীহাও বড় থাকে না এবং তাহাতে জীবাণুও থাকে না।

কালাজ্বরের জীবাণু কর্ত্তৃক শরীরের স্থানে স্থানে একরূপ ঘা হয় ইহাকে ইংরাজীতে Oriensal sore অথবা Delhi boil কহে।

চিকিৎসা :—সর্ব্বসাধারণকে আমি এই বলিয়া আশা দিতে যে, কালাজ্বরের সুচিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রধান প্রতিষেধক অন্টিমনি নামক ধাতু—এই ধাতুটী ষোড়শ শতাব্দীতে বেসিল ভ্যালেণ্টাইন নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঘটনা ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা কতকগুলি সন্ন্যাসীর (morks) মৃত্যু ঘটে এবং সেই জন্যই ইহার নাম Antimony অর্থাৎ against the monk হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাসপার ভায়না নামক ডাক্তার কালাজ্বরে ধমনীতে এন্টিমনি পরিচালনের প্রথম সূত্রপাত করেন।

কালাজ্বরের সূত্রপাত চারিপ্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টাইফয়েডের ন্যায় জ্বর হইয়া কালাজ্বরে আরম্ভ হয়। রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে তখন সোডিয়াম অথবা পটাসিয়াম অ্যান্টিমান ট্রাষ্টের শতকরা দুইভাগ অনুপাতে জলে গুলিয়া ধমনীতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়।

এই চিকিৎসাতে শত শত লোক আরোগ্য লাভ হইয়াছে। কেহ কেহ ভাল হইবার কিছুদিন পরে পুনরাক্রান্ত হয় বটে, তথাপি যেখানেই অ্যান্টিমোনি দ্বারা কালাজ্বরের চিকিৎসা হইতেছে সেইখানে কালাজ্বরের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে।

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ। *

[কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত, এচ্, এম্, বি]

:o:

বিষমজ্বরে—

(১) কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, বাসকছাল, চিরতা, আমলকী ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথ সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা সর্ব্বসমষ্টি ২ তোলা।

(২) কৃষ্ণজীরা অল্প ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে বিষমজ্বর ভাল হয়।

(৩) প্রত্যহ প্রাতে রসুন পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন এই যোগ সেবনে বাতরোগও নষ্ট হয়।

(৪) মনসাপাতা অগ্নিতে ঝল্‌সাইয়া তাহার রস অর্দ্ধছটাক পরিমিত ৩।৪ রতি পিপুল চূর্ণ ও কিঞ্চিত মধু সহ পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ আমরা ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহার করিয়া বেশ উপকার পাইয়াছি।

(৫) শিউলিপাতা, বেলপাতা, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাঁপড়া ইহাদের স্বরস এক ছটাক পরিমিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব সহ পান করিলে বিষমজ্বর উপশম হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা বহু পরীক্ষিত।

* আমার পিতামহ ইটালির স্বনামধন্য কবিরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র সেনগুপ্ত শিরোমণির পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জীর্ণখাতা হইতে সংগৃহীত। —লেখক।

আমাশয়ে—

(৫) আমরুলপাতার রস দুই তোলা ও থুলকুড়িপাতার রস দুই তোলা একত্র মধুসহ প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে ৬।৭ দিনের ভিতর প্রবল আমাশয়ের বিশেষ উপকার হয়।

(৭) বেলশুঁঠ ঘসা দুই আনা পরিমাণ। জীরাভাজা চুর্ণ ৪।৫ রতি, ডালিমের কচিপাতা ৩।৪ রতি কিঞ্চিৎ মধু সহ প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করিয়া ৩।৪ দিন সেবন করিলে রক্তামাশয় বিনষ্ট হয়।

(৮) মুথার রস একছটাক পরিমাণ প্রত্যহ দুইবার করিয়া ৩।৪ দিন সেবনে আমাশয় ভাল হয়। শিশুর আমাশয়ে অর্দ্ধছটাক প্রয়োগ করিতে হইবে।

মুর্চ্ছায়—

(৯) শতমূলীর রস ২ তোলা, পিঁপুলচুর্ণ ।৴০ আনা কিঞ্চিৎ মধু সহ মুর্চ্ছারোগীকে কিছু দিন সেবন করাইলে মূর্চ্ছার উপকার হয়।

(১০) ঝাল লঙ্কা জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে মুর্চ্ছা রোগীর চৈতন্ত হয়।

দাহ রোগে—

(১১) বেণার মূল ও রক্তচন্দন কাঁজির সহিত পেষণ পুর্ব্বক বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা ভাল হয়।

উন্মাদ রোগে—

(১২) ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা কুড়চুর্ণ ।৴০ আনা কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবন করিলে, উন্মাদ রোগ ভাল হয়। ইহা স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত করিতে মহৌষধ। এই ঔষধ আমাদের [illegible] স্থলে পরীক্ষিত।

(১৩) শতমূলীর রস ২ আনা, মিশ্রি ।৵০ আনা একত্রে প্রত্যত তিনবার সেবনে উন্মাদ রোগ ভাল হয়। এই ঔষধ দীর্ঘ দিন সেবন করিতে হয়।

গৃধ্রসী রোগে—

(১৪) নিসিন্দা পাতার রস বা কাথ দীর্ঘ কাল সেবনে গৃধ্রসী রোগ প্রশমিত হয়।

(১৫) বিল্বমূল, ভেরেণ্ডমূল, কণ্টকারী ও বৃহতী ইহাদের কাথ পান করিলে গৃধ্রসী রোগ ভাল হয়।

জ্বরাতিসারে—

(১৬) শুঁঠ, মুথা ও ইন্দ্রযব—ইহাদের কাথ প্রত্যহ প্রাতে দুইবার দুইঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে জ্বরাতিসার ভাল হয়।

ক্রিমি রোগে—

(১৭) বিড়ঙ্গচুর্ণ ২।৩ রতি পরিমাণ মধু সহ সেবনে শিশুর ক্রিমি নষ্ট হয়।

(১৮) পলাশ বীজ দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু সহ লেহন করিলে ৭।৮ দিনের মধ্যে ক্রিমি বহির্গত হয়। (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বোলপুরে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বোলপুর শান্তি নিকেতনে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্ত আয়ুর্ব্বেদ বিত্তালয় খোলা হইবে।

ডাক্তারের আয়ুর্ব্বেদানুরাগ। এখনকার দিনের অনেক ডাক্তারই সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুরক্ত। আয়ুর্ব্বেদের [illegible]রত্ন মকরধ্বজের ব্যবহার তো এখন অনেকে করিতেছেনই, তদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় অন্যান্য ভেষজও এখন ডাক্তারেরা সাদরে ব্যবহার করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় বাসক, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, নিম, নিসিন্দা, পুনর্নবা, অশোক, কুড়চি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বনৌষধি গুলির এখন তরলসার আকারে ডাক্তারি চিকিৎসায় স্থান পাইয়াছে। লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে ইহা যে আশার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদের আরও আশা। অনেকে মেডিকেল কলেজের শিক্ষা সমাপ্তি পুর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্ত মনোযোগী। আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে ইহাও বিশেষ আশার কথা বলিতে হইবে। যাহা সত্য তাহা প্রকাশের জন্ত আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না। ফলে আমাদের দেশের লোকের ধাতু প্রকৃতি অনুসারে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই যে বিশেষ উপযোগী তাহা এখন অনেকেই স্বীকার করিতে হইতেছে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯ নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৬ষ্ঠ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৯—ভাদ্র | ১২শ সংখ্যা।

অঙ্গহীন শিক্ষা।

(শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ)

আজকাল চারিদিকে শিক্ষাবিস্তার, সাহিত্যোৎকর্ষ, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। দেশে শিক্ষা-বিস্তার হইলেই—দেশের লোকে সুশিক্ষিত হইলেই দুঃখ দারিদ্র্য মোচন হইবে। স্বীকার করি, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুশিক্ষিত জাতি উন্নতিলাভ করিয়াছে; অসভ্য বর্ব্বরগণ শুধু পাশববলে বিজ্ঞানের কাছে তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা আমরা সকলেই ভুলিয়া যাই—দেহ বা জীবন অগ্রে? না শিক্ষা অগ্রে? জীবন থাকিলে ত সুশিক্ষার ফলোদয় হইবে। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি অকালে মরিয়া যাইলে আর সে শিক্ষার ফল কি? ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের লোকে শিক্ষা লাভ করিয়া, দীর্ঘজীবী হইয়া সেই কষ্টার্জ্জিত শিক্ষার ফলভোগ করিতেছে। আর আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে আজ যে এত অকালমৃত্যু ইহার কারণ কি?

কারণ বহু হইলেও তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণটী যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অসম্পূর্ণ শিক্ষা—অঙ্গহীন উৎকর্ষই আমাদের অবনতির মূল। বিষয়টী ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

সকল দেশে ছাত্রগণই সমাজের মেরুদণ্ড। বালকই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মানুষ হয়। সুতরাং এই বালকগণের অধুনা যেরূপ শিক্ষা হইতেছে তাহার আলোচনা করা যাউক। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল মাতাপিতা জাত শিশুর 'হাতে খড়ি' হইয়া গেল। সে প্রতিদিন কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া ছোট একটী

মূরে লিখিতে ও পড়িতে লাগিল। এইরূপে তাহার মানসিক ব্যায়াম আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তাহার শরীরের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখা হইল না। সে কতক্ষণ ও কতটা পড়ে—অন্ততঃ সঙ্গতিপন্ন অভিভাবক বেশ খবর রাখেন। কিন্তু সে কতকক্ষণ খোলাবাতাসে ও কিরূপ খেলা করে, কিপ্রকার খাদ্য খায়, কয়দিন অন্তর স্নান করে, তাহার শরীর দিন দিন সবল না কৃশ হইতেছে এ সকল তত্ত্বের কোন সন্ধান লওয়া হয় না। ফলে বালকটীর প্রত্যহ মানসিক ব্যায়াম জনিত যে ক্ষয় হইতেছে, পুষ্টিকর খাদ্য ও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাহার পূরণ হইতেছে না। প্রত্যহ অলক্ষিত ভাবে যে বালকটীর একটু একটু ক্ষয় হইতেছে—তাহা কে লক্ষ্য করে? এই ক্ষয় পূরণ করিতে পারে—এক মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম আর এক পুষ্টিকর ও আয়ুবর্দ্ধক আহার্য্য। আমাদের দেশে এই দুইটী বিষয়েই সকলের সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। আমরা ছেলেকে কেবলই পাড়তে বলি। কিন্তু কোন্ ছেলেটীর কতক্ষণ পড়াউচত—তাহারখোঁজ রাখি কি? পড়িতেই হইবে—তুমি সবলই হও আর দুর্ব্বলই হও। জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ যেমন, সেইরূপ আজ আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে জাতস্য হি ধ্রুবঃ পাঠো জাতস্য হি ধ্রুবা শিক্ষা পিতৃপিতামহানুগা। হাতে খড়ি দিয়াই ছেলেকে ক, খ, A. B. C. D. হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, শকুন্তলা, Shakespeare-milton প্রভৃতি পড়িতেই হইবে। (সুখের বিষয়, শিল্প বাণিজ্যের প্রতি একটু দৃষ্টি পড়ায় পূর্ব্বের সেই পুঁথিগত বিদ্যানুরাগ অনেক পরিমাণে কমিয়াছে) সে তখন হই আধ শোওয়া, আধ বসা ভাবে প্রতিদিন সম্যক্ আলোক ও বায়ু সঞ্চালন বিরহিত ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে পড়িতে লাগিল। মফঃস্বলের ছাত্রগণের অপেক্ষা এ বিষয়ে সহরের ছাত্রদিগের অবস্থা আরো শোচনীয়।

মনে করুন অমুক কেরাণী বাবুর চারিটি পুত্র আছে। তাঁহার মাসিক বেতন ৪০৲ চল্লিশ টাকা। এত অল্প আয়ে তাঁহার পক্ষে ভাল 'বাসা-বাড়ী' পাওয়া একরূপ অসম্ভব। কাজেই খোলার ঘরে বা ২।৫ জন মিলিয়া একটী মাঝারি বাড়ী ভাড়া করিয়া উহার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিতে হয়। সে বাসার কামিনীগণ এই অনন্ত আকাশের মাত্র এক টুকরা দেখিতে পান, আর এই সুবিশাল ভূপৃষ্ঠের ৪।৫ হাত পরিমিত ভূমিও একত্র দেখিতে পান না। বড় বড় অট্টালিকায় ধাক্কা খাইয়া যে বাতাসটুকু তাঁহাদের বাসার মধ্যে কোনগতিকে প্রবেশ করে, তাহার অতি সামান্য অংশই এক এক জন ২।১টী ছোট জানালা ও দুয়ারের কৃপায় ভোগ করিতে পান। এইরূপ সম্যক আলোক ও বায়ু বিহীন blackhole বড় সহরে অনেক আছে। নাদাচাপা ঘাস যেমন সাদাটে ও ফ্যাস্‌কা হয়, সহরের এইরূপ ক্ষুদ্র cell নিবাসী বাবুদেরও চেহারা তদ্রূপ। গায়ের রং প্রায় সকলেরই সাদা ও নিষ্প্রভ। দেখিতে বেশ গোল গোল, কিন্তু heartএ বল নাই—মজ্জার জোর নাই। যেন কৃত্রিম কলের মানুষ। এত ঠুনকো যে, একটু আঘাতেই চুরমার হইয়া যায়। বড় বড় জ্বরের সহিত লড়াই করা একটু শক্তি সাপেক্ষ। সে শক্তি নাই বলিয়া জ জ্বর হইতে না হইতেই injection

চাই। পীত ঔষধ পাকস্থলীতে গিয়া রক্তের সহিত মিশিতে একটু সময় লয়। কিন্তু সে সময়ের অপেক্ষা করে কে? রোগী যে তাহার পূর্ব্বেই আনাড়ী হইয়া পড়ে। কাজেই বাজারে আজকাল এত injection এর প্রাবল্য।

"ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যে কয়টী 'jection' ওয়ালা শব্দ প্রযুক্ত হইত, তন্মধ্যে অভিধানে থাকিলেও injection কথাটীর বড়একটা প্রচলন ছিলনা। Projeotion, rejcction, snbjection, dejection, interjection, objection প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রয়োগ থাকিলেও একমাত্র নেশাখোর ও ডাক্তার ব্যতীত অপর কেহ injection শব্দের বড় বেশী খবর রাখিতেন না। ক্রমশঃ বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত মাদক দ্রব্য সেবী যখন দেহে morphia injection করিতে লাগিলেন, তখন হইতে সাধারণ্যে এই injection কথাটির প্রচার হইল। অমুক ভয়ানক নেশাখোর—আফিং প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিলে আর তেমন নেশা হয় না বলিয়া তিনি উরুতে morphia injection করেন। এই স্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ সংবরণ করিতে পারিতেছিনা। বাল্যকালে শুনিতাম—অমুক morphia-injection করে। কিন্তু শরীরের কোন্ স্থানে ও কি-প্রকারে এই বিষ অন্তর্নিক্ষিপ্ত হয়—তাহা কিছুই জানিতাম না। কথাপ্রসঙ্গে এই বিষয় উত্থাপিত হইলে উহা জানিতে সাতিশয় কৌতুহল হইত। যাহা হউক একদিন এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া খাইতে বসিয়াছি। এক দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ বলবান্ ব্রাহ্মণ আমাদের দিকে পরিবেশন করিতেছেন। লোকটি বেশ চতুর ও সতর্ক। খুব সাবধানে ও ধীরে ধীরে ভোজ্যবস্তু দিতে-ছেন। কিন্তু আমাদের দেশে ভোজকন্দারের আসরে প্রথমে একটু শৃঙ্খলা ও নিস্তব্ধতা থাকিলেও, শেষে যখন দধি সন্দেশ সবেগে ভাণ্ডার হইতে আসরে অবতীর্ণ হয়, তখন একটু গোলমাল হয়ই। এ বলে সন্দেশ দাও ও বলে 'দধি দাও'—এ পাতে লুচি চাই, ও পাতের সম্মুখে একজন সন্দেশের হাঁড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন (কারণ তিনি একটী কলির বৃকোদর)—এইভাবে চারিদিকে যখন কলরব হইতেছে, তখন আমাদের সাত্ত্বের পরিবেশন কারী ঠাকুরটী আর তাল সামলাইতে না পারিয়া একবারে সহসা উরুদেশের কাপড় গুটাইয়া খুব ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার সহিত পাতে পাতে সন্দেশ ঢালিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার জঙ্ঘার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, অসংখ্য কাল কাল দাগ রহি-রাছে। পার্শ্বস্থিত দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, লোকটী পাকা নেশা—খোর—উরুদেশে morphia injection করে। তখন বুঝিলাম injection কি। সে আজ প্রায় ২০ বিশ বৎসরের কথা। কিন্তু এইঅল্প-কালের মধ্যেই injection এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে,পাঁচ সাত বৎসরের শিশুটীও না বুঝিলেও খাঁ করিয়া বলিয়া ফেলে—"দিদির ভারি রক্তামাশয় হইয়াছে; বাবা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন, ডাক্তার বাবু আসিয়াই একটা injection দিবেন।" আর কিছুদিন পরে হয়ত আধকপালে, মাথাধরা হইলেও injection করিতে হইবে। nature

হইতে artএ আসিয়া মানুষ কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।।

এখন injection ছাড়িয়া আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আ। যাউক। সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠবাসী কেরাণীবাবু প্রাতঃ ৭।৮টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অফিসে কার্য্য করিয়া নিস্পেষিত ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় নীরস হইয়া বাড়ী আসেন। আসিয়া দেখেন—ছেলেগুলি ঘুমাইতেছে। আর জাগিয়া থাকিলেও, এসময়ে কি আর ছেলে পড়ান ভাল লাগে? এখন চা ও তামাক তৃষ্ণা এত বলবতী যে, মনে অন্য কোন চিন্তাই স্থান পায়না। এইভাবে তাঁহার জীবন কাটিতেছে—আর তাঁহার পুত্র কন্যা গুলিও এইরূপ অবহেলা ও অযত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার দেখিবার সময় কই? যাঁহার সময় নাই, অথচ সামর্থ্য আছে, তিনি না হয় বড়জোর একটা মাষ্টার রাখিয়া দিলেন। শ্যামাপূজার রাত্রিতে অনেক পুরোহিত যেমন ২।৪টা মন্ত্রমাত্রই এক একখানি প্রতিমাপূজা শেষ করেন, সেইরূপ যাঁহাকে বাড়ী ২ ঘুরিতে হয়—এমন মাষ্টার মহাশয় এই কেরাণীবাবুর পুত্রটিকে কতক্ষণ ও কিরূপ যত্ন সহকারে পড়ান—তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই কেরাণীবাবুর আর গত্যন্তর নাই। তিনি ভাগ্যস্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন, আর তাঁহার illfed এবং illcladপুত্রগুলিও কোনরকমে বাঁচিয়া আছে মাত্র। তাহাদের না হইতেছে দৈহিক উৎকর্ষ—না হইতেছে মানসিক উন্নতি। তাহাদের জীবনের গোড়া হইতেই life নাই—ইউরোপ-আমেরিকায় যাহাকে প্রকৃত জীবন বলে সে life সেactivity নাই। আছে কেবল existence—অস্তিত্ব—প্রাণবায়ু ধুক ধুক করিতেছে মাত্র।

এই ত গেল সাধারণ গরীব লোকের ছেলের অবস্থা। পিতা বুঝিলেও তাঁহার বিবেক অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। কারণ যেরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহা হইতে উজান বহিয়া যাওয়া বড়ই সুকঠিন। পুত্রটী পেট ভরিয়া আহার্য্য পাইতেছেনা, এবং তাহার শিক্ষাও যথারীতি হইতেছেনা। ইহা বুঝিলেও অনেক পিতাকে বাধ্য হইয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতে হয়। যেহেতু অনেক সময়ে মানুষ অবস্থার দাস। ইচ্ছা করিলেই রোগ সারান যায় না। কিন্তু যাঁহাদের অবস্থা তেমন মলিন নয়—অনায়াসে যাঁহারা সন্তানদিগকে প্রকৃত মানুষ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই বা এ বিষয়ে লক্ষ্য কই? তাঁহারা পুত্রের লেখাপড়ার জন্য মাসিক বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু এত শিক্ষালাভ করিয়াও আজ শিক্ষিত সম্প্রদায় এত ভগ্ন স্বাস্থ্য ও জীবন্মৃত কেন? ইহার একমাত্র কারণ মনে হয়—দৈহিক শিক্ষা ও নৈতিক উৎকর্ষের অভাব। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ঠিক মানুষ হইতে চাহে, সেই দেশের লোকেরা উৎকর্ষের যথাবিহিত ক্রম জানে। তাঁহারা এইভাবে ক্রমোন্নতি লাভ করে :—

Physical culture— দৈহিক উৎকর্ষ
Intellectual ,, — মানসিক ,,
Moral ,, — নৈতিক ,,
Spiritual ,, — আধ্যাত্মিক

প্রথমে দেহ, তারপর মন, তদনন্তর চরিত্র, শেষে ধর্ম্ম—এইভাবে উৎকর্ষ সাধন করিলে

মানব একটা সুস্থ, সবল, সুশিক্ষিত ও পবিত্র জাতি হইতে পারে। আমাদের দেশে যে শিক্ষা তাহা অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন। আমরা দেহটাকে বাদ দিয়া মন লইয়া সাতিশয় ব্যস্ত। বাল্যকাল হইতে ছেলেরা, অন্ততঃ যাহারা ভাল ছেলে তাহারা সর্ব্বদাই বহি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সংসারের কোনও কাজে লাগেনা। কেমন করিয়া হাট বাজার করিতে হয়—তাহা কিছুই শিখেনা। তাহাদের কাজ কেবল—তোতাপাখীর ন্যায় পড়া আর পড়া—কতকগুলি পুঁথি মুখস্থ করিয়া মাথাটাকে tonheavy করা। এইরূপ অতিরিক্ত বোঝা চাপানই, আমার মনে হয়, apoplexyর প্রধান কারণ। আজ এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে এত educated invalids অর্থাৎ শিক্ষিত রোগীর আধিক্য। বেশ ফিটফাট বাবুটী—ফড়্ ফড়্ করিয়া ইংরাজী বলিতে পারেন। ভাল ভাল কবিতা লেখার জন্য সুধী সমাজে তাঁহার বিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তি আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তিনি আধপোয়া পুষ্টিকর খাদ্যও হজম করিতে পারেন না। পাঁচ মাইল পথ চলিতে হইলে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাজার হইতে দুই সের জিনিস আনিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয়। হায়, কালক্রমে কি পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে !! দেহের প্রতি এত অবহেলা—এরূপ শক্তিহীনতা—এমন যৌবনে বার্দ্ধক্য পূর্ব্বে ছিল না। গায়ের জোর ও সাহস একটা বড় আদরের জিনিস ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতেন—the glory of a young man is his strength. it is excellent to have agiants strength, Bnt it is tyrannous to use it like againt

পশ্চিমে এখনও অনেক বলবান্ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এখনও শিক্ষাযন্ত্রের পেষণে শরীরটা একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। তথাপি একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যাহারা দিবানিশি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া nate মুখস্থ করতঃ বি, এ, এম, এ পাশ করিয়াছে, তাহাদের শরীরে আর তেমন বল—সেরূপ লাবণ্য নাই। কেমন শুষ্ক ও ম্লান হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ—তাহারা প্রথমে 'পড়া পড়া' করিয়া দেহের প্রতি উপযুক্ত যত্ন করে নাই। কাজেই দেহটা যেন Stunted হইয়া গিয়াছে—তেমন মজবুদ হয় নাই। বর্ত্তমান ফ্যাসনে লেখাপড়া যিনিই করিয়াছেন, তাঁহারই শরীরের অল্প বিস্তর এই অবস্থা হইয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে ২।৫টী যে ব্যতিক্রম্ নাই একথা বলিতেছিনা। পরন্তু যাহারা স্বাস্থ্যের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়াছে, তাহাদের চেহারা দেখিলে নয়ন সত্যই সার্থক হয়। বড় বড় দুটো জলপূর্ণ টব রাস্তার ধারে জলের কল হইতে অবলীলাক্রমে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। মন্থর গতিতে যখন পথে চলিতে থাকে, তখন দেখিলেই মনে হয়, পালোয়ান এক অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। আমাদের মত উচ্চ লিখিত অজীর্ণ পীড়িত শৃগাল চতুর বাঙ্গালী বাবু সে স্ফূর্ত্তির আস্বাদ পায় না। দৈহিক উৎকর্ষের একটা আশ্চর্য্য ফল এই যে, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া চিত্ত সংযত ও স্থির হয়। শক্তিশালী যুবকের একটা বড় উচ্চাভিলাষ—কেমন করিয়া শরীরটাকে তৈয়ারী করিব। এই concentra-

tion জন্য তাহার মন কুপথে ধাবিত হয় না। মনকে সদা ব্যাপৃত রাখাই চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণের একমাত্র উপায়। An idle brain is the devil's-workshop কাজ না থাকিলে কুচিন্তা ও দুরভিসন্ধি আমাদের অজ্ঞাত সারে মনোমধ্যে প্রবেশ লাভ করে। সেই জন্যই বলিতেছি, দৈহিক উৎকর্ষও এক প্রকার যোগ বা সাধনা। পক্ষান্তরে শক্তিহীন ভগ্নস্বাস্থ্য শিক্ষিত যুবকের ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা অত্যন্ত অধিক। সে ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখলাভে এত ব্যাকুল যে, তাহার শিক্ষামার্জ্জিত হিতাহিত বুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়। পাঁচজন একত্র বসিয়া খোসগল্প ও বৃথা আমোদ প্রমোদে বহুমূল্য সময় নষ্ট করে। কারণ দেহে যাহাদের বল নাই, তাহারা ছুটাছুটি, লাফালাফি বা দৈহিক পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ কেমন করিয়া করিবে? সেজন্য গোয়ালার বাছুরের ন্যায় শুইয়া শুইয়া লেজ নাড়িতে ভালবাসে! গৃহস্থের হৃষ্টপুষ্ট বাছুরের ন্যায় দৌড়িতে তাহার ইচ্ছা হয় না। এই সব কারণে আমাদের দেশের ছাত্র সমাজে আজ এত অধিক দৈহিক দৌর্ব্বল্য—দৃষ্টিহীনতা অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ। শারীরিক ব্যায়াম ও নৈতিক উৎকর্ষের অভাবই এই যৌবনে বার্দ্ধক্যের একমাত্র কারণ। সাহিত্যপরিষৎ, পুরাণপরিষৎ, সাহিত্যসম্মিলনী, শিল্পপ্রদর্শনী, কাব্যনাটক, সভা, reading Room, library প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রাবল্যে স্বাস্থ্যসভা ও খাদ্যসভার প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিনা। সেজন্য আমরা ভূতলে কেবল স্মৃতিবীর কাব্যবীর ও বাক্যবীরই হইয়া রহিলাম। জগতে Dracti al hero হইয়া প্রকৃত বীরসমাজে স্থান পাইলাম কই? যতদিন আমাদের দেহের প্রতি—স্বাস্থ্যের প্রতি ও খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি না পড়িবে, ততদিন আমরা সোণার চসমাধারী ফিটফাট বাবুটী হইয়া চীনে মাটির ন্যায় ঠুন্‌কো হইয়াই থাকিব। বড় বড় ঝড়ের কথা দূরে থাকুক, একটু জোরে জ্বর আসিলেই heartfail হইয়া মরিয়া যাইব।

হিন্দু স্বাস্থ্যনীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:•০•:—

[শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

২৩। পরিপাক কার্য্য আরম্ভ না হইলে পথ চলা আর বেশী কথা বলা উচিত নহে। বাঙ্গালা য় একটী প্রবাদ আছে—"খেয়ে দেয়ে না জিরায়, তার পিছনে যম যায়"। এই প্রবাদটি একেবারে ভিত্তিহীন নহে। পূর্ণ উদরে শ্বাসের গতি প্রবল এবং দ্রুতগামী হয়

অবস্থায় গমন, তীব্র উচ্চহাস্য এবং সঙ্গীত করিলে শারীরিক বিঘ্ন অনিবার্য্য। কেননা নিশ্বাসই হইল জীব-জীবনের প্রধান লক্ষণ। উহার আধার স্থান ফুসফুস্ যন্ত্র এবং তদাশ্রিত যন্ত্র-গুলি। সুতরাং জীবন গতি প্রচলনের নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইবার সময় তাহাকে অন্যভাবে প্রবহমান করিলে শারীরিক বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী।

২৭। আহারান্তে বিশ্রাম না করিয়া মলত্যাগ করা অনিষ্টজনক, কিন্তু পিত্ত শূল এবং অম্লপিত্তের রোগী আহারের অব্যবহিত পরে মল ত্যাগ করিলে বিকৃত পিত্ত নিঃসৃত হওয়ার জন্য তাহাদের পীড়ার উপশম হয়; অপরের পক্ষে কিন্তু অনিষ্ট জনক।

২৮। আহারের পর অন্ততঃ ২০।২৫ মিনিট কাল ধীর স্থির ভাবে দুই পায়ের দুই পার্শ্বে চাপিয়া হাঁটু সংযোগ করতঃ মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিবে। ইহা অভ্যাসসিদ্ধ কার্য্য। এই সময় গুহ্যদ্বার শূন্য না থাকে— এরূপ ভাবে কোনরূপ মোলায়েম বস্ত্র উচ্চ ভাবে পাতিয়া বসিবে। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় চিরুণি দ্বারা চুলের গোড়া আঁচড়াইলে যথেষ্ট উপকার হয়। হিন্দু স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞগণ কহেন যে, এই ভাবে চুল আঁচড়াইলে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং অকালপক্কতা নিবারিত হয়। উহার ফলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বিনাশ, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা জিহ্বা সবল এবং কার্য্যক্ষম থাকে। বিশেষতঃ বহুভাষী ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়ম অতি প্রয়োজনীয়। এই নিয়মটি অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইহা এক প্রধান কার্য্য।

এই বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হয়। এই জন্য গুটি কয়েক উদাহরণ দ্বারা এই নিয়মের যুক্তি প্রদর্শিত হইল।

(ক) আমার পরিচিত একটী বড় ব্যবসায়ী ব্যক্তি অজীর্ণ পীড়ায় আর বায়ুবৃদ্ধিরোগে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। একদিন একটী নানক-পন্থী সাধু তাঁহাকে উপরোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেন। ব্যবসায়ীটি ডাক্তার কবিরাজের বহু ঔষধ ব্যাবহারে হতাশ হইয়া সাধুর উপদেশানুযায়ী এক বর্ষ পরে উত্তম রূপে আরোগ্য লাভ করেন। তিনি ৮০।৯০ বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ এবং সবলাবস্থায় থাকিয়া জীবিত ছিলেন। ধনী মহাশয় এই নিয়ম প্রতিপালন সময় বিন্দুমাত্র ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। আবার আমি নিজে আহারের পর চুল আঁচড়া-ইয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতে গিয়া, এই—"পঞ্চা-শোর্দ্ধবনং ব্রজেৎ—সময়েও যুবকের ন্যায় উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ বর্ণ কেশ রক্ষা করিয়াছি। স্নায়-বিক পীড়ায় কখনও পীড়িত হই নাই।

এই সমস্ত কারণে প্রবন্ধের সূত্রপাতেই বলি-য়াছি—যে,হিন্দুস্বাস্থ্য-নীতি প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই নিয়মটি আমি নিয়ম মত প্রতিপালন করিতে পারি-নাই। তথাপি যাহা করিয়া থাকি তদ্বারা আমার দীর্ঘ দিনের উৎকট অজীর্ণ কাশীধামে থাকিয়া পোনর আনা আরোগ্য হইয়াছে, কেশের এবং কান্তির গুণে আমার কনিষ্ঠগণকে আমা হইতে প্রাচীন দেখায়।

২৯। আহারের পর প্রস্রাব অন্তে যখন দ্বিতীয় বার প্রস্রাবের বেগ হইবে—তখনি নিদ্রা যাওয়া সঙ্গত। বস্তুতঃ আহার করিয়াই নিদ্রা

খাওয়া উচিত নহে; এই জন্ত হিন্দু-স্বাস্থ্য নীতির পূর্ণ পালক ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় পূর্ব্বাপর রাত্রি ৮|৯টায় আহার করিয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করার পর রাত্রি ১১টা ১১|টায়—নিদ্রা গিয়া থাকেন। আবার প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করেন।

৩০। পাক-করা দ্রব্য জবং উষ্ণ থাকিতে থাকিতে আহার করা উচিত। কেন না খাস্ত দ্রব্য—অধিক শীতল হইলে উহাতে চক্ষুর অদৃশ্য একরূপ কীট করে। এই কীট রাশি বহু পীড়ার মুখ্যকারণ। যাহারা "জারম থিয়রি" অর্থাৎ কীটাণুতত্ত্বের আলোকে মুহমান, তাঁহাদের নিকট এই সত্য পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বর্ত্তমানে ডাক্তারি চিকিৎসা অভিনব জারম-তত্ত্বের আলোচনায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই তত্ত্ব আলোচনা করিয়া "ইনজেক্ট" অর্থাৎ চর্ম্মের তলে পিচকিরী যোগে সেই সেই বহু ব্যাধির কীটাণু অংশ প্রবেশ করাইয়া বহু মারাত্মক ব্যাধির প্রশমন করিতেছেন।

এইস্থানে উক্ত তত্ত্ব আলোচনার আবশ্যক নাই। কেননা উক্ত থিয়রি সাধারণ লোকের বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় নহে। উহা প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।

৩১। মাটির পাত্রে আহার্য্য প্রস্তুতই সঙ্গত কার্য্য। কেননা এক একটি খাস্ত ঘৃত মসলা যোগে পাত্র বিশেষে রক্ষিত হইয়া বিষাক্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে। কেবল অগ্নি তাপ-জন্ত পিত্তল লৌহ প্রভৃতির কড়া-বগুনায় পাক করা খাস্ত তত বিষাক্ত হইতে পারেনা! কিন্তু স্থান বিশেষে সাধারণ ধাতুপাত্রে রক্ষিত খাস্ত যে গুণান্তর প্রাপ্ত হয়—ইহা পরীক্ষিত সত্য। স্মরণ হয় আজ ১০|১২ বর্ষ হইল কলিকাতার ভবানীপুরে কোন ধনীর গৃহে তামার ডেকচিতে রক্ষিত খাস্তে বিষাক্ত হইয়া একসঙ্গে ৬০|৭০ জন লোকের কলেরা পীড়া হইয়াছিল।

হিন্দু বিধবাগণ পিত্তলের বগুনায় রক্ষিত নিরামিষ খাস্ত আহার করিয়া থাকেন। তাহাদের শারীরিক জনন শক্তি এবং উশৃঙ্খল প্রবৃত্তি অতি সামান্ত। ব্রহ্মচর্য্য পালন উদ্দেশ্যে বিধবাগণ নিয়মিতভাবে জীবনের প্রধান ক্রিয়া আহার, বিহার, নিদ্রা, শয়ন এবং মনের পবিত্রতা রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা অধিকাংশই সুস্থা এবং কার্য্যক্ষমা। দেখিয়াছি যে কামিনী সধবা অবস্থায় রুগ্না এবং কার্য্যশক্তিতে পূর্ণ অক্ষমা তিনি বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন জন্ত হিন্দু স্বাস্থ্যতত্ত্বের বহু নিয়ম পালন করিয়া নীরোগী হইয়াছেন। বলা বাহুল্য রান্নার পাত্র সাধারণতঃ মাটির এবং পিতলের হওয়া উচিত। তামার পাত্র এবং সেই পাত্রে খাস্ত পাক করিলে দ্রব্যবিশেষ গুণান্তর প্রাপ্ত হয়। এই জন্ত ইউরোপীয়গণ রান্নার পাত্র গুলি কলাই করিয়া লইয়া থাকেন। কলাই করা দ্রব্য অধিকাংশই মৃত্তিকার রূপান্তর বস্তুতে নির্ম্মিত। এ কথা স্বীকার্য্য যে হিন্দু ব্যতীত অন্তান্ত জাতি কিছু রাজসিক গুণশালী। আধ্যাত্মিকতা হিন্দুর জাতিগত প্রথা।

৩২। শূন্ত উদরে কখনো কাঁচা ফল মূল আহার করা উচিত নহে। কেননা খালিপেটে অম্লরস অধিক পরিমাণে উদরে অবস্থিত থাকে। উহাতে অপক্ক ফল মূল পড়িলে আচারের স্তায় এক রূপ পিচ্ছিল আঠা তুল্য দ্রব্য হইয়া যায়। উহা সহজে পরিপাক হয় না।

৩৩। মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২ দিন উপবাস করা সঙ্গত। কিন্তু পিত্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের অর্থাৎ যাহার যকৃৎ দুষিত—তাহার পক্ষে এবং অতি সুস্থ দেহীর পক্ষে এ নিয়ম প্রযুজ্য নহে। এতদর্থে প্রতি একাদশীতে উপবাস করাই যুক্তি যুক্ত।

যাহারা একাদশী করিব বলিয়া ভাত পরিত্যাগ করিয়া উদর পুর্ণ করত রুটি আহার করেন তাহারা মনকে আর লোকদিগকে বুঝাইয়া থাকেন যে, আমি একাদশী করি—আমি অতি নিষ্ঠাবান। আবার এরূপ খাদ্য পরিবর্ত্তনে একেবারেই যে কোন উপায় নাই তাহা নহে। অন্নাহারী বাঙ্গালীর পক্ষে এ নিয়ম "নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল।' যাহারা ভাত না খাইয়া আটা-ময়দা-সুজি, দুগ্ধ ইত্যাদি খাইতে এরূপে অভ্যস্ত, তাহারা 'চতুর পেটুক"। একাদশীর অছিলায় সুখাদ্য আহার তাহাদের ইচ্ছা। বিধবাগণ অধিকাংশ স্থানে নিরম্বু উপবাস করে—একাদশীর ব্রতাচার ইহাদের পক্ষেই ধর্ম্ম হিসাবে আর শরীর রক্ষা হিসাবে উপকারী। এই উদ্দেশ্যে বালবিধবাগণকে পর্য্যন্ত নির্য্যাতীত হইতে হয়। আর্য্যঋষির ব্যবস্থিত নিয়ম এই যে "শরীর মাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং"। এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রাণ জাতি হিন্দুর ধর্ম্ম লক্ষ্য গ্রন্থ সকল লিখিত। হিন্দুর প্রত্যেক নিয়ম প্রতি ধর্ম্ম কাহিনী সমস্তই শরীর রক্ষা ব্যপদেশে অনুষ্ঠিত। রাত্রি প্রভাত হইতে পুনঃ নিদ্রা যাইবার সময় পর্য্যন্ত প্রতিকার্য্যে প্রত্যেক নিয়মে ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া শরীর রক্ষার উপায় নির্দ্ধারিত আছে।

এই উপবাস-নিয়ম প্রতি পালন জন্য শাস্ত্রে একাদশী-ব্রতের বহু গল্প উল্লিখিত আছে। মোটের উপর কথা এই যে তিথি-বিশেষে মনুষ্য শরীরে রস সঞ্চার হয় বলিয়া একাদশীর নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। শরীর রক্ষা করে অন্তত ১দিন উপবাস নিতান্ত উচিত।

৩৪। আচমনান্তে মুখের জল গামছা-তোয়ালে ইত্যাদিতে না মুছিয়া সিক্ত হস্তে কপাল হইতে কর্ণের পশ্চাৎ দিয়া গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত ২।৩ বার মুছিয়া তাহার পর কপাল এবং মুখ গামছা দ্বারা মুছিবে। এই নিয়ম অভ্যাস করিলে মুখে ব্রণ ইত্যাদি এবং মাথাধরা—মাথাঘোরা, এমন কি মাথা গরম হওয়া পর্য্যন্ত নিরাময় হইবে। দেখা গিয়াছে—কথা বলিবার সময় কোন কোন ব্যক্তির 'মুদ্রা দোষ" নামে মুখের একটা বিকৃতভঙ্গি হয় অথবা কথা বলিতে বলিতে একটা শব্দ বা বৃথা বাক্য উচ্চারণ করে। তাহারা এই প্রক্রিয়া দ্বারা অব্যাহতি পাইতে পারে।

আমারটি এক চট্টগ্রামী কম্পাউণ্ডার ছিল। সে ব্যক্তি প্রতি কথা বলিবার সময় মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করিত, আর—"বুললেন কিনা" কথাটা বহুবার বলিত। আমি ইহার এই ভাবে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। ভদ্র যুবক এক সময় নৈমিষারণ্যে গিয়াছিল। চারিমাস ঘুরিয়া আসিলে দেখিলাম তাহা কদভ্যাস চৌদ্দ আনা দুরীভূত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, চুণি লাল মহতা নামে একটী সীতাপুর নিবাসী বৈদ্য তাহার ভঙ্গী দেখিয়া—আমার পুর্ব্ব লিখিত প্রক্রিয়া তাহাকে অভ্যাস করাইয়াছে। কমপাউণ্ডারের অবস্থা জানিয়া আমি ভারতীয়

পূর্ব্বকালের স্বাস্থ্যনীতির আচরণকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রক্রিয়া অনেককে শিখাইয়াছি বিশেষতঃ কাশীর "বেদউদ্বোধিনী সমিতি"র আর "বিশুদ্ধানন্দ আশ্রমের" বালব্রহ্মচারীবৃন্দকে অভ্যাস করাইতেছি। বলা বাহুল্য যে, এই দুই আশ্রমের শিক্ষার্থীগণের স্বাস্থ্য-শিক্ষকতা আমার উপর নির্ভর।

৩৫। আহারের পর পান খাওয়া একটা রীতি। হিন্দু সমাজে "মুখশুদ্ধি" বলিয়া হরীতকী, আমলকী, সুপারী, পান প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানে পান খান খাওয়া বিলাসিতার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। মুখশুদ্ধি দ্বারা শরীরের উপকার আছে। কিন্তু বিলাসিতা ও অভ্যাস দোষে এই উপকার বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য নীতির বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে, হরীতকী আয়ু বর্দ্ধক দ্রব্য হইলেও ইহা স্তম্ভনগুণে গৃহীর পক্ষে ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পান—বায়ু নাশক, শ্লেষ্মা নাশক এবং পাচক বলিয়া মুখশুদ্ধি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত পান খাওয়ার জন্য সুপারি এবং চুণের অপব্যবহারে দন্ত পীড়া এবং অপাক ব্যাধি বাড়িয়া যায়। যাহারা অল্প মাত্রায় পান খাইয়া থাকেন, তাহারা মুখশুদ্ধির জন্য উহা ব্যবহারকরিতে পারেন। অত্যধিক পান খাওয়ায় বহু ব্যক্তি দাঁতের পীড়া ভোগ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকেন। পানের উপাদান চুণ, সুপারি এই উৎপাতের মূল। ইউরোপীয়গণ পান ব্যবহার করে না। তথাপি তাঁহাদের দন্ত পীড়া হয়, তাহার কারণ তাঁহারা বড় মাংসাশী, আবার প্রত্যহ অধিকাংশ ব্যক্তি দন্ত মার্জ্জনা করেনা ও করিলেও পশু লোম জাত ব্রাস ব্যবহারে দাঁতের পীড়া ভোগ করে। দেখিয়াছি বাঙ্গালী হইতে হিন্দুস্থানী সাধারণ লোকে পান অধিক ব্যবহার করে। তাই দাঁতের নানারূপ ব্যাধি হিন্দুস্থানীগণের এক চেটিয়া।

এই দেশে অদ্যাপি মুসলমানী সভ্যতা চৌদ্দ আনা প্রচলিত। এ কারণ বিলাস-ব্যসন স্থলে পান খাওয়া এই প্রদেশের আবাল বৃদ্ধ মহিলার মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রচলিত। এক কাশী নগরে একটা পানের খিলি ৪৲ চারি টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। ভগবানের অনুগ্রহে এই বিলাস মূলক অপব্যবহার বঙ্গে নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা উদ্দেশ্যে হিন্দুয়ানী মুখশুদ্ধি উদ্দেশ্যে পান খাওয়া উচিত, তাহার অধিক একেবারে নিষিদ্ধ।

এতদর্থে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি অনুমোদিত আছে। পান ধুইয়া মুছিয়া বোটার নিকটের শির গুলির সন্ধিস্থানের সহিত বড় শিরাটী পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার পর পানের ভিতর দিকে চুণ লাগাইয়া দ্বিখণ্ড পান পরস্পর ঘর্ষণ করিবে। তাহার পরে অধিক্ষণ ভিজান কষ পরিত্যক্ত সুপারি অল্প পরিমাণে লইয়া ঝিনুক পোড়ান চুণ সহ ব্যবহার করিবে। প্রথম চর্ব্বণে যে রস বাহির হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া খাইবে। এইস্থানে রুচি অনুযায়ী মসলা মিশাইলে হানি নাই, কিন্তু বর্ত্তমানের সুরতী, জরদা ব্যবহার স্বাস্থ্যজনক নহে। বিলাসিতা দ্বারা অনিষ্ট আর অর্থব্যয় ব্যতীত কোন লাভ নাই।

পল্লিকামিনীগণ পানসহ দোক্তা পাতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হানিজনক। সাধারণতঃ খয়ের সহ ধনের চাউল, মৌরি আর সামান্য পরিমাণ

লবঙ্গ, এলাচি ব্যবহার করা যায়। ইহা ভিন্ন মৃগনাভি যুক্ত সুরতী ইত্যাদি ব্যবহার সঙ্গত নহে। সুতরাং মুখশুদ্ধি আর অল্প পরিমাণে পাচকশক্তি বৃদ্ধির জন্য ও বিলাস বাসনা পূরণের জন্য সাধারণতঃ পান-সুপারী-চুণ-খয়ের এবং ধনের চাউল মৌরিই যথেষ্ট।

শিশুদের যকৃৎ রোগ।

(Infantile Liver)

[ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসু কাব্যবিনোদ]

—:০:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, প্রসূতির স্তন্যের উপর শিশুর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, স্তন্যদানের ব্যবস্থার পূর্ব্বে প্রসূতির স্বাস্থ্য ও আহার বিহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, অনেকেই বোধহয় জানেন, মাতার ক্রোধের সময় স্তন্যপান করিয়া অনেক শিশুর তড়কা উপস্থিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই সময়ে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায় সেইরূপ মাতার অন্য কোন রিপুর উত্তেজনার সময়েও তাহার দুগ্ধ শিশুর পানের অযোগ্য হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ত্তব্যের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হয়—রোগগ্রস্থ বিশেষতঃ এই দুর্জ্জয় ব্যাধিপীড়িত শিশুর মাতার স্বামীসহবাস কোন ক্রমেই উচিত নহে এবং কোনরূপ রিপুর উত্তেজনা যাহাতে না হয় তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই উচিত, উত্তম স্বাস্থ্যযুক্ত মাতার স্তন্যদানকালে ঋতু বন্ধ থাকে, সুতরা এই সময়ে যাঁহাদের ঋতু প্রকাশ পায়, তাঁহাদের দুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর মনে করিয়া ত্যাগ করাই সদ্বিবেচকের কার্য্য।

দন্তোদগম না হওয়া পর্য্যন্ত সাগু বার্লি, ময়দা আটা ইত্যাদি ষ্টার্চ্চযুক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে এই সমস্ত খাদ্য তাহারা সহজে পরিপাক করিতে পারেনা, ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু অনেক স্থানে দেখা যায়—দরিদ্রের ঘরে যেখানে কারণবশতঃ মাতৃদুগ্ধ পাওয়া যায় না, অথচ অর্থাভাবে গো-দুগ্ধেরও সংগ্রহ হয় না, সেখানে বার্লি ও আটার উপরেই অনেক শিশুর জীবন নির্ভর করে, কিন্তু সকল স্থলেই যে কুফল দেখা যায়—তাহা নহে, তবে সকলের প্রকৃতি একরূপ নহে, দরিদ্রের শিশুরা যে আটা বার্লি সহজে পরিপাক করিতে পারে, ধনীদের শিশুরা তাহা পারে না। যাহা হউক যাহাদের যকৃতের দোষ আছে, তাহাদের শুধু গো দুগ্ধ সেবন করান উচিত নহে। এস্থলে মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়, অর্থাৎ যতদিন দন্তোদগম না হয়, ততদিন দুধ বার্লি সেবন করানই কর্ত্তব্য। কিন্তু দাঁত উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে

ক্রমে শিশুর খাদ্যের পরিবর্তন করা উচিত। এই সময় ষ্টার্চযুক্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন খাদ্য—যথা সুজি, সাগু, ভাত প্রভৃতি খাওয়ান অভ্যাস করান যাইতে পারে। শিশুর ষষ্ঠমাসের পর সাধারণতঃ অষ্টম মাস হইতে দাঁত উঠিতে থাকে, দাঁত উঠিলে শিশুকে অল্প অল্প ভাত খাওয়ান যাইতে পারে, এবং সেরূপ করাও উচিত, ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে হিন্দু শাস্ত্রমতে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা এই কারণ বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অনেকে বলেন গর্দ্দভীর দুগ্ধ, নারীদুগ্ধের অনুরূপ। বাস্তবিক তাহা নহে নারী দুগ্ধ অপেক্ষা গর্দ্দভীর দুগ্ধের পুষ্টি অপেক্ষাকৃত কম, নারীদুগ্ধ অপেক্ষা গর্দ্দভীর দুগ্ধে জল এবং লবণের ভাগ একটু বেশী, কিন্তু প্রটিড, ফ্যাট্ (চর্ব্বি) ও কার্ব্বহাইড্রেট (চিনি) র ভাগ কম, গর্দ্দভীর দুগ্ধপানে শিশুর জীবনধারণ করিতে হইলে অন্ততঃ দ্বিগুণ পরিমাণের প্রয়োজন, কিন্তু উহাতে লবণ ও চিনির ভাগ অধিক থাকাতে অপকারও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। গাভী দুগ্ধে প্রটিডফ্যাট ও চিনির ভাগ পূর্ব্বোক্ত দু'টি দুগ্ধ অপেক্ষাই বেশী, সুতরাং শিশুর পক্ষে প্রথম প্রথম হজম করা একটু কঠিন, যাহারা গাভীদুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে গর্দ্দভীর দুগ্ধই প্রশস্ত। মহিষীর দুগ্ধ অত্যন্ত দুষ্পাচ্য, তাহাতে চর্ব্বির ভাগ অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী। ছাগীর দুগ্ধ সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকর বলিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে উহাও দুষ্পাচ্য। বাস্তবিক ছাগীর দুগ্ধে অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা লবণ বেশী, অন্যান্য উপকরণও কম নহে, সুতরাং দুষ্পাচ্য। উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশাইলে শিশুর উপযোগী হইতে পারে। এখানে সকল প্রকার দুগ্ধের উপাদানের (শতকরা হিসাবে) একটা তালিকা দেওয়া গেল।

দুগ্ধ	জল	প্রোটিড	চর্ব্বি	চিনি	লবণ
নারীদুগ্ধ	৮৮'০	২'৯৭	২'৯০	৫'৮৭	'১৬
গাভীর	৮৬'৮৭	৩'৯৭	৪'২৮	৪'৫২	৬
মহিষীর	৮১'০	৪'৪	৯'০	৪'৮	'৮
ছাগীর	৮৭'৬২	৩'৬২	৪'২০	৪'০	'৫৬
গর্দ্দভীর	৯১'১৭	১'৭৯	১'০২	৫'৫০	'৪২

যকৃৎগ্রস্ত শিশুর জ্বর না থাকিলে তাহাকে সহমত স্নান করান যাইতে পারে, এক্ষেত্রে ঈষদুষ্ণ অথবা সূর্য্যতাপে গরম জল বিশেষে হিতকর।

উন্মুক্ত আলোকে এবং বায়ু যাহাতে শিশুরা প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সুশ্রুতঃ।

[কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ]

চির বিশ্রুত সুশ্রুত। শস্ত্র বিধি
বিহিতো ভবতাতিপুরা খলুযঃ।
অমুস্যত্যতমঙ্গবিদেশিজনাঃ
কলয়া কলয়ন্তি কতি স্বকৃতীঃ॥

(২)

নিজতীক্ষ্ণমতেঃ পরিচালনায়া
পরিকল্প্য হিতে নবযন্ত্রচয়ং।
বিদধত্যাতি বিস্মিত মদ্য জনম্
চির বিস্মৃত সুশ্রুতশাস্ত্রগুণম্॥

(৩)

নৃশরীরগশস্ত্র বিধেয় গদান্
প্রতিকর্ত্তুমনা অমনাঙ্মহিমা।
সহি সুশ্রুত আর্য্যভিষগ ভিষগ্রাং
সকলাঙ্গময়ং বিদধৌ সুবিধিং॥

(৪)

ইহ বীজতয়া সমহান্ হি বিধিঃ
প্রতিভাতি সমং ভুবনে হ্যুদিনং।
প্রতিদেশমাবিস্কৃত নিত্যনবা
ধ্রুবমস্তফলং বহুশস্ত্রকৃতিঃ।

(৫)

পরিকৃত্তশিরোঽস্থিকলং লগয়ন্
জগদ্ভূতভবময়ং কলয়ন্।
ভুবি জীবতি সুশ্রুত শস্ত্রবিধি
শ্চিরমাত্মমহত্বগুণৈ বিজয়ী॥

(৬)

স্বগৃহস্থিত রত্নচয়ে ন বয়ং
হতদৃগ্বদহো বত দৃষ্টিপথাঃ।
পরবস্তুনি যাদৃশতাদৃশকে
বহুমানতয়া নু রতাঃ সততং॥

সুশ্রুত।

(অনুবাদ)

বিশ্ব সুবিদিত কীর্ত্তি তুমি হে সুশ্রুত।
কতযুগ হ'ল গত
শাস্ত্র বিধি তব মত
ঘোষিছে গৌরব তব যশঃ সুরভিত
অদ্যাপি শিক্ষিত রাজ্য হ'য়ে অনুসৃত।
লেশমাত্র অনুকৃতি করি তব কৃতি
কতবুধ আজ কৃতী
প্রসারি আপনি কৃতি।

স্বদেশে বিদেশে এস হে পূজ্য মূরতি
লহ মোর ভক্তি অর্ঘ্য সহিত প্রণতি।

(২)

আজ নিজ প্রতিভার পরিচালনায়
অভিনব যন্ত্রগণ
করি কত বিচরণ
বিস্মিত করিছে বিশ্ব পাশ্চাত্য বিদ্যায়—
শিক্ষিত ভিষক্‌ ভুলি, তব গরিমায়।

(৩)

শস্ত্রসাধ্য ব্যাধিচয় শান্তির কারণ
বিরচিত তব বিধি
সুসম্পূর্ণ মহানিধি
হায়রে মোদের মোহে না পেয়ে যতন
ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিপ্রায় কালিমামগন॥

(৪)

তথাপি সে জীবরূপে বিশ্ব সমর্চ্চিত
অভ্রান্ত স্বশক্তিবলে
আর্ষবিধি, ধরাতলে—
অপর শারীর শাস্ত্র শস্ত্রপরিচিত
তার(ই) ভিন্নফলরূপে নিশ্চয় বিদিত!

(৫)

ছিন্ন শিরঃ করিলগ্ন যে বিধি, ভুবন
করিল বিস্ময় স্তব্ধ
পুনঃ কি হইবে লব্ধ
সে পূত সৌশ্রুত শাস্ত্র সেভাবে কখন
মোরা যে সেবক তাঁর মোহে বিচেতন।

(৬)

নিজগৃহমাঝে গুপ্ত মহার্ঘ রতনে
হায় মোরা অন্ধপ্রায়
হেরিনা বারেক তায়
করিছি সন্ধান কিন্তু কত আকিঞ্চনে
সাগ্রহে সতত ধিক্‌ মোদের জীবনে।

শিশু-পরিচর্য্যা।

[কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

বক্তব্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমাদের দেশের বহুবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আগে শিশুদিগকে কিরূপে লালনপালন করিতে হইত, তাহা গৃহিণীমাত্রেই ভালরূপ জানিতেন। এমন কি, গৃহিণীগণের শত শত পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ শিশুগণের অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত নিবারণ করিতে পারিত। এখন আর সেরূপ কাল নাই, পরমুখাপেক্ষিতা আমাদিগের সর্ব্বগ্রাস করিয়াছে। এখন কোন জননীই সন্তান পরিপালনে সম্পূর্ণ সক্ষম নহেন—একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি করিলে সন্তান সুস্থ ও সবল হইবে, একথা কেহই জানেন না। এখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তারের বন্দোবস্ত থাকে, এবং অবস্থার সচ্ছলতা থাকিলে প্রসবের অব্যবহিত পর হইতেই পরিচারিকার ক্রোড়ে শিশুটী দিয়া

জননী নিশ্চিন্ত হয়েন। পিতাও ডাক্তারকে ডাকিয়া পিতৃকর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। অসুখ না হইতেই এখন ডাক্তার আসিয়া শিশুর সুখ বা অসুখের যাহা হয় একটা ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াই নিশ্চিন্ত,—পরিচারিকাও শিশুর ভালমন্দ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের পরিচর্য্যায় নিরত থাকে।

সন্তান যদি প্রথম হইতেই জননীকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে কখনও পরিচারিকার নিকট তাহার অক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য প্রত্যাশা করা যায় না। বোধহয় এই জন্যই বড়লোকদিগের ঘরে শিশুদিগের রোগের এত বাহুল্য। তদ্ভিন্ন কিরূপে সন্তান প্রতিপালন করিতে হইবে, সে বিষয়ে গৃহস্থগণের অনভিজ্ঞতাও শিশুদিগের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। অতএব যাহাতে গৃহস্থমাত্রেই কথায় কথায় ডাক্তার না ডাকিয়া নিজেই শিশুদিগের সামান্য সামান্য রোগের প্রতিকার করিতে পারেন, এবং যেরূপ নিয়মে শিশুপালন করিলে তাহাদের রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকে, অথচ সন্তান সুস্থ সবল ও দিনে দিনে শারীরিক ও মানসিক শক্তিলাভে সমর্থ হয়, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সেই সকল অমূল্য উপদেশনিচয় আমরা আয়ুর্ব্বেদে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে যদি একজন গৃহস্থও উপকৃত হন, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

সদ্যোজাত শিশুর পরিচর্য্যা।

গর্ভের মধ্যে সন্তান বেশ গরমেই থাকে। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই যাহাতে তাহার শরীরে বাহিরের খোলাবাতাস অনবরত না লাগিতে পারে, সেজন্য শিশুর গায়ে একটা ঢিলে গরম কাপড়ের জামা বা অন্য কোনরূপ আবরণ দেওয়া দরকার, এবং বিছানায়ও গরম কাপড় বিছাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ, খোলা গায়ে রাখিলে অথবা ঠাণ্ডা বিছানায় শয়ন করাইলে শিশুর গায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাসি ও জ্বর প্রভৃতি হইতে পারে।

শিশুকে যদি বাতাস করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কুল, নিম, অথবা ফলসার শাখার দ্বারা বাতাস করাই ভাল; তাহাতে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

শিশুর বিছানা ও বিছানার চাদর প্রভৃতি খুব নরম, পাতলা ও বেশ পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। উহা কোনরূপ দুর্গন্ধযুক্ত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যদি বিছানার চাদর বা শিশুর গায়ের জামা প্রভৃতি ঘামে বা অন্য কোনরূপে ভিজিয়া যায়, তাহাতে যদি পিপীলিকা ধরে, অথবা মলমূত্রাদি দ্বারা অপরিষ্কৃত হয়, তবে সেসকল তখনই পরিত্যাগ করিবে, অথবা সেগুলিকে বেশ করিয়া কাচিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইবে। বালিশটীকেও প্রত্যহ রৌদ্রে দিয়া লইবে।

সদ্যোজাত শিশুর আহার।

সন্তান প্রসবের তিন কিংবা চারি রাত্রির পর প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ আসে। যে কয়দিন স্তনে দুগ্ধ না আসে, সে কয়দিন জাতসন্তানকে অনন্তমূল মধু সহ ঘষিয়া ঘষিয়া চন্দনের মত করিবে ও তাহাতে দুই তিন ফোঁটা বেশ ভাল গাওয়া ঘি মিশাইয়া একটা কাচের বা পাথর বাটীতে রাখিয়া দিবে, এবং উহা মাঝে মাঝে শিশুকে চাটিতে দিবে। ইহাতে সন্তান

মোটেই দুর্ব্বল হইবে না, অধিকন্তু তাহার শরীর নীরোগ এ সবল হইবে।

স্তনে যে কয়দিন দুগ্ধ না আসে, আজকাল অনেকেই যে কয়দিন গরুর দুগ্ধ খাওয়াইতে আরম্ভ করেন কিন্তু ডাক্তারগণ এ ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করেন না। তাঁহারা বলেন,—প্রসবের পর যে কয়দিন স্তনে দুগ্ধ না আসে, সে কয়দিন প্রসূতির স্তনে যে আটা আটামত ঘন দুগ্ধ থাকে, তাহাই প্রথমদিনে ছয় ঘণ্টা অন্তর চারিবার, এবং দ্বিতীয়দিনে চারি ঘণ্টা অন্তর ছয়বার শিশুকে খাওয়ান উচিত. সাধারণতঃ দুই দিন পরেই স্তনে দুগ্ধ আসে; তখন দুই ঘণ্টা অন্তর সন্তানকে স্তন্যপান করান উচিত।

কিন্তু যাঁহারা এ সকল ব্যবস্থা না মানিয়া স্তন দুগ্ধের অভাবে পলতে করিয়া গো-দুগ্ধ খাওয়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের উচিত,—একভাগ গো-দুগ্ধে তিনভাগ জল মিশাইয়া গরম করিয়া পলতে দিয়া খাওয়ান। প্রত্যেক বারেই পলতেটা বদলাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, একবারে যতটা দুগ্ধ সন্তানকে খাওয়াইবার জন্য লওয়া হয় তাহার যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা যেন দ্বিতীয় বারে না খাওয়ান হয়, এবং প্রতিবারেই দুগ্ধটা একটু গরম করিয়া লওয়া উচিত। ঠাণ্ডা দুধে ছেলেদের অনেক রকম অসুখ হইয়া থাকে।

স্তন্যপান-বিধি।

প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ আসিলে. শিশুকে উহা পান করাইবার সময়, প্রথমে স্তনদ্বয় বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। পরে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া শিশুকে স্তন ধরাইয়া দিবে। প্রথমে একটু স্তনদুগ্ধ না গালিয়া ফেলিলে, স্তনে পরিপূর্ণভাবে দুগ্ধ থাকায় স্তন্যপানের সময় সন্তানের গলায় এককালে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ আসে; তাহাতে শিশুর দুগ্ধপানে বাধা জন্মে। সেজন্য শিশু হাঁপ্রাইয়া উঠিতে পারে, অথবা তাহার কাসি কিংবা বমি আসিতেও পারে।

স্তন্যপান করিতে করিতে শিশু ঘুমাইয়া পড়িলে, স্তন দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। নিদ্রিত অবস্থায় স্তন্যপান করাইলে অনেক প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে। এজন্য স্তন মুখে করিয়া সন্তান যাহাতে না ঘুমাইয়া পড়ে, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা উচিত। ঘুমাইয়া পড়িলে শিশুকে স্তন দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া শোয়াইয়া দিবে।

স্তন্যপান করাইবার পর শিশুর মুখের ভিতরটা একটু পরিষ্কার ভিজে ন্যাকড়া দিয়া মুছাইয়া দিবে। তাহাতে শিশুর মুখে ঘা হইবার ভয় থাকিবেক না, হজমও ভাল হইবে।

শিশুর দুগ্ধপান বিধি।

প্রসূতির স্তন-দুগ্ধের কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, অথবা তাহা শিশুর পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলে, কিম্বা অন্য কোন কারণে স্তনদুগ্ধের অভাব ঘটিলে, শিশুকে ধাত্রীর দুগ্ধ অথবা গরু, ছাগল কিংবা গাধার দুগ্ধ পান করান যাইতে পারে।

শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবার একটা নিয়ম রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। আহারের অনিয়মে বয়স্কগণের যেমন নানাপ্রকার রোগ হয়, শিশুদিগেরও তেমনি নানাপ্রকার রোগ জন্মে। শিশু যখনই কাঁদিবে, তখনই তাহার ক্ষুধা

পাইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইয়া দেওয়া কখনই উচিত নয়। শিশু নানা কারণে কাঁদিতে পারে।

সন্তানকে গো-দুগ্ধ পান করাইতে হইলে তিনদিন হইতে চৌদ্দদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্রিতে দুইঘণ্টা অন্তর দশবার দুগ্ধ পান করাইবে এবং প্রত্যেকবারে তিন কাচ্চা বা এক ছটাক পরিমাণে দিবে। তন্মধ্যে সন্ধ্যাবেলা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আটবার; তাহার পর সারারাত্রির মধ্যে দুইবার মাত্র দুধ খাওয়াইতে পারা যায়। চৌদ্দদিন হইতে একমাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ দুইঘণ্টা অন্তর দিনে রাত্রে দশবার দুগ্ধপান করাইবে। কিন্তু দুগ্ধের পরিমাণ প্রতিবারে কিছু কিছু বাড়াইয়া দিবে।

প্রথম সপ্তাহে একভাগ গো-দুগ্ধে তিন ভাগ জল মিশাইয়া খাওয়াইবে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে একমাস পর্য্যন্ত গো-দুগ্ধ এক ভাগ, জল দুইভাগ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া শিশুকে পান করাইবে। তারপর শিশুর যেমন বয়স বাড়িবে তদনুসারে দুগ্ধে জলের ভাগ কমাইয়া দিবে। শিশুকে যখনই দুগ্ধপান করান হইবে, তখনই উহা গরম করিয়া লইতে হইবে, একথা যেন মনে থাকে।

আজকাল অনেকেই প্রথম হইতে সন্তানকে বিলাতী টিনের দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন। সেরূপ দুগ্ধ পান করান কখনই উচিত নহে; তাহাতে সন্তানের নানাপ্রকার রোগ হইতে পারে। অনেক স্থলে গো-দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। সুতরাং মাতৃস্তন্যের অভাবে সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থামত গো-দুগ্ধ পান করানই উচিত। কেহ কেহ শিশুকে দুগ্ধের সহিত 'বার্লি' বা 'এরারুট' মিশাইয়া খাওয়াইয়া থাকেন। সেরূপ করাও ভাল নহে। ছয় মাস অর্থাৎ দাঁত উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সন্তানের 'বার্লি' বা 'এরারুট' প্রভৃতি হজম করিবার শক্তি থাকেনা। সাত আট মাস পরে, অর্থাৎ দাঁত উঠিলে শিশুর দুগ্ধের সহিত 'বার্লি' বা 'এরারুট' মিশাইয়া পান করান যাইতে পারে। এই সময়েই আমাদের দেশে অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে; অন্নপ্রাশনের পর হইতে শিশুকে উৎকৃষ্ট দাদখানি চাউলের সুসিদ্ধ অন্নের মণ্ড কাপড়ে ছাঁকিয়া গো-দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাওয়ান যাইতে পারে।

ধাত্রী-নির্ব্বাচন।

দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় সন্তান প্রসবের পরেই জননীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে,—অথবা কোন প্রকার রোগের আক্রমণে পীড়িত হইয়া পড়ে অথবা প্রসবের পর জননীর স্তন-দুগ্ধের অল্পতা ঘটে। সুতরাং প্রসূতি সন্তান পালনে অসমর্থ হয়। এরূপস্থলে সেই সদ্যোজাত শিশুর লালনপালনের জন্য ধাত্রী নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

ধাত্রী নিয়োগ করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনার সহিত করা উচিত। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ,—সজাতীয়া, মধ্য-বয়স্কা রোগশূন্যা ও সদাচারসম্পন্না কোন রমণীকে ধাত্রী নিযুক্ত করা। তাহার আকৃতি অতিদীর্ঘ বা অতিখর্ব্ব কিংবা অতিস্থূল অথবা অত্যন্ত কৃশ হইবে না। স্বভাব ধীর হইবে, সন্তানের প্রতি সবিশেষ স্নেহ থাকিবে এবং তাহার স্তনে প্রচুর দুগ্ধ থাকিবে, সেই দুগ্ধে

কোনপ্রকার দোষ থাকিবে না; অধিকন্ত তাহার সন্তান জীবিত থাকা উচিত। এইরূপ ধাত্রীর স্তন্ত পান করিলে সন্তান নীরোগ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে।

স্তন্য পানের বিধি-নিষেধ ;

মাতৃস্তনের দুগ্ধ সন্তানের পক্ষে অমৃতের ন্যায় উপকারী। শিশু যদি পেট পুরিয়া নির্দ্দোষ স্তন্তপান করিতে পায়, তাহা হইলে তাহার কোন প্রকার রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং শরীরও দিনে দিনে সবল ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা মাতার সেই দুগ্ধে কোন প্রকার দোষ জন্মে, তাহা হইলে সেই দুগ্ধের দ্বারা সন্তানের শরীরের পরিপুষ্টি বা সবলতা তো হয়ই না, অধিকন্তু দূষিত স্তন্ত পানের জন্ত শিশুর স্বাস্থ্যহানি এবং নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং প্রসবের পর প্রসূতির বিশেষ সাবধানতার সহিত আহারাদি করা উচিত। তদ্ভিন্ন, অত্যন্ত ক্ষুধার সময়, বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইলে, অথবা জ্বর বা অন্ত কোন রোগের দ্বারা পীড়িত হইলে সন্তানকে স্তন্তপান করাইবে না। গর্ভিণীরও গর্ভাবস্থায় স্তন্তপান করান উচিত নহে। যে সকল প্রসূতির দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ বা অত্যন্ত স্থূল, তাঁহাদেরও স্তনদুগ্ধের দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। তা' ছাড়া জননী অম্লজনক বা অনুচিত আহারাদি করিয়াও শিশুকে স্তন্তপান করাইবেন না। যাঁহারা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের এই সকল শাস্ত্রীয় নিয়ম মানিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্তন্তবিজ্ঞান।

মাতৃস্তনের দুগ্ধ পানেই যে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে, একথা বলিতে পারা যায় না। সেই সকল দোষ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, এবং দোষযুক্ত হইলে তাহার প্রতিকার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

স্তনদুগ্ধে কোন প্রকার দোষ আছে কি না—তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্তনদুগ্ধ একটু গালিয়া দেখিবে—উহা গরম বলিয়া মনে হয় কি না। স্তনদুগ্ধ যদি বেশ ঠাণ্ডা, নির্ম্মল, জলের মত তরল ও শাঁখের মত শাদা হয়,—জলে দিলে সহজেই মিশিয়া যায়, অর্থাৎ ফেনার মত বা সূতার মত আলা'দা না হয়, অথবা জলে দিবামাত্র ডুবিয়া না যায় কিংবা আলাদা হইয়া না ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে জানিবে,—সেই স্তনদুগ্ধে কোন প্রকার দোষ নাই। তাদৃশ নির্দ্দোষ স্তনদুগ্ধ পানেই সন্তান রোগমুক্ত, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে।

যদি প্রসূতি, গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন, কিংবা অসময়ে অনিয়মে অনুচিত আহার বিহারাদি করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। জননীর শরীর খারাপ হইলে স্তনদুগ্ধও দূষিত হয়। দূষিত স্তন দুগ্ধপানে সন্তানের নানাবিধ রোগ জন্মে। সেজন্য স্তন্তপায়ী শিশুর অসুখ করিলে প্রসূতির আহারাদি সম্বন্ধে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত এবং শিশুর চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতিরও স্তনদুগ্ধের দোষ নিবারণের জন্ত রীতিমত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। নতুবা কেবল শিশুর চিকিৎসা করিয়া রোগ নিবারণ করিলেই চলিবে না। যতক্ষণ

রোগের নিদান—মাতৃস্তন্যের দোষের প্রতিকার করা না হয়, ততক্ষণ আর শিশুর সম্পূর্ণ আরোগ্যের আশা করা যায় না।

স্তন্যদোষের প্রতীকারোপায়।

১। যদি স্তনদুগ্ধ কষায়-রসযুক্ত বলিয়া মনে হয় এবং উহা জলের সঙ্গে মিশিয়া ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে সেই দোষের প্রতিকারের জন্য,—

বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর এই দশটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী তিন আনা পরিমাণে লইয়া আধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে এবং আধপোয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার প্রসূতিকে পান করিতে দিবে।

২। স্তনদুগ্ধ যদি অম্লস্বাদ কটুরস যুক্ত বলিয়া মনে হয়, এবং উহা জলে দিলে যদি হলুদ রঙের রেখা সকল দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দোষের প্রতীকারের নিমিত্ত,—

গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপাতা, নিমপাতা রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী সাঁড়ে পাঁচ আনা পরিমাণে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করিতে দিবে।

৩। স্তনদুগ্ধ যদি পিচ্ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং উহা জলে দিলে যদি জলের সঙ্গে না মিশিয়া গিয়া ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দোষ নিবারণের জন্য,—

আমলা, হরীতকী, বহেড়া, মুতা, চিতামূল কটকী, বামনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ,—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী তিন আনা পরিমাণে লইয়া আধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে দিবে এবং আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করাইবে। অথবা,—

কাকজঙ্ঘা, হরীতকী, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আকনাদি, ইহাদের প্রত্যেকটী দুই আনা পরিমাণে লইয়া জল দিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া একছটাক আন্দাজ জলে গুলিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। কিংবা ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে যে কোন একটী আট আনা পরিমাণে লইয়া জলে বাটিয়া প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। ইহাতেও স্তনদুগ্ধের পূর্ব্বোক্ত প্রকার দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

৪। স্তনদুগ্ধ জলে নিক্ষেপ করিলে যদি ফেনা ফেনা বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে ঐ দোষের প্রতীকারের জন্য আকনাদি, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা ও মুগরামুল,—ইহাদের প্রত্যেকটী দুই আনা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে বাঁটিয়া এক ছটাক আন্দাজ অল্প গরম জলে গুলিয়া প্রত্যহ একবার পান করিতে দিবে।

৫। স্তনদুগ্ধ যদি সাঁখের মত সাদা না হইয়া কোনরূপ বিবর্ণ বলিয়া মনে হয়, তবে ঐ দোষ নিবারণের জন্য, যষ্টিমধু, কিসমিস, ক্ষীরকাঁকোলী ও নিসিন্দা পাতা—ইহাদের প্রত্যেকটী দুই আনা পরিমাণে লইয়া বেশ ভাল করিয়া বাটিয়া জলে গুলিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার প্রসূতিকে পান করিতে দিবে।

৬। স্তনদুগ্ধে কোনরকম দুর্গন্ধ বোধ

হইলে,— কাঁকড়াশৃঙ্গী, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও ত্বচ,—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী দুই আনা পরিমাণে লইয়া জলে বাটিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার প্রসূতিকে পান করিতে দিবে।

খ। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলেও স্তনদুগ্ধের সর্ব্বপ্রকার দোষ নষ্ট হইয়া থাকে। যথা,— ছাতিমছাল একতোলা এবং গুলঞ্চ একতোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কুড়চূর্ণ এক আনা পরিমাণে দিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া সেবন করা উচিত। অথবা,— কেবল দুই তোলা চিরতা পূর্ব্ববৎ জল দিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। অথবা,— আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মুগরামূল, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্‌কী ও অনন্তমূল প্রত্যেকটী তিন আনা পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার খাইতে দিবে।

গ। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলেও স্তনদুগ্ধের দোষ নষ্ট হইয়া থাকে। যথা,— পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ ও কুলখকলায়,— এই সকলের প্রত্যেকটী সমান পরিমাণে লইয়া জলে বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিবে এবং উহা শুকাইয়া গেলে বেশ করিয়া স্তন দুইটা ধুইয়া ফেলিয়া সমস্ত দুগ্ধটা গালিয়া ফেলিয়া দিবে। এইরূপ দিনে একবার করিলেই স্তনদুগ্ধের কোন প্রকার দোষ থাকিবে না। প্রলেপ রাত্রিতে দিতে নাই, অথবা,— বেড়েলা, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা ও মুগরামূল এই কয়টী দ্রব্য কিংবা,— ক্ষীরকাকোলী ও চাকুলে বাটিয়া স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিবে এবং উহা শুকাইয়া গেলে স্তন দুইটা বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। ইহা দ্বারা স্তনদুগ্ধের গুরুত্ব নষ্ট হয়।

স্তন্য দুষ্টিতে প্রসূতির পথ্য।

যে সকল প্রসূতির স্তনদুগ্ধে কোন প্রকার দোষ থাকে, তাহাদের আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। দুইবেলা ভাত খাইবে না। অধিক পরিমাণে অম্ল, শাক, সরিষা বা লঙ্কার ঝাল বা কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য হজম হইতে দেরী লাগে এরূপ দ্রব্যাদি ভোজন করা ভাল নয়। দিনে পুরাতন চাউলের ভাত (চাউলগুলি সরু হইলেই ভাল হয়) কৈ, মাগুর ও শিঙ্গি প্রভৃতি মাছের ঝোল, বা মুগ, মটর ও কুলথ কলায়ের দাল, পটোল, ডুমুর, কাঁচকলা, উচ্ছে, করলা, মোচা, পল্‌তা, কচি বেগুন প্রভৃতির তরকারী এবং রাত্রিতে ক্ষুধা বুঝিয়া লুচি, রুটী বা যবের পালো ও দুগ্ধ প্রভৃতি যাহা অল্প সময়ে হজম হইতে পারে, এরূপ আহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

অনৌষধি

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসাদ রায় কবিরত্ন)

বরুণ—বরুণগাছ—হিং—বরণা।

বঙ্গদেশে অধিকাংশ স্থলে বরুণ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে, পুরাতন জঙ্গলাবৃত পুষ্করিণীর খাদে এবং বিলের মধ্যে বরুণ গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা জলে মরিয়া যায় না। বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শুষ্ক ভূমিতে কদাচিৎ জন্মিয়া থাকে। ইহার পত্রগুলি ত্রিপত্র, কোমল। ফলগুলি ছোট কয়েদবেলের ন্যায়।

বরুণের গুণ—

অশ্মরী (পাথরী) রোগে—২ তোলা বরুণ ছাল অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে, ঐ ক্বাথে চারি আনা সোরা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পাথরী নির্গত হয়, এই ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগেও বিশেষ হিতকারী।

অর্শ রোগে বরুণ—অর্শ-রোগে বেদনায় কষ্ট পাইলে তিল তৈল মাখাইয়া বরুণ পত্রের কাথে অবগাহন করাইবে।

বাতজ বেদনায় বরুণ—বরুণ ছাল ও সজিনাছাল সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া বাতজনিত বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনার উপশম হয়।

গণ্ডমালায় বরুণ—

বরুণ মূলের ছালের কাথ (২ তোলা ছাল, অর্দ্ধসের জল, শেষ অর্দ্ধপোয়া) প্রচুর মধু সহ পান করিলে চিরে গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয়।

বিদ্রধি-রোগে বরুণ—

শ্বেত পুনর্ণবার মূল ও বরুণ মূলের ছাল একত্র ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ঐ কাথ পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি বসিয়া যায়। (শরীরাভ্যন্তর জাত ফোড়াকে বিদ্রধি বলে।)

মেচেতা রোগে বরুণ—

অনেকের মুখমণ্ডলে একপ্রকার কালো কালো দাগ দৃষ্ট হয়, তাহাকে মেচেতা বলে। ছাগী দুগ্ধের সহিত বরুণছাল পেষণ করিয়া উহার প্রলেপ দিলে মেচেতা বিনষ্ট হইয়া মুখের স্বাভাবিক বর্ণ দৃষ্ট হয়।

ব্লিষ্টারে বরুণ—ডাক্তারগণ মাষ্টার চূর্ণ দ্বারা রোগীকে ব্লিষ্টার লাগাইয়া থাকেন। বরুণের ছাল অথবা পত্র গরম জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্লিষ্টারের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রলেপের স্থানে ফোস্কা হইবে। যে মাষ্টার চূর্ণ (সর্ষপ চূর্ণ) বিলাত হইতে আমদানী করা হয়, তৎকার্য্য বরুণে সাধিত হইতে পারে।

পরমায়ু প্রসঙ্গ

বা

মানুষ মরে কেন ?

(কবিরাজ শ্রীঅক্ষয় কুমার বিদ্যাবিনোদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—:•০•:—

আত্মা যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, তাহা পুরাণাদিতেও বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে লিখিত আছে, যমদূতগণ আসিয়া সত্যবানের মৃত্যুর পর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

আত্মা অতিশয় সূক্ষ্ম, এই জন্য কলেবর মধ্যে অবস্থান করিলেও সাধারণ চক্ষুর বিষয়ীভূত হয়েন না। এই জীবাত্মা অপাঞ্চভৌতিক, অথবা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম. এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত নহেন। তন্নিমিত্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রত্যক্ষীভূত থাকেন না।

জীবাত্মা তেজোময় পদার্থ, এই জন্য গর্ভাশয়ে শুক্রশোণিতের সংযোগে অবস্থিতি করেন বলিয়া উহারা পূতিভাব প্রাপ্ত হয় না। অধিকন্তু আত্মা স্বয়ং প্রকাশমান, অথবা স্বীয় জ্যোতিতে সতত সমুজ্জল। জীবাত্মা চৈতন্যময়, এই জন্য সূক্ষ্ম শরীরি জীবাত্মা পঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হইলেই সেই স্থূল দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আবার জীবাত্মা জড়াত্মক বপু পরিহার করিলেই সেই দেহকে চৈতন্যশূন্য বা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত বলা যায়। অর্থাৎ তৎকালে মানব-বিগ্রহে চৈতন্যের সত্তা না থাকায় কেবল ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের অবরোধমাত্র থাকে। তন্নিমিত্ত মৃত্যুর নামান্তর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি।

পাঠকগণ পূর্ব্বে আত্মার সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মা যে কি পদার্থ, তাহা মোটামুটি বুঝিয়া লউন, অতঃপর, সেই আত্মার বা জীবাত্মার শুক্র-শোণিত-সংযোগে গর্ভরূপে আবির্ভূত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট ও অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যাবৎ নির্ব্বাণ মুক্তি না হয়, অথচ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার পুনর্ম্মিলন না ঘটে, তাবৎ প্রত্যেক জীবাত্মার সূক্ষ্ম শরীর বর্ত্তমান থাকে। আবার ঐ সূক্ষ্ম শরীরের সহিত পূর্ব্বজন্মের উপার্জ্জিত বিদ্যা বা জ্ঞান, পুণ্য বা পাপকর্ম্ম জনিত স্বভাব ও অদৃষ্ট, সত্ত্ব, রজঃ, তম এই গুণত্রয় এবং মন, জীবাত্মার সহিত মিশ্রিত থাকে।

শুক্র-শোণিতের সংযোগ ব্যতিরেকে জীবাত্মার পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের আর কোন উপায় নাই। যে জীবাত্মা যে দেহে যদ্রূপ সদসৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ফল ভোগার্থ তাঁহাকে তদনুরূপ উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট দেহে প্রবেশ করিতেই হইবে। নতুবা শুভকার্য্যের

ফল ভোগই হয় না এবং অশুভ কার্য্যের দণ্ড-দাতা জগদীশ্বরের পুণ্যময় বিশাল রাজ্য কলুষ রাশিপূর্ণ হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত মনুষ্যগণ নিরন্তর সুখাশায় ধাবমান হইলেও কাহারও অদৃষ্টে সুখ প্রাপ্তির সংঘটন হয়, কাহারও হয় না, ইহা অবশ্যই জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অধিকন্তু ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কেহ কেহ বিশিষ্ট অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যারম্ভ করিয়াও বৈকল্যের হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন না; কেহ বা তাহাতে আগ্রহবান্ না হইয়াও অনায়াসে বা অল্পায়াসে সংসিদ্ধির মুখাবলোকন করিয়া থাকেন। তাহা না হইলেই বা কবি,—'উদ্যোগিনাং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ' বলিয়া শেষে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ' ইহাই বা বলিবেন কেন? অতএব ভাগ্য যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

মনুষ্যাদি প্রাণী সকল (বিশেষতঃ মনুষ্য) আপন আপন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের উপযুক্ত সন্তান লাভের সময় উপস্থিত হইলে, যদি স্ত্রী-পুরুষে যথাকালে যথানিয়মে পরস্পর সম্ভোগ দ্বারা শুক্র-শোণিতের সংযোগ করে, তাহা হইলে, যে যে জীবাত্মার পক্ষে স্ব স্ব পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মফল ভোগার্থ ঐরূপ ব্যক্তির সন্ততিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করা ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে অনুমোদিত, সেই সেই জীবাত্মা ঐ ঐ ব্যক্তির শুক্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও আর্ত্তব-শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুনর্ব্বার গর্ভ রূপে আবির্ভূত হয়, এবং যথাকালে প্রসূত হইয়া মর্ত্ত্যভূমে মনুষ্য নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। আবার কর্ম্মক্ষয় হইলে, পুনর্ব্বার লোকান্তরিত হন। ইহারই নাম জন্ম ও মৃত্যু, এই জন্ম মৃত্যু ব্যাপার জগতীতলে অহর্নিশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আত্মা যে কি পদার্থ তাহা ত বলা হইল। এইবার ঐ আত্মার পুনর্জন্মের সম্বন্ধে আরও কতক কথা বলিব।

আত্মার পুনর্জন্ম।

কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত আত্মাকে ভোগায়তন দেহাশ্রয় করতঃ পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এই কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিতে লিখিত আছে :—

"নিজ অদৃষ্ট অর্থাৎ কৃতকর্ম্ম বশে আবদ্ধ হইয়া শরীর গ্রহণ করাকেই সংসার বলে।"

অন্যত্র লিখিত আছে :—

প্রাক্ কর্ম্মের জন্মহেতু :—

ইহার অর্থ এই—পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মই মনুষ্যের শরীর ধারণের হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম সমুদায়ের ফলভোগের নিমিত্তই মানবকে শরীর ধারণ করিতে হয়।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাক্‌কায় সম্ভবম্।
কর্ম্মজা লভয়ো নৃনামুত্তমাধম-মধ্যমাঃ॥

ইহার অর্থ এই—মনুষ্য মন, বাক্য ও দেহদ্বারা যে সকল কর্ম্মের আচরণ করে; ঐ সকল কর্ম্মে শুভ বা অশুভ ফলানুসারে তাহাদিগের উত্তম, মধ্যম বা অধম গতি লাভ হয়। অথবা মনুষ্য উত্তম কর্ম্ম করিলে উত্তম গতি, মধ্যম কর্ম্ম করিলে মধ্যম গতি এবং অধম কর্ম্ম করিলে অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্যগণকে স্বস্বকৃত কর্ম্মনিচয়ের ফল-

[illegible] যেরূপ [illegible] তাহার [illegible]মাত্র এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

তোগাবসানে জীবাত্মা বৃষ্টিরূপে ঊর্দ্ধলোক হইতে ভূমণ্ডলে পতিত হয়। সেই বৃষ্টি পাইয়া শস্যাদি জন্মিয়া থাকে' সেই শস্যাদি ভক্ষণে পুরুষের রেতঃ উৎপন্ন হয় সেই রেতঃ যথাকালে স্ত্রী-যোনিতে পতিত হইলে, তদ্বারা গর্ভোৎপত্তি হইয়া থকে।

এদিকে যে জীবাত্মা [illegible] শস্যাদির অন্তরে নিহিত থাকে, [illegible] নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহাকে [illegible] পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, [illegible] ব্যক্তির উদরস্থ হয়। তত্ক্ষণে উৎপন্ন [illegible] শোণিত সহ যোনিমধ্যস্থ হইয়া পুত্র[illegible] ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই নাম [illegible] পুনর্জন্ম।

জীব-বিজ্ঞান

[illegible]।*

(শ্রীবন[illegible]বিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি)

খাদ্য।

আমরা জানি, cellদের মুখ নেই যে গিলিবে, দাঁত নেই যে চিবুবে। জলে দ্রবীভূত খাদ্য ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তা'দের কোন কাজেই লাগেনা। অথচ দেহের cell-সমষ্টির খোরাক জোগাইবার জন্য আমরা খাচ্ছি ভাত, ডাল, আলু, পটল প্রভৃতি কঠিন পদার্থ। এদের দ্বারা cellদের দেহ পুষ্টি ক'র্‌তে হ'লে এ-গুলাকে দ্রবীভূত ক'রে রক্তের সঙ্গে তাদের কাছে পাঠাতে হ'বে। আমাদের পাকপ্রণালীর মধ্যে সেই কাজই হ'চ্চে। কতকগুলা পাচক-রসের সাহায্যে কঠিন পদার্থ গুলে জলের মত হয়ে যাচ্চে, গোঁড়া লেবুর রসে কড়ি যেমন গলে যায়—সেই রকম। এই রস যদি না থাকতো, ত লুচি পলান্ন আকণ্ঠ খেয়েও শুকিয়ে ম'র্‌তে। পেট যত বড় জয়ঢাকই হোক না, cellগুলো যে তা'র থেকে এক [illegible] রস পেতো না।

আমরা যা' খাই, বিশ্লেষণ ক'র্‌লে দেখা যায় তা'তে প্রধানতঃ তিন রকম জিনিস আছে। একটা হচ্চে শ্বেতসার। এ [illegible] দেখ্‌তে সাদা, খেতে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না, এবং সিদ্ধ ক'র্‌লে আটার মত হয়, যেমন বালি, এরোরুট ইত্যাদি। আমরা কিছু বার্লি এরোরুট প্রত্যহ খাচ্চিনা। কিন্তু আমরা চাল খাই, আলু খাই, রাঙাআলু খাই। এ গুলাকে শুকিয়ে গুঁড়া ক'র্‌লে বার্লির মত জিনিসই পাওয়া যায়, এদের মধ্যে শ্বেতসার বেশী পরিমাণে আছে ব'লে। মাছ, মাংস বা ডিম কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জিনিস। শুকিয়েই হোক বা যে কোন উপায়েই হোক, এদের ভিতর থেকে বার্লির মত সাদা, স্বাদহীন

---

* "ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত।"

গুঁড়া একটুও পাবে না। সিদ্ধ ক'রে আটা হজম দূরে থাক্, কাঁচা বেলায় যা'রা আটার মত থাকে, যেমন ডিমের ভিতরটা, তা'রা সিদ্ধ হ'লে শক্ত হয়ে যায়। এই সব খাদ্যের প্রধান উপাদান প্রোটীড। জীব বা উদ্ভিদের জীবন্ত অংশে প্রোটীড বেশী পরিমাণে থাকে। প্রোটীড বেশী খেতে ইচ্ছা হ'লেই যে কতকগুলো বেশী মাংস খেতে হ'বে, তা'র কোন মানে নেই, তরিতরকারিতেও সে জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রোটীড এবং শ্বেতসার ছাড়া আর একটা জিনিস আমরা খাই, যেমন তেল-ঘি প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ।

এই তিনপ্রকার পদার্থকে গলা'বার জন্য তিন প্রকার পাচকরসের দরকার হয়েছে। তা'দের একটা থাকে মুখে, একটা থাকে পাকাশয়ে, এবং একটা থাকে অন্ত্রের মধ্যে। মুখের রস বা লালার কাজ হচ্চে শ্বেতসারকে শর্করায় পরিবর্ত্তিত করা; শর্করা হ'লেই সে জলে গুলে যা'বে। আমরা একগাল মুড়ি মুখে পুরে যখন চিবুতে থাকি, তখন প্রথমটা তত তাল লাগে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মিষ্ট লা'গতে থাকে। মুড়ির শ্বেতসার শর্করায় পরিবর্ত্তিত হয় বলেই এ রকম হয়। National Hotel এর cutlet কিন্তু এমন মিষ্ট লাগে না। খুব ভাল লাগে সত্য, কিন্তু মিষ্ট লাগে না। পাকাশয়ের রসে প্রোটীড গ'লে যায়; আর অন্ত্রের রস শ্বেতসার, প্রোটীড ও তৈল জাতীয় পদার্থ এই তিন রকম জিনিসকেই গলিয়ে ফেলিতে পারে।

কোন জিনিসকে যদি জলে গুল্‌তে চাই এবং তা' শীঘ্র না গলে, ত কি করি? সেটাকে গুঁড়িয়ে দিই। আস্ত ড্যালার চেয়ে গুঁড়ো খুব সহজেই গলে। সুতরাং খাদ্যকে যদি শীঘ্র হজম ক'রতে চাই ত তাকে বেশ গুঁড়িয়ে দেওয়া চাই। এইজন্যই দাঁতের দরকার। খাদ্য মুখে প'ড়লেই ৩২টা দাঁতের মধ্যে প'ড়ে ছিঁড়ে কেটে পিশে ছাতু হ'য়ে যায় এবং লালার সঙ্গে মিশে হড়হড়ে হয়ে গলা দিয়ে সহজে নেবে যায়; সঙ্গে-সঙ্গে লালার সাহায্যে শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়ে থাকে। দাঁতে যা' গুঁড়ো করা, বা টুকরো করা যায় না, তা' হজম করা বড় শক্ত। কারণ পেটের ভিতর দাঁতও নেই জাঁতাও নেই। এ কথাটা কিন্তু আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই; এবং দাঁতকে বিশ্রাম দিয়ে গপ্‌ গপ্‌ করে গিলে খেতে থাকি। ফলে বিকাল বেলায় সোডা খাবার জন্য ছুটাছুটি। আরে, সোডা খেয়ে কি হবে? যা'র যা' কাজ তা'কে তাই ক'রতে দাও, দেহযন্ত্র অবাধে চলবে। খাদ্য মুখে পড়বামাত্র তিন জায়গা থেকে এই তিন রকম রস বেরিয়ে তা'কে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। জ্বর প্রভৃতি রোগ কিন্তু এমন হয় না, তখন জিব যেমন ময়লা এবং শুক্‌নো থাকে; পেটের ভিতরের অবস্থাও প্রায় সেই রকম থাকে। এ সময়ে লঘু পথ্য ছাড়া আর কিছু পেটুকের মত খেলে মিছে কষ্ট বাড়ে। তা' হজমও হয় না, তা' থেকে শরীরে বলাধানও হয় না।

মিছরি জলে গ'লে যায় আমরা জানি। কিন্তু জলে ফেলবামাত্র গলে যায় না, কিছু সময় লাগে। আমরা যা খাই তা'ও গ'লতে বা হজম হ'তে সময় লাগে, মুখে দিতে দিতেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। আমরা ত পাঁচ মিনিটে দু-থাল ভাত গলাধঃকরণ করলুম। এ-গুলোর

জন্য একটা আধার চাই, যতক্ষণ না সব হজম হয়ে যাচ্ছে। এইরকম একটা আধার ওপর পেট জুড়ে রয়েছে। এর নাম পাকাশয় stomach। পাকাশয় ভিস্তির মশকের মত দেখতে একটা থলি। এক-দিকে গলাথেকে খাবার নল এসে পৌঁছেছে, আর এক-দিক থেকে অন্ত্রের আরম্ভ হ'য়েছে। পাকাশয়ের গায়ে সূতার মত সরু সরু পেশী সব বিছান আছে, কতকগুলো লম্বালম্বিভাবে, কতকগুলা এড়ো ভাবে এবং কতকগুলো কোণাকুণি ভাবে। এদের আকুঞ্চন-প্রসারণের ফলে পাকাশয় বিভিন্ন আকার ধারণ ক'রতে থাকে, এবং তা'র ভিতরে ডাল তরকারী আছে, তা'কে আচ্ছা ক'রে তারাও পাকাতে থাকে। এ রকম করা'তে পাকাশয়ের ভিতরকার পাচক রস সেই খাদ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশতে পারে। এই রসের সঙ্গে মেশায় এবং এই রকম নাড়া-নাড়ি ঘাঁটা-ঘাঁটিতে খাদ্যের প্রোটিড অংশ অনেকটা হজম হয়ে যায় এবং সমস্তটা কাদার মত হ'য়ে আস্তে আস্তে গিয়ে হাজির হয়। পাকাশয় থেকে অন্ত্রে যাবার পথ বড় সরু; কাদার মত না হ'লে সেখান দিয়ে বড় যেতে পারে না। যতক্ষণ না কাদার মত হচ্ছে, ততক্ষণ তা' পাকাশয়েই জমে থাকে। পাকের পক্ষে পাচক রসের যেমন দরকার, পাকাশয়ের নড়া চড়াও তেমনি দরকার। যদি পুনঃপুনঃ অতি ভোজন ক'রে পাকাশয়কে সর্ব্বদা অতি মাত্রায় ফুলিয়ে রাখে, তবে তা'র উপরকার মাংপেশীগুলা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, তা'রা আর আগেকার মত ছোট বড় হতে পারে না। টানাটানি ক'রে একটা রবারের নলকে খুব লম্বা ক'রে ফেলানতে তা'র যেমন আকুঞ্চন-প্রসারণ শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এও সেই রকম। এই রকমে পাকাশয়ের নড়া-চড়া প্রায় বন্ধ হয়ে আসে; এবং এর মধ্যে যে খাদ্য এসে পৌঁছায়, তার সকল অংশের সঙ্গে পাচক রসের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হতে পারে না; কাজেই তা হজম হয় না। হয় ত মাংসপেশীগুলির কোন দোষ ঘটে নি; কিন্তু এমন দ্রব্য আহার করলুম যা'র উপর পাচক রস সহজে কাজ করতে পারে না। তা' হলেও হজমের ব্যাঘাত হবে। তেলে বা ঘীয়ে ভাজা জিনিসের প্রতিকণা ঘীয়ে ডুবে আছে। এই তেল বা ঘীয়ের আবরণ ভেদ ক'রে পাচক রস তা'তে পৌঁছুবে কি করে? পৌঁছুতে দেরী হয়। আবার এমনও হতে পারে যে, মাংস-পেশীগুলি সুস্থ অবস্থায় আছে, খাদ্যও সুপাচ্য, কিন্তু খেয়ে উঠে গল্‌গল্ করে দু-ঘটী জল খেয়ে পাচক রসকে পাতলা ক'রে ফেললুম। তাতেও ঐ ফল হবে। আধ আউন্স নাইট্রিক এসিডে একটা পয়সা ফেলে দিলে তা অল্পক্ষণেই গলে যায়। কিন্তু তা'র সঙ্গে দশ বাল্‌তি জল মেশা'লে এমন গ'ল্‌বে কি?

ভুক্ত অন্ন পাকাশয়ে গিয়া যদি পরিপাক না হয় তবে সেইখানেই জম্‌তে জম্‌তে তা পচে উঠে। সাধারণতঃ যা' খাই, তা' প'চলে কি হয়? ট'কে যায় এবং কতকগুলা গ্যাস তৈরী হ'য়ে তাতে গাঁজা উঠতে থাকে। পেটের ভিতরেও তাই হয়। গ্যাস তৈরী হ'য়ে পেটের ভিতর ঘড়ঘড় ক'রতে থাকে, পেট ফাঁপে, ঢেঁকুর উঠে; এবং তাতে অনেক সময়ে দুর্গন্ধ থাকে। তা' ছাড়া অম্বল হয়। একটু লেবুর রস চোখে দিলে জ্বালা করে, জল পড়ে; নাকে দিলে জ্বালা করে, জল পড়ে। পেটের ভিতর যে অম্লরস তৈরী হয়, তারও ফল জ্বালা করা

এবং জল পড়া। নাক চোখের জলের মত এ জল অবশ্য বাইরে পড়ে যায় না, পাকাশয়ের মধ্যেই জমে। দেহের যে কোন ফাঁপা যন্ত্রের ভিতরে প্রদাহের কারণ ঘটলে এই রকম জল প'ড়তে থাকে এবং তাতে কফ বা আমের মত পদার্থ মিশানো থাকে। এই রকম জল বেরুবার উদ্দেশ্য, প্রদাহের কারণকে ধুয়ে ফেলা বা তা'র শক্তি হ্রাস করা। যে বিষ প্রদাহ ঘটাচ্চে, তা যদি উগ্র হয়, পাকাশয় তা'কে তাড়াতাড়ি বমির আকারে বার ক'রে দিবার চেষ্টা করে; এবং যখন বমি করে দিতে না পারে, তখন পেটে বড় যন্ত্রণা হয়। এ সময়ে ঐ বিষকে বার করে দেওয়াই চিকিৎসা। এবং বার ক'রবার সহজ উপায় খুব খানিকটা অল্প গরম জল খাওয়া। খেতে খেতেই বমি হয়ে পাকাশয় ধুয়ে সব বেরিয়ে যা'বে এবং যন্ত্রণার উপশম হবে। এ রকম বমি করা'তে কষ্টও খুব কম—গা বমি বমি নেই, বারবার ওয়াকতোলাও নেই।

কতকগুলা জিনিস পেটের মধ্যে প'চে প্রদাহ উপস্থিত ক'রচে; কষ্ট পাচ্চি। বন্ধু বলিলেন, সোডা খাও। সোডা খেলে অম্লরস নষ্ট হয়ে ক্ষণিক শান্তি পা'ব সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগের ত কোন প্রতীকার হয় না—পেটের ভেতর যে কাণ্ড হচ্ছিল, তা' হতেই রৈল। পচা জিনিসগুলো সেখান থেকে বেরিয়ে গেল না; তারা আরও প'চতে লাগল; আবার নূতন করে অম্লরস তৈরী হ'তে লাগল। এ অবস্থায় যদি আহার কর ত কি হয়? পাকাশয়ে জল বেরিয়ে পাচক রস পাতলা হ'য়ে গেছে এবং আম থাকার জন্য এমন অবস্থা হয়েছে যে, তা ফুঁড়ে সে রস খাদ্যের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারে না। তাই সে খাদ্যও আবার প'চতে লাগল আবার তা'র থেকে অম্বল হল; এই অম্লে নূতন ক'রে পাকাশয়ের প্রদাহ হল; আবার বেশী করে আম ও জল বেরুল; এবং সেগুলোর জন্য এর পরের বারের খাদ্যও প'চতে লাগল। এই রকম চ'লতে রৈল, Dyspepsia পাকা হয়ে দাঁড়াল। রোগের প্রতিকার করতে চাও, ত তার কারণ বর্জ্জন কর:—

১। পেটের মধ্যে পচা জিনিস যা' থাকে তাকে রোজ ধুয়ে বার ক'রে দাও। রোজ সকালে অল্প গরম জল খেয়ে বমি ক'রতে পার বা বেশী গরম (চা'র মত গরম) জল এক গেলাস ক'রে খেতে পার। এই জল পাকাশয় ধুয়ে নিয়ে অন্ত্র-পথে বেরিয়ে যাবে।

২। পেটে কিছু থাকতে খেয়ো না। অনেক সময়ে অম্বল হয়ে যে কষ্ট হয়, তাকে ক্ষুধার জ্বালা বলা ভুল হয়। একটু বুদ্ধি ক'রে সে ভুল কাটাতে হবে।

৩ সিটে, ছিবড়ে, হাড়, শক্ত বীজ বা যে কোন জিনিসকে দাঁতের সাহায্যে ছেঁড়া বা পেশা না যায় সে সব জিনিস স্পর্শ কোর না; তেলে বা ঘীয়ে ভাজা বা মাখান জিনিস, বা যে সব বীজে তেল বেশী আছে, তাও বর্জ্জন কর। চিনি গুড় প্রভৃতি আম বাড়ায়; এই জন্য মুখে দিবামাত্র চটচটে হ'য়ে উঠে। এগুলা বেশী খাওয়া কোন সময়েই ভাল না, অম্ল রোগে একেবারে না খাওয়াই ভাল।

৪। যা কিছু খাবে, বেশ করে চিবিয়ে খাবে।

৫। খাবার সময়ে বা খাবার পরে দু ঘণ্টার মধ্যে জল বা কোন জলীয় পদার্থ খেয়ো না;

এবং যা' খাবে তা' যথাসম্ভব শুকনো অবস্থায় খাবে? কেবলমাত্র পাচক রসে তা' ভিজুক।

৬। পেট ভরাট করে খেয়ো না।

৭। খেয়ে উঠেই ঘুমিও না। নিদ্রিত অবস্থায় হজম হ'তে দেরী লাগে। তা'র প্রমাণ বেলা দশটায় যা' আহার করি, তা' পরিপাক হয়ে বিকাল ৪টার মধ্যে বেশ ক্ষুধা বোধ হ'তে পারে। কিন্তু রাত্রে দশটার আহারের পর তা'র পরদিন বেলা দশটার আগে আর বড় ক্ষুধা লাগে না।

৮। রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম ক'র, শরীরকে সুস্থ সবল রাখবার চেষ্টা কর। দুর্ব্বল দেহে হাত-পায়ের পেশীগুলা যেমন রোগা হয়ে যায় এবং তাদের জোর কমে, পাকাশয়ের পেশীদেরও তেমনি হয়। তা' ছাড়া পাচক রসেরও তেমন তেজ থাকে না। পাকাশয়ের মত অন্ত্রের গায়েও পেশীতন্তু সব ছড়ান আছে; এক থাকে লম্বালম্বিভাবে, এক থাকে এড়ো ভাবে। এদেরো পেশীদের আকুঞ্চণ-প্রসারণের একটী ধারা আছে। সব গুলি এক সঙ্গে সঙ্কুচিত হয় না। কতকগুলা ছোট হল, তার নীচে কতকগুলা হল তার নীচে কতকগুলা হল; পরক্ষণেই যেগুলা ছোট ছিল সেগুলা বড় হল, যেগুলো বড় ছিল, সেগুলো ছোট হল। দেখ্‌লে মনে হয় যেন অন্ত্রের উপর দিয়ে ঢেউ চলচে, চলন্ত কেঁচোর গাগে যেমন হতে থাকে। এই ক্রিয়ার নাম peristalsis এবং এর চেষ্টা ভিতরকার জিনিসকে নীচের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। অর্দ্ধজীর্ণ অন্ন পাকাশয় থেকে অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে peristalsisএর ফলে বরাবর নীচের দিকে নামতে থাকে; সঙ্গে-সঙ্গে অন্ত্রের পাচক রস তার উপর ক্রিয়া করতে থাকে, এবং তাকে একটু একটু করে গলিয়ে জলবৎ করে ফেলে। দ্রবাবস্থায় রক্তে মেশবার আর কোন বাধা নেই, কারণ অন্ত্রের গায়েই অসংখ্য capillary ছড়ান আছে। (তৈল-জাতীয় পদার্থ একেবারে দ্রব হয় না; তাই শুষে শুষে capillaryতে ঢুকতে পারে না, একদম আলাদা পথ দিয়ে রক্তে গিয়ে মেশে।) রক্তধারার সঙ্গে এই খাদ্য সকল Cellএ গিয়ে পৌঁছুল এবং তাদের পুষ্টিসাধন করল। এতক্ষণে খাদ্যের সার্থক হল।

যতদূর সম্ভব পরিপাক হয়েও কতকটা জিনিস পড়ে থাকে, যা হজম হবার নয়। এগুলো আবর্জ্জনা। এদের বার করে দিবার জন্য হজম হ'বার পরও peristalsis চ'ল্‌তে থাকে এবং এদের ঠেলে নিয়ে গিয়ে মলদ্বারের কাছে হাজির করে দেয়। পথে আস্‌তে-আসতে তাদের জলীয় অংশ রক্তে শুষে গিয়ে তারা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্ত্রের শেষ দিকের এই অংশ, যেখানে তারা এসে জমছে, তার নাম Rectum, আমরা নাম দিলাম মলভাণ্ড। মলভাণ্ডে খানিকটা ময়লা জমলেই আমাদের খবর হয়, এবং আমাদের চেষ্টা হয় তাকে বার ক'রে দেওয়া। অনেক সময়ে কাজের ভিড়ে বা লজ্জায় পড়ে বা আলস্য বশতঃ আমরা মলভাণ্ডের আবেদন অগ্রাহ্য করি। এই রকম ক'রতে-ক'রতে এমন অবস্থা হয় যে, অনেক ময়লা জমা হলেও মলভাণ্ড আর সাড়া দেয় না। এ সময়ে পিচকারী দিয়ে হয় ত দু'সের ময়লা বার হয়; কিন্তু রোগী নিজেই আশ্চর্য্য হয় যে, ভিতরে

ত ময়লা থাকতেও তার মলত্যাগের চেষ্টা কিছু ছিল না। যা আবর্জনা অপকারী হলেই তাকে বার করে দিবার জন্য দেহ যন্ত্রের এত চেষ্টা, তাকে শরীরের মধ্যে পুষে রেখে দিলে ক্ষতি হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর ইত্যাদি। এ ছাড়া কত বড় বড় রোগ আছে, যার কল্যাণে কত বড়-বড় ডাক্তারের মোটর, জুড়ি চলছে।

কোষ্ঠবদ্ধতার একটা প্রধান কারণ পূর্ব্বেই বলেছি। বেগধারণটা মহাপাপ, কখনো ক'রতে নেই। আর যদি পূর্ব্বে ক'রে থাক এবং এখন তা'র ফলভোগ ক'রচ এমন হয়, তবে এখন থেকে এক-বেলা বা দুবেলা সময়মত পায়খানায় গিয়ে মলভাণ্ডের বদ অভ্যাস ছাড়াতে হবে; সে যাতে সময়-মত সাড়া দেয়, এমন শিক্ষা তাকে দিতে হবে।

আরও কয়েকটী কারণে কোষ্ঠবদ্ধ হ'তে পারে। উপরে যা' বলা হয়েছে, তার থেকে অনেক একটু আন্দাজ পাওয়া যাবে। যদি বেছে-বেছে লঘুপথ্য খেতে থাকি, তবে তার সবটা প্রায় হজম হ'য়ে যাওয়াতে আবর্জ্জনা কম থাকে। এইজন্য মলভাণ্ডে পৌঁছে আমাদের সাড়া জাগাতে পারে না, ভিতরেই জমতে থাকে। এর ওষুধ ফলমূল, শাক সবজী ভাজাভাজা আটা প্রভৃতি। এদের মধ্যে অপাচ্য ছিবড়ে-ছাবড়া বেশী থাকাতে সে গুলো সহজ জোলাপের কাজ করে। চিকিৎসক একজন রোগীকে প্রত্যহ জোলাপ নিতে বলেন। রোগী প্রশ্ন করেন, রোজ জোলাপ নেওয়া কি স্বাভাবিক? চিকিৎসক উত্তর দেন, বেছে-বেছে খোসা ছিবড়ে বাদ দেওয়া fine জিনিস খাওয়া কি স্বাভাবিক? অর্থাৎ খাদ্যের দুষ্পাচ্য অংশ একেবারে বাদ দেবার চেষ্টা করলে জোলাপ না নিয়ে উপায় নেই। একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার; ফলমূল ইত্যাদি খেলে পেট পরিষ্কার হয় ভাল। না হ'লে কিন্তু ওগুলো পেটের ভিতরে জমে উল্টো উৎপত্তি হয়।

অনেক সময়ে মল এত কঠিন হয় যে, তা'কে বার করা দুষ্কর। যারা জল কম খান তাদের প্রায়-এই রকম হয়। এর চিকিৎসা বেশী জল খাওয়া; অবশ্য সেটা খাবার সময়ে নয়। সকালে এক গেলাস, দুপুরে ও রাত্রের আহারের মধ্যে দু এক গেলাস, অন্ততঃ জল খাওয়া উচিত।

Paristalsis এর জোর না থাকাও কোষ্ঠবদ্ধতার এক কারণ। অন্ত্রের উপরকার পেশী দুর্ব্বল হইলেই Peristalsis-এর জোর কমে। এর প্রতীকার ভাল খেয়ে এবং রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম ক'রে দেহকে সবল করা। তখন অন্যান্য পেশীর সঙ্গে অন্ত্রের পেশীও সবল হয়ে উঠবে। বিশেষ ক'রে পেটের exercise করা দরকার, তা' হ'লে অন্ত্রের পেশীর উপর কাজ বেশী হবে। পায়খানায় যাবার আগে ১০।১৫ মিনিট পেটে মালিশ করলেও উপকার হয়। মলবাহী অন্ত্র আরম্ভ হয়েছে ডান কুঁচকির কাছে; সেখান থেকে সোজা উপরে উঠেছে পাঁজরার ভিতর কিছুদূর; সেখান থেকে পেটের সামনে দিয়ে বাঁ পাঁজরার ভিতর গেছে; সেখান থেকে বরাবর নেমে গেছে মলদ্বার পর্য্যন্ত। মালিশ করতে হবে এক লাইনে ডান কুঁচকির কাছ থেকে ডান পাঁজরা পর্য্যন্ত; সেখান থেকে বাঁ মাইএর কিছু নীচে; তার পর বাঁ দিক ঘেঁসে বরাবর নীচের দিকে। একটা ভারি বল (গোলা) কাপড়ে জড়িয়ে ঐ লাইনে গড়ালেও হয়। নিয়মিত মালিশ করা চাই।

খাদ্য পরিপাক না হ'লে পাকাশয়েও যা হয়, অন্ত্রেও তাই হয়,—গ্যাস তৈরী হয়ে পেট ভুট ভাট করে, পেট ফাঁপে, আম আর জল বেশী ক'রে বেরুতে থাকে, জলে আর বাতাসে মিশে পেটের ভিতর কলকল ক'রতে থাকে। সঞ্চিত মল পচেও এই সব কাণ্ড হয়। দূষিত পদার্থকে পাকাশয় যেমন তাড়াতাড়ি বার

ক'রে দিবার চেষ্টা করে, অন্ত্রও তেমনি করে; তবে পাকাশয় বার করে উপর দিকে বমির আকারে, অন্ত্র বার করে নীচের দিকে। এই রকম করে উদরাময়ের সৃষ্টি হয়। উদরাময় আরম্ভ হইলেই বুঝতে হবে পেটে দূষিত পদার্থ জমেছে এবং অন্ত্র তা' বার করে দিবার চেষ্টা করছে। বার করে দেওয়াই মঙ্গল। এই জন্য টপ করে ডায়েরিয়া বন্ধ করতে নেই। দূষিত পদার্থ যা বেরুচ্চে তাকে বেরিয়ে যেতে দাও। আবার নতুন করে কিছু না জমে তার চেষ্টা কর। পেটের অসুখের ওপর কিছু আহার কোরো না। তবে, যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তার ক্ষতি পূরণ দরকার। এই কারণে বার্লি ওয়াটার বা ছানার জল প্রভৃতি খেতে পার। অনেক সময় এমন হয় যে, কেবল জলই বেরুতে থাকে, দূষিত পদার্থ যা—তা ভিতরেই থেকে যায়। যাঁরা কোষ্ঠ-বদ্ধতায় ভোগেন, তাঁদের মধ্যে কারুর এরকমও প্রায়ই হয়ে থাকে। কঠিন মল জমে জমে যে প্রদাহ সৃষ্টি করে, তার ফলে অন্ত্রের মধ্যে জল আর আম জ'মতে থাকে। এইগুলো মধ্যে মধ্যে উদরাময়ের আকারে দেখা দেয়। রোগী মনে করে, পেট পরিষ্কার হোলো; কিন্তু সেটা মহা ভুল।

দূষিত পদার্থকে বার করবার জন্য উদরাময়, তা যতক্ষণ না নিঃশেষ বেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ এ থামবে না। অতএব উদরাময় থামাতে হলে অন্ত্রের ভিতরকার সমস্ত দূষিত পদার্থ বার করে দেওয়া উচিত। দু-চারবার দাস্ত হবার পরও যদি পেটের অসুখ বন্ধ হ'তে না চায়, ত চিকিৎসকেরা ক্যাষ্টরঅয়েল দিয়ে থাকেন। এত বার দাস্ত হ'ল তার উপর ক্যাষ্টার অয়েল? হাঁ। ক্যাষ্টর অয়েল খেলে আরও দু-চারবার দাস্ত হয়ে থামতে পারে। না খেলে আর দুবারও হতে পারে, বিশবারও হতে পারে, কিছু ঠিক নেই। আমি এখানে সাধারণ বদ্ হজমের কথা বলচি' যা অনেকে গ্রাহ্য করে না এবং গ্রাহ্য না করিলেও শয্যাশায়ী হতে হয় না। দুবার দাস্ত হয়ে নাড়ী ছেড়ে গেল, বা দশ বৎসর ধরে এক-ঘেয়ে পেটের অসুখ চলচে, এসব এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। ভাল জিনিসই পেটের ভিতর পচে এত কাণ্ড বাধায়, তবে লোকে পচা জিনিষ খায় কোন্ আক্কেলে? পচা মাছ মাংস খেয়ে কলেরার মত বমি ও দাস্ত হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লোক মারা যেতে পারে। অন্ত্র কোন জিনিসকে বার করে দিতে চাচ্চে, অথচ কঠিন মলে বা আর কিছুতে পথ বন্ধ থাকাতে পেরে উঠছে না, তখন পেটে যন্ত্রণা হয়, পেট কামড়ায়। আমরা বাধা পেলে পিছিয়ে যাই। অন্ত্র ত আমাদের মত বুদ্ধিমান নয় সে পিছায় না, বাধা অতিক্রম করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তারির উৎকট peristalsis-এর ফলে এই যন্ত্রণা। পেট কামড়ানি সময়ে সময়ে সাংঘাতিক হতে পারে। সুতরাং ওর চিকিৎসা ডাক্তার কবিরাজের হাতে থাক। আমাদের শুধু এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে, পেটে চাপ দিলে, বা জোরে একটা কাপড় বাঁধলে বা গরম জলের বোতল বসিয়ে রাখলে ছোটখাট পেট কামড়ানির উপশম হয়।

ধান ভানতে কি শিবের গীত গাইলাম। খাদ্যের কথা হতে হতে উদরাময় বা কোষ্ঠ-বদ্ধতার আলোচনা আরম্ভ হ'ল কেন? একটু আলোচনা করতে হয় বৈ কি। বাইরের খাদ্য আর দেহের cell, এদের মধ্যে পাক-প্রণালী হচ্চে স্থলপথ। তার পরে আছে শিরা উপশিরার জল-পথ। cell-পাড়ায় হাহাকার উঠেছে, ভারে ভারে খাদ্য পাঠাচ্চ; কিন্তু পথের কোথায় পুল ভাঙ্গলো কোথায় জলে ডুবলো, সে সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকাও দরকার এবং এ রকমের বিপদের হাতাহাতি প্রতীকারও জানা দরকার। তা' না হ'লে খাদ্যের ভার স্তূপাকার হয়ে পথের মাঝে প'চতে থাকবে; আসল যার দরকার, সে একটা কণাও পাবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, এচ, এম, বি)

আর্য্য উপদেশ শ্রীশ্রীমৎস্বামীকেশবানন্দ মহাভারতী মহাত্মার সমাহিত চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস। প্রকাশক শ্রীঅচলানন্দ ভারতী। ঋষিযুগের বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ ধর্ম্ম প্রবন্ধ সকল ইহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রথমেই সৃষ্টিতত্ত্ব। ইহাতে জানিবার ও ভাবিবার অনেক জিনিস আছে। তাহার পর "আমি কে?" প্রবন্ধে এই দেহের ব্যাধি বলিতে গ্রন্থকার বলিতেছেন— 'কামাদি প্রাপ্তির বাসনা এবং শান্তি ও ক্ষমাদির অভাব বা অপ্রাপ্তি, অ-বস্তুকে বস্তুজ্ঞান মিথ্যাকে সত্য বোধ এবং বহির্মুখীন প্রকৃতি বা মায়া-জীবের অঙ্কুর, এই দেহের ব্যাধি.—'আমাকে' আমি চিনি না। আর জ্ঞানরূপ মনোবৃত্তিকে 'মহাকারণ দেহ' বলে, ঐ মনোবৃত্তির উৎপত্তি ও নাশ উক্ত দেহের ব্যাধি। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার তাই বলিতেছেন 'যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি সৎগুরুর উপদেশ গ্রহণে কার্য্য করিবেন। নচেৎ 'আমিকে' চিনিবেন না। "জীবও ব্রহ্ম।" ইহাতে বলা হইয়াছে 'জীবই শিব, নরই নারায়ণ।' এইরূপ বহু উপদেশ ইহাতে আছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত কাব্যতীর্থ, সাংখ্যরত্ন, কবিরত্ন মহাশয় যে ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে অনেক সুন্দর উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা গৃহ পঞ্জিকার মত এই পুস্তকখানি সকলকে সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতেছি। মূল্য ৷৷০ আনা। ১৩নং যদুনাথ মিত্রের লেন, শ্যামবাজার-কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

ধূমকেতু। আমরা ২৩শে শ্রাবণ হইতে ধূমকেতু নামে একখানি পত্রিকা পাই [illegible]। ইহার সারথী হইয়াছেন বাঙ্গালার উদীয়মান কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী সাহেব একজন সত্যিকারের ভাবুক কবি। দেশের যত সব আবর্জ্জনা পরিষ্কার করাই ধূমকেতুর উদ্দেশ্য। আমরা ইহার যে কয় সংখ্যা পড়িয়াছি, তাহাতে অনুমান হয় ধূমকেতুর উদ্দেশ্য সার্থক হবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা কচ্চি। 'ধূমকেতু' সপ্তাহে দুইবার করিয়া উদিত হইয়া থাকেন ইহার বাৎসরিক মূল্য সডাক ৫৲টাকা নগদ মূল্য ৴০ আনা। ধূমকেতু কেন্দ্র ৩নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

মজলিস। নূতন প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র। ২৭শে শ্রাবণ হইতে বাহির হইতেছে। সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার। মাসিক আকারে প্রতি সপ্তাহে ছবি সমেত বেশ মজলিসী প্রবন্ধ লইয়া প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার চারি সংখ্যা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' শীর্ষক প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দর হইয়াছে। তা'ছাড়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়ের 'শনিবার' ও 'স্বদেশ গৌরব', কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর বি এ, মহাশয়ের 'উদ্ভট সাগর' এবং শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'বেগমী আমল' বড় সুন্দর লাগিয়াছে। "বিটকেল নামধারী লেখকের যে কয়টী লেখা বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই 'বিটকেলি' লাগিল। ইহার মূল্য ২৷৷০ টাকা। ২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।